প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক প্রস্তুতি পরীক্ষার জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে ভর্তির সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে সাম্মানিক একটি বার্ষিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথ্য বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটাই মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায় ব্যাপকতর ব্যবহারে মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

15তম পুনর্মুদ্রণ : জুন 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ ঐচ্ছিক বাণিজ্য **সাম্মানিক স্তর**

পাঠ্যক্রম ঃ পর্যায় ঃ ECO : 02 : 7-12

	রচনা	সম্পাদনা
একক **40-44**	অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ব্যানার্জী	অধ্যাপিকা লেখা মুখার্জী
একক **45-51**	অধ্যাপক মৃণাল কান্তি ব্যানার্জী	অধ্যাপিকা লেখা মুখার্জী
একক **52-57**	অধ্যাপক অমল কুমার কুন্দগ্রামী	ড. মহালয়া চ্যাটার্জী
একক **58-62**	অধ্যাপক অমল কুমার কুন্দগ্রামী	অধ্যাপিকা শীলা মান্না
একক **63-66**	ড. শ্রাবণী ঘোষ	অধ্যাপিকা ইন্দ্রানী মুখার্জি
একক **67-71**	অধ্যাপিকা মাধবী সেনগুপ্ত	অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ECO — 2

বাণিজ্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম (ব্যবসায়িক অর্থনীতি)

পর্যায়

7

একক 40	অর্থনীতির সমস্যার প্রকৃতি	9–14
একক 41	সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব	15–20
একক 42	অর্থব্যবস্থার মূল কাজ ও কর্মপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য	21–25
একক 43	প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়	26–31
একক 44	বিভিন্ন অর্থ ব্যবস্থার রূপ	32–45

পর্যায়

8

একক	45	চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব : কয়েকটি মৌলিক ধারণা	46–52
একক	46	ভোগ, তৃপ্তি ও চাহিদা	53–59
একক	47	চাহিদার ভিত্তি : মার্শাল প্রদত্ত ব্যাখ্যা	60–68
একক	48	চাহিদার ভিত্তি ১ নিরপেক্ষতা তত্ত্ব	69–86
একক	49	চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা	87–94
একক	50	যোগানের নিয়ম ও স্থিতিস্থাপকতা	95–99
একক	51	উৎপাদনের নিয়ম ঃ স্বল্পকাল দীর্ঘকাল	100–117

পর্যায়

9

একক	52	উৎপাদন ব্যয়	118–135
একক	53	বাজার ও আয় বিশ্লেষণ	136–149
একক	54	পূর্ণ প্রতিযোগিতা	150–177
একক	55	একচেটিয়া বাজার	178–202
একক	56	একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা	203–211
একক	57	অলিগোপলি বা মুষ্টিমেয় বিক্রেতার বাজার	212–217

পর্যায়

10

একক 58	উপাদানের দাম তত্ত্ব	218–229
একক 59	খাজনা তত্ত্ব	230–246
একক 60	মজুরি তত্ত্ব	247–278
একক 61	সুদ তত্ত্ব	279–297
একক 62	মুনাফা তত্ত্ব	298–311

পর্যায়

11

একক 63	জাতীয় আয় ও তার পরিমাপ	312–325
একক 64	ভোগ অপেক্ষক ও গুণক	326–348
একক 65	অর্থ	349–359
একক 66	মুদ্রাস্ফীতি	360–371

পর্যায়

12

একক	**67**	বিনিয়োগের ত্বরণ তত্ত্ব ও বাণিজ্য চক্র	372–377
একক	**68**	বাণিজ্য চক্র	378–388
একক	**69**	ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও আর্থিক নীতি	389–401
একক	**70**	সরকারী আয় ও ব্যয়	402–413
একক	**71**	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন	414–432

একক ৪০ ◆ অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি

গঠন

৪০.০ উদ্দেশ্য

৪০.১ প্রস্তাবনা ঃ জীবন ধারণের সমস্যা

৪০.২ ক্রুশোর সমস্যা

৪০.৩ আধুনিক জটিলতা

৪০.৪ বিনিময় ও বাজারের উদ্ভব

৪০.৫ সরকারী প্রভাব

৪০.৬ রাষ্ট্রের সমস্যা

৪০.৭ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

৪০.৮ সারাংশ

৪০.৯ অনুশীলনী

৪০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৪০.০ উদ্দেশ্য

সমাজবদ্ধ মানবজীবনে প্রধান সমস্যা নানা অভাব পূরণ করে জীবন ধারণ করা। জীবন ধারণের তাগিদেই একজন মানুষকে বহুজনের সমাজে মানুষের মতই বিভিন্ন কাজে আত্মনিয়োগ করতে হয়। অভাব পূরণের প্রয়োজনে মানুষ যে কর্মপ্রণালী বা প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকে সে-আচরণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই অর্থনৈতিক চর্চার মূল বিষয়। রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতো, একক জীবনে বা বৃহত্তর সমাজ জীবনে মানুষের অর্থনৈতিক প্রণালীর মূলে আছে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব আলোচনার শুরুতে সেই মূল প্রকৃতি এখানে আলোচিত। সমস্যার মূল প্রকৃতি না বুঝলে মানুষের সমাধান প্রচেষ্টাও ঠিকমতো বোঝা যায় না। মূল অর্থনৈতিক সমস্যার পর্যালোচনাই সব রকম অর্থতত্ত্বের আলোচনায় প্রবেশের সিংহদ্বার।

৪০.১ প্রস্তাবনা ঃ জীবন ধারণের সমস্যা

আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের প্রধান অংশ জুড়েই আছে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি। অতীতেও মানবজীবনে এসব সমস্যাবলী ছিল। এমন কি নির্জন দ্বীপে একলা বসবাসকারী রবিনসন্ ক্রুশোর কল্পকাহিনীতেও দেখা যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নির্বাসিত মানুষটি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি—খাদ্য, পানীয় জল, বাসস্থান ইত্যাদি নিজেই সংগ্রহ করে নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। আধুনিক মানুষ

রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমাজবন্ধ। তাছাড়া, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও তার বাস্তব প্রয়োগ, যোগাযোগ তথা তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি একদিকে যেমন প্রয়োজন মেটাতে উন্নতমানের বিপুল পরিমাণ পণ্যসামগ্রী তার কাছে হাজির করছে, অন্যদিকে তেমনি তার দৈনন্দিন জীবনের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান অনেক অনেক বেশী জটিল ও কঠিন করে তুলেছে।

৪০.২ ক্রুশোর সমস্যা

ক্রুশোর কাছে বা বেশ কয়েক শতাব্দী আগে সমস্যাগুলি থাকলেও সেগুলির এত তীব্রতা ও জটিলতা ছিল না। ক্রুশোর দৈনন্দিন জীবনযাপন ও কর্ম্মপ্রণালীর মধ্যেই অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি লুকিয়ে আছে। সেখানে আর আধুনিক রাষ্ট্রের মানুষের জীবনযাপনে মূল সমস্যা একই। নিজ প্রয়োজন মেটাতে ক্রুশোর কাছে ছিল নিজ শ্রম এবং নির্জন দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ। রোজকার জীবনে ফলমূল খেতে ভাল লাগে না, অতৃপ্তি আসে। আবার পিপাসা মেটাতে বার বার ঝর্ণায় গিয়ে জলপান বেশী পরিশ্রমসাধ্য। তাই সে নিজশ্রমের সবটা ফলমূল সংগ্রহে খরচ না করে কিছু শ্রম দিয়ে শিকার করে বন্যপ্রাণী এনে এবং আরও বুদ্ধি করে চক্‌মকি পাথর দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ঝল্‌সানো মাংস পাওয়ার ব্যবস্থা করলো। তৃষ্ণা মেটাতে কম সময় আর পরিশ্রম ব্যয় করতে নিজশ্রম খরচ করে কাঠের পাত্র তৈরী করে একবারেই ঝর্ণা থেকে জল এনে সারাদিনের প্রয়োজন মেটাতো। নিজ বাসস্থানের কাছেই ঝর্ণার জলধারা পেতে সে শিকারে শ্রমব্যয় কমিয়ে সেই শ্রম দিয়ে ঝর্ণা থেকে তার বাসস্থান পর্যন্ত জলধারা আনতে একধরনের সরল 'পাইপ লাইন' তৈরী করল। খাদ্য ও পানীয় জল সংগ্রহের জন্য সময় ও শ্রমব্যয় কমে যাওয়ায় ক্রুশো জঙ্গলের গাছ, লতাপাতা, ইত্যাদি দিয়ে ক্রমশ একটি কুটির বানিয়ে বাস করতে থাকলো। এভাবে সে নিজ উদ্যোগে, নিজশ্রম ব্যয় করে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগে সমর্থ হ'ল। কিন্তু যত সহজই হোক তাকে নিঃসঙ্গ জীবন থেকে মুক্তি পেতে হবে। সমুদ্রে জাহাজ দেখলেই হবে না, কূল থেকে মাঝদরিয়ায় জাহাজে উঠতে প্রয়োজন মজবুত ও বড় নৌকা। দৈনন্দিন জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসায়, অন্যদিকে কম সময় ব্যয় হওয়ায়, ক্রুশো বেশ কিছু সময় ধরে কাজ করে সেই রকম নৌকা তৈরী করতে পারলো। এভাবে একদিন সে নির্জন দ্বীপের নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে জীবনে মুক্তির স্বাদ পেল।

এখানে লক্ষণীয় যে ক্রুশো তার জীবন ধারণের সমস্যা মেটাতে বেশ বিচার বিবেচনা করে কাজ করেছে। প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে প্রথম দিকে সে বেশীরভাগ সময়ই খাদ্য ও পানীয় সংগ্রহে ব্যয় করতো। পরে, দিনের সীমিত সময় আর নিজ পরিশ্রমের ও ক্ষমতার কিছুটা অন্যভাবে ব্যয় করে ক্রমে আরও বেশী তৃপ্তিদায়ক ও নিরাপদ স্বাচ্ছন্দ্যের দ্রব্যসামগ্রী নিজেই তৈরী করে অভাব মেটাতে পেরেছে। নির্জন দ্বীপে একক অবস্থায় তার সামনে অভাব ছিল অনেক কিছুর, কিন্তু সেগুলি মেটাতে তার হাতে ছিল সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় আর কায়িক পরিশ্রমের সীমিত ক্ষমতা। এ-দুটি সীমিত উপকরণ সে বেশী বা কম প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে নিয়ে সেই ক্রম অনুযায়ী দ্রব্য তৈরী করারা কাজে ব্যয় করেছে। এভাবেই দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করে, নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে, আরও কাম্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ, উন্নত সমাজ-জীবনের লক্ষ্যে যাত্রা করতে পেরেছে।

৪০.৩ আধুনিক জটিলতা

আধুনিক সমাজে মানুষের জীবনযাপনের কাজগুলি অবশ্যই ক্রুশোর কাজের ধরন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন

ধরনের, ব্যাপক ও জটিল। ক্রুশো একক প্রচেষ্টায় সীমিত সময় আর পরিশ্রম ব্যয় করে অভাব মেটাতো। অন্য কোনও দাবীদার না থাকায় সেখানে বিনিময় বা অর্থের ব্যবহার ছিল না, নিজেই বিভিন্ন দ্রব্য সংগ্রহ বা উৎপন্ন করে একাই সে-সব ভোগ করতে পারতো। তার কাছেও প্রয়োজনের তুলনায় উপকরণগুলি ছিল দুষ্প্রাপ্য, আজকের মতো বাজারে গিয়ে অর্থখরচ করে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। আবার, ফলমূল না শিকার-করা প্রাণীমাংস, কোনটা কত পরিমাণ ব্যবহার করবে সে-সম্বন্ধে তার পছন্দ বা সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আধুনিক সমাজেও মানুষের অভাব অনন্ত, অভাব মেটাবার উপকরণ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। এখন দ্রব্যসামগ্রী পেতে মানুষকে কর্ম্মকাণ্ডে যোগ দিয়ে, অর্থ উপার্জন করে, অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করতে হয়। স্থানীয় বা দেশের বাজারে পাওয়া না গেলে বিদেশের বাজার থেকে কিনতে হয়। কেনাবেচায় যেমন অর্থের ব্যবহার আছে তেমনি উপকরণ প্রাপ্তির বাজারের পরিধিও বিস্তৃত হয়ে পৃথিবী ব্যাপী ছড়িয়েছে। ফলে দেশ বিদেশের বিচিত্র উপকরণ-সম্ভার মানুষের কাছে এসেছে। তাঁর পছন্দ বা কোন্ দ্রব্যের ব্যবহার কখন ও কতটা করা সম্ভব সে-সিদ্ধান্ত ঠিক করাও বেশ জটিল হয়েছে। আধুনিক মানুষের অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীতে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই নির্বাচন বা পছন্দের সমস্যা। বলা বাহুল্য, ক্রুশোর একার সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যাও আজকের মতো অসীম অভাব, দুষ্প্রাপ্যতা ও পছন্দভিত্তিক হলেও এককভাবে তার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা আধুনিক সমাজের মতো এত জটিল ও ব্যাপক রূপ নেয়নি।

৪০.৪ বিনিময় ও বন্টনের কাজে বাজারের উদ্ভব

আধুনিক অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীতে আর একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ক্রুশোর একজনের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অভাব মেটাতে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ বা উৎপাদনের, এবং অভাবপূরণ বা ভোগের কাজ এক ব্যক্তিই সম্পন্ন করতো। একজন ভোগকারী বলে সেখানে দ্রব্য বণ্টনের জন্য আধুনিক ব্যবসা বা বাজারের কোনও প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীতে ব্যবসা ও বাজার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এখন একদল মানুষ দ্রব্য উৎপাদন করে। আর একদল মানুষ এ-সব জিনিস উৎপাদকের কাছ থেকে সংগ্রহ করে ক্রেতা বা ভোগকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান উৎপন্ন করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সেগুলি সংগ্রহ করে ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। এভাবে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান, ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের চাহিদা নিয়েই বাজার সৃষ্টি হয়। একদিকে অসংখ্য মানুষের প্রয়োজনীয় অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের সমস্যা। একাজে যারা জড়িত তাদের উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম বলে। অসংখ্য ফার্ম অসংখ্য দ্রব্য উৎপন্ন করে যোগান দিতে ব্যস্ত। অন্যদিকে, আর একদল মানুষ ফার্মের জিনিষপত্র বা সেবা ভোগকারীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ব্যবসার কাজে জড়িত। ফার্ম ও ব্যবসায়ী দু'দল মানুষই যোগানের কাজে লিপ্ত। উৎপাদনকারী ফার্ম সাধারণত বিক্রয় করে না, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলি সেই উৎপন্ন জিনিস ক্রয় বিক্রয় সংক্রান্ত ব্যবসা করে। দু'দলের কাজের ফলে বাজারে যোগান পৌঁছায়। আবার বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবা যোগানের লক্ষ্য ভোগকারীর অভাবপূরণ। ভোগকারীদের কাছ থেকেই আসে পণ্যের বা সেবার চাহিদা। তারা বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ব্যয় করে পণ্য ক্রয় করে চাহিদা মেটায়। উৎপাদনকারী ফার্ম বা ব্যবসায় সংগঠন, আর দ্রব্য বা সেবার চাহিদা সৃষ্টিকারী ভোগকারীরা অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার দু'-টি অঙ্গ মাত্র। উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সমাজবদ্ধ মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়োজিত। ক্রুশোর একক কর্ম প্রচেষ্টায় একদম কাজের বিভাজন ছিল না।

৪০.৫ সরকারি প্রভাব

মূলতঃ আধুনিক অর্থনীতিতে বাজার ও বিনিময় ব্যবস্থা উদ্ভবের পিছনে একটি কারণ রয়েছে যা ক্রুশোর অর্থনীতিতে নেই। আর তা হল উৎপাদনের উপকরণের মালিকানার অসম অধিকার। প্রয়োজন মনে করলে ক্রুশো তার শ্রম দিয়ে উৎপাদনের যে কোন উপকরণ (যদি তা প্রকৃতিতে লভ্য হয়) সংগ্রহ করতে পারে। যেমন, ঝরনার জলধারা আনতে 'সরল পাইপ লাইন' তৈরীর উপকরণ সে নিজেই শ্রম দিয়ে সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু আধুনিক মানুষ শুধু শ্রম দিয়েই উৎপাদনের উপকরণ বা অন্যান্য সম্পদের, যেমন যন্ত্রপাতি, কারখানা ঘর বা কয়লাখনির মালিক হতে পারে না। এক্ষেত্রে মালিকানা ভোগ করে সে, যার হাতে অনেক পুঁজি বা মূলধন রয়েছে। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় বাজারে মানুষের অভাব মোচনের ক্ষমতা, তার ক্রয়ক্ষমতা নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপকরণের ও অন্যান্য সম্পদের মালিকানা ও তার উপর তার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার দ্বারা। সম্পদের অসম মালিকানা ও অসম নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্যই আধুনিক বাজার অর্থনীতিতে দেখা যায় কারোর ক্রয়ক্ষমতা বেশী, কারোর কম।

আধুনিক অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে। পৃথিবীর সব মানুষই এখন কোন না কোন রাষ্ট্র বা সমাজে বাস করে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ আদর্শ, রীতিনীতি অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে কমবেশী নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। দেশের প্রয়োজনে সরকার পণ্যসামগ্রী সেবা উৎপাদন ও বন্টন নিয়ন্ত্রণ করেন। অথবা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। উৎপাদনে দেশের সরকার নিজেই উপকরণ সংগ্রহ করে দ্রব্য উৎপন্ন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন। অথবা, মাথাপিছু দ্রব্য প্রাপ্তির পরিমাণ স্থির করে রেশনিং প্রবর্তন করতে পারেন। পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানারকম কর আরোপ করে সরকারী ব্যয়ের অর্থসংস্থান করা ছাড়াও করের হ্রাসবৃদ্ধি করেও সমাজের মোট উৎপাদন বা ভোগব্যয় ও চাহিদা প্রায়শঃই নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে।

এখানে যে-বৈশিষ্ট্যটি লক্ষণীয় তা হ'ল, ক্রুশোর নিঃসঙ্গ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে আধুনিক কাজের মতো কোনও সরকার বা দ্বিতীয়পক্ষের অস্তিত্ব ছিল না। প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন, সংগ্রহ বা বন্টনের কাজে তাকে অন্য কারও নির্দেশ বা নিয়ন্ত্রণ মানতে হ'ত না। অর্থনৈতিক কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে নিজ প্রয়োজন ও সামর্থ্য বিচার করে দ্রব্যদ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহে মন দিতে পারতো। কিন্তু আধুনিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির বা জনসমষ্টির অর্থনৈতিক কাজে কমবেশী সরকারী প্রভাব প্রায় সবক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারী প্রভাবের বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী কয়েকটি এককে পাওয়া যাবে।

৪০.৬ রাষ্ট্রের সমস্যা

এখন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাক। বৃহত্তর জনসমাজ নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে রাষ্ট্রে বাস করে। আধুনিক রাষ্ট্র শুধু রাজনৈতিক সংগঠনই নয়, অর্থনৈতিক সংগঠনও বটে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণের জন্য, উন্নত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রই দেশের সম্পদ সদ্ব্যবহার করে আরও বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের চেষ্টা করে। অন্যদিকে নাগরিকের জীবনের, সম্পত্তির সুরক্ষা বা বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে প্রতিরক্ষার জন্যও প্রস্তুতি নিতে হয়। একদিকে যেমন প্রজা কল্যাণে উন্নত মানের খাদ্য, বাসস্থান, রাস্তা, বিদ্যায়তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়, অন্যদিকে তেমনি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হয়। কিন্তু এ সব জিনিষ উৎপন্ন করতে কোনও রাষ্ট্রেই নিজস্ব সম্পদ প্রচুর নয়। খাদ্যদ্রব্য বেশী উৎপন্ন করতে হলে বন্দুক কামান ইত্যাদি প্রতিরক্ষা উৎপাদন কমাতে হয়। দুটোই

একসঙ্গে বেশী উৎপন্ন করা সম্ভব হয় না। দেশের সরকারকে দেশের প্রয়োজনের গুরুত্ব বিচার করে নির্বাচন করতে হয় খাদ্যবস্তু না সামরিক বস্তু কোনটি কম বা বেশী উৎপন্ন করতে হবে, কোনটি উৎপন্ন করতে সম্পদ কতটা নিয়োগ বা ব্যবহার করতে পারা যাবে। নির্দিষ্ট সময়ে দেশে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ, যেমন জমি, মূলধন, শ্রম ইত্যাদি দুষ্প্রাপ্য। অপ্রচুর উপকরণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে সর্বাধিক কত পরিমাণ জিনিষ উৎপন্ন হতে পারেতো জানা দরকার। এটাই দেশের সীমিত উপকরণ ব্যবহার করে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সর্বাধিক দ্রব্য উৎপাদন সম্ভাবনার সীমা বা দেশের Production Possibility Frontier। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সীমিত উপকরণ ব্যবহার করে সর্বাধিক উৎপন্নের এই সীমার মধ্যে একটি দেশ কোনও দ্রব্যের কম বা বেশী উৎপন্নের পথ বেছে নিতে পারে, কিন্তু সীমা অতিক্রম করতে পারে না। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ্ পল স্যামুয়েলসণ্ তাঁর বিখ্যাত 'অর্থনীতি' বইয়ে দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার বিষয়টি 'মাখন' বা 'বন্দুক' এ দুটির উৎপাদন সম্ভাবনার উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। যাহোক, দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার বিচারে দেখা যায় যে ক্রুশোর মতো নিঃসঙ্গ মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা যেমন অভাব, দুষ্প্রাপ্যতা ও পছন্দ বা নির্বাচন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলে, আধুনিক রাষ্ট্রেও তেমনি অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর মূলে আছে অভাব, দুষ্প্রাপ্যতা ও পছন্দ করার ক্রিয়া। অনেকে বলেন যে, সব অর্থনৈতিক সমস্যার কেন্দ্রবিন্দুই হ'ল 'দুষ্প্রাপ্যতা' বা 'scracity'. অভাব পূরণের তাগিদেই সমাজবন্ধ মানুষ নানা কর্ম্মপ্রণালীতে যুক্ত হয়ে উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা করে দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করে অভাব মেটায়। কিন্তু কিছু পরেই আবার পুরনো অভাব নতুন করে অথবা নতুন অভাব দেখা দেয় যেগুলি পূরণ করতে মানুষ আবার অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীতে যুক্ত হয়। অনন্তকাল ধরে মানবসমাজে এই চক্রাকার আবর্তন মানুষকে ব্যস্ত রাখছে।

৪০.৭ দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের আর একটু ব্যাখ্যা দরকার। কোনও সমাজেই জমি, মূলধন, শ্রম ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যায় না। আবার নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ বিভিন্ন সেবা-দ্রব্য উৎপন্নের কাজে ব্যবহার হতে পারে। একখণ্ড জমিতে গম বা ধান উৎপন্ন, অথবা শিল্পস্থাপন করা যেতে পারে। ঐ জমি একবার শিল্পস্থাপনে ব্যবহার হলে ধান বা গম উৎপন্নের কাজে পাওয়া যাবে না। এভাবে প্রায় সব উপকরণেরই বিকল্প ব্যবহার (alternative use) আছে। সমাজকেই পছন্দ বা নির্বাচন করতে কি উৎপন্নের কাজে কোন্ উপকরণ কীভাবে ব্যবহার করা হবে। এ নির্বাচনের কাজ কখনো কখনো রাষ্ট্র করলেও অনেক ক্ষেত্রেই এ পছন্দের দায়িত্ব পালন করে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক।

৪০.৮ সারাংশ

আলোচিত অংশে আমরা জানলাম যে আধুনিক রাষ্ট্রে, নাগরিক জীবনে, এবং নিঃসঙ্গ একলা মানুষের জীবনেও, জীবনধারনের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি একই; অনেক অভাব পূরণ করতে সকলকেই অপ্রচুর উপকরণের ব্যবহার ও নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারে সেই উপকরণ অর্থনৈতিক পছন্দের কাজে কিভাবে লাগানো যায় সেই কাজে ব্যস্ত থাকে। অর্থনৈতিক কর্ম্মকাণ্ডে জড়িত অন্যান্য কয়েকটি বিষয় ও সংগঠনেরও কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। ব্যবসা সংক্রান্ত অর্থতত্ত্ব সমাজবন্ধ মানুষেরই অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীর অংশবিশেষ। অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মূল প্রকৃতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে এ অংশের তত্ত্বগুলি সঠিক অনুধাবন করা যায় না। এ-কারণেই ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের মুখবন্ধ হিসেবে সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির মূল প্রকৃতি আলোচনা হ'ল।

৪০.৯ অনুশীলনী

১। মানুষের অভাবপূরণ বলতে কি বোঝায়?

২। ক্রুশোর অর্থনৈতিক কাজ ও সমাজবদ্ধ আধুনিক অর্থনৈতিক কাজের মূল পার্থক্য কি?

৩। আধুনিক অর্থনৈতিক কাজে জটিলতার দু'টি কারণ উল্লেখ করুন।

৪। দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা বলতে কি বোঝায়?

৫। উপকরণের বিকল্প ব্যবহারের একটি উদাহরণ দিন।

৬। 'দুষ্প্রাপ্যতা' ও 'পছন্দ' ধারণা দুটির তাৎপর্য কি?

৪০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. Mankiw, N.G : *Principles of Economics*
2. Samuelson, P.A. and Nordhans, W.D : *Economics 16th Edition.*
3. Lipsey, R.G. & Chrystal, K.A : *An Introduction of Positive Economics.*

একক ৪১ ◆ সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব

গঠন

৪১.০ উদ্দেশ্য

৪১.১ প্রস্তাবনা

৪১.২ সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব

৪১.২.১ সাধারণ অর্থনৈতিক চর্চা

৪১.২.২ ব্যবসায়িক চর্চা

৪১.২.৩ উভয়ের কাজের সম্বন্ধ

৪১.৩ অর্থনৈতিক আলোচনার সংজ্ঞা

৪১.৪ ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা

৪১.৫ সারাংশ

৪১.৬ অনুশীলনী

৪১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব কাকে বলে
- তাদের মধ্যে কাজের সম্বন্ধ কি রকম
- অর্থনৈতিক আলোচনার সংজ্ঞা কি ও
- ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা কি

৪১.১ প্রস্তাবনা

আগের এককে অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃতি বিশ্লেষণের পর ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ সাধারণ সমস্যায় কী অংশ গ্রহণ করে বোঝা প্রয়োজন। আজকাল দু'টি বিষয়কে পৃথক ভাবে আলোচনার চেষ্টা হলেও উভয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ সন্দেহ নেই। এ-সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করলে বিষয় দুটির পৃথক সংজ্ঞা পাওয়া যায়। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব সাধারণ অর্থতত্ত্বের এক ফলিত ক্ষেত্র। আরও সংক্ষেপে, ব্যবসায়িক তত্ত্বগুলি 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ' সংক্রান্ত বলা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৃহদায়তন শিল্প সংগঠনের ব্যাপক প্রসারের ফলে উৎপাদন সংক্রান্ত কাজে সংগঠনের ব্যবস্থাপক বা 'ম্যানেজার'-এর গুরুত্ব যথেষ্ট বেড়েছে। ব্যবস্থাপনায় তাঁদের সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়া উপযুক্ত হলে

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়। কাজেই ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব আসলে ব্যবস্থাপনার অর্থনীতি যা নির্দিষ্ট শিল্পকেন্দ্রিক। সাধারণ অর্থনৈতিক আলোচনার পরিধি অনেক বেশী বিস্তৃত।

৪১.২ সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব

৪১.২.১ সাধারণ অর্থনৈতিক চর্চা

প্রথম পর্বের আলোচনা থেকে আমরা পাই যে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সর্বকালে সর্বজনীন ক্ষেত্রে বর্তমান। একজন মানুষের দৈনিক জীবনযাপনের প্রচেষ্টায় যেমন, আধুনিক রাষ্ট্রে সমাজবন্ধ মানুষের ক্ষেত্রেও তেমনি একই ভাবে বিরাজমান। অতীতে এ-সব সমস্যার সমাধানের কাজ বর্তমানের তুলনায় অনেক সহজ ও সরল ছিল। এখনকার সমাধান-প্রচেষ্টা অনেক জটিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে আজ পৃথিবীতে জনসমাজের পরিধি ব্যাপকতর রূপ নিয়েছে। এইসঙ্গে মানুষের অভাব ও অভাব মেটানোর উপকরণও বেড়েছে বেশ কয়েকগুণ। কিন্তু মানব প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হল আরও বেশী, আরও ভাল, বৈচিত্র্যপূর্ণ জিনিষপত্র সংগ্রহ করে আরও স্বাচ্ছন্দ্যসহ উচ্চতর জীবন যাপনের চেষ্টা করা। ফলে, অপ্রাচুর্য্য (Scarcity) ও পছন্দ বা নির্বাচনের (Choice) সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। সমাজে পরিবারভুক্ত ব্যক্তি উৎপাদন ও কেনাবেচার কাজে জড়িত মানুষ এবং দেশের কল্যাণকামী সরকার সকলেরই অর্থনৈতিক সমস্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সর্বজনীন অর্থনৈতিক কাজের মূল সূত্রগুলি আবিষ্কার ও বিশ্লেষণ করাই অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। অভাব মেটাতে ভোগ, দ্রব্য, বা সেবার উৎপাদন, বিক্রয়, ব্যবসার কাজ ইত্যাদি সব বিষয়ে কার্যপ্রণালীর সূত্রাবলী সন্ধানই সাধারণ তত্ত্বের মূল কাজ। এ-অর্থে অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোচনার পরিধি বিস্তৃত।

৪১.২.২ ব্যবসায়িক চর্চা

ব্যবসা বলতে উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার কেনা-বেচার কাজ বোঝায়। একাজে জড়িত মানুষদের মোটামুটি দু'ভাবে দেখা যায়। একদল মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য-সেবা উৎপন্ন করার কাজে নিযুক্ত। এ-কাজের মানুষ সাধারণতঃ উৎপন্ন সামগ্রী বিক্রী করে না। একই ধরনের দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত বিভিন্ন সংস্থার প্রত্যেকটিকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম (Firm) বলে। ফার্মের লক্ষ্য উৎপাদন করতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সংগ্রহ করে এমনভাবে নিয়োগ করা যাতে সর্বনিম্ন ব্যয়ে উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ সর্বাধিক হয়। সব রকম ব্যয় মিটিয়ে যেন সে কিছু উদ্বৃত্ত বা লাভ পেতে পারে। কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে ফার্মকে শুধু উৎপাদন করলেই হবে না, সেগুলি ভোগ বা চাহিদাকারী মানুষদের কাছে বিনিময়ের জন্য পৌঁছে দিতে হবে। অভাব মেটাতে ব্যবহৃত না হলে উৎপাদন অর্থহীন। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ফার্মের বিশেষ দ্রব্যটি পছন্দকারী ব্যক্তিদের কাছে সরবরাহ করার কাজ সম্পন্ন করে অপরদলের মানুষ বা ব্যবসায় সংগঠন। উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহকারী ব্যবসায় সংগঠন সাধারণতঃ দ্রব্য উৎপন্ন করে না। আঞ্চলিক ভাবে, দেশের মধ্যে, অথবা, বিদেশে উৎপন্ন করা দ্রব্য বা সেবা ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রেই ভোগ বা চাহিদাকারীর অভাব মেটায়। উৎপাদনের লক্ষ্যপূরণ হয়। সরবরাহ করার কাজে, কেনাবেচা সংক্রান্ত কাজে জড়িত মানুষ বা ব্যবসায় সংগঠনও গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে। অভাব পূরণের কাজে ধারাবাহিকভাবে লিপ্ত বলে ব্যবসায় সংগঠন ব্যবসার ক্ষেত্রে কেনাবেচার মাধ্যমে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মতই কিছু অর্থলাভ বা মুনাফা করে থাকে। ভোগকারীর কাছে ঠিকমতো, ঠিক

সময়ে না পৌঁছলে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কাজেই উৎপাদন ও ব্যবসায়ের কাজের ধরন পৃথক হলেও অর্থনৈতিক আলোচনায় উভয় পক্ষকেই একত্রে উৎপাদন বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম বলা হয়। দ্রব্য বা সেবার উৎপাদন ও সরবরাহ একই অভাব-পূরণ প্রক্রিয়ার দুই অঙ্গ। কাজেই ব্যবসায়িক কর্ম্মপ্রচেষ্টা ও সাধারণ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত।

কিছুকাল আগেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত কাজকে অনেক সমাজে হেয় করার চেষ্টা হত। কিন্তু বৃহত্তর সমাজে মানুষের অভাব পূরণের কর্ম্মপ্রণালীর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করলে বোঝা যায় ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ উৎপাদন ও যোগানের দিকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উৎপাদন সমপরিমাণ হলেও ব্যবসায় সংগঠনের সুবন্দোবস্ত না থাকায় শহরের তুলনায় গ্রামের মানুষ অনেক সময়ই নীচু মানের স্বল্প পরিমাণ জিনিষপত্র ভোগ করে কম তৃপ্তির স্তর ভোগ করে ও বঞ্চনার শিকার হয়। ব্যবসায় সংগঠন সুসংগঠিত না হলে দেশের এক অঞ্চলে খাদ্য সামগ্রীর প্রাচুর্য ও কম দাম, অথচ অন্য অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্যতা ও উচ্চমূল্য এই দুই-ই পাশাপাশি থাকতে পারে। অবশ্য এ-ব্যাপারে দেশের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের বস্ত্রশিল্পে উৎপন্ন বস্ত্রসম্ভার দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিক্রয়ে ব্যবসায় সংগঠনগুলি আগ্রহী না হলে অন্য অঞ্চলের মানুষকে বেশী দাম দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের বস্ত্র ব্যবহার করতে হতো। এর ফলে বস্ত্রশিল্পে নিয়োগের পরিমাণও কমে যেত। তেমনি ভারতের অন্য রাজ্য থেকে চিনি কিনে বিক্রী করতে ব্যবসায় সংগঠন রাজী না হলে অনেক রাজ্যকেই খান্দসারী বা গুড় জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। এর ফলে চিনি শিল্পেরও প্রসার ঘটতো না। অন্যদিকে খান্দসারী শিল্পের উৎপাদন সংশ্লিষ্ট অন্য উপজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে সরবরাহ কমিয়ে দিতে বাধ্য হ'ত। সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলিরও কাজ কমে যেত। শুধু উপাদিত দ্রব্য বা সেবাই নয়, ফার্মের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ—কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, অর্থ ইত্যাদি সরবরাহের কাজেও ব্যবসায়িক সংগঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। ব্যবসায়িক সংগঠন না থাকলে আজকের মানুষের অনেক অভাব অপূর্ণ থেকে যেত।

৪১.২.২ উভয়ের সম্বন্ধ

সমাজবন্ধ মানুষ অভাব পূরণের কাজে দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসামগ্রী ও উপকরণের যথাযথ ব্যবহার করতে কিভাবে পছন্দ বা নির্বাচন ক'রে নিজ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হয় তাই সাধারণ অর্থনীতির তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে। এ বিচার-বিশ্লেষণ থেকে অর্থনৈতিক সম্বন্ধ কার্যপ্রণালীর কিছু সাধারণ সূত্র জানা যায়। যেমন, সবকিছু অপরিবর্তিত অবস্থায় একটি জিনিষের দাম বেড়ে গেলে তার চাহিদা কমে যায়। অথবা নির্দিষ্ট সময়ে একই দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ভোগ করতে থাকলে সে দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত বাড়তি উপযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। এ রকম সাধারণ সূত্রগুলি সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ-ভাবে পাওয়া কিছু অর্থতত্ত্বের সূত্র ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া, উৎপাদন ও সরবরাহের কাজে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার লক্ষ্যে পৌঁছতে উপকরণের দুষ্প্রাপ্যতা বিচার করে এমন সমন্বয় নির্বাচন করতে হয় যা থেকে সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। কর্মপ্রণালীর সাদৃশ্য থেকে বিষয় দু'টির সম্পর্ক নিবিড় হয়। তবে মনে রাখা দরকার যে অর্থতত্ত্বের সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণই ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচনায় প্রাসঙ্গিক হয় না। সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে-সব অংশ বাস্তব ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শুধুমাত্র সেগুলিই গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের প্রক্রিয়া ও পরিমাপ স্থির করা যেমন ব্যবসায়িক স্বার্থে অবশ্য বিচার্য, দেশের সার্বিক কল্যাণ, মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মান বিচার, আয়বৈষম্যের পরিমাপ ও কারণ অনুসন্ধান, ইত্যাদি অর্থনৈতিক বিষয় গুরুত্ব পায় না।

৪১.৩ অর্থনৈতিক আলোচনার সংজ্ঞা

এখন অর্থতত্ত্বের কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টা আলোচনার সময় দেখা গেছে যে একা বা সমাজবন্ধ মানুষ তার জীবনযাত্রায় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি নানা জিনিষের অভাব পূরণের চেষ্টায় দুষ্প্রাপ্যতা বা অপ্রাচুর্য্য সম্পর্কিত সমস্যার মোকাবিলা করার চেষ্টা করে। সময় সম্পদ, বা অন্যান্য উপকরণের অভাবে সব অভাব মেটানো সম্ভব নয়। কাজেই প্রয়োজনের অগ্রাধিকার বিবেচনা করতে হয়। সীমিত জমিতে ধান উৎপন্ন না করে শুধু কারখানা বসালে খাদ্যের অভাব ঘটে। কাজেই ঠিক করতে হয় খাদ্য না কারখানা কোনটা বেশী প্রয়োজন। অর্থাৎ পছন্দ বা নির্বাচনের সমস্যা দেখা দেয়। অপ্রাচুর্য্যে কারণে বেছে বেছে অভাব পূরণের চেষ্টা করতে হয়। আবার একই উপকরণ ব্যবহার করে বিভিন্ন অভাব মেটানো সম্ভব হলেও সর্বোত্তর ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করা চলে। এ বিষয়ে সর্বাধিক প্রচলিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন অধ্যাপক L. Robbins। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহার যোগ্য অপ্রচুর উপকরণ নিয়ে আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলীর আলোচনাই হল অর্থনৈতিক আলোচনা।

অর্থনৈতিক সমস্যার সংজ্ঞা

১৯৩০-এর দশক থেকে রবিন্‌স প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও তার আগে কয়েকটি সংজ্ঞা সমালোচিত হয়ে তেমন গ্রহণযোগ্য হয়নি। ১৭৭৬ সালে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের সময় বিষয় হিসেবে অর্থনীতি চর্চার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের সূত্রপাত করেন Adam Smith। তিনিই এ-বিষয়ে পথিকৃৎ। তাঁর 'An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations', সংক্ষেপে ‘Wealth of Nations’ গ্রন্থে অর্থবিজ্ঞানকে ‘সম্পদের বিজ্ঞান’ বা ‘Science of Wealth’ ধরে বিশ্লেষণ করেছিলেন। পরে তাঁর মন্ত্রশিষ্যরা একই সংজ্ঞায় প্রভাবিত হয়েছেন। মানুষের ক্রিয়াকলাপ এড়িয়ে শুধু সম্পদই মূল বিবেচ্য মনে করায় একদা অর্থবিজ্ঞানকে বহু নিন্দা ও অবজ্ঞান সম্মুখীন হতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১৮৯০ সালে অধ্যাপক Alfred Marshal তাঁর ‘Principles of Economics’ গ্রন্থে বিষয়টির অপবাদ দূর করার চেষ্টা করেন। মার্শাল বলেন যে অর্থনৈতিক আলোচনা সম্পদ (Wealth)-কেন্দ্রিক হলেও মনে রাখতে হবে যে তা’ মানুষের অভাব পূরণের উপায়মাত্র। সম্পদ সংগ্রহই আলোচনার শেষ কথা বা উদ্দেশ্য নয়। মানুষের অভাবপূরণের প্রচেষ্টায় অর্থ উপার্জন ও ব্যয় সংক্রান্ত কর্ম্ম প্রণালী বিশ্লেষণই মূল উদ্দেশ্য। অবশ্য এ সংজ্ঞাও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিবেচিত না হওয়ায় এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রবিন্‌সের সংজ্ঞাই সমাদৃত হয়। তাঁর ভাষায় অর্থবিজ্ঞান হ’ল “........the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.” ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতিবিদ্ Watson-এর বক্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। সেই বক্তব্য অনুযায়ী মূল অর্থনৈতিক সমস্যা হ’ল আরও বেশী পাওয়ার, বর্তমান সম্পদের আরও প্রকৃষ্ট ব্যবহারের। প্রত্যেক পরিবার, প্রত্যেক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের প্রতিটি এককের এটাই চিরন্তন অর্থনৈতিক সমস্যা।

৪১.৪ ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা

পরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট যে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচনার প্রায় সবটাই ব্যক্তিনির্ভর বা ব্যবসায় সংগঠন কেন্দ্রিক। কি, কতটা এবং কি ভাবে উৎপন্ন ও সরবরাহ হবে সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত ফার্মকেই নিতে হয়। ছোট প্রতিষ্ঠানে মালিক নিজে আর আধুনিক বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক

বাস্তব অবস্থা ও ভবিষ্যৎ ঝুঁকি ইত্যাদি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত বা নীতি নির্ধারণ করে থাকে। আধুনিক ব্যবসায়ে ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী। বাজারে চাহিদা ওঠানামা করে, সরবরাহের ব্যাপারে অনেক অনিশ্চয়তা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। সব কিছুর অনুমান করে উৎপাদন পরিকল্পনা আগে থেকেই কার্যকর করতে হয়। ব্যবস্থাপকের কাজ যথাযথ হ'লে প্রতিষ্ঠানের ক্ষয়ক্ষতি কমে লাভ হয়। উৎপাদন-কাজে আধুনিক কালে এ-সব জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় উপযুক্ত সংগঠক ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের অনেক কিছুই ব্যবস্থাপককে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এ কারণে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বকে অনেকে সাধারণ অর্থনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগক্ষেত্র বা Applied Economics বলে থাকেন। আবার ব্যবস্থাপকের উৎপাদন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কিত অর্থতত্ত্বগুলির সাহায্য নিয়ে ব্যবসায় নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র বলে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বকে Managerial Economics-ও বলা হয়। ব্যবসায়িক ব্যাপারে ব্যবস্থাপকের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের (decision making) কর্ম্মপ্রণালী আলোচনাই এর মূল ব্যাপার।

ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাজের বিশ্লেষণ থেকে আমরা ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের সংজ্ঞা দিতে পারি। E. J. Douglas-এর বর্ণনার অনুসরণে বলা যায় যে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব বাস্তব অর্থনৈতিক কাজে অনিশ্চয়তার পরিস্থিতিতে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্ম্মপ্রণালী আলোচনা করে। এ-প্রক্রিয়ায় সাধারণ অর্থতত্ত্বের কিছু সূত্র বা বিশ্লেষণ-পদ্ধতি বিশেষ সহায়ক হয়। এজন্য বিষয়টিকে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব বা ব্যবস্থাপনার তত্ত্ব বা ফলিত অর্থতত্ত্বও বলে। উৎপাদন সংস্থা বা ফার্মের কার্যনীতি ঠিক করতে, বিশেষ করে চাহিদা, উৎপাদন ব্যয় বা দ্রব্যের দাম স্থির করার কাজে, অর্থতত্ত্ব সহ অন্যান্য অনেক সমাজবিজ্ঞানের অঙ্কশাস্ত্র, পরিসংখ্যান ও তথ্যপ্রযুক্তির বহুল প্রয়োগ হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৫১ সালে Joel Dean-এর প্রথম এ-বিষয়ে বই প্রকাশের পর থেকে বাজারের বিস্তৃতির সঙ্গে ব্যবসায় সংগঠনগুলি যেমন বহুদেশ ও বহুজাতিক হয়েছে, বিষয়টিও তেমনি সংশ্লিষ্ট শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ব্যবহার করছে। এভাবে ব্যবস্থাপকদের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনেক বেশী বাস্তব ও সার্থক হয়ে উঠছে। অর্থতত্ত্বের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচার করে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন্ বলেছেন যে সাধারণ অর্থতত্ত্বের শিক্ষার্থীকে সফল ব্যবস্থাপক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে কখনই অর্থতত্ত্বের চর্চা করা হয় না। কিন্তু এটা মানতেই হবে যে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব-র চর্চা তাকে ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজে নতুন ভাবনাচিন্তা প্রেরণা দেয়।

৪১.৫ সারাংশ

সাধারণ ও ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের তুলনা থেকে দেখা গেল যে উভয় বিষয়ে আলোচনার মূল ভিত্তি এক হলেও দ্বিতীয়টির পরিধি কিছুটা নির্দিষ্ট। ব্যবসায়ে উৎপাদন ও নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত বাস্তব বিষয়গুলিই প্রাধান্য পায়। উভয় বিষয়ের কয়েকটা সংজ্ঞা থেকে এটা বোঝা যায়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সংশ্লিষ্ট বলে ব্যবস্থাপকের যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণই মূল বিষয়।

৪১.৬ অনুশীলনী

১। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব ও সাধারণ অর্থনৈতিক আলোচনার পরিধির স্বরূপ কি?

২। অর্থনৈতিক আলোচনার একটি বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা মনে রাখুন।

৩। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত কোন সময় হয় লক্ষ্য করুন।

৪। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের সম্পর্কটি মনে রাখুন।

৫। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্ব বোঝাতে অন্য দু'টি নামের উল্লেখ করুন।

৪১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. ধীরেশ ভট্টাচার্য ও প্রণবকুমার চক্রবর্তী ঃ ব্যবসায়িক অর্থবিদ্যার মূল তত্ত্ব।

2. K. A Chrystal and R. G. Lipsey : *Economics for Business and Management OUP 1997.*

একক ৪২ ◆ অর্থব্যবস্থার মূল কাজ ও কর্ম্মপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য

গঠন

৪২.০ প্রস্তাবনা

৪২.১ উদ্দেশ্য

৪২.২ মূল সমস্যা বিলিকরণের ঃ কি, কিভাবে, ও কাদের জন্য; প্রসার ও উন্নয়নের কাজ

৪২.৩ সারাংশ

৪২.৪ অনুশীলনী

৪২.৫ উত্তর সংকেত

৪২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

৪২.০ প্রস্তাবনা

অপ্রাচুর্যতাজনিত সমস্যাবলির সমাধানে বিভিন্ন দেশ ও সেখানকার সমাজ, প্রচলিত আদর্শ, রীতিনীতি ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে, স্থান কাল পাত্র বিচার ক'রে, নিজ নিজ প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালী চলতে থাকে। এভাবে অর্থনৈতিক সমস্যা মেটাতে যে কর্ম্মপ্রণালী গড়ে ওঠে সেই কর্ম্মপ্রক্রিয়াকেই দেশের অর্থব্যবস্থা বলে। অতীত ভারতে কৃষি উৎপাদনের কাজে প্রয়োজনীয় ঋণ সংগ্রহ করতে গ্রামীণ মহাজনকে উচ্চ হারে সুদ দেওয়ার রীতি সে-সময়ে ভারতীয় অর্থব্যবস্থার একটি অনুমোদিত প্রক্রিয়া ছিল। পরিবারের মধ্যে খাদ্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সদস্যের অগ্রাধিকারও দেশের সামাজিক রীতির অন্তর্ভুক্ত। এরকম রীতি যা সমাজে লিঙ্গ-বৈষম্য সৃষ্টি করে মহিলাদের বঞ্চনার শিকার করে যা ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় স্বীকৃত। আবার জমিদারী সংক্রান্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভারতীয় ভূমি ব্যবস্থা ও কৃষি উৎপাদনকে যতই ব্যাহত করুক না কেন, পুরনো অর্থব্যবস্থায় সেটাই জমিদারী সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এসব রীতিনীতি ভারতের অর্থনীতিকে যতই পঙ্গু ও অনগ্রসর করে রাখুক না কেন অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রক্রিয়ায় এগুলোই ছিল তখনকার অর্থব্যবস্থার স্বীকৃত রূপ। সুতরাং, একটি দেশের মানুষ অর্থনৈতিক কাজ করতে যে-সব সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধিনিষেধ মেনে চলে সেগুলির সম্মিলিত প্রক্রিয়াই দেশের অর্থব্যবস্থাকে গড়ে তোলে। এভাবে বিভিন্ন দেশের বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে বিভিন্ন ধরনের অর্থব্যবস্থা দেখা দেয়।

৪২.১ উদ্দেশ্য

অর্থব্যবস্থার মূল সমস্যা হল দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মধ্যে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার্য সীমিত উপকরণের সদ্ব্যবহার করে উৎপন্ন দ্রব্যগুলি যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে পৌঁছে দিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম, বিভিন্ন ব্যবসায় সংগঠন এমন কি আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার এ কাজে অংশগ্রহণ করে। কোন দ্রব্যের কত পরিমাণ, কি পদ্ধতিতে উৎপন্ন করে, দেশবাসীর কোন কোন অংশের প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহার করতে পারবে—এ সংক্রান্ত কাজকেই সংক্ষেপে বিলিকরণের কাজ বলে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও প্রসার সম্পর্কিত আধুনিক প্রচেষ্টাও বিলিকরণের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত বিনিময় ও বাজার-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে অনেক কাজ সম্পন্ন হলে সে ব্যবস্থা সর্বজনীন নয়। ১.৩ বিভাগের অংশে আমরা বিলিকরণের এইসব সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করবো।

৪২.২ বিলিকরণের মূল সমস্যা

বিভিন্ন দেশের অর্থব্যবস্থায় বিলিকরণ ব্যবস্থা বৈচিত্রপূর্ণ হলেও মূল সমস্যা সব ক্ষেত্রেই একই ধরনের। ১.১ এককে আমরা দেখেছি যে অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে অপ্রাচুর্যতা থেকে সৃষ্ট নির্বাচনের সমস্যা। ব্যক্তি বা ফার্মের মত দেশের অর্থব্যবস্থাকেও একই অপ্রাচুর্যতাজনিত নির্বাচন সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হয়। দেশে ব্যবহারযোগ্য সম্পদের সদ্ব্যবহার এমন করতে হবে যাতে জাতির অনন্ত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ অভাব মেটানোর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা যায়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসনের বিশ্লেষণ অনুসরণে বলা হয় যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বা সেবা উৎপন্ন করে মানুষের কাছে সেগুলো পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অর্থব্যবস্থাকে তিনটি মূল সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রথম সমস্যা, কোন কোন দ্রব্য ও সেবা কত পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, দ্বিতীয়টি, কিভাবে সেগুলি উৎপাদন করা হবে, অর্থাৎ উৎপাদন কৌশল ঠিক করতে হবে; এবং তৃতীয় সমস্যা, কাজের জন্য উৎপন্ন করা হবে? অর্থাৎ যাদের প্রয়োজন তাদের কাছে উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার বন্টন সংক্রান্ত। মূল সমস্যা তিনটিকে সংক্ষেপে 'কি, কিভাবে, এবং কাদের জন্য' (What, how, and for whom to produce?)-রূপে প্রকাশ করা হয়। প্রথম ও তৃতীয়—এ দু'টি সমস্যা সমাধানে দেশের অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টাসমূহ লক্ষ্য করলে অর্থব্যবস্থার প্রকৃতি বা স্বরূপ বোঝা যায়। আমরা প্রথমে মূল সমস্যা তিনটি আর একটু বিশ্লেষণ করবো।

সব দেশেই মানুষের অসংখ্য অভাব মেটাতে প্রয়োজন ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের অফুরন্ত যোগান। কিন্তু উপকরণগুলির যোগান অপ্রচুর। কাজেই ঠিক করতে হয় কতটা উপকরণ ব্যবহার করে কোন্ কোন্ দ্রব্য উৎপন্ন করা হবে। আগের বিভাগে এ সমস্যাকে সরলভাবে 'খাদ্যবস্তু না কামান' কোনটির কম বা বেশি তা নির্বাচনের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। উৎপাদন কৌশল অপরিবর্তিত অবস্থায়, নির্দিষ্ট সময়ে, দু'টি দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ সর্বাধিক কত হতে পারে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশের উৎপাদন সম্ভাবনার দিগন্ত বা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উল্লেখ করা হয়েছিল। এ রেখার ওপর কোন্ বিন্দুতে একটি দেশ দুটি দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ স্থির করতে পারবে সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি খাদ্যের প্রয়োজন বেশী হয় তবে উপকরণের বেশীর ভাগই সেকাজে নিয়োগ করতে হবে, বন্দুক উৎপাদনে নিয়োগের পরিমাণ কমাতে হবে। এভাবে সীমিত উপকরণের বিভিন্ন ব্যবহারে প্রয়োগের সম্ভাবনা পরিবর্তনতার মধ্য দিয়ে নির্দ্দিষ্ট একটি দ্রব্য সমন্বয় উৎপাদনের কাজে ব্যবহার হবে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার এই কাঙ্ক্ষিত সর্বোত্তম বিন্দুটি নির্বাচন করার কাজ অর্থ ব্যবস্থাকেই সম্পন্ন করতে হয়। এ সমস্যাটিকে বিভিন্ন দ্রব্য ও সেবা উৎপন্নের কাজে সীমিত উপকরণের বিলিকরণের সমস্যাও বলা যায়। উৎপাদনের কাজে বিলিকরণের সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল উৎপাদনে বিভিন্ন উৎপাদন-কৌশল ব্যবহারের সুযোগ থাকলে বিকল্প কৌশলগুলি থেকে যেকোনো একটিকে প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া। উৎপাদন ও উপকরণ নিয়োগের মধ্যে কারিগরী (technical) সম্পর্ক থাকে। x উপকরণটির ব্যবহার বৃদ্ধি করলে y বা অন্য উপকরণের ব্যবহার

কমিয়ে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব। বৃহদায়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের ব্যবহার হ্রাস করে বেশী মূলধন প্রয়োগ হতে পারে। ছোট বা কম পরিমাণ উৎপন্নের কাজে কখনও মূলধন অপরিবর্তিত রেখে তার বদলে বেশী বা কম শ্রম নিয়োগ করা চলে। সীমিত উপকরণকে বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতিতে বন্টন বা বিলিকরণের সমস্যার সমাধানও গুরুত্বপূর্ণ। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ বা শ্রমের প্রাচুর্য থাকলে উৎপাদন পদ্ধতিতে এ-সব সহজলভ্য উপকরণ বেশী ব্যবহারই সুবিধাজনক মনে হবে। এর সঙ্গে প্রযুক্তির প্রশ্নও জড়িত। সমপরিমাণ বা পূর্বাপেক্ষা কম উপকরণ ব্যবহার করে অনেক বেশী পরিমাণ উন্নতমানের দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হতে পারে উন্নত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার সম্ভব হলে। কিভাবে উৎপন্ন করা হবে সে-সিদ্ধান্ত অর্থব্যবস্থার কর্ম্মপ্রণালী অনুযায়ী স্থির করতে হয়। বাজার-নির্ভর ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানই এ-সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক কাজ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে সে পক্ষই সবকিছু স্থির করে দেয়। যা হোক, সব অর্থব্যবস্থাতেই কিভাবে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা উৎপন্ন হবে সেটা ঠিক করতে হয়। এ-বিষয়টিও উপকরণ বিলিকরণ সংক্রান্ত কাজ।

অর্থব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক সমস্যা উৎপন্ন পণ্য ও সেবা সামগ্রী কারা ব্যবহার করবে। পণ্য সামগ্রী উৎপন্ন হলেও তার পরিমাণ দেশের সব মানুষ বা সব পরিবারের জন্য যথেষ্ট হয় না। সকলের সব প্রয়োজন মেটানোর পক্ষে উৎপাদন অপ্রচুর। সমাজে কোন ব্যক্তি বা পরিবার কোন্ কোন্ পণ্যের কতটা পরিমাণ ব্যবহার করতে পারবে তা ঠিক করাও অর্থব্যবস্থার বিলিকরণের কাজ। অপ্রাচুর্যতার পরিপ্রেক্ষিতে এ-কাজকে 'রেশনিং' (rationing) বলা হয়। ভারতে কয়েকটি নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের (চাল, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদির) পণ্যবন্টন ব্যবস্থা থেকে জানা যায় যে সরকার থেকে নির্দিষ্ট মূল্যের মাথাপিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবার-পিছু রেশনকার্ডের সাহায্যে বন্টন বা বিলি করা হয়ে থাকে। পণ্যবন্টন ব্যবস্থায় দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ স্থির থাকলেও যাদের প্রয়োজন বেশী এবং যারা সম্পন্ন মানুষ তারা বাজার থেকে কিছু বেশী দামে প্রয়োজনমত অতিরিক্ত পরিমাণ একই পণ্য সংগ্রহ করতে পারে। এ রকম দ্বৈত ব্যবস্থা—একদিকে নিয়ন্ত্রিত রেশনিং ব্যবস্থা; অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত খোলাবাজার—দেশে পণ্য বিলিকরণের মাধ্যমে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা, এবং দেশের দুর্বলতর শ্রেণীর মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট দামে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসামগ্রী যোগানের চেষ্টা করা হয়েছে। এ রকম বিলিকরণ দেশে ধনী ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে আয় বৈষম্য কিছুটা কমাতে পারে। বন্টন বা বিলিকরণ অবশ্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হিসেব বা নির্দেশ অনুসারেও সম্পন্ন হতে পারে। সেক্ষেত্রে বরাদ্দ দাম ও পরিমাণের অতিরিক্ত পণ্যসামগ্রী ভোগের জন্য পরিবারগুলি পায় না। যে ভাবেই হোক পণ্য ও দ্রব্যসামগ্রীর বন্টন বা বিলিকরণ অর্থব্যবস্থাকেই সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে হয়। সুষ্ঠু বিলিকরণ ব্যবস্থা না থাকলে অর্থ ব্যবস্থার কার্যক্রম নিরর্থক বিশৃঙ্খল রূপ নেয়।

কি, কিভাবে এবং কাজের জন্য অর্থব্যবস্থার এই তিনটি মৌলিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে আরও একটি বিশেষ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টাও বিভিন্ন দেশের অর্থব্যবস্থার কাজ মনে করা হচ্ছে। এই কাজের একটি হল যুদ্ধের পর মন্দাজনিত পরিস্থিতি ও বেকারত্ব নিরসনে অর্থব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠনের কাজ। অপর কাজের পরিধি আরও বিস্তৃত। ঐ সময়ে বিজ্ঞজনের নজর অষ্টাদশ শতাব্দীতে Smith-এর সম্পদের কারণ ও প্রকৃতি অনুসন্ধানের দিক থেকে সরে সুইডিশ্ অর্থনীতিবিদ্ গুন্নার সিরডাল বর্ণিত এশিয়ার দেশগুলির দারিদ্র্যের দিকে পড়লো। আবিষ্কার হ'ল যে ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি দেশেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কেন্দ্রীভূত আছে। তখনকার পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই দারিদ্র্য, অভাব, অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে নিম্নস্তরের জীবনযাপন করছে। এ-অনুন্নত অবস্থার পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করতে অর্থব্যবস্থাকেই যথোচিত কাজে অগ্রণী হতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ব্যাপক দারিদ্র্য না হলেও ছিল মন্দাজনিত ব্যাপক বেকারত্ব, অপূর্ণ নিয়োগ

অবস্থা। এইসঙ্গেসমস্যা হ'ল দেশে অর্থনৈতিক প্রগতির হার বজায় রাখা ও আরও প্রগতির জন্য জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি করে আরও উন্নত স্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া। এ লক্ষ্যে পৌঁছতে সে-সব দেশের অর্থব্যবস্থাকেই জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা Economic growth-এর ধারাবাহিক কাজ করতে হয়। দরিদ্র দেশগুলিতে রাষ্ট্র অর্থব্যবস্থার সাহায্যেই দ্রুত উন্নয়নের চেষ্টা শুরু করে। কাজেই, সর্বাধুনিক কালে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বও অর্থ ব্যবস্থাকেই পালন করতে হচ্ছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অনগ্রসর দেশগুলিতে সরকারই অগ্রণী হয়ে অর্থব্যবস্থাকে কমবেশী নিয়ন্ত্রণ করে নির্দেশ দিয়ে থাকে। নতুন আবিষ্কার, উৎপাদন-কৌশল ও প্রযুক্তি সংগ্রহ ও প্রয়োগ করে উপকরণগুলির উন্নত ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন অনেক বেশী পরিমাণ করতে প্রায় সব দেশেই সরকারের ব্যবস্থাপনা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। অর্থব্যবস্থার কাজ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাজেরই অংশবিশেষ হয়।

৪২.৩ সারাংশ

দেখা গেল যে সব রকম অর্থব্যবস্থাকেই চারটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। কি, কিভাবে এবং কাজের জন্য—এই তিন মৌল সমস্যার সঙ্গে সর্বাধুনিক কালে জাতীয় সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যাবলির সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টাও অর্থব্যবস্থাকেই করতে হয়। আমেরিকা ও পশ্চিমের সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে যুদ্ধোত্তর জীর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থার অবসান ঘটিয়ে দ্রুত প্রসারের প্রয়োজন দেখা দিল।

অন্যত্র, এশিয়া ও লাটিন আমেরিকার দরিদ্র দেশগুলির করুণ আর্থিক অবস্থার উন্নতির দিকেও সকলের দৃষ্টি পড়ল। অর্থব্যবস্থার অদৃশ্যশক্তির কার্যকারিতার উপর অতীত নির্ভরশীলতা ত্যাগ করে প্রসার ও উন্নয়নের কাজের দায়িত্বও দেশের অর্থব্যবস্থার অন্যতম একটি কাজ বলে বিবেচিত হতে থাকলো। বিলিকরণের সঙ্গে যুক্ত হ'ল প্রসার ও উন্নয়নের কাজ।

৪২.৪ অনুশীলনী

১। বিলিকরণের কাজ কি কি?

২। অর্থব্যবস্থায় বিলিকরণের কাজগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ভাগ দুটি কি কি?

৩। 'প্রসার' ও 'উন্নয়নের' কাজ বলতে কি বোঝায়?

৪। আধুনিক অর্থব্যবস্থায় সরকারের গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান—দু'টি কারণ দিন।

৫। 'কিভাবে' উৎপাদন করা হবে প্রশ্নটি অন্য কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত?

৬। সাধারণ অর্থনৈতিক ও বিলিকরণের সমস্যার পার্থক্য আছে কি?

৪২.৫ উত্তর সংকেত

১। বিষয়টি এককের তৃতীয় অনুচ্ছেদে দেখুন।

২। কি এবং কিভাবে কাজ দু'টি উৎপাদন সংক্রান্ত। কাদের জন্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ বন্টন সংক্রান্ত। তবে 'উন্নয়ন ও প্রসার' কাজটি একযোগে উৎপাদন ও বন্টনের সঙ্গে জড়িত। দেশে মোট উৎপাদন ধারাবাহিক বৃদ্ধি না হলে অর্থনৈতিক প্রসার ঘটে না। আবার উৎপাদন বৃদ্ধি না হলে দেশে আয় বণ্টন, জীবনধারণের মান ইত্যাদির উন্নতি সম্ভব হয় না।

৩। ‘প্রসার’ কথাটি ইংরাজী ‘Growth’ কথাটির প্রতিশব্দ। দেশে প্রকৃত জাতীয় আয় ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে ‘প্রসার’ ঘটছে ধরা য়ায়। কিন্তু ‘উন্নয়ন’ বা ‘Development’ কথাটির তাৎপর্য শুধু আয় বৃদ্ধিই নয়, সঙ্গে অর্থব্যবস্থার কতগুলি কাঠামোগত পরিবর্তনও বোঝায়। কাজেই ‘প্রসার’ কথাটি একমুখী, কিন্তু ‘উন্নয়ন’ একটি বহুমুখী বিষয়। অনুন্নত দেশের অগ্রসর প্রচেষ্টাকেই ‘উন্নয়ন’ বলে।

৪। প্রথম কারণ অবধি উদ্যোগাধীন বাজার ব্যবস্থার ব্যর্থতা, ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমতার আদর্শের আকর্ষণ। দ্বিতীয় কারণ, দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের দায়দায়িত্ব গ্রহণ।

৫। ‘কি ভাবে’ কাজটি উৎপাদনে কারিগরী কুশলতার সঙ্গে জড়িত প্রযুক্তিগত কৌশল নির্বাচনের সমস্যা।

৬। সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে আছে দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের সমস্যা। বিলিকরণের বাস্তব সমস্যা সমাধানও এ মূল বিষয়টি ধরে নিয়েই কাজ সম্পন্ন হয়।

৪২.৬ গ্রন্থপঞ্জী

1. Samuelson, P.A and Nordhans : *Economics.*
2. Lipsey, R.G & Chrystal, K.A : *An Introduction to Positive Economics : ELBS.*

একক ৪৩ ◆ প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তার সং(্প্ত পরিচয়

গঠন

৪৩.০ উদ্দেশ্য

৪৩.১ গ্রীসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

৪৩.২ রোমান সাম্রাজ্যের চিন্তা

৪৩.৩ মধ্যযুগের ন্যায্য মূল্য

৪৩.৩.১ মার্কেন্টাইলিজম

৪৩.৩.২ ফিজিওক্র্যাসি

৪৩.৩.৩ ধ্রুপদী চিন্তার শুরু

৪৩.৪ ভারতের চিন্তাধারা

৪৩.৫ সারাংশ

৪৩.৬ অনুশীলনী

৪৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৪৩.০ উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণের পর বর্তমান এককের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে প্রাচীন ইউরোপ ও ভারতে অর্থনীতি চর্চার অল্প পরিচয় দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা সর্বকালের। অতীতে বিভিন্ন সমাজের দার্শনিক ও চিন্তাশীল মানুষ সমস্যাগুলিকে কি চোখে দেখতেন জানলে আধুনিক অর্থতত্ত্বের সঙ্গে প্রাচীন চিন্তাধারার কিছু যোগসূত্র পাওয়া যেতে পারে। যোগাযোগ ও তথ্যের আদান-প্রদান ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নতির প্রভাবে গোটা পৃথিবীই আজ এক বিশাল গ্রামসমাজে পরিণত হতে চলেছে। কোন একটি দেশের চিন্তা বা কর্ম্মপ্রণালী সে দেশের সীমা পেরিয়ে অন্যান্য অনেক দেশের আর্থিক ক্রিয়াকলাপকে যথেষ্ট প্রভাবিত করছে। পাশ্চাত্যের ও ভারতের চিন্তার পরিচয় থেকে আমরা উভয়ের যোগসূত্র ঠিকভাবে বুঝতে পারবো। আবার অতীত অর্থনৈতিক চিন্তার যোগসূত্র থেকেই আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ব্যবসায়িক কার্যকলাপের পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৪৩.১ প্রাচীন গ্রীসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা *(Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২)*

পরিবারভুক্ত মানুষের উন্নত নৈতিক জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিবারিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। প্রথমতঃ, পরিবারের অভাবপূরণে সম্পদভোগের

সুকৌশল এবং দ্বিতীয়তঃ, অর্থ বন্দ্ব বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহের অনুমোদিত পথ। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক চিন্তাকে 'Chrematistics' বলা হয়। এতে অর্থনৈতিক কাজের দুটি দিকের নির্দেশ ছিল। একদিকে ছিল 'স্বাভাবিক' বা 'natural', অন্যদিকে কিছু কাজ 'অস্বাভাবিক' বা 'unnatural'। ভোগের উদ্দেশ্যে দ্রব্য বিনিময় মানুষের 'স্বাভাবিক' অর্থনৈতিক কাজ বলে মনে করা হ'ত। কিন্তু ব্যবসায়িক বা শুধু অর্থ লেনদেনের কাজ 'অস্বাভাবিক'। অভাবপূরণের উদ্দেশ্যে দ্রব্যের ভোগ 'স্বাভাবিক' কাজ। কিন্তু অর্থের বিনিময় করে আরও অর্থ সংগ্রহের কাজটি 'অস্বাভাবিক', বা অনুৎপাদনশীল। অ্যারিষ্টটলের বিবেচনায় ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিময়, অর্থ ঋণ দিয়ে সুদ-নেওয়াও অস্বাভাবিক। অবশ্য তিনি মনে করতেন যে ব্যবসায় সুযোগ-সুবিধা যত প্রসার হবে অর্থের ব্যবহারও তখন অপরিহার্য হয়ে উঠবে। তখনকার সমাজে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সবটাই নৈতিক বা ধর্ম্মীয় দিক থেকে বিচার করা হত। নগররাষ্ট্রে নাগরিক জীবনের অভাব ছিল সরল ও সীমিত। এ-অবস্থায় ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক চিন্তার অস্তিত্ব প্রায় ছিল না বলা যায়।

৪৩.২ রোমান আইনজ্ঞদের চিন্তা

প্রাচীন রোমের আইন বিশারদরা সাধরণভাবে গ্রীক্ চিন্তার অনুগামী হলে বাণিজ্যকে কিছুটা মর্যাদা দিয়েছিলেন। ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষা এবং বাণিজ্যিক চুক্তির মর্যাদা দিয়ে বিনিময় সংক্রান্ত কাজকে আইনের মর্যাদা দিয়েছিলেন। ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে চুক্তি ও সুদ গ্রহণের ঘটনা রোমের চিন্তায় নৈর্ব্যক্তিক আইনসিদ্ধ কাজ বলেই মনে করা হতো। এসব কাজকে প্রাচীন গ্রীসের মতো তাচ্ছিল্যভরে দেখা হ'তো না। আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যের স্রোতধারাও অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক বিনিময়ের কাজ বলে বিবেচিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীন এ-সব চিন্তায় দর্শন, ধর্ম্ম, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের প্রাধান্য থাকায় অর্থনৈতিক চিন্তার ছিঁটেফোঁটা ঐসব চিন্তার সঙ্গে মিলেমিশে প্রকাশ পেত। 'ক্রিম্যাটিস্টিক্স্' বা 'রোমান আইনের' পটভূমি আজকের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল বলেই অর্থনৈতিক আলোচনায় সে-সব বিশেষ অবদান রাখতে পারে নি। তবুও দুটি বিষয়ের পুনরুত্থান ঘটেছে বলা যায়। অ্যাডাম স্মিথের সময় থেকেই পরিবারভুক্ত মানুষের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা বা কর্ম্মপ্রণালী আজও অর্থনীতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দু। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বসমূহের বিশ্লেষণ শুরু হয় পরিবারের সমস্যা থেকেই, চলে অর্থতত্ত্বের প্রায় অর্ধেক জুড়ে। আবার আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্য বা সংগঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ম ও চুক্তির ওপর প্রাচীন রোমান আইনজ্ঞদের চিন্তার কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

৪৩.৩ মধ্যযুগের ন্যায্যমূল্য

পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য পতনের পর থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে মধ্যযুগ বিস্তৃত। ইতিহাসের এ-অন্ধকারময় যুগে অর্থনৈতিক চিন্তার বিশেষ পরিবেশ রচিত হয়নি। সামন্ত প্রভু ও সার্ফদের মধ্যে জমির মালিকানা থাকে। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিশ্রমের কাজ করে সার্ফ প্রায় দাস শ্রমিকরা। খৃষ্ট ধর্ম্মতত্ত্বের প্রভাবে সমাজজীবন নিয়ন্ত্রিত হ'ত। জীবনধারা চার্চের নীতিনির্দেশ দ্বারা পরিচালিত হওয়ার 'ন্যায্যমূল্য' সংক্রান্ত কিছু আলোচনা থাকলেও ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধীয় কাজকে সাধারণতঃ তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হত। এ রকম সংকীর্ণ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক চিন্তার বিকাশ প্রায় ছিল না।

৪৩.৩.১ মার্কেন্টাইলিজম্

আধুনিক অর্থনৈতিক চিন্তার ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু সওদাগরী বা 'Mercantilism' এবং কিছু 'ফিজিয়োক্র্যাট'-দের চিন্তাধারা থেকে (অষ্টাদশ শতাব্দী)। সওদাগরী চিন্তা

মধ্যযুগীয় নৈতিকতার বন্ধনের বিরুদ্ধে এক ধরনের বিদ্রোহ। ইউরোপ ঐ সময় রাজতন্ত্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার পক্ষে এক ধরনের শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে। শক্তিশালী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজন বিপুল সম্পদ যা' দেশ-বিদেশ থেকে সংগ্রহ করতে হবে। সম্পদ সংগ্রহের কাজে উদ্ভব হ'ল সওদাগর বা merchant নামক নতুন শ্রেণীর মানুষ। মধ্যযুগীয় বিধিনিষেধের শেকল ছিঁড়ে এরাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ তৈরী ও প্রশস্ত করেন, এতদিনের স্থানীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি প্রসারিত হয়ে বহুদেশের সঙ্গে বহুজাতিক বাণিজ্যের পথ রচনা করেন। মূল্যতত্ত্বের বা কর-সংক্রান্ত তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। সওদাগরী চিন্তায় বলা হয় যে মানুষ তার স্বার্থচিন্তা দ্বারা পরিচালিত। তবে বিভিন্ন ব্যক্তির কাজ যাতে সংঘাত সৃষ্টি না করতে পারে সেজন্য রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেওয়া দরকার। এভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিরংকুশ হলে দেশের ও মানুষের উভয়েরই সামঞ্জস্য থাকবে, সকলেরই মঙ্গল হবে। রাষ্ট্র হবে 'প্রভু' এবং প্রজাসকল হবে 'আজ্ঞাবহ' কর্ম্মী। সকলেরই লক্ষ্য আরও বেশী সোনা, রূপো সংগ্রহ করে দেশকে শক্তিশালী করে তোলা, আমদানী কমিয়ে রপ্তানী বাড়ানোই এ কাজে সহায়ক। বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সকে দেশের পক্ষে রাখতে হবে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সওদাগরী ধ্যানধারণা রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের সহায়ক। 'মার্কেন্টাইলিষ্ট'দের অনেকেই সফল বণিক ছিলেন। তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দ্রব্যের দাম নিরূপণে চাহিদা-যোগানের ভূমিকা, অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের সম্পর্ক, ইতাদি কিছু বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার সূত্রপাত ঘটলেও সামগ্রিক বা ধারাবাহিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

৪৩.৩.২ ফিজিওক্র্যাসি

সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে সওদাগরী চিন্তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে 'ফিজিওক্র্যাসি' বা কিছু সামন্ত প্রভুর কল্পনা প্রসূত অর্থনৈতিক চিন্তার উদ্ভব হয়। এই চিন্তায় জমি ও কৃষিকাজ ছিল উৎপাদনশীল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যালান্সের দিকে বেশী নজর দেওয়ায় সওদাগরী নীতি তীব্র প্রতিযোগিতা, বিরোধিতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের কারণ হয়েছে। তাঁদের মতে শুধুমাত্র কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীল কাজে মনোযোগ দিলে মানুষের সব অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসারী নয় বলে সমাজে অসাম্যের উদ্ভব হয়। তাঁদের মডেলে (ট্যাব্লো) সম্পদ বন্টনের যে ছক্ দেখানো হয় সেখানে কৃষক, জমির মালিক ও রাষ্ট্র সকলেই নিজ নিজ অংশ ন্যায্যভাবে পেয়ে যায় বলে সম্পদ বন্টনে সমতা থাকে।

'সওদাগরী বা ফিজিওক্র্যাসি'-র চিন্তায় অর্থতত্ত্বের কিছু চিন্তাভাবনা থাকলেও সেগুলি কিছুকাল পরে অর্থতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত, পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, আলোচনার ভিত্তি রচনা করেছিল মাত্র।

৪৩.৩.৩ ধ্রুপদী চিন্তা

ওপরে প্রাচীন গ্রীস ও মধ্যযুগের বিক্ষিপ্ত আলোচনায় অর্থনীতি চর্চার সূচনা পাওয়া গেলেও 'মার্কেন্টাইলিস্ট' ও 'ফিজিয়োক্রাট'দের হাতেই আধুনিক অর্থনীতি চর্চার বুনিয়াস গড়ে উঠেছিল, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের শুরুতে, অ্যাডাম স্মিথ নানা অর্থনৈতিক সমস্যার মূল ঐক্যসূত্র আবিষ্কার করে বিষয়টির এক বৈজ্ঞানিক রূপ দেন। আজকে আলোচিত প্রায় সব বিষয়ই ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Wealth of Nations'-এ আলোচিত। তাঁর বিশ্লেষণের ধারা থেকেই শুরু হয় 'ধ্রুপদী' বা 'classical' অর্থনীতি চর্চা। এ-ধারা পরে পূর্ণতা পায় রিকর্ডো (১৭৭২-১৮২৩) ম্যালথাস্ (১৮৩৪) এবং জন স্টুয়ার্ট মিলের (১৮০৬-১৮৭৩) কাছে। ধ্রুপদী চিন্তার ভিত্তিতেই ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মার্কসের

'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল দুর্বলতাগুলি স্পষ্ট হয়েছে।

৪৩.৪ ভারতীয় চিন্তাধারা

প্রাচীন ভারতে নানা বিষয়ে জ্ঞানচর্চা হলেও তখন অর্থনৈতিক আলোচনায় বিশেষ উৎসাহ ছিল না। অনেক আগের কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকৃত অর্থে রাজ্য প্রশাসনের নীতি ও করনীতির সম্বন্ধে আলোচনা। অর্থনীতির কিছু প্রসঙ্গ প্রশাসনিক আলোচনার হাত ধরে এসেছে। ইউরোপের চিন্তাবিদ্দের মতো বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণ সেখানে বিরল। অথচ বৌদ্ধযুগে শ্রেষ্ঠীদের কাজ ইউরোপে সওদাগরী চিন্তাধারার অনেক আগেই ক্রিয়াশীল ছিল। ভারতের বণিকদের সঙ্গে বিদেশেরও অনেক বাণিজ্যিক কাজের কাহিনী প্রচলিত। অর্থ বিনিময় ও ঋণদান সম্পর্কিত কার্যকলাপ তখনকার বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ভারতে ধারাবাহিক আধুনিক অর্থনৈতিক আলোচনার সূত্রপাতও ব্রিটিশ ধ্রুপদী চিন্তাধারার সূত্রপাতের অল্প পরেই। এদেশে আধুনিক আর্থিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এদেশে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার হারায়। তখন নতুন আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাণিজ্যের রূপ বদলাচ্ছে, তৈরি হচ্ছে নূতন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাঙ্ক। এইসব কাজে বিদেশী ধরন-ধারণ ও বিদেশী প্রভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশজ ক্ষুদ্রশিল্প যে মৃতপ্রায় হতে চলেছে সেদিকে কারও নজর পড়ছে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল সম্বন্ধে তিনি মত প্রকাশ করেন, একতরফা সম্পদ নির্গমনও তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর পর দেশে অনেক পরিবর্তন ঘটলেও দেশের অনুন্নত অর্থব্যবস্থার চরিত্র বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। চিরাচরিত কৃষি-পদ্ধতিতে প্রকৃতি নির্ভর চাষ, জমির খাজনার ক্রমবর্ধমান বোঝা, দেশজ কুটিরশিল্পের অবনতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি ১৮৫০ সালে যেমন ছিল ১৮৯০ সালেও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে-র বর্ণনায় একই ছিল। তবে শতাব্দীর শেষের দিকে দেশের অর্থনীতি চর্চায় গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন আসে দাদাভাই নওরোজী (১৮২৫-১৯১৭), রাণাডে (১৮৪২-১৯০১) এবং রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)—এই ত্রয়ীর কাছ থেকে। অপরিণত ও অসম্পূর্ণ হিসাব করতে পরিসংখ্যান দিয়ে ভারতীয় তথ্যের চর্চায় নওরোজী পথ প্রদর্শন করেন। ইংরেজ শাসনের অবসান না চাইলেও দেশের ব্যাপক দারিদ্র্যের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে বিদেশী শাসনকে 'বৃটিশসুলভ নয়' (Un-British Rule) বলে বর্ণনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্তের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস, সম্পদ নির্গমন। রাণাডে জার্মান আপেক্ষিকতাবাদ সমর্থন করে ইংল্যান্ডের ও ভারতের আর্থিক পরিবেশের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। ইংল্যান্ডের 'ক্ল্যাসিক্যাল' অর্থতত্ত্বের চর্চায় ব্যক্তিস্বার্থের জয়গান, প্রতিযোগিতা, চলনশীলতা ইত্যাদির অনুমান অবাস্তব। কাজেই এদেশে পাশ্চাত্যের উপযোগী কর্ম্মপন্থা অচল। দেশের পরিস্থিতির উপযোগী কর্ম্মপন্থা ঠিক করতে হবে। সরকারের অভিভাবকত্বে ও সাহায্যে দেশের মোট সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা প্রয়োজন। বিংশ শতাব্দীর শেষেও ভারতের স্বাধীন অর্থব্যবস্থা ত্রয়ীর চিন্তার প্রভাবমুক্ত হ'তে পারেনি।

গত শতাব্দীর শেষ থেকে দেশে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি প্রবাহে উপরোক্ত ত্রয়ীর চিন্তা বিশেষ প্রেরণা দিয়েছিল, সন্দেহ নেই। একদিকে বিদেশী শাসনে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্র, অন্যদিকে, সোভিয়েত দেশে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, দেশবাসীকে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ সন্ধানে প্রবৃত্ত করে। আবার বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে আসা ভারতীয় গবেষকরা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক অবস্থার মূল্যায়নের কাজে জড়িয়ে নতুন চিন্তায় সকলকে তৈরী করেন। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণিত পণ্ডিতজন ভারতের শিল্পায়নের উপর জোর দেন। বিপরীত এক চিন্তার সূত্রপাত হয় মোহনদান করমচাঁদ গান্ধীর বিভিন্ন রচনায়। জওহরলাল নেহেরু বা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কেউই গান্ধীর অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ

বিশ্বাস করতেন না। স্বাধীনতা পর্যন্ত ভারতের আর্থিক চিন্তায় ইংলন্ডের শিল্পবিপ্লব ও আমেরিকার উন্নতির সঙ্গে জাপানের উন্নতি ও সোভিয়েত রাশিয়ার পরিকল্পিত ব্যবস্থার এক সংমিশ্রণ ঘটে। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে যে শিল্পনীতি, বা ১৯৫০ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠনে এইসব চিন্তাধারাই প্রতিফলিত।

আজকের ভারতে অর্থনীতি চর্চা অনেক ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। উচ্চ পর্যায়ের অর্থনৈতিক চর্চার সবক্ষেত্রেই ভারতীয় অর্থনীতিবিদদের কাজ পৃথিবীর সবদেশেই সম্মানিত। এ-সব বিস্তারিত আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়। তবে এটা মনে রাখা দরকার যে দেশের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের লক্ষ্য উল্লেখ এবং পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে প্রথমপর্বে শিল্পের জাতীয়করণের ঝোঁক লক্ষ্য করা গেলেও দেশে ব্যক্তি উদ্যোগের প্রসার খুব একটা ব্যাহত হয়নি। ১৯৫৬ সালে গৃহীত মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার আদর্শ কখন সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কখনও উদারীকরণ—এই দুই মেরুর মধ্যেই থেকেছে। দেশের ব্যক্তি উদ্যোগও এ ব্যবস্থাকে মেনে তার অংশীদার হয়েছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাতেই সরকারী ও বেসরকারী ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক চিন্তার সামঞ্জস্য বিধানে তৎপর। অন্য অনেক দেশের মতো ভারতেও অর্থনীতির চর্চা বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে।

৪৩.৫ সারাংশ

প্রাচীন গ্রীসে অর্থনৈতিক চিন্তা পরিবারভুক্ত মানুষের উন্নত নৈতিক জীবনের লক্ষ্যে পারিবারিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনাকে কেন্দ্র করে ছিল। অভাব পূরণে ভোগ 'স্বাভাবিক' মনে করলেও বিনিময়ের কাজ 'অস্বাভাবিক' মনে করা হ'ত। তখন সব কাজই নৈতিক বা ধর্মীয় দিক থেকে বিবেচনা করায় ব্যবসায়িক অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল না। রোমান 'জুরিষ্ট'দের কাছে 'চুক্তি' কিছুটা মর্যাদা পায়। তবে অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে পরিবারের দিকে দৃষ্টি আজও নিবদ্ধ আছে। মধ্যযুগে অনেক সময় ধরে চার্চের প্রভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যকে তাচ্ছিল্য করা হত। শুধু 'ন্যায্যমূল্য' সংক্রান্ত কিছু আলোচনা পাওয়া যায়। মধ্যযুগের নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 'মার্কেন্টাইলিজ্‌ম' ও 'ফিজিয়োক্র্যাসি'র চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক আলোচনার ভিত্ রচনা করে। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে রপ্তানি বৃদ্ধি, দাম নির্ণয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু আলোচনার সূত্রপাত হয়। ধ্রুপদী অর্থনৈতিক তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক আলোচনা আরম্ভ হয় ১৭৭৬ সালে অ্যাডাম স্মিথ-এর প্রকাশিত বই থেকে।

ভারতে অর্থনীতিচর্চার সূত্রপাত হয় রামমোহন রায়-এর চিন্তা ধরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তাঁর পর দাদাভাই নওরোজী, রাণাডে এবং রমেশচন্দ্র দত্ত—এই ত্রয়ী বিদেশী শাসনে অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্বদেশী আন্দোলন প্রেরণা পেলেও রাণাডে, গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র বসুর চিন্তার সবটা গৃহীত হয় নি। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় ভারতে অর্থনৈতিক চিন্তায় বিশ্বায়ণ ঘটেছে। প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তাধারার উপরোক্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ ও বিক্ষিপ্ত সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্যার সর্বজনীন প্রকৃতি পুরনো ও নতুন চিন্তাধারা দেশে-বিদেশে কিভাবে সক্রিয় হয়েছে সে পরিচয় পেতে আগ্রহ থেকে যায়। সে-আগ্রহ সৃষ্টি করতেই এ-অংশের সংযোজন। আরও জানতে হ'লে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ডক্টর ভবতোষ দত্ত প্রণীত "অর্থনীতির পথে" শীর্ষক বাংলা পুস্তিকাটি সাহায্য করে। তবে ভারতে বিষয়টির চর্চাই সেখানে মূল বিষয়। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণের সব উৎসই ইউরোপের চিন্তাধারা বলে মনে করা যায়।

৪৩.৬ অনুশীলনী

১। প্রাচীন গ্রীসে অর্থনৈতিক চিন্তায় 'স্বাভাবিক' এবং 'অস্বাভাবিক' কাজের উদাহরণ কি কি?

২। মধ্যযুগে অর্থনৈতিক চর্চা সংকীর্ণ হওয়ার মূল কারণ কি?

৩। আধুনিক অর্থনৈতিক চর্চার ভিত্তি কারা রচনা করেছিলেন?

৪। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করতে 'মার্কেন্টাইলিজ্‌ম', কোন পথের নির্দেশ দেয়?

৫। 'শিল্প বিপ্লব' কি এবং কখন সর্বপ্রথম ঘটে?

৬। বৈজ্ঞানিক অর্থনৈতিক আলোচনার সূত্রপাত কে কখন করেন?

৭। 'অদৃশ্য হস্তের' ধারণাটির মূল বক্তা কে? ধ্রুপদী অর্থনৈতিক চিন্তার সূত্রপাত করেন কে?

৮। কী অর্থে কার্লমার্কস্ ধ্রুপদী চিন্তার অংশীদার? তিনি কোন অর্থ ব্যবস্থার সমালোচনা করেছিলেন?

৯। ভারতে অর্থনীতি চর্চার পথ প্রথম কে রচনা করেছিলেন?

১০। এদেশে অর্থনীতি চর্চার ত্রয়ী কারা?

১১। ভারতে ব্যক্তি ও সরকারী উদ্যোগের সহাবস্থান নীতি কখন ঘোষণা করা হয়?

৪৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. Schumpter : *History of Economic Analysis.*

একক ৪৪ ◆ বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার রূপ

গঠন

৪৪.০ উদ্দেশ্য

৪৪.১ গ্রীসের অর্থনৈতিক চিন্তাধারা

৪৪.১.১ বাজার ব্যবস্থা

৪৪.১.২ আদেশাত্মক অর্থব্যবস্থা

৪৪.১.৩ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

৪৪.২ বিভিন্ন ব্যবস্থার মূল্যায়ন

৪৪.৩ দাম ব্যবস্থা ও উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার

৪৪.৪ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত আলোচনার বৈশিষ্ট্য

৪৪.৫ অনুশীলনী

৪৪.৬ ১ নং পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

৪৪.৬.১ পাঠ্য বিষয়ের অতিরিক্ত চর্চা

৪৪.৭ অতিরিক্ত অনুশীলনী

৪৪.০ উদ্দেশ্য

এককের তৃতীয় অংশে অর্থব্যবস্থার মৌলিক চারটি সমস্যার সমাধান প্রচেষ্টার আলোচনা প্রসঙ্গে দেখা গেছে যে সমস্যাগুলি এক ধরনের হলেও সমাধান প্রচেষ্টার রূপ বিভিন্ন হতে পারে। আদর্শ, রীতিনীতি, প্রচলিত আইন, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়গুলি অর্থব্যবস্থার স্বরূপ প্রকাশ করে। অবস্থাভেদে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পথে পণ্য ও উপকরণের ব্যবহার বা বিলিকরণ ব্যবস্থার পার্থক্য ঘটে থাকে। এ-পার্থক্যজনিত কারণে অর্থ ব্যবস্থার রূপ ও কর্ম্মপ্রচেষ্টাও পৃথক হয়। সাধারণতঃ তিন ধরনের অর্থব্যবস্থার পরিচয় জানলে বাস্তব অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার প্রকৃতি সহজেই অনুধাবন করা চলে। অর্থব্যবস্থার তিনটি মূল রূপ হ'ল—বাজার বা দাম-নির্ভর ব্যবস্থা, নির্দেশ মূলক বা নিয়ন্ত্রিত অর্থব্যবস্থা, এবং মিশ্র অর্থব্যবস্থা। ব্যবস্থাগুলির প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য বিচার করে আর্থিক কর্ম্মপ্রণালীর স্বরূপ ও বৈচিত্র্য জানা যাবে। বিলি-বন্টন ব্যবস্থার প্রকৃতি পৃথক হওয়ায় কিছু অর্থব্যবস্থা ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে চাহিদা যোগান বা দাম-ব্যবস্থার ওঠানামা বিচার করে বিলিকরণের কাজ সম্পন্ন করে। এক্ষেত্রে বাজারই অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল চালিকাশক্তি। আবার দ্বিতীয় ধরনের অর্থব্যবস্থায় বিলিকরণের মৌলিক সমস্যাগুলি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

এক্ষেত্রে বাজার শক্তির কোনও ভূমিকা নেই বলা চলে, বিলিবন্টনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশই চূড়ান্ত। তৃতীয় রূপের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি রূপেরই আংশিক প্রতিফলন দেখা যায়। বাজার শক্তির কিছুটা এবং নির্দেশাত্মক ব্যবস্থার কিছুটা নিয়ে মিশ্রভাবে বিলিকরণের কাজ সম্পন্ন হয়। প্রথম রূপকে দাম-নির্ভর বাজার ব্যবস্থা বা Free Market System বলে। এ ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপকে ধনতান্ত্রিক বা Capitalist System বলে। দ্বিতীয় রূপে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালন ব্যবস্থাকে নির্দেশাত্মক অর্থব্যবস্থা বা Command Economy বলে। এরই চূড়ান্ত পরিণত রূপ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা Mixed Economy। আধুনিক পৃথিবীতে যে ব্যবস্থা সর্বাধিক দেশে গৃহীত তা'হল তৃতীয় মিশ্র ব্যবস্থা বা Mixed Economy এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত কিছু অর্থনৈতিক কাজে সরকারী নীতিনির্দেশ সার্থক করা হলেও বাকী অংশের ক্রিয়াকলাপ অনেকটাই-নিয়ন্ত্রণবিহীন বাজারশক্তি-নির্ভর ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছাধীন। তিনরূপের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এখন আলোচ্য।

৪৪.১ অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ধরন

৪৪.১.১ বাজার ব্যবস্থা

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে প্রথমে ইংলন্ডে, পরে ইউরোপের কয়েকটি দেশে, পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের ও বন্টনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন করার ক্ষেত্রে কিছু আবিষ্কারের সার্থক প্রয়োগ আধুনিক ফ্যাক্টরী উৎপাদন পদ্ধতির দ্রুত প্রসার ঘটায়। ফলে পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণ পণ্য কম খরচে উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। আনুষঙ্গিক পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি অনেক মানুষের কাছে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী সহজলভ্য করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ঐসব পরিবর্তন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে অন্য যে সব সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলোকে একত্রে 'শিল্পবিপ্লব' বা Industrial Revolution বলা হয়। বৈপ্লবিক পরিবর্তনগুলির কার্যধারা ও সুফল রাষ্ট্রের বা কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঘটেনি। ব্যক্তি বিশেষের স্বাধীন স্বার্থচিন্তা ও ক্ষমতা বিনা বাধায় অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টা চালানো থেকেই উদ্ভব হয়। বিনা নিয়ন্ত্রণে নিজ নিজ স্বার্থবুদ্ধির প্রয়োগ শেষ পর্যন্ত সমাজের সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। এ সাফল্য লক্ষ্য করেই ধ্রুপদী অর্থনীতির চর্চার জনক এ্যাডাম স্মিথ্ ঐ সময় স্বার্থবুদ্ধির জয়গান করে 'শিল্পবিপ্লব'কে স্বাগত জানিয়েছিলেন। এ রকম অভাবনীয় সাফল্যের মূলে ছিল প্রচলিত আইন, রীতিনীতি। প্রচলিত ব্যবস্থাগুলি দেশের অর্থনৈতিক কর্ম্মধারাকে উপকরণ ও পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বাজারমুখী ও সেখানে দাম নির্ধারক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছিল। পণ্য উৎপন্ন করে বিক্রির জন্য উৎপাদন সেগুলি বাজারে যোগান দেবে। আবার, অভাব মেটাতে ক্রেতা সাধারণ তাদের চাহিদা নিয়ে বাজারে আসবে। ক্রেতা সাধারণ সর্বনিম্ন দামে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের চেষ্টা এবং বিক্রেতাদের সর্বোচ্চ দামে সর্বাধিক মুনাফার প্রচেষ্টা, বাজারদরকে প্রভাবিত করে উভয়ের মধ্যে টানাপোড়েন ঘটায়। এই টানাপোড়েন-এর মধ্য দিয়েই শেষপর্যন্ত বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়পক্ষেরই স্বার্থরক্ষা হয়, 'উৎপন্ন দ্রব্য কাদের জন্য' বিলিকরণের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। অন্যদিকে, উপকরণের বিলিকরণজনিত সমস্যাও বাজারের প্রক্রিয়ায় মিটে যায়। বেশী চাহিদার দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির, অথবা স্বল্প চাহিদার দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস-সংক্রান্ত ধারণা, দাম-ব্যবস্থাই স্পষ্ট করতে পারে। কোন্ কোন্ দ্রব্য কিভাবে উৎপন্ন করতে হবে সে সমস্যাও বাজার ব্যবস্থা মিটিয়ে দেয়।

বিলিকরণের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে বাজার ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমতঃ

ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার। এ-ব্যবস্থার সমর্থকদের মতে, সম্পত্তির মালিকানা মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম করতে যাদুমন্ত্রের মত প্রেরণা দেয়। মানুষ বেশী আয় ও বেশী ধনসম্পদ সংগ্রহের সম্ভাবনা থাকলে বেশী পরিশ্রম করতে রাজী থাকে। সম্পত্তির আকাঙক্ষা পূরণে তাকে পূর্বাপেক্ষা বেশী উৎপাদনের চেষ্টা করতে হয়। সমাজের সব মানুষের স্বার্থচিন্তা উৎপাদন বৃদ্ধি করে শেষ পর্যন্ত সমাজকেই লাভবান করে। কাজেই মানুষের কর্ম্মপ্রেরণা যোগাতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার সুরক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। বাজার শক্তির সাফল্যের একটি বড় উপাদান সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার। সম্পদ বাড়লে একদিকে ব্যক্তির আয় বাড়ে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত কিছু অংশ পুনরায় উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে নিয়োগ করে উৎপাদন ও আয় আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। বিনিময়-নির্ভর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কার্লমার্কস্-এর বিখ্যাত ব্যাখ্যা মনে আসে। সম্পদকে (M) ব্যবহার ক'রে পণ্য উৎপাদন (C) ও বিনিময় করে পুনরায় সম্পদে (M^1) রূপান্তরিত করাই মূল বৈশিষ্ট্য। কিন্তু লক্ষণীয় যে $M^1 > M^1$ অর্থাৎ প্রথম সম্পদের পরিমাণ থেকে বিনিময়ের পর শেষ সম্পদের (M^1) পরিমাণ অনেক বেশী। উদ্বৃত্ত সম্পদের ক্রমাগত বৃদ্ধি করে আত্মসাৎ করাই ধনতন্ত্রের লক্ষ্য। তিনি অবশ্য ব্যক্তি ও বাজার-নির্ভর অর্থব্যবস্থার নিশ্চিত পতনের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করতেই এ-প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু এটা ঠিক যে উৎপাদন-ব্যবস্থায় মূল চালিকা শক্তি বা প্রেরণা এই উদ্বৃত্ত সম্পদ লাভের সম্ভাবনা থেকেই আসে। কাজেই বাজার-ব্যবস্থাকে সক্রিয় রাখতে সম্পত্তির মালিকানায় ব্যক্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন হয়ে থাকে।

বাজার-ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্বাচনে ক্রেতার স্বাধীনতা বা Consumer Sovereignty। কোন্ কোন্ পণ্যসামগ্রীর জন্য আয়ের কতটা খরচ করা হবে সে বিষয়ে ভোগকারীরাই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী। ভোগের জন্য দ্রব্য বা সেবা নির্বাচনের অধিকার বাজার-ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যের বিলিকরণের কাজ সম্পন্ন করে। তারাই পণ্য উৎপান ব্যবস্থার নিয়ামক। তাদের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী বাজারে পণ্যের যোগান বেশী বা কম হয়। কাজেই ভোগের বা ক্রেতার নির্বাচনের স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখতে হবে।

স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা ঃ তৃতীয়ত, বাজার ব্যবস্থার কর্ম্মধারা বিচার করে তাকে দাম-মুনাফা ব্যবস্থা বলেও বর্ণনা করা হয়। মুনাফার প্রত্যাশায় পণ্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হবে কিনা নির্ভর করে বাজার দাম ও ক্রেতার পছন্দের উপর। দাম বেশী হ'লে বেশী লাভের আশায় বেশী পরিমাণে দ্রব্য উৎপন্ন হবে। বেশী উৎপন্ন করতে বেশী মূলধন বর্ধিত দামের দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা হবে। এইভাবে দাম-মুনাফা ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপকরণ ও পণ্যের বিলিকরণ সম্পন্ন করে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাধান হয় বলে বাজার-ব্যবস্থায় কোন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না। নিয়ন্ত্রণহীন, মুক্ত, বাজার ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই সকলের মঙ্গল সাধন করে।

উদ্যোগের স্বাধীনতা বাজার-ব্যবস্থার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। এ-অবস্থায় দেশের সরকার ব্যক্তি বিশেষের অর্থনৈতিক কাজে হস্তক্ষেপ করে না। দেশের সরকার 'পুলিশ রাষ্ট্রের' বা Laissey Faire নীতি অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও বিদেশী আক্রমণের দিকে নজর রাখে। ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্বের চেষ্টা করে না। উৎপাদন ও বন্টনের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যক্তি বিশেষ বা উদ্যোক্তার উপর নির্ভর করে। অযোগ্য উদ্যোক্তা ভুল সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতি স্বীকার করে নেবে, শেষ পর্যন্ত যোগ্যতম উদ্যোক্তাই বাজারে টিকে থাকবে। এ-প্রক্রিয়ায় ক্রেতাসাধারণ সর্বনিম্ন দামে দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করতে পারে। উদ্যোগের স্বাধীনতা ধনতন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সেইজন্য অনেকে ধনতন্ত্রকে অবাধ উদ্যোগাধীন ব্যবস্থা বলে বর্ণনা করেন। অবশ্য বাজার ব্যবস্থায় বিলিকরণের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি শেষ পর্যন্ত কিছু ধনী বা পুঁজিপতিরাই গ্রহণ করে থাকে। সেজন্য বাজার ব্যবস্থা বাস্তবে ধনতন্ত্রের

রূপ নেয়। উৎপাদনে মূলধনেরই প্রাধান্য থাকে।

অবাধ উদ্যোগের সঙ্গে বাজার ব্যবস্থায় পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে অবাধ প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। অবাধ প্রতিযোগিতা পঞ্চম বৈশিষ্ট্য। এক বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে বহু উৎপাদন প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ফলে ফার্মগুলির মধ্যে বিক্রয় বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। অন্য বিক্রেতার কাছে থেকে ক্রেতাকে বিশেষ দ্রব্যটি ক্রয়ে আকৃষ্ট করতে বিশেষ দ্রব্যটি বিক্রয়মূল্য কমানো, দ্রব্যটি সমজাতীয় অন্য দ্রব্য থেকে পৃথক বা অধিক গুণমানসম্পন্ন প্রমাণ করতে ব্যয়বহুল বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। প্রতিযোগিতার এ-সব অপচয় সত্ত্বেও মনে করা হয় যে নিয়ন্ত্রণবিহীন অর্থব্যবস্থায় শেষপর্যন্ত বাজার শক্তির ঘাত প্রতিঘাত বিলিকরণের কাজ সন্তোষজনক হয়। বাজার শক্তির প্রক্রিয়া 'অদৃশ্য হাতের' সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সমস্যার সমাধান করে দেয়। এ্যাডাম স্মিথ বাজার শক্তিকেই অদৃশ্য হাতের ক্রিয়া বলে বর্ণনা করেছেন। অন্যদিক থেকে বলা যায় যে সামগ্রীর দাম, শ্রমের মজুরী বা উপকরণের আয় আইন দ্বারা স্থির না করে বাজারে চাহিদা-যোগানের শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে স্থিত করতে প্রয়োজন নিয়ন্ত্রণহীন প্রতিযোগিতা।

বাজার-নির্ভর বিলিকরণ ব্যবস্থায় সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। কিছু মানুষ সম্পদশালী, আর এক দলে আছে বেশীর ভাগ মানুষ যারা 'সর্বহারা' (haves and have-nots)। সমাজে এরকম শ্রেণী-বিভাজন বাজার শক্তি নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিলিকরণ প্রক্রিয়াটি আয় বন্টনে বৈষম্য ও অসাম্য বজায় রাখে। এই শ্রেণী বিভাজন বা অসাম্য বাজার ব্যবস্থার ষষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য সম্পূর্ণ বাজার-ব্যবস্থা-নির্ভর অবিমিশ্র ধনতন্ত্র বা অবাধ উদ্যোগের ব্যবস্থা আজকাল পৃথিবীর কোনও দেশেই দেখা যায় না। এখন সব দেশেই সরকার জনস্বার্থে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার বা বিলিকরণের অন্যান্য কাজে কমবেশী নিয়ন্ত্রণ করে। তবে যতক্ষণ নিয়ন্ত্রণের কাজ সীমিত এবং উৎপাদক বা ক্রেতার স্বাধীনতা বিলোপের চেষ্টা না হয় ততক্ষণ অর্থব্যবস্থাকে বাজার নির্ভর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা চলে।

দেখা গেল যে, বাজার নির্ভর, ব্যক্তি উদ্যোগাধীন, ক্রেতার স্বাধীনতা সম্পন্ন দাম-মুনাফার প্রতিক্রিয়ায় পরিচালিত বাজার ব্যবস্থা নৈর্ব্যক্তিক চাহিদা-যোগান দুটি বাজার শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলিকরণের অর্থনৈতিক কাজগুলি একযোগে সুসম্পন্ন করতে পারে। উদ্যোগ বা ক্রেতার অবাধ স্বাধীনতা আজকাল না থাকলেও পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সীমিত নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বাজার শক্তির কার্যকারিতা এখনও বহাল আছে। এ ব্যবস্থার গুণ বা দোষ আছে। সে মূল্যায়ন কিছু পরে করা যাবে।

৪৪.১.২ আদেশাত্মক অর্থব্যবস্থা (Features of a Command Economy)

বাজার ব্যবস্থার বিপরীত যে-আদর্শ ব্যবস্থা বিশেষভাবে আলোচিত হয় তাকে নির্দেশমূলক অর্থব্যবস্থা বলে। আদর্শ বিচারে একে সমাজতান্ত্রিক বা Socialist ব্যবস্থাও বলে। এখানে মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাবলী এক ধরনের হলেও সেগুলি সমাধানের চেষ্টা ভিন্ন পথে করা হয়ে থাকে। এ-পথ বাজার ব্যবস্থার দোষত্রুটি, ব্যর্থতা থেকেই উদ্ভূত।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি, উদ্যোগ ও ক্রেতার স্বাধীনতা, অনিয়ন্ত্রিত বাজারে 'অদৃশ্য হাতের শক্তির' ক্রিয়া ইত্যাদি বাজার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলির জায়গায় সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বার্থের বদলে সামাজিক স্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। সামাজিক কল্যাণসাধনে দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনার দায়িত্ব সমাজ বা রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। দাম-মুনাফা ব্যবস্থার পরিবর্তে সরকার বা কোনও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সংস্থার নির্দেশে উপকরণ ও উৎপন্ন সামগ্রীর বিলিকরণ করা হয়। সরকার নিজেই উদ্যোগী হয়ে উৎপাদন সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ম-নির্দেশের মাধ্যমেই কার্যকর করার চেষ্টা করেন। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তির অধিকার খর্ব করে উৎপাদনের

উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত সকল সম্পদের মালিকানা সমাজ বা সরকার গ্রহণ করে। উদ্যোগের স্বাধীনতার বিলোপ ঘটে। এই অর্থব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল দ্রব্য উৎপাদন ও বিলিকরণের ব্যাপারে ব্যক্তি নির্ভর 'অদৃশ্য হাতে'র ক্রিয়ার উপর নির্ভর না করে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দাম, পরিমাণ ইত্যাদি সবকিছুই হিসাব করে স্থির করা।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিলিকরণের কাজ করবে। কি, কিভাবে এবং কাদের উৎপন্ন হবে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই হিসেব করে ঠিক করবে। পরিকল্পনা সর্বাত্মক করতে অর্থব্যবস্থার ছোটবড় বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরস্পরের সম্পর্কযুক্ত হতে হবে। একাজে উৎপাদন, ভোগ ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে জটিল হিসাবের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষই এ-দুরূহ কাজ সম্পন্ন করে।

চতুর্থতঃ, বিপ্লব না ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতেও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রচলন সম্ভব বলে কেউ কেউ মনে করেন। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক সাম্য এবং সমাজতন্ত্রে অর্থনৈতিক সাম্যের আদর্শ লালিত হয়। সরকারের পরিচালকগণ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে পার্লামেন্টে আইন পাশ করে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনকারী শিল্পকে জাতীয়করণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। এভাবে ধীরে ধীরে আইনের মাধ্যমে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও উদ্যোগের প্রসার ঘটিয়েও এক ধরনের 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' আদর্শ কার্যকর করার চেষ্টা করা যেতে পারে। এ রকম democratic socilism বা 'Fabian Socialism' অহিংস পথে, ভোটের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা কার্যকর হ'তে পারে। ভারতের স্বাধীন অর্থব্যবস্থায় এ পথেই সংবিধানের নির্দেশ অনুয়ী সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছানোর কথা বলা হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ইউরোপ সমাজতন্ত্রের পক্ষে বিভিন্ন মতবাদ সোচ্চার হয়। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে এ-ব্যবস্থার পত্তন হয়। তারপর দুই কি তিন দশকের মধ্যেই সোভিয়েত দেশের অর্থনৈতিক শক্তির বিকাশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে আকৃষ্ট করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত এবং অন্যান্য অনেক অনগ্রসর দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রগতির চেষ্টায় সমাজতান্ত্রিক পথেই অগ্রসর হয়, পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে নানা নিয়ম-নির্দেশের প্রবর্তন করে।

দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কর্মসূচীর মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ব্যক্তিগত মালিকানার সংকোচন, দাম মুনাফা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের নির্দেশ কার্যকর করার ব্যাপারে সাধারণ মতৈক্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরী, পোলান্ড, আল্‌বেনিয়া প্রভৃতি দেশগুলি কেন্দ্রীয় নির্দেশেই নিয়ন্ত্রণ হয়। দাম-মুনাফা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। ব্যক্তি উদ্যোগ না থাকায় 'মুনাফার' প্রত্যাশা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ ও দামও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির হয়। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের 'ম্যানেজার' বা বেতনভুক্‌ পরিচালকদের মূল কাজ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ম-নির্দেশ বাস্তবে কার্যকর করা। কি কি দ্রব্য, কি পদ্ধতিতে উৎপন্ন করা হবে সে-সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষই সমাজের প্রয়োজন ও উপকরণের পরিমাণ বিবেচনা করে, জটিল হিসাব কষে স্থির করে থাকে। দ্রব্যের দাম বণ্টনের পরিমাণ একই হিসাব থেকে স্থির করে দেওয়া হয়। হিসাব সঠিক হলে উদ্বৃত্ত বা ঘাট্‌তি থাকে না। ঘাট্‌তি হলেও দামের উপর বিশেষ প্রভাব দেখা দেয় না, অতিরিক্ত মুনাফা সৃষ্টি হয় না। নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা থেকে যে উদ্বৃত্ত আয় সৃষ্টি হয় তার ফলভোগ ব্যক্তিবিশেষ করতে পারে না, সমস্ত সমাজ যৌথভাবে উদ্বৃত্ত আয়ের ফল ভোগ করতে পারে। এভাবে সমাজে সাম্যের নীতি অনুসরণ করে বিলিকরণ ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রচেষ্টা হয়। কর্তৃপক্ষের স্থির-করা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণকারী সকলকে কেন্দ্রীয় নির্দেশ মেনে চলা বাধ্যতামূলক হয়। ভোগকারী পূর্বনির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য ভোগ করতে পারবে, শ্রম ব্যবহারেও নির্দিষ্ট দায়িত্ব

পালন করতে হবে। আবার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপককেও প্রদত্ত ‘কোটা’ পূরণ করতে হবে। একটি শিল্পে উৎপাদন কোটা পূরণ না হ’লে অন্য শিল্পে উপকরণের ঘাট্‌তি দেখা দেবে, বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদনের সামঞ্জস্য (balance) ব্যাহত হলে কেন্দ্রীয় নির্দেশ কার্যকর করা যাবে না। এজন্য নির্দেশ পালন বাধ্যতামূলক হয় এবং এ ব্যবস্থাকে নির্দেশাত্মক অর্থ ব্যবস্থা বা Command Economy বলা হয়। অবশ্য এ রকম সরকারী নির্দেশ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কতটা কার্যকর করা হবে সে বিষয়ে সমাজতন্ত্রের সমর্থকগণ সকলে একমত নন।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপরোক্ত বর্ণনায় বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ।

প্রথমতঃ, সব সমর্থকই সম্পদের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার বিপক্ষে। কেউ কেউ ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিলোপ না করে সীমিত ভাবে বজায় রাখার পক্ষপাতী। তবে উৎপাদনের উপকরণগুলির উপর রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব রাখার ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪৪.১.৩ মিশ্র অর্থব্যবস্থা

পুরোপুরি ব্যক্তি উদ্যোগাধীন বাজার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু ভাল দিক একত্র করে তৃতীয় এক অর্থব্যবস্থা বর্তমান পৃথিবীতে অনেক দেশেই গৃহীত হয়েছে। এ রকম ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছু বৈশিষ্ট্য মিলিয়ে দেশের অর্থব্যবস্থা সংগঠিত হয় তখন সে অর্থব্যবস্থাকে মিশ্র ব্যবস্থা বা Mixed Economy বলে। এক্ষেত্রে বিলিকরণের সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি উদ্যোগ সহাবস্থান ও সহযোগিতা করে। যুক্তরাজ্য (U.K.) বা যুক্তরাষ্ট্রের (USA) অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে উৎপাদন পরিকল্পনা করে অর্থব্যবস্থার সীমিত ক্ষেত্রে। রাষ্ট্রের এ কাজ সরাসরি অথবা কিছু শিল্পের জাতীয়করণের মাধ্যমে কার্যকর করা হতে পারে। অন্যদিকের সমস্ত কাজ ব্যক্তি উদ্যোগ প্রায় স্বাধীনভাবে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থির করে। সম্পত্তির মালিকানা ভোগকারীর স্বাধীনতা ক্ষেত্র বিশেষে সরকার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সরকার ও ব্যক্তি উদ্যোগ পরস্পরের প্রতিযোগী না হয়ে সহযোগী হয়ে বিলিকরণের কাজে উভয় অংশ নেয়। উভয়ের মিশ্রণেই আধুনিক মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের পর ভারতের অর্থব্যবস্থা মিশ্র অর্থনীতির এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যবস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগের প্রসার দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রে সীমিত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে যথেষ্ট সফল হতে পারে। অসংখ্য ছোটবড় মাঝারি উৎপাদন ক্ষেত্রে শত সহস্র দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় পরিচালন কর্তৃপক্ষের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে ভ্রান্ত হলে পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য নষ্ট হয়। সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের কাজ ব্যাহত হয়। সেক্ষেত্রে মুনাফা সন্ধানী অগণিত ব্যক্তি বিশেষের ওপর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব ছেড়ে দিলে উৎপাদনের কাজ অনেকটা সহজ হয়ে যায়। তবে কতগুলো মূল ও বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ঝুঁকি ও প্রত্যাশিত মুনাফা সম্বন্ধে বিশেষ নিশ্চয়তা না থাকায় ব্যক্তি উদ্যোগ দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয় না। যেমন, ভারতের মতো স্বল্পোন্নত দেশে রেলপথ বা বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে বিপুল পরিমাণ প্রাথমিক বিনিয়োগের দায়দায়িত্ব ব্যক্তি অপেক্ষা সরকারী উদ্যোগের অধীন রাখা অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত। কাজেই এরকম ক্ষেত্রে সামাজিক বা সরকারী মালিকানা প্রয়োজন।

অন্যদিকে দামব্যবস্থা উৎপাদিত পণ্যের বিলিকরণের কাজে প্রচলিত আয়বণ্টন মেনে নেয়। বাজার প্রক্রিয়া ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে পারে না। বৈষম্য দূর করে অর্থব্যবস্থাকে সমতার দিকে নিতে সরকারী নিয়ম, নির্দেশ ও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হলে বাজার-ব্যবস্থার ত্রুটি সংশোধন করা যায়, পরিকল্পিত পথে বিলিকরণের কাজ সচারুভাবে সম্পন্ন করা যায়। এভাবে উন্নত ও অনুন্নত অনেক দেশেই বাণিজ্য চক্রের

কুপ্রভাব, বেকারত্ব হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসারের কাজ রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় কার্যকর করা যায়। সরকারী ব্যবস্থাপনা বৃহত্তর সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। একাজে যে-সব সমাজতান্ত্রিক কার্যসূচী সরকার প্রয়োগ করে সেগুলি হ'ল:

কার্যসূচী

(ক) মূল ও ভারী শিল্পে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা প্রয়োগ করে অন্যান্য ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রচেষ্টা বজায় রাখা;

(খ) কর ব্যবস্থাকে ব্যাপক ও গতিশীল করে আয় বৈষম্য দূর করা;

(গ) ব্যক্তি-সম্পত্তির মালিকানার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে সম্পদের কেন্দ্রীভবন রোধ করা;

(ঘ) বেকার, বার্ধক্য, দুর্ঘটনা ইত্যাদি বীমার প্রবর্তন করে মানুষের সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপক ব্যবস্থা করা; এবং

(ঙ) পরিকল্পনা গ্রহণ করে অর্থব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি করা। এ রকম কর্মসূচীর মাধ্যমে পৃথিবীর অনেক দেশেই ব্যক্তি ও সরকারী উদ্যোগের বিভিন্ন সমন্বয় ঘটিয়ে পরিকল্পনার সাহায্যে 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের এসব উন্নয়নশীল দেশে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও গুরুত্ব ইউরোপ বা যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত প্রথম বিশ্বের দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশী। ভারত, ঈজিপ্ট, বাংলাদেশ, তানজানিয়া ইত্যাদি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা' কায়েম করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে।

৪৪.২ বিভিন্ন ব্যবস্থার মূল্যায়ন

• অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত পৃথিবীতে অবাধ উদ্যোগাধীন মুক্ত বাজার ব্যবস্থার জয়যাত্রা অব্যাহত ছিল। উদ্যোগ ও সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা সহ দেশের মধ্যে ও বৈদেশিক বাণিজ্যে মুক্ত বাজার ব্যবস্থা বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সহ অনেক দেশে সমৃদ্ধির জোয়ার এনেছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই, বিশেষ করে কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পক্ষে জোরালো যুক্তি উত্থাপনের পরই, বাজার ব্যবস্থায় 'অদৃশ্য হস্তের' কার্যকারিতা সম্বন্ধে চিন্তাশীল মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন। অবাধ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় সমাজে অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করে আয়-বৈষম্য ঘটায়। মুক্ত দাম-ব্যবস্থা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর ও উপকরণের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে না। চাহিদা-যোগানের সম্বন্ধে ভুল অনুমান প্রায়ই বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি-মুনাফা নির্ভর বলে সামাজিক স্বার্থ ব্যাহত হয়। এই অবস্থা নিরসনে উন্নত দেশগুলিতেও রাষ্ট্রের নীরব দর্শকের ভূমিকা ত্যাগ করে অর্থব্যবস্থায় সরাসরি অংশগ্রহণের পক্ষে নানা তাত্ত্বিক মতের উদ্ভব হয়। J.M. Keynes পূর্ণ নিয়োগের প্রয়োজনে সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের সাধারণ তত্ত্ব প্রচার করেন। অন্যদিকে ১৯১৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থার পত্তন হয়। দু'তিন দশকের মধ্যেই পরিকল্পিত ব্যবস্থার দ্রুত সাফল্য, অর্থনৈতিক সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রগতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

অন্য একটি বিষয়ও অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তনের শক্তি যোগায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মিত্রশক্তির সমৃদ্ধিশালী দেশগুলিতে যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও আধুনিকীকরণের প্রয়োজন দেখা দেয়। যুদ্ধফেরত অনেক মানুষের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন সমস্যার দ্রুত সমাধান জরুরী হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে 'আবিষ্কার' হয় যে তৃতীয় বিশ্বে বসবাসকারী দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে প্রচলিত অবাধ বাজার-ব্যবস্থার বহুল প্রচারিত

সুফলগুলির ছিঁটেফোঁটা পেয়ে বিদেশী কোনও শক্তির নিয়ন্ত্রণ-নির্ভর হয়ে আছে। দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি, অশিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে নীচু মানের জীবনযাত্রা পাপপঙ্কে নিমজ্জিত আছে। এসব দেশের কয়েকটি সদ্য বিদেশী শাসন মুক্ত হলেও নিজ নিজ অর্থব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করতে পারলে রাজনৈতিক মুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়বে। উন্নয়নের সার্বিক প্রচেষ্টা মুনাফার স্বার্থরক্ষা কার্যকর করা সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রের আদর্শ, এবং ঐ সময়ে পরিকল্পিত ব্যবস্থাধীন সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্রুত সাফল্য, তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই অর্থব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা ও নির্দেশের মুখাপেক্ষী হয়। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উন্নত এবং উন্নয়নশীল সব দেশেই অর্থনৈতিক বিলিকরণ ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন মাত্রায় ঘটতে থাকে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনাধীন ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় কেন্দ্রিকতা আমলাতান্ত্রিক লালফিতার ফাঁসে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের গতি মন্থর করে। ব্যক্তির স্বাধীনতা না থাকায় কাজে উৎসাহ বাধা পায়, নিরুৎসাহী মানুষ বৈচিত্র্যহীন জীবনযাত্রায় নানা দুর্নীতির শিকার হয়। বাজার ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে দাম-ব্যবস্থার কার্যকারিতা প্রমাণ করে নৈর্ব্যক্তিক ক্রিয়ায় 'পুরস্কার বা তিরস্কার' নীতির সফল প্রয়োগ করতে পারে। কর্ম্মপ্রেরণা বা উৎসাহ বজায় থাকে। Lange এবং Taylor অর্থনীতিবিদদ্বয় দেখিয়েছেন যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত এক ধরণের দাম ব্যবস্থা থাকে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলি বিবেচনা করে সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর অনেক দেশেই মিশ্রব্যবস্থা, বাজার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Market Socialism) ইত্যাদি পথে বিলিকরণের কাজ করা হচ্ছে।

সারাংশ

বিভিন্ন অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য বিচারে দেখা গেল যে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিচালনায় আদর্শ চিন্তা প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে বিলিকরণের কাজ উন্নত করতে গেলে কোন নির্দ্দিষ্ট ছক্ কার্যকর হয় না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও যেমন কর্ম্মপ্রেরণা ও উৎসাহ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, তেমনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হয়। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায়ও বাজার ব্যবস্থার কিছু কিছু ব্যক্তি সিদ্ধান্ত বা সীমিত বাজার ব্যবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তির স্বাধীনতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি না সমাজের সার্বিক সুখ-সমৃদ্ধি কোনটি কতটা নিশ্চিত করা উচিত সে-বিষয়ে বিরোধের সন্তোষজনক নিষ্পত্তি এখনও হয়নি।

৪৪.৩ দাম ব্যবস্থা ও উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার

১.৫ এককের ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় মূল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রসঙ্গে আমরা বাজার ব্যবস্থা ও দামের বিষয় আলোচনা করেছি। কিছুটা পুনরুক্তি হলেও উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে এ-অংশে আমরা দাম-ব্যবস্থার ভূমিকার দু একটি দিকের কথা আরও একটু আলোচনা করব।

অবাধ উদ্যোগাধীন অবস্থায় ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে উৎপন্ন করে। দাম নিয়ে উপকরণগুলি সংগ্রহ করে যে-সব দ্রব্যসামগ্রী তৈরী হয় সেগুলি বিভিন্ন দামেই ক্রেতাদের কাছে বিক্রী করা হয়। বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকেই প্রতিষ্ঠানগুলি জমির খাজনা, শ্রমের মজুরী, বা মূলধন ব্যবহারের সুদ মিটিয়ে দেয়। সব পাওনা মিটিয়ে অবশিষ্ট কিছু থাকলে প্রতিষ্ঠানের মালিক তার আয় বা মুনাফা পেয়ে যায়। অন্যদিকে, ব্যক্তি বা পরিবারগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিভিন্ন দামে কিনতে প্রয়োজনীয় অর্থ উৎপাদন-কাজে উপকরণের যোগান

দিতে পেয়ে থাকে। কোন কোন দ্রব্য বা সেবা কতটা উৎপন্ন করতে হবে তা নির্ভর করে ক্রেতা সাধারণের চাহিদার উপর। আবার ক্রেতার চাহিদা নির্ভর করে মূলত তার আয়ের উপর। উপকরণ সরবরাহ করে যে দাম পাওয়া যায় সেটাই আয়। এভাবে পণ্যের দাম থেকেই উৎপাদকগণ ও ক্রেতাসাধারণ নিজ নিজ সংকেত পেয়ে যায়। দাম ব্যবস্থা এক রকম তথ্য সরবরাহের সংগঠন (information system)। দাম যে সংকেত দেয় সেটা অনুধাবন করেই পরিবারগুলি পণ্যসামগ্রীর বিভিন্ন পরিমাণ কেনে; আবার ফার্মগুলিও দাম থেকেই দ্রব্য উৎপাদনের নির্দেশ পেয়ে যায়, যোগান ঠিক হয়। পরিবারগুলি যে যে পণ্যসামগ্রী বেশী পেতে চায়, সেগুলির চাহিদা ও দাম বাড়ে। ফার্মগুলিও সেইসব জিনিষ উৎপাদন যোগানে বেশী উপকরণের নিয়োগ করতে চায় যাতে সর্বাধিক মুনাফা পাওয়া যায়। পণ্যসামগ্রী বিভিন্ন দামে বিক্রী করে যে অর্থাগম হয় সেটা থেকে উপকরণের জন্য ব্যয় মিটিয়ে কিছু অবশিষ্ট থাকলে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা থাকবে, এবং উৎপাদনে উৎসাহ দেখা দেবে। এভাবে বাজার দামই ক্রেতার চাহিদা ও ফার্মের উৎপাদন বা বিক্রয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থির করে।

দাম ও ব্যয়ের এ রকম সংকেত কিছু ফার্ম বা কিছু পরিবারের মধ্যেই সীমিত থাকে না। সারা দেশে বিভিন্ন দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করার ক্ষেত্রেও একই প্রক্রিয়া কাজ করে। অর্থনৈতিক সমস্যার সংজ্ঞা নির্ধারণ প্রসঙ্গে ১.১ এককে আমরা নির্বাচনের সমস্যা আলোচনা ও দেশের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার উল্লেখ করেছি। সামগ্রিকভাবে দেশে কি কি দ্রব্য কিভাবে উৎপন্ন করা হবে বিষয়টি বুঝতে, খাদ্য না যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দাম ব্যবস্থাই তথ্য দেয়। খাদ্য সামগ্রীর বেশী চাহিদা হলে এর উৎপাদনেই বেশী উপকরণ নিয়োগ হবে। খাদ্য দ্রব্যের দামস্তরই সে নির্দেশ দেবে। আবার দেশে দামস্তর বাড়লে মানুষ নির্দিষ্ট আয় ব্যয় করে আগের থেকে কম চাহিদা করবে বলে এ-সব জিনিষ উৎপাদনে উপকরণের ব্যবহার কমে যাওয়ার সম্ভাবনা। তখন দেশে পরিবারগুলির সঞ্চয় এবং বিনিয়োগও কমে যেতে পারে। দাম-ব্যবস্থার এ রকম নির্দেশ থেকেই দেশের সরকার আর্থিক নীতি পরিবর্তনের নির্দেশ পেয়ে যায়। অর্থব্যবস্থার নির্দিষ্ট ক্ষেত্র ছাড়াও সামগ্রিকভাবে দেশের কর্ম্মপ্রণালীও দাম ব্যবস্থার নির্দেশ থেকেই বিনিয়োগ, ভোগ বা সঞ্চয় ইত্যাদি বিষয় স্থির হয়ে থাকে।

পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ অগণিত শিল্প-সংস্থা বা পরিবারের সম্মিলিত জটিল সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হতেই পারে। বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপের জটিল তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলোর সামঞ্জস্য বিধান বোধ হয় ভগবানের পক্ষেও অসম্ভব। কিন্তু দাম ব্যবস্থার নৈর্ব্যক্তিক স্বয়ংক্রিয় কর্ম্মধারা প্রায় নিখরচায় চাহিদা ও যোগানের এমন সামঞ্জস্য করে দেয় যা সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। যেমন উৎপন্ন দ্রব্য বা সেবার বিলিবণ্টন, তেমনি দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার—সব ক্ষেত্রেই দামব্যবস্থা অদৃশ্য ভাবেই কাজ করে সমস্যার সমাধান করে দেয়, নিয়ন্ত্রণ বা রেশনিং কর্তৃপক্ষের নিয়ম, নির্দেশ বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই। বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে উপকরণ বা পণ্যসামগ্রীর বিলিকরণ ঘটলে অর্থব্যবস্থা সম্পূর্ণ দক্ষ বা Efficient হয় বলে অনেকেই মনে করেন। উৎপাদন ব্যবস্থাকে সর্বোত্তম করতে নির্দেশাত্মক সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এক ধরনের 'হিসাবরক্ষণের দাম' ধারণার সাহায্য নিয়ে থাকেন।

তবে মনে রাখা দরকার যে দাম ব্যবস্থার দক্ষতা সর্বোত্তম হতে হলে বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতা, নিয়ন্ত্রণহীনতা, উপকরণ ও উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর চলনশীলতা থাকতে হবে। তবেই উপকরণের মালিক উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরবরাহ করে সর্বাধিক আয় পাবে। ফার্মের মালিকও সর্বোচ্চ দামে দ্রব্য বিক্রয় করে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করবে। আবার ক্রেতা সাধারণও সর্বাধিক তৃপ্তি পাবে। এ-সব কাজই সম্পন্ন হবে বাজারে

বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে। বাস্তবে এ রকম আদর্শ ব্যবস্থা দেখা যায় না। কিছু একচেটিয়া ক্ষমতার উদ্ভব হয়, চলনশীলতাও সীমিত দেখা যায়। আবার নানা কারণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এসব ক্ষেত্রে দাম ব্যবস্থার দক্ষতা হ্রাস পেতে বাধ্য।

দেখা গেল যে দাম ব্যবস্থা এমন এক শক্তিশালী সংগঠন যা অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদক, বিক্রেতা ও ক্রেতাদের স্বার্থ বিনিময় বাজারের মধ্যে দিয়ে সংযোগ ও রক্ষণ করে। আদর্শ অবস্থায় এই সংগঠন বিলিকরণের কাজকে দক্ষ ও সর্বোত্তম করে তোলে। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বাজার না থাকায় উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব নয় বলে অনেক অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন। পরে প্রমাণ করা হয়েছে যে পরিকল্পিত ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে হিসাব বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের যৌক্তিকতা বিচার করার সময় এক ধরনের 'হিসাবরক্ষণে'র দাম বা 'Accounting Price' ধারণার সাহায্য নিতে হয়। কাজেই, আদর্শ দাম ব্যবস্থার কার্যকারিতা থাকলে উপকরণের নিয়োগ দক্ষ হ'তে বাধ্য।

৪৪.৪ ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত আলোচনার বৈশিষ্ট্য

• মিশ্র অর্থব্যবস্থায় বাজারকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে তিন ধরনের সংস্থা। প্রথম, কিছু ব্যক্তি নিয়ে গঠিত পরিবারগুলি। দ্বিতীয় সংস্থা, উৎপাদন বা ব্যবসায় সংস্থাগুলি। তৃতীয় যে সংস্থার আর্থিক ক্রিয়াকলাপ প্রথম দুটি সংস্থার বা দেশের সামগ্রিক কর্ম্মপ্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে সেটি দেশের সরকার। প্রত্যেক সংস্থার কর্ম্মপ্রণালী কিছুটা স্বতন্ত্র। কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে পরিবার বা ফার্ম বা সরকারের ক্রিয়াকলাপ একে অপরকে প্রভাবিত করে। এ রকম জটিল সম্পর্ক বুঝতে অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণে পৃথক দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করা হয়। প্রথমটি হ'ল ব্যষ্টিগত আলোচনা বা Microeconomics, অপরটি সমষ্টিগত আলোচনা বা Macroeconomics। ৫.৫ অনুচ্ছেদে দু'টি দৃষ্টিকোণের তাৎপর্য আলোচনা করা হল।

• **ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ ঃ** যখন ভোগ বা উৎপাদন সংক্রান্ত আর্থিক কর্ম্মপ্রণালীর একটি ক্ষুদ্র অংশের বা এককের কর্ম্মপ্রণালীর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বিশ্লেষণ করা হয় তখন সেই আলোচনা ব্যষ্টিগত। একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রকৃতি আচার-ব্যবহার, গড়ণ ইত্যাদি বিশ্লেষণ ব্যষ্টিগত আলোচনা। একজন ভোগকারী বিভিন্ন দ্রব্য ভোগের সময় কিভাবে তার আয় বণ্টন করে, একটি দ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে সে দ্রব্য ক্রয়ের উপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে, অথবা দাম বৃদ্ধি দ্রব্যের উৎপাদনে কতটা প্রভাব বিস্তার করে—এরকম নানা প্রশ্ন আলোচনার দৃষ্টিকোণ হ'ল ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণের উদাহরণ। একটি ক্ষুদ্র অংশের কর্ম্মপ্রণালীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে বলে ধরে নিতে হয় যে অন্যান্য অংশের ক্রিয়া অপরিবর্তিত। আধুনিক শল্য চিকিৎসায় যেমন চিকিৎসক শরীরের অসুস্থ অংশে অস্ত্রোপচারের সময় ধরে নেন যে রোগীর সাধারণ স্বাস্থ্য, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া, রক্তচাপ ইত্যাদি ঠিক আছে। ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক বিশ্লেষণও নির্দিষ্ট অংশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সেই অংশটুকুর ক্রিয়ায় কীভাবে সাম্যাবস্থা সৃষ্টি হয় সে-বিষয়ে আলোচনা করে। এ-আলোচনাকে অনেক সময় অংশ বিশেষের সাম্যাবস্থার আলোচনার বা 'Partial Equilibrium Analysis বলে।

• **সমষ্টিগত আলোচনা বা Macroeconomics :** সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আলোচনার দৃষ্টিকোণ বিশেষ অংশের দিকে নিবদ্ধ থাকে না। সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যে সংযোগ সমগ্র অর্থব্যবস্থার

সব অংশকেই প্রভাবিত করে সেই সামগ্রিক ধারণাগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করে। এক্ষেত্রে একক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য উৎপন্ন প্রক্রিয়ার বদলে জাতীয় উৎপাদন, একজন ভোগকারীর ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণের পরিবর্তে জাতীয় আয় বা ভোগ ব্যয়, অর্থের যোগান ও চাহিদা, দেশের বাজারে চাহিদা-যোগানের ক্রিয়ার স্থলে বিদেশের সঙ্গে লেনদেন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সামগ্রিক আর্থিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থব্যবস্থার বৃহত্তর অংশে ব্যাপক দৃষ্টিপাত ঘটায় সমষ্টিগত আলোচনায় অর্থব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি নজরে আনা হয় না। অবশ্য সামগ্রিক কর্ম্মপ্রণালী ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অংশকেও প্রভাবিত করে। কিন্তু অংশগুলির পৃথক প্রক্রিয়া সামগ্রিক আলোচনার বাইরে রাখা হয়। দেশের সরকার বিপুল পরিমাণ ব্যয় করে অর্থনৈতিক কর্ম্মপ্রণালীকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে সে-আলোচনা সমষ্টিগত দৃষ্টিকোণের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু একটি বা দুটি দ্রব্যের ওপর করারোপ করে রাজস্ব সংগ্রহের চেষ্টা করলে সে প্রতিক্রিয়ার আলোচনা ব্যষ্টিগত দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়।

অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত—এই দুই শাখায় বিস্তৃত করা হলেও উভয়ের সম্পর্ক আছে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক বা ব্যবসায়ীরা নিজ নিজ দ্রব্যের দাম, চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ের দিকেই বেশী নজর দিয়ে থাকেন। এ-বিষয়ে চিন্তাভাবনা ব্যক্তিগত। তা'বলে সমষ্টিগত অর্থনৈতিক অবস্থার গুরুত্ব চিন্তাভাবনার বাইরে রাখা চলে না। অর্থব্যবস্থায় তেজী ভাব দেখা দিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়, অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। আবার মন্দাজনিত অবস্থা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে সংকুচিত করে। এরকম তেজী মন্দাবস্থা বিভিন্ন ফার্ম বা ব্যবসাকেও কমবেশী প্রভাবিত করে। কাজেই ফার্ম বা ব্যবসায়ীকেও সামগ্রিক আর্থিক অবস্থার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। নিজ নিজ দ্রব্যের বাজার সংক্রান্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপাদন বা ব্যবসা চালালেও, সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ব্যাপারে অন্ধ বা উদাসীন থাকলে, ব্যবসার স্থায়িত্ব বিপন্ন হতে পারে।

দেশের সরকার কর্ম্মসংস্থান আয়স্তর বাড়াতে বিভিন্ন নীতি প্রয়োগ করে থাকে। এ রকম বিস্তারমুখী নীতি কার্যকর করতে সরকারকে করভার বৃদ্ধি করে বা অন্য উপায়ে সম্পদ সংগ্রহ করতে হয়। বেশী সম্পদ সংগ্রহ করতে অতিরিক্ত করের বোঝা ব্যবসায়ী সমেত সকলকেই বহন করতে হয়। অনেক সময় করভার লাঘব করতে উৎপাদিত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু সরকারের বিস্তারনীতি আয় বৃদ্ধি করে। সমাজে আয়বৃদ্ধি হ'লে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়িয়ে বেশী লাভের সম্ভাবনা দেখা দেয়। সরকারী নীতির এইসব ভালমন্দ দিক সমষ্টিগত অর্থনৈতিক আলোচনার বিষয় হলেও প্রতিটি ব্যবসায়ী বা ফার্মকে ঐসব বিষয়ে অবহিত হতে হয়। ব্যষ্টিগত আলোচনার নির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে বৃহত্তর ক্ষেত্রে দেশের সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ এমনকি বিদেশের বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধেও অবহিত হতে হয়।

সারাংশ

অর্থতত্ত্বের আলোচনার ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত বিশ্লেষণের দুদিকে পৃথকভাবে দৃষ্টিপাত করলেও, উভয় দিক একই বৃক্ষের দুটি শাখা মাত্র, পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত। ব্যষ্টিগত আলোচনায় কেন্দ্রবিন্দু পরিবারভুক্ত একজন ভোগকারী, অথবা একটি দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যস্ত একটি ফার্ম। এদের চাহিদা ও যোগান বাজারে দ্রব্যটির দাম নির্ধারণ করে বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। আবার উৎপাদনকারী ফার্ম উপকরণ কেনে বিভিন্ন বাজার থেকেই, যেমন শ্রমের বাজার, জমির বাজার, বা মূলধনের বাজার। প্রত্যেকটি অংশের আংশিক আলোচনাই ব্যষ্টিগত। অন্যদিকে সমষ্টিগত আলোচনায়, দেশের সব পরিবারের সামগ্রিক ভোগব্যয়,

উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির বিনিয়োগ অথবা সামগ্রিক ক্রিয়াতে সরকারের প্রভাব। এছাড়া জাতীয় আয়, কর্ম্মসংস্থান, মূল্যস্তর বা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজে সরকারের ভূমিকা ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত।

ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচনার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে, আমরা ব্যষ্টিগত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব। অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো জানবার পর ক্রমশ সমষ্টিগত বিশ্লেষণের পর্যায়ে প্রবেশ করবো। ব্যষ্টিক কর্ম্মধারা চক্রাকারে আবর্তিত হয়। এ-চক্রাকার আবর্তন এক নজরে বুঝতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ২.১ অংশে এক সরল ছক্ দেওয়া হয়েছে। ছকে ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সম্পর্কগুলি বিপরীত স্রোতের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। এ সম্পর্ক মৌলিক ধারণার অন্তর্গত ।

৪৪.৫ অনুশীলনী

১। অর্থব্যবস্থার প্রধান তিনটি রূপ কি কি?

২। অবাধ বাজার ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কয়টি স্মরণে রাখুন।

৩। 'দাম ব্যবস্থা এক শক্তিশালী তথ্য সরবরাহকারী সংগঠন' বলতে কি বোঝায়?

৪। বাজার ব্যবস্থার উদ্ভব ও প্রসার কোন সময়ে ঘটে?

৫। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিণতি সম্বন্ধে কার্ল মার্কস কি বলেছিলেন?

৬। সমাজতন্ত্রের মূল আদর্শ কি?

৭। নির্দেশাত্মক অর্থব্যবস্থায় বাজারের বিকল্প কি?

৮। 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' ধারণাটি স্মরণে রাখুন।

৯। নির্দেশাত্মক ব্যবস্থার দুর্বলতা কোথায়?

১০। বাজার ব্যবস্থার অসুবিধা কি?

১১। 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা'র প্রসারে কি অভিজ্ঞতা প্রেরণা দিয়েছে?

১২। আদর্শ অর্থব্যবস্থার বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় কিনা ভেবে দেখুন।

১৩। কোন অবস্থায় 'দাম ব্যবস্থা' উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার করতে সক্ষম?

১৪। ব্যষ্টিক অর্থতত্ত্বের আলোচনার পরিধি দেখুন।

১৫। সমষ্টিগত আলোচনার কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করুন।

৪৪.৬ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের সারসংক্ষেপ

প্রথম পর্যায়ে ১ থেকে ৫ একক পর্যন্ত আলোচিত বিষয়গুলিকে ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচনার মুখবন্ধ বলা যায়। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের ভিত্তি সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা। কাজেই সাধারণ সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে প্রথমে মূল জীবন ধারণের সমস্যা উল্লেখ করা হয়েছে। কল্প কাহিনীর রবিন্‌সন্ ক্রুশোর নিঃসঙ্গ একক জীবনে যেমন অর্থনৈতিক সমস্যা, তেমনি আধুনিক সমাজবন্ধ মানুষের জীবনেও সমস্যা দুষ্প্রাপ্যতাজনিত।

অবশ্য আধুনিক মানব সমাজে সমস্যাটি অনেক জটিল। অনুরূপ ভাবে ব্যবসায় সংস্থা বা দেশের সরকারের কাছেও সমস্যার প্রকৃতি একই।

সাধারণ অর্থনৈতিক সমস্যা ও ব্যবসায়িক সমস্যা এক প্রকৃতির হলেও বাস্তবে দ্বিতীয়টির পরিধি বেশ ছোট, ব্যবসা সংক্রান্ত। দুটি বিষয়কে পৃথক করতে উভয়ের সম্বন্ধ ও সংজ্ঞা আলাদা করে দেখা হয়েছে।

তৃতীয় এককে আধুনিক অর্থব্যবস্থার মূল কাজ কর্ম্মপ্রণালীকে বিলিকরণের কাজ বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আর্থিক কর্ম্মপ্রণালীর বিলিকরণের সমস্যার পরিধি বিস্তৃত হয়ে দেশের আর্থিক প্রসার ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়গুলিও অর্থব্যবস্থার মূল কাজ হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

অর্থনৈতিক চিন্তাও আজ আর নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে অল্প কিছু মানুষের স্বার্থকে সার্বিক স্বার্থরক্ষার কাজ মনে করে না। দেশে দেশে চিন্তাধারার এই সার্বিক রূপান্তর বুঝতে ইউরোপে এবং ভারতে প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তার কিছু পরিচয় চতুর্থ এককের বিষয়বস্তু। দেশের নির্দিষ্ট সীমা, ধর্ম্মীয় বা নীতিশাস্ত্রের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলে ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই অর্থনৈতিক চিন্তার পরিসর বিস্তৃত হতে থাকে। অষ্টাদশ শতকে রাষ্ট্রীয় চেতনা এবং শিল্প-বিপ্লবের ঢেউ অর্থনৈতিক চর্চাকে বৈজ্ঞানিক চর্চার সম্মানিত আসনে অধিষ্ঠিত করে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতেও এ রকম চিন্তার প্রসার ঘটে। চতুর্থ এককে চিন্তাধারার কিছু বিক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বাস্তবে কিরূপে বিভিন্ন দেশে কার্যকর হয়েছে তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় পঞ্চম এককে আলোচিত। জীবন ধারণের সমস্যার সমাধান ও গুণগত মান দ্রুত উন্নত কর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরনের অর্থব্যবস্থা সক্রিয়। এ-সব ব্যবস্থার নানাগুণ ও দোষ থাকায় বর্তমানে মিশ্র ব্যবস্থা কার্যকর করার দিকে প্রবণতা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এই সঙ্গে বাজার ও দাম ব্যবস্থার কার্যকারিতা নিয়েও নানা আলোচনা হয়েছে। তাহলেও দাম-ব্যবস্থার বিকল্প হিসাবে অন্য কোনও ব্যবস্থা ততটা সফল হয় না বলে অনেকের বিশ্বাস। অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রয়োজনে ও প্রভাবে দেশে দেশে ব্যবসায়িক চিন্তাধারা বাস্তব অর্থব্যবস্থা সংগঠনে প্রভাব ফেলেছে। তা' সত্ত্বেও দুষ্প্রাপ্যতা ও 'নির্বাচনে'র মূল দুটি বিষয়ই চিরন্তন রূপে আর্থিক কর্ম্মপ্রণালীর মূল চালিকাশক্তি হয়ে রয়েছে।

অর্থতত্ত্বের আলোচনা দু'ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ একটি ব্যষ্টিক আলোচনা, অপরটি সমষ্টিগত আলোচনা। প্রথম ক্ষেত্রে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সংকীর্ণ, দৃষ্টি অর্থব্যবস্থার নির্দিষ্ট অঙ্গে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে আলোচনার পরিধি সারা দেশের, এমনকি বিদেশেরও, আর্থিক কর্ম্মপ্রণালী পর্যন্ত বিস্তৃত। বর্তমান পর্যায়ের মতই পরবর্তী কয়েকটি পর্যায়ে আমরা ব্যষ্টিক অর্থতত্ত্বের পর্যালোচনা করব। দ্বিতীয় ভাগের সমষ্টিগত আলোচনা, যেমন জাতীয় আয়, ভোগ বিনিয়োগ, সরকারী অর্থনৈতিক কার্যাবলী, বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়গুলি বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে।

৪৪.৬.১ পাঠ্য বিষয়ের অতিরিক্ত চর্চা

পড়ুয়ার মন আরও বিস্তৃত আলোচনায় আকৃষ্ট হলে কয়েকটি বই থেকে আগ্রহ মেটানো যেতে পারে। তবে মনে রাখা দরকার যে বাংলা ভাষায় লেখা নির্ভরযোগ্য বই-এর সংখ্যা খুবই সীমিত। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত বইয়ে এখানে আলোচিত বিষয়গুলি পাওয়া যাবে। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক ধীরেশ ভট্টাচার্য্য ও প্রণবকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'ব্যবসায়িক অর্থবিদ্যার মূল তত্ত্ব' বইটি উল্লেখ করা যায়। ইংরাজী ভাষায় ভাল বইয়ের অভাব নেই। প্রাথমিকভাবে A. Stonier and D. C. Hague প্রণীত 'A Text-book of Economic Theory' (সর্বশেষ সংস্করণ) বইটি উল্লেখযোগ্য। ভারতে প্রাচীন অর্থনৈতিক চিন্তার প্রসঙ্গে ডক্টর ভবতোষ দত্ত প্রণীত 'অর্থনীতির পথে'

পুস্তিকাটি উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন সংবাদপত্রে নির্দিষ্ট দিনে অর্থনৈতিক চর্চা প্রকাশ করা হয়। এছাড়া নানা সাময়িক পত্রিকাও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিশেষ আলোচনা প্রকাশ করে থাকে। অর্থব্যবস্থার বর্তমান কার্যধারা বুঝতে এগুলো সহায়ক। দূরদর্শনেও বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায় জগৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ নানা আলোচনায় অংশ নিয়ে থাকেন। এ-সব সমসাময়িক কার্যধারা বুঝতে সাহায্য করে।

৪৪.৭ অতিরিক্ত অনুশীলনী

এ-পর্যায়ের বিভিন্ন এককের শেষে অনুশীলনী অংশে কিছু প্রশ্ন ও উত্তর সংকেত দেওয়া আছে। নীচে দেওয়া প্রশ্নাবলীর উত্তর সে তুলনায় একটু বড় আকারের। অনধিক ৫০ শব্দের মধ্যে এ-গুলোর দেওয়া বিধেয়।

১। 'অর্থনৈতিক আলোচনায় দুষ্প্রাপ্যতাই মৌল সমস্যা' উক্তিটির তাৎপর্য লিখুন।
(১.১ এককের পঞ্চম অনুচ্ছেদ)

২। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের সংজ্ঞা কি? (১.২ এককের চতুর্থ অনুচ্ছেদ)

৩। যাদের জন্য উৎপন্ন করা হবে কাজটি কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত?
(সংকেত ঃ আয় বন্টনের সঙ্গে। ১.৩ এককের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

৪। অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজের দুটি উদাহরণ দিন। (১.৩ একক)

৫। 'মার্কেন্টাইলিজম্' চিন্তাধারার মূল বিষয় কি? (১.৪ একক)

৬। কী পরিস্থিতিতে ধ্রুপদী অর্থনৈতিক চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়? (১.৪ একক)

৭। ভারতে রাণাডে-র চিন্তাধারা কিছুটা পৃথক ছিল কি? (ঐ একক)

৮। স্বাধীন ভারতে আর্থিক নীতি প্রণয়নে কোন কোন দেশের চিন্তার প্রভাব দেখা যায়?
(১.৪ এককের ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ)

৯। 'দাম ব্যবস্থার' কার্যকারিতা কতটা? (১.৫)

১০। 'মিশ্র অর্থব্যবস্থা'র প্রসারের মূলে কি চিন্তা কাজ করেছে? (ঐ অনুচ্ছেদে এইরূপ প্রসঙ্গ)

১১। ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের আলোচনা এবং সরকারী অর্থনৈতিক ক্রিয়ার আলোচনার ভাগ দুটি কি কি?

১২। ব্যষ্টির ও সমষ্টিগত আলোচনার সম্বন্ধ আছে কি?

১৩। যে বিষয়গুলি ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের প্রকৃতি ও পরিধির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে সেগুলি বোঝার চেষ্টা করুন।

- শেষ তিনটি প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর-সংকেত বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা আছে।

একক ৪৫ ◆ চাহিদা ও যোগানের তত্ত্ব ঃ কয়েকটি মৌলিক ধারণা

গঠন

৪৫.০ উদ্দেশ্য

৪৫.১ মৌলিক ধারণা

৪৫.১.১ পরিবার

৪৫.১.২ উপযোগ

৪৫.১.৩ দ্রব্য ও সেবা

৪৫.১.৪ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম

৪৫.১.৫ আয়

৪৫.১.৬ অর্থনৈতিক তত্ত্বে উৎপাদন

৪৫.১.৭ ভোগ

৪৫.১.৮ উপকরণ বা উৎপাদনের উপাদান

৪৫.১.৯ ভারসাম্য

৪৫.১.১০ আবর্তন

৪৫.২ শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ

৪৫.৩ সারাংশ

৪৫.৪ অনুশীলনী

৪৫.০ উদ্দেশ্য

বিভিন্ন আর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর পরিচয় আমরা জেনেছি। অর্থনীতির ব্যষ্টিগত আলোচনায় পরিবার বা ব্যক্তিকে ভোগ নামক অর্থনৈতিক কর্মের প্রাথমিক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই বিভাগে আমরা ভোগকারী হিসেবে একটি পরিবার বা ব্যক্তির অভাবপূরণ সংক্রান্ত লাভের বিশ্লেষণ করবো। এ কাজে ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক ধারণার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এই মৌলিক ধারণাগুলির ব্যাখ্যা চাহিদাতত্ত্বের বিশ্লেষণে সাহায্য করবে।

৪৫.১ মৌলিক ধারণা

৪৫.১.১ পরিবার

কয়েকজন মানুষ নিয়ে একটি পরিবার যা সমাজের প্রাথমিক একক। তবে কয়েকজন মানুষ একত্রিত হলেই তা পরিবার নয়। ভারতরে জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (NSS) পরিবারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে যে, কতিপয় মানুষের যদি বসবাসের সংস্থান একটিই হয় এবং সেক্ষেত্রে একটি পাকশালা থেকে রন্ধনকার্য সম্পাদিত হয় তবে তা পরিবার বলে গণ্য করা হবে। পরিবারভুক্ত মানুষ অভাব মেটাতে পণ্যসামগ্রী বা সেবার ব্যবহার করে। পরিবারের বয়ঃপ্রাপ্ত সক্ষম মানুষ অর্থনৈতিক কাজে নানাভাবে অংশগ্রহণ করে যে অর্থ উপার্জন করে সে অর্থ দিয়েই নিজ ও নির্ভরশীল সদস্যদের প্রয়োজন মেটানো হয়। একজনের উপর নির্ভরশীল পরিবারের অর্থনৈতিক কাজ একজন ব্যক্তির কাজের অনুরূপ ধরলে পরিবার বা ব্যক্তি সমার্থক মনে করা চলে। পরিবারগুলি অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দু। কারণ এদের কাছ থেকেই আসে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা; আবার উৎপাদনের উপকরণগুলির—শ্রম, মূলধন ইত্যাদির—যোগানও পরিবারগুলিই দেয়।

৪৫.১.২ উপযোগ

দ্রব্যের উপযোগ বা 'utility' বলতে ‘অভাব পূরণক্ষমতা’ বোঝায়। দ্রব্য বা সেবার ব্যবহার মানুষের অভাবেব তৃপ্তিসাধন করে, তাই দ্রব্যের তৃপ্তি সাধন ক্ষমতাই তার উপযোগিতা। এ ক্ষমতা থেকেই পণ্যসামগ্রীর চাহিদা সৃষ্টি হয়। অবশ্য ‘অভাব’ আলোচনায় নৈতিক বা আইনসঙ্গত দিক বিবেচনা করা হয় না।

৪৫.১.৩ দ্রব্য ও সেবা (Goods, Commodities, Services)

মানুষের অভাবপূরণ ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু বা সেবা-সামগ্রীকে দ্রব্য বলে। একজাতীয় বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য থাকে। যেমন, মারুতি ও সিয়েলো মোটরগাড়ি। মোটরগাড়ি হিসেবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকায় গাড়ি দুটি পৃথক সামগ্রী। মারুতি-৮০০ গাড়ীর প্রতিটি একক পরস্পরের সম্পূর্ণ বিকল্প। কাজেই এরকম সাদা গাড়ি একটি সামগ্রী। আবার আইন-ব্যবসায়ী, ডাক্তার বা শিক্ষক অ-বস্তুগত সেবা সরবরাহ করে বিনিময়ে অর্থোপার্জন করেন। এ-সব সেবার উপযোগিতা আছে বলে গ্রহীতার কাছে মূল্য আছে।

দ্রব্যসামগ্রীর স্থায়িত্বকাল বিচার করে দু'ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমত, যেসব একবার মাত্র ব্যবহারেই শেষ হয়ে যায়; যেমন সিঙারা, রসগোল্লা ইত্যাদি। দ্বিতীয় প্রকার দ্রব্যগুলি টেকসই, কিছু সময় ধরে ব্যবহার করা চলে। দুই প্রকার দ্রব্যই সরাসরি মানুষের অভাব মেটায় বলে এগুলি ভোগ্যদ্রব্য। যেমন জামা, জুতো, হাতঘড়ি ইত্যাদি। উৎপাদনের কাজে যখন দ্রব্য ব্যবহার হয় তখনও একই শ্রেণীবিভাগ করা চলে। কিছু উপকরণ আছে সেগুলি একবার মাত্র ব্যবহার করা চলে। যেমন কাঁচামাল। আবার কিছু আছে সেগুলি টেকসই, যেমন কারখানার বাড়ি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এগুলি বিনিয়োগ দ্রব্য; ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনেই এগুলির সদ্ব্যবহার।

৪৫.১.৪ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম

একই দ্রব্য উৎপাদনকারী একটি সংস্থাকে ফার্ম বা উৎপাদন সংস্থা বলে। ফার্ম নির্দিষ্ট দ্রব্যের এমন কিছু একক উৎপন্ন করে যেগুলি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিকল্প। আবার একই দ্রব্যের উৎপাদনকারী বিভিন্ন সংস্থাকে

একত্রে শিল্প বা 'Industry' বলে। যেমন বালী জুটমিল চট উৎপাদনকারী একটি ফার্ম। এরকম আরও সব চট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসঙ্গে চটশিল্প বলা হয়।

৪৫.১.৫ আয়

নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রাপ্য কিছু ক্রয়ক্ষমতাকে আয় বলে। সাধারণত এ-ক্ষমতা অর্থের অঙ্কে প্রকাশ করা হয় বলে আর্থিক আয়ই আমাদের পরিচিতি। ব্যবসায়ে মূলধন ব্যবহার করে আয় সৃষ্টি হয়। আবার বাড়ি, জমি ইত্যাদি ব্যবহার থেকেও আয় হয়। সেবাজাতীয় কাজ মানুষের অভাব মেটায়। পেশাদার ব্যক্তিগণ ব্যক্তিগত সেবার বিনিময়ে আয় উপার্জন করেন; যেমন ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক, উকিল ইত্যাদি। তবে আয়ের মূল উৎস মূলধন। যদিও বস্তুগত সম্পদ থেকে আমরা উপযোগিতার প্রবাহ পাই। আয় একটি প্রবহমান ধারণা বা flow concept। কিন্তু মূলধন নির্দিষ্ট সময়ে পুঞ্জীভূত সম্ভার বা stock concept। আয়ের অংশবিশেষ ভোগের জন্য ব্যয় না হ'লে যে-সঞ্চয় হয় তাকে মূলধনে পরিবর্তিত করা যায়।

৪৫.১.৬ অর্থনৈতিক তত্ত্বে উৎপাদন

অর্থতত্ত্বে উৎপাদন বলতে ‘উপযোগিতা সৃষ্টি’ বোঝায়। প্রাচীন অর্থনীতিবিদগণ অবশ্য বাস্তব দ্রব্যের সৃষ্টিকেই উৎপাদন বলতেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য এই যে, মানুষ জড়পদার্থ সৃষ্টি করতে পারে না। জঙ্গা ল থেকে প্রকৃতিদত্ত কাঠ সংগ্রহ করে ছুতোর মিস্ত্রি নিজ পরিশ্রম ব্যয় করে কাঠের আসবাবপত্র তৈরি করেন। জঙ্গালের গাছ মানুষের কাজে না লাগলেও আসবাবপত্রে অভাব মেটায়। এভাবে অনেক প্রকৃতিদত্ত উপকরণের সঙ্গে মানুষের শ্রম ব্যবহার করে দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হলে সেগুলির উপযোগ সৃষ্টি হয়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সামাজিক শ্রমের সাহায্যে প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত পদাথের্র পরিমাণগত (যেমন কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি আমের বীজ। আঁটি থেকে আমগাছ, গাছ থেকে অনেক আম), গুণগত (যেমন শিল্পক্ষেত্রে তুলো থেকে সুতো) বা স্থানগত (যেমন খনিজ উৎপাদনে ভূগর্ভ থেকে কয়লা উত্তোলন) রূপান্তর ঘটে। সেবাকর্মের উৎপাদন (যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসা) অর্থনীতিতে উৎপাদন বলে গণ্য হয়। সেবাও উপযোগিতা সৃষ্টি করে কারণ সেবার ব্যবহার মানুষের অভাব মেটায়। সুতরাং উৎপাদনের অর্থ উপযোগিতা সৃষ্টি। হিক্সের বর্ণনা অনুসারে শারীরিক বা মানসিক কাজের ফলে উৎপন্ন পণ্য যখন বিনিময় প্রথার মাধ্যমে অন্য ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করে তখন সেসব দ্রব্য বা সেবাকে উৎপাদন বলে, ফসল উৎপন্ন করেচাষী যেমন উৎপাদন করে, ব্যবসায়ীও তেমনি একধরনের সেবা সৃষ্টি করে উৎপাদন করেন।

সম্পদ—যেমন বস্তু বা সেবার অর্থমূল্য আছে এবং বিনিয়োগযোগ্য, সেগুলি সম্পদ। সম্পদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত উপযোগিতা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত, চাহিদার তুলনায় যোগান অপ্রচুর হতে হবে। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, হস্তান্তরযোগ্যতা বা মালিকানা পরিবর্তনের সম্ভাবনা। জমি স্থানান্তরযোগ্য না হলেও এর মালিকানার পরিবর্তন করা চলে। কাজেই জমি এক ধরনের সম্পদ। চতুর্থ বৈশিষ্ট্য, বহিরাবস্থান। গায়কের সুকণ্ঠ তাঁর নিজস্ব সম্পদ, হস্তান্তরযোগ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা তাঁর নিজস্ব, অনুকরণ বা হস্তান্তরের অযোগ্য। নিজস্ব গুণাবলী বা দক্ষতা অধিকারীদের অর্থোপার্জনের সহায়ক কিন্তু হস্তান্তরের অযোগ্য বলে ব্যক্তিগত সম্পদ। রাস্তাঘাট, রেলপথ ইত্যাদি সামাজিক সম্পদ অনেকে যৌথভাবে ব্যবহার করে। এরকম

সামাজিক সম্পদের সঙ্গে ব্যক্তির মালিকানায় সম্পদ যোগ করে জাতীয় সম্পদের হিসাব পাওয়া যায়।

৪৫.১.৭ ভোগ

উৎপাদন উপযোগ সৃষ্টি করে, কিন্তু ভোগ উপযোগের বিনাশ করে। নতুন জামা বা আসবাব-পত্র কিছু সময় ধরে ভোগের মধ্য দিয়ে উপযোগিতা হারায়। শেষ পর্যন্ত সেগুলি বিনিময় করে নতুন কিছু স্বল্পমূল্যের জিনিস বা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যে-সব জিনিস দীর্ঘদিন ধরে ভোগ করা যায়, সে সব টেকসই দ্রব্য। রসগোল্লা বা সিঙ্গারা ক্ষণস্থায়ী। কাজেই ভোগের অর্থ উপযোগের বিনাশ।

৪৫.১.৮ উপকরণ বা উৎপাদনের উপাদান (Factors of production or inputs)

উৎপাদন করতে কিছু উপকরণের প্রয়োজন। উৎপাদনে সাহায্য করে এমন যা কিছু উপকরণকেই উৎপাদনের উপাদান বলে। উপকরণগুলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত—জমি বা Land, মূলধন বা Capital, শ্রম বা Labour এবং সংগঠন বা Organisation, জমি বলতে প্রকৃতিদত্ত উপকরণগুলি বোঝায়। নদীর জল, সূর্যের আলো, বাতাস ইত্যাদি জিনিস উৎপন্ন করতে খরচ করতে হয় না। এসব অবাধ জিনিসকে একসঙ্গে জমি বলে। মানুষের কায়িক বা মানসিক প্রচেষ্টাই শ্রম। উৎপাদনের কাজে যে-সব স্থায়ী উৎপন্নদ্রব্য, যেমন যন্ত্রপাতি ইত্যাদি, সেগুলি মূলধন বা উৎপাদিত উৎপাদনের উপাদান। যারা তিনটি উপাদানের বিভিন্ন সমন্বয় করে, উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়ে কমপ্রচেষ্টা সংগঠিত করেন, তাদের উদ্যোক্তা (entrepreneur) বলে। অনেকে অবশ্য সংগঠকের কর্মপ্রচেষ্টাকে একধরনের শ্রম বলে পৃথকভাবে দেখতে চান না।

প্রকৃতপক্ষে মূল উপাদান দু'টি—মানুষের শ্রম ও প্রকৃতিদত্ত সামগ্রী। মূলধন ও সংগঠন মানুষেরই সৃষ্টি। কিন্তু ব্যবসায়িক অর্থতত্ত্বের বিশ্লেষণে জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই চারটি উপাদানের কাজ ও তাৎপর্য পৃথক ভাবে জানা প্রয়োজন। আধুনিক বৃহদায়ন উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠনই উৎপাদন ব্যবস্থায় মূল চালিকা শক্তি। যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষকে সংগঠক হিসেবে খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

৪৫.১.৯ ভারসাম্য

'ভারসাম্য' কথাটির অর্থস্থিতি বা সাম্যতা। যে-অবস্থায় পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াশীল অর্থনৈতিক শক্তিগুলির ক্রিয়ায় পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না, সে-অবস্থাকে ভারসাম্য অবস্থা বলে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভারসাম্য অবস্থায় শক্তিগুলি স্থিতিলাভ করে। দামব্যবস্থার ক্রিয়ায় দেখা যায় যে, একটি দ্রব্যের বিক্রেতা চড়া দামে বেশি পরিমাণ কিন্তু কম দামে অল্প পরিমাণ বিক্রয়ে আগ্রহী। অন্যদিকে ক্রেতা কম দামে বেশি পরিমাণ, কিন্তু চড়া দামে কম পরিমাণ ক্রয়ে আগ্রহী। এভাবে চাহিদা-যোগানের বিপরীত শক্তি দু'টি একটি নির্দিষ্ট দামে এসে স্থিতি বা সাম্যতা লাভ করে। এ-বিন্দুতে একবার পৌঁছলে আর পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে না। ঐ অবস্থায় দামকে ভারসাম্য দাম বলে। পদার্থবিদ্যা থেকে ভারসাম্যের ধারণাটি অর্থতত্ত্বের আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

৪৫.১.১০ চক্রাকার আবর্তন

সরল আর্থিক কর্মপ্রণালীর দুটি অঙ্গ—একটি ব্যক্তি বা পরিবার, অপরটি ব্যবসায় বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। সরল অর্থব্যবস্থার এ দুটি অঙ্গই আর্থিক ক্রিয়াকলাপের মূলস্রোতে অংশ নেয়। প্রত্যেকটি অঙ্গের আর্থিক কর্মপ্রণালী থেকে দুটি করে স্রোত পরস্পরের দিকে বয়ে যায়। বিনিময় বা বাজার ব্যবস্থার

মাধ্যমে উভয় অঙ্গের কর্মধারা অর্থব্যবস্থাকে প্রবহমান রাখে। ব্যষ্টিক অর্থতত্ত্বের মূল দুটি পারস্পরিক সম্পর্ক একনজরে বুঝে নিতে নিচের মডেল বা চক্রাকার আবর্তনের ছকটি যথেষ্ট সাহায্য করে। সরল অর্থনৈতিক কর্মপ্রণালীর একটি রূপ এই আয় ও দ্রব্যস্রোত।

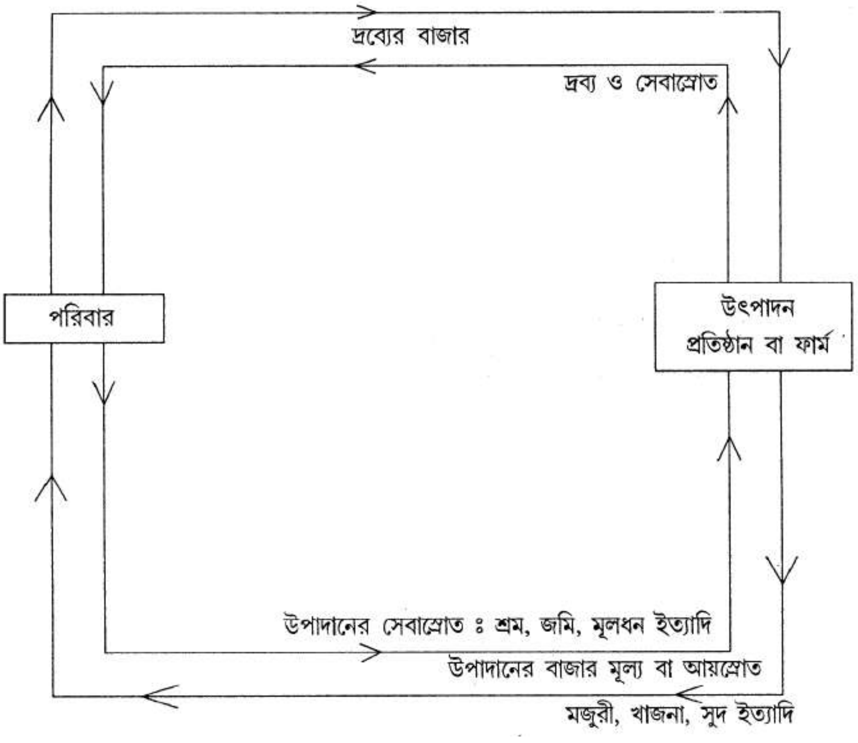

চিত্র ৪৫.১ চক্রাকার আবর্তনের ছক্

৪৫.১ রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, পরিবারের অভাবপূরণ চেষ্টা থেকে দ্রব্য বা সেবার চাহিদা ফার্মের দিকে প্রবাহিত। বিপরীত প্রবাহ দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর। ফার্ম উৎপাদিত পণ্যস্রোত পরিবারের দিকে প্রবহমান। পরিবারগুলি চাহিদা মেটাতে অর্থ খরচ করে দাম দিতে। ফার্ম পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করে মূল্যের বিনিময়ে যোগান দেয়। পণ্যের বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বিনিময় সম্পন্ন হয়ে যায়। ছকের নিচের দিকে ফার্ম থেকে দ্রব্য বা সেবাস্রোত রূপে পরিবারের দিকে, আবার পরিবার থেকে ফার্মগুলোর দিকে অর্থস্রোত রূপে ফিরে আসে। উপকরণের সেবা শ্রম, মূলধন জমি ইত্যাদি রূপে ফার্মের কাছে যায়, তার বিনিময়ে মজুরি, সুদ, খাজনা ইত্যাদি মূল্য আয় হিসেবে পরিবারগুলির কাছে ফিরে আসে। এভাবে প্রাপ্ত আয় পরিবারগুলি অভাবপূরণে দ্রব্য বা সেবা কিনতে ব্যয় করে। উভয় আবর্তন উপকরণ বা দ্রব্যের বাজারের মধ্য দিয়ে দুটি অঙ্গের কাছে পৌঁছে ফিরে আসে। এটাই দ্রব্য বা আয়স্রোতের চক্রাকার আবর্তন। ২.১ রেখাচিত্রে অবশ্য ব্যষ্টিক আলোচনার সরল রূপ দেওয়া হয়েছে। এখানে সরকারের প্রভাব বা বিদেশ থেকে আমদানি বা রপ্তানি ধরে বাস্তব কিন্তু জটিল ও সম্পূর্ণ অর্থব্যবস্থার চক্রাকার আবর্তন ধরা হয়নি। সম্পূর্ণ সম্পর্ক সমষ্টিগত অর্থব্যবস্থার প্রসঙ্গে পরবর্তী কয়েকটি অধ্যায়ে জানা যাবে।

৪৫.২ শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ

আগেই বলা হয়েছে যে, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে উৎপাদনের ক্ষেত্রে জটিলতা খুব বেশি। ক্রুশোর অর্থব্যবস্থা ছিল এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা। আধুনিক বৃহদায়তন কলকারখানায় একটি পণ্য উৎপাদনের কাজ কোনও শ্রমিক একা সম্পন্ন করে না। বিভিন্ন পর্যায়ের কাজগুলি কয়েকদল শ্রমিকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। মোটরগাড়ি উৎপাদনে একদল শ্রমিক লোহার পাতগুলিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করেছে। কারখানার অন্য অংশে অন্য শ্রমিকরা পাতগুলি নিয়ে মোটরগাড়ির যন্ত্রাংশের আকৃতি দিচ্ছে। আরও কয়েকটি দল মোটরের বিভিন্ন অংশগুলি তৈরি করছে। এভাবে মোটরের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিভিন্ন শ্রমিক দল উৎপন্ন শেষ করলে অন্য আর একদল যন্ত্রাংশগুলি একত্র করে, বহিরঙ্গের কাজ সম্পন্ন করলে শেষে সম্পূর্ণ একটি মোটরগাড়ি তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। এভাবে একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত অসংখ্য শ্রমিককে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলে বিভক্ত করে উৎপাদনের এক একটি পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত করার প্রক্রিয়াকেই শ্রমবিভাগ বলে। অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ পিন তৈরির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন যে, একটি পিন তৈরির কাজ প্রায় ১৭/১৮টি পর্যায়ে ভাগ করে প্রত্যেক পর্যায়ে এক এক দল শ্রমিককে যুক্ত করে শ্রমবিভাগ সুদূরপ্রসারী করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত শ্রমিক একই কাজ নিয়মিত সম্পন্ন করছে।

আধুনিক শিল্পে শ্রমবিভাগ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করার বেশ কিছু সুফল পাওয়া গেছে। প্রথমত, পণ্যটি উৎপাদনে সময়সংক্ষেপ হয়েছে। ক্রুশো জল, খাদ্য, কুটির নির্মাণ ইত্যাদি সব কাজই একা সম্পন্ন করতো বলে তাকে উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হতো। প্রত্যেক কাজে সময় অনেক বেশি ব্যয় করতে হতো। আধুনিক সমাজে বেশি সময় ব্যয় করার অর্থ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি। শ্রমবিভাগের ফলে মোট উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি হয় বলে উৎপন্ন পণ্যের একক প্রতি ব্যয় কমে যায়, সাধারণ মানুষের পক্ষেও ঐ পণ্য ক্রয় সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদল একই কাজে প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকায় তাদের দক্ষতা বাড়ে। সর্বোপরি, একই কাজের পুনরাবৃত্তি থেকেই নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়া উদ্ভাবন সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, অতীতে, শ্রমবিভাগ সীমিত অবস্থায়, শুধু মহারানী রাণী ভিক্টোরিয়াই নাইলন মোজা ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু আধুনিক কালে শ্রমবিভাগ ও বৃহদায়তন উৎপাদনের ফলে দ্রব্যটি সাধারণ মানুষের করায়ত্ত। শ্রমবিভাগ নিবিড় ও সুদূরপ্রসারী করতে নতুন কৌশল ও যন্ত্রপাতির প্রয়োজন।

শ্রমবিভাগের অপর নাম বিশেষীকরণ। একটি ফার্মে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভাজন প্রত্যেক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের সেই কাজে দক্ষতাও বিশেষ বৃদ্ধি করে। বৃহত্তর ক্ষেত্রে, ব্যাপক অর্থে, শ্রমবিভাগের সরলরূপ দেখা ফার্ম বা শ্রমিক গোষ্ঠী সব ধরনের পণ্য উৎপাদনের চেষ্টা না করে পণ্যের উৎপাদনের বিভিন্ন ফার্ম বা শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষীকৃত করতে পারে। ঢাকাই ও ধনেখালীর তাঁতবস্ত্র উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকরা বিশেষীকৃত। এরকম শ্রমবিভাগ অবশ্য সরল এবং আদ্যিকালের। তুলনায় একই কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষীকৃত বিভিন্ন কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এক বিভাগের শ্রমিকদের কাজের সঙ্গে অন্য বিভাগের শ্রমিকদের অন্য কাজের সমন্বয়সাধন প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ বিশেষীকরণের মাত্রা যত বাড়বে সমন্বয়ের কাজও ততই জটিল হবে। এজন্য আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পে শতাধিক বিভাগের বিশেষীকৃত কাজের সমন্বয়সাধন, ক্ষুদ্রায়তন ফার্ম কম বিশেষীকরণের জন্য, অনেক বেশি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ।

শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহার বৃদ্ধি করে উৎপাদন বাড়ায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, বিশেষীকরণের সুবিধা কতটা পাওয়া যাবে তা বাজারের আয়তনের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কালে উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা বাজারের ভৌগোলিক সীমা প্রভাবিত করেছে। আবার আর্থিক প্রগতি লোকের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করেছে। তবুও বিশেষীকরণ ও বৃহদায়তন উৎপাদন বাজারের বিস্তৃতির দ্বারা সীমিত। পণ্যের জন্য বিশাল বাজার থাকলে বিশেষীকরণ নিবিড় করে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রক্রিয়া ক্ষুদ্রায়তনের তুলনায় অনেক বেশি সুবিধাযুক্ত। এই বিবেচনা করে স্মিথ বলেছেন, "শ্রমবিভাগ বাজারের সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট।" আর একটি সীমা হল ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। 'দৈত্যাকৃতি বৃহদায়তন উৎপাদনে শ্রমবিভাগ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে সবদিকের সামঞ্জস্যবিধান অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি উৎপাদন হ্রাস করে ব্যয়বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। তখন অসুবিধাগুলি প্রকট হয়ে ওঠে।

সুতরাং শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ অবিমিশ্র আশীর্বাদ নয়। দক্ষতা, উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করলেও বাজারের আয়তন ও ব্যবস্থাপনার অসুবিধা ব্যয়বৃদ্ধিও ঘটাতে পারে।

৪৫.৩ সারাংশ

এই এককে অর্থতত্ত্ব আলোচনায় ব্যবহূত কয়েকটি মৌলিক ধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। অর্থনীতি চর্চায় ভোগের বিশেষ অর্থ, পরিবার, উপযোগ, ফার্ম ও শিল্প, উৎপাদন, সম্পদ, ভারসাম্য, পরিবার-ফার্মের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের চক্রাকার আবর্তন। বিশেষীকরণ, ইত্যাদি বহুব্যবহূত অর্থনৈতিক ধারণাগুলির বিশেষ অর্থ আলোচিত হ'লো। আরও কিছু ধারণা প্রসঙ্গ সূত্রে যথাস্থানে আলোচিত হবে।

৪৫.৪ অনুশীলনী

১। কোন্ ধরনের অর্থনৈতিক কাজ বিচার করুন ঃ

(ক) কৃষকের ধান চাষ, (খ) কলকাতা থেকে বর্ধমান রেল ভ্রমণ, (গ) প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা প্রদর্শন, (ঘ) নিসর্গ শোভা পরিদর্শনে ভ্রমণ।

২। উপযোগিতা কি?

৩। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে পরিবারের দ্বৈতভূমিকা কি?

৪। বিশেষীকরণ ও শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি মনে রাখুন।

৫। শ্রমবিভাগের অসুবিধা বা সীমা কি?

৬। সরল অর্থব্যবস্থার ছকে ক্রিয়াকলাপের দুটি অঙ্গের সম্পর্ক থেকে ব্যক্তির আয়সূত্র ও ব্যবসায়ের আয়ের সূত্র পৃথক করা যায় কি?

৭। ভারসাম্য অবস্থার ব্যাখ্যা মনে রাখুন।

একক ৪৬ ◆ ভোগ, তৃপ্তি ও চাহিদা

গঠন

৪৬.০ উদ্দেশ্য

৪৬.১ উপযোগ

৪৬.১.১ উপযোগ ভোগ

৪৬.১.২ অভাব ও তৃপ্তিলাভ

৪৬.২ চাহিদা

৪৬.২ চাহিদার প্রকৃতি

৪৬.২.২ দাম ও চাহিদার সম্পর্ক ঃ চাহিদা রেখা

৪৬.২.৩ চাহিদা সূত্রের ব্যতিক্রম

৪৬.৩ সারাংশ

৪৬.৪ অনুশীলনী

৪৬.০ উদ্দেশ্য

আগে অর্থব্যবস্থার মূল কাজ হিসেবে কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী কি উপায়ে কত পরিমাণ এবং কাদের জন্য উৎপন্ন করা হবে এগুলি বলা হয়েছে। আমরা জেনেছি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূল লক্ষ্যে মানুষের অসংখ্য অভাবের পূরণ বা তৃপ্তির চেষ্টা। অভাব পূরণ হয় ভোগের মাধ্যমে। আবার, মানুষ কতটা ভোগ করে কি পরিমাণ তৃপ্তি পাবে তা তার সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। প্রধানত আর্থিক সক্ষমতাই তাঁর অভাব পূরণ বা তৃপ্তির সীমা ঠিক করে দেয়। এটাই ভোগ ও তৃপ্তির জন্য মানুষের চাহিদা। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ফার্মকে, মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে মানুষের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হয়। আগে এ সংক্রান্ত দু'একটি প্রাথমিক ধারণা উল্লেখ করা হলেও বাণিজ্যক্ষেত্রে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা হয়নি। বর্তমান এবং পরবর্তী আরও কয়েকটি এককে আমরা ভোগ ও তৃপ্তির সঙ্গে চাহিদার তাত্ত্বিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবো শুধু চাহিদার দিকটি নিয়ে।

৪৬.১ উপযোগ

৪৬.১.১ উপযোগ ভোগ

আগের এককের শেষ অংশে অর্থনৈতিক ধারণা হিসেবে 'ভোগ' কথাটির বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, দ্রব্য বা সেবার উপযোগ বিনাশই ভোগ। অনন্ত অভাব থেকেই দ্রব্য বা সেবা ভোগের ইচ্ছা দেখা দেয়।

আধুনিক অর্থব্যবস্থায় ভোগের দ্রব্যসামগ্রী অর্থের বিনিময়ে কিনতে হয়। কাজেই ব্যক্তি বা পরিবার অথবা সারাদেশবাসী কত পরিমাণ ভোগ করতে পারবে তা প্রধানত ক্রয়ক্ষমতা বা আয়ের ওপর নির্ভরশীল, অনেক ভোগ্যপণ্যর মধ্য থেকে কার কতটা পণ্যের ওপর ভোগের অধিকার আছে সেটা আর্থিক সামর্থ্য বা ক্রয়ক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে। আর একটি বিষয়ও আছে। উপযোগ বিষয়টি এক মানসিক ধারণা মাত্র। কাজেই বিভিন্ন মানুষ একই দ্রব্য বা সেবা ভোগ থেকে যে সমপরিমাণ উপযোগ পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। মানসিক অবস্থার সঠিক পরিমাপ প্রায় অসম্ভব। অথচ ভোগ থেকে উপযোগের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা না করতে পারলে সাধারণ কোনও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না, বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয় না। এ অসুবিধা দূর করতে অর্থনীতিবিদরা কিছুটা অন্তর্দৃষ্টি বা অনুমানের সাহায্যে ভোগকারীর ব্যবহার সম্বন্ধে সাধারণ তত্ত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ভোগকারীর আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি কিছু বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্যের ভোগ থেকে কতটা উপযোগ পাওয়া সম্ভব বে তা ঐ দ্রব্য বা সেবার বাজার দামের ওপর নির্ভরশীল। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোগকারী নির্দিষ্ট আয় দিয়ে সর্বাধিক ভোগ করার চেষ্টা করবে। উপযোগ পেতে ভোগকারীর ত্যাগ স্বীকারের পরিমাপ অর্থ খরচের পরিমাপ দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। অর্থাৎ, একটি দ্রব্য থেকে কতটা উপযোগ পাওয়া গেল সেটা ঐ দ্রব্যের জন্য ব্যয় কর আয়ের অংশের সমান ধরা যেতে পারে। এটা ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগের একটা চলনসই আর্থিক পরিমাপ যা সর্বদা যুক্তিযুক্ত নাও হতে পারে।

৪৬.১.২ অভাব ও তৃপ্তিলাভ

দ্রব্য বা সেবা ভোগ থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি একটি মানসিক ধারণা। ভোগ থেকেই তৃপ্তি হয়, অভাব মেটে। কিন্তু নির্দিষ্ট পরিমাপ দ্রব্য বা সেবা ভোগ করে ঠিক কতটা তৃপ্তি পাওয়া গেল, সে অনুভূতি কী ভাবে মাপা সম্ভব? কিছু অর্থনীতিবিদ কিন্তু তৃপ্তির পরিমাপকে একটি দ্রব্যের জন্য অর্থ খরচের পরিমাণ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। সর্বাধিক তৃপ্তি লাভের জন্য ভোগকারী একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য খরচের পরিমাণ ঐ একক থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য উপযোগের সমান করতে চেষ্টা করবে। যতই দ্রব্যটির বিভিন্ন একক ভোগ করা হবে ততই পরবর্তী একক থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য তৃপ্তি হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে এক পর্যায়ে যে একক থেকে সম্ভাব্য তৃপ্তি ও সেজন্য ব্যয়ের পরিমাণ সমান হয়ে যাবে, সে পর্যায়ে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ হবে। এখানেও সম্ভাব্য তৃপ্তির পরিমাণ অর্থের সাহায্যে পরিমাপ ও সংযোজনযোগ্য।

আর একদলে আধুনিক অর্থবিজ্ঞানী কিন্তু উপযোগ বা তৃপ্তির পরিমাপ যোগ্যতায় আস্থাহীন, কারণ অর্থের নিজস্ব উপযোগ স্থির থাকে না। তাছাড়া দ্রব্যসামগ্রীর পিছু সম্বন্ধে সঠিক, যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। এঁদের মতে, উপযোগ না মেপেও একজন স্বাভাবিক ভোগকারী বিভিন্ন দ্রব্য সমন্বয়কে তৃপ্তির স্তর অনুযায়ী, বেশি বা কম বিবেচনা করে, স্তরক্রম অনুযায়ী সাজাতে পারে। অর্থাৎ, একটি দ্রব্য না ধরে দুটি দ্রব্যের (যেমন X এবং Y দুটি দ্রব্য) বিভিন্ন সমন্বয়কে সমতৃপ্তি, কম বা বেশি তৃপ্তির স্তর অনুযায়ী পছন্দক্রমে সাজানো যেতে পারে। তৃপ্তির এরকম পছন্দক্রম সাজানো দিয়েই ভোগকারীর তৃপ্তিসৃষ্টিকারী কার্যধারা বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য উপযোগের অর্থের সাহায্যে পরিমাপ ও সংযোজন এবনং বিভিন্ন দ্রব্য সমন্বয়কে পছন্দক্রম অনুযায়ী সাজানো—এই দুটি পদ্ধতি ২.৩ ও ২.৪ বিভাগ যথাক্রমে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুটি পদ্ধতিই ভোগকারীর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে এখানে ভোগ ও তৃপ্তিকে কিছুটা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তৃপ্তির সঙ্গে কল্যাণের (welfare) ধারণাও জড়িত, যদিও সে আলোচনা এখানে করা হয়নি।

৪৬.২ চাহিদা

৪৬.২.১ চাহিদার প্রকৃতি

মানুষের অভাব পূরণের কাজে যেমন দ্রব্য বা সেবাসামগ্রী প্রয়োজনীয়, বাণিজ্যিক কাজকর্মেও তেমনি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন, বিক্রয় বা সরবরাহ সংক্রান্ত অর্থনৈতিক উদ্যোগ। ও সব উদ্যোগের লক্ষ্য মানুষের চাহিদাপূরণ। ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদাই কোন্ দ্রব্য কত পরিমাণ এবং কী পদ্ধতিতে উৎপন্ন করা হবে সে নির্দেশ দেয়। ভোগকারীর পছন্দ বা প্রয়োজন চাহিদার উৎস। অপ্রচুর অর্থনৈতিক দ্রব্য বা সেবা পাওয়ার আকাঙক্ষা যখন আর্থিক সক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই জিনিসপত্রের অর্থনৈতিক চাহিদা সৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় বাসগৃহে ঝোড়ো হাওয়া লাভের আকাঙক্ষা অর্থনৈতিক চাহিদা নয়। কিন্তু প্রচণ্ড শীতে স্নানের জন্য উষ্ণ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা আর্থিক সামর্থ্য সাপেক্ষে অর্থনৈতিক চাহিদা। অভাববোধ বা আকাঙক্ষাকে চাহিদা বলা হয় না। অর্থনৈতিক দ্রব্যের জন্য দাম দিয়ে কিনে চাহিদা মেটাতে হয়। কাজেই ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে চাহিদা অর্থহীন। প্রচলিত দামে যে পরিমাণ দ্রব্য আয় করা হয় সেটাই প্রকৃত চাহিদা। আবার, নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতার অনুমান-নির্ভর সম্ভাব্য দামে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যেতে পারে, তাকেই ক্রেতার পরিকল্পিত চাহিদা বলে।

চাহিদাকে তিনদিক থেকে দেখা হয়ে থাকে। যেমন, (ক) ব্যক্তিগত চাহিদা, (খ) বাজার চাহিদা এবং (গ) সামগ্রিক চাহিদা।

(ক) ব্যক্তি বা পরিবার প্রত্যাশিত দামে একটি দ্রব্যের যে-পরিমাণ ক্রয়ের পরিকল্পনা করতে পারে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, সেটাই ব্যক্তির বা পরিবারের চাহিদা। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত ধরে নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যাশিত দাম ও চাহিদার পরিমাণকে পাশাপাশি রেখে দেওয়া তথ্য থেকে আমরা ব্যক্তির চাহিদাসূচী বা Demand schedule দেখাতে পারি। এই সূচীতে একটি দ্রব্যের দাম এবং ক্রয়ে পরিমাণে প্রায় সর্বদাই বিপরীত সম্পর্ক ধরা যায়।

(খ) বাজারে অনেক ব্যক্তি বা পরিবারের চাহিদা সম্মেলন ঘটে। অন্যভাবে বলা হয় যে একটি দ্রব্যের বাজার চাহিদা বিভিন্ন ব্যক্তি বা পরিবারগুলির সম্মিলিত চাহিদার ফল। বাজার চাহিদাসূচী হলো বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের জন্য সব ব্যক্তি বা সব পরিবারের চাহিদার সমষ্টি। কাজেই ব্যক্তির চাহিদাসূচীর বৈশিষ্ট্য বাজার চাহিদাসূচীতেও প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ বেশি দামে চাহিদার পরিমাণ কম, কিন্তু কম দামে ঐ পরিমাণ বেশি।

(গ) সামগ্রিক চাহিদা সারা দেশে সব ব্যক্তি বা পরিবারগুলির এবং ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির সবরকম চাহিদার সমষ্টি। সমষ্টিগত চাহিদা বলে বিষয়টি সমষ্টিগত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ব্যষ্টিক আলোচনার সঙ্গে শুধু একটি পার্থক্য মনে রাখা দরকার। একটু সংকীর্ণ অর্থে সারা দেশের অসংখ্য দ্রব্য সামগ্রীর একটি অংশ সরাসরি মানুষের অভাব পূরণ বা ভোগের জন্য এককথায় ভোগ (C), অপর অংশ পুনরায় উৎপাদনের কাজে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ দ্রব্য বা বিনিয়োগ (l) কাজেই দেশে সামগ্রিক চাহিদা (D) এ'দুটির সমষ্টি। সামগ্রিক চাহিদাও মূলত দেশের আয়ের (Y) ওপর নির্ভরশীল। Y এর একটি অংশ C এর জন্য ব্যয় অপরটি l-এর জন্য। কাজেই সামগ্রিক চাহিদা $= C + 1$. সামগ্রিক অর্থনীতির আলোচনার সময় সামগ্রিক চাহিদার বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য বোঝা যাবে।

ব্যক্তির বা বাজারের চাহিদা কি কি বিষয় দ্বারা প্রভাবিত? সাধারণত আমরা ধরে নিই একটি দ্রব্যের ব্যক্তি বা বাজার চাহিদা শুধু তার দাম দ্বারা প্রভাবিত। বাস্তবে কিন্তু এরকম চাহিদা দাম ছাড়া অন্যান্য অনেক

বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। দাম ছাড়া বিষয়গুলি হল; ব্যক্তির প্রয়োজন নির্ভরতা, রুচি-পছন্দ সম্পর্কিত অবস্থা, ব্যক্তির আয় বা ক্রয়ক্ষমতা, দ্রব্যটির নিজ দাম ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্যদ্রব্যের দাম, ভবিষ্যতে দাম পরিবর্তন সম্বন্ধে বর্তমানে ক্রেতার অনুমান, এবং সমাজে অন্যান্য পরিবারের ভোগের ধরন থেকে প্রভাবিত হতে পারে। এই শেষ বিষয়টি প্রদর্শন প্রভাব নাম পরিচিত

৪৬.২.২ দাম ও চাহিদার সম্পর্ক ঃ চাহিদারেখা

দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি চাহিদাকে প্রভাবিত করলেও তাত্ত্বিক আলোচনার সময় ধরা হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এগুলি অপরিবর্তিত। সেক্ষেত্রে শুধু দ্রব্যের দামের ওপর তার চাহিদা নির্ভর করে। দামের পরিবর্তনের প্রভাবে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে। সাংকেতিক সাহায্যে প্রকাশ করলে D = চাহিদা, P = দ্রব্যটির দাম এবং f = দাম ও চাহিদার মধ্যে বিশেষ সম্পর্কের চিহ্ন ধরলে আমরা চাহিদা অপেক্ষককে নিম্নলিখিত রূপে প্রকাশ করতে পারি—

$D = f(p)$, অর্থাৎ D শুধুমাত্র P-এর উপর নির্ভর করে।

দ্রব্যটির পরিচায়ক X ধরলে উভয় দিকে X যুক্ত করে নিম্নরূপটি পাই,

$d_x = f(p_x)$, X দ্রব্যটি পরিমাণ d_x ঐ দ্রব্যের দামের p_x উপর নির্ভর করে। d_x হলো p_x-এর অপেক্ষক। এখানে অবশ্যই দামছাড়া অন্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত ধরা হয়েছে।

অপেক্ষকটি থেকে ব্যক্তির দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ (d_x) দ্রব্যটির দামের (p_x) সঙ্গে সম্পর্কিত, শুধু এটুকুই জানা যায়। কিন্তু সম্পর্কটি কি রকম, p_x পরিবর্তিত হলে d_x-এর পরিবর্তন কি রকম হবে—এ তথ্য পাওয়া যায় না। সে তথ্য পেতে X দ্রব্যের বিভিন্ন দামে ব্যক্তি দ্রব্যটির কত পরিমাণ কিনতে পারে এ সংক্রান্ত তথ্য পাশাপাশি সাজাতে হবে। নিচে ৪৬.১ সারণীতে A নামক ব্যক্তির এরকম একটি তথ্য সাজানো হয়েছে।

৪৬.১ সারণী ঃ A ব্যক্তির চাহিদাসূচী

P_x (টাকায়)	Qd_x (একক)
৮	০
৭	১
৬	২
৫	৩
৪	৪
৩	৫
২	৬
১	৭

সারণিতে দামের পরিবর্তন দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণের উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। X দ্রব্যের বিভিন্ন দামে কি পরিমাণ চাহিদা হচ্ছে তাই উপরে ঐ দ্রব্যের জন্য A ব্যক্তির চাহিদাসূচী দিয়ে দেখানো হয়েছে। এটি X দ্রব্যের চাহিদাসূচী বা Demand Schedule for X। ব্যক্তির চাহিদাসূচী X দ্রব্যের বিভিন্ন

দামে ঐ দ্রব্যের বিভিন্ন একক চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করে অন্যান্য সব বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায়। সারণিতে দেওয়া দাম ও চাহিদার প্রতিটি সমন্বয়কে একটি বিন্দু দিয়ে প্রকাশ করে বিন্দুগুলিকে একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করলে X দ্রব্যের জন্য A নামক ভোগকারীর চাহিদারেখা (demand curve) পাওয়া যায়। দ্বি-মাসিক রেখাচিত্রে ৪৬.১ সারণির তথ্য সন্নিবিষ্ট করলে আমরা X দ্রব্যের চাহিদা বা dx রেখা পাই। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ে এই রেখাই ব্যক্তির চাহিদার রেখা।

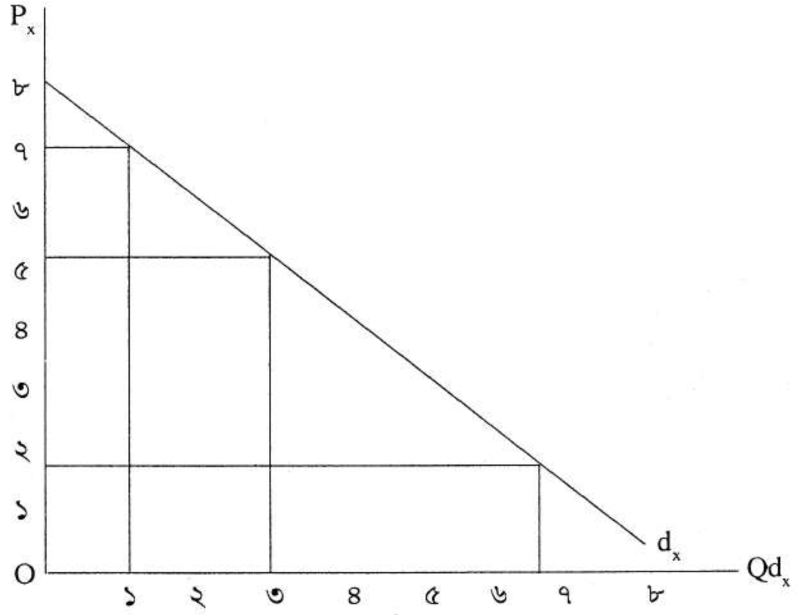

রেখাচিত্র ৪৬.১

৪৬.১ রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে যখন X দ্রব্যের দাম ৭ টাকা, তখন A ব্যক্তি ১ একক X দ্রব্য কিনতে ইচ্ছুক, দাম কমে ৬ টাকা হলে সে নির্দিষ্ট সময়ে ২ একক, আর কমে ৫ টাকা হলে ৩ একক X দ্রব্য কিনতে ইচ্ছুক। এভাবে দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিমাণেরও পরিবর্তন ঘটতে থাকবে। দাম ও চাহিদার এসব সমন্বয় বিন্দুগুলি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন দামে চাহিদার পরিমাণ নির্দেশ করে। রেখাচিত্রে বিভিন্ন সমন্বয় বিন্দুগুলি একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে আমরা A নামক ক্রেতার X দ্রব্যের চাহিদারেখা বা dx পাই। লক্ষণীয় যে, এখানে উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম (p_x) এবং আনুভূমিক অক্ষে দ্রব্যটির পরিমাণ ধরা হয়েছে। যদিও p_x অনপেক্ষ চলরাশি এবং Qd_x অধীন চলরাশি বা dependent variable।

৪৬.১ সারণিতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে X এর দাম যত কমছে, চাহিদার পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। দাম-চাহিদার এই বিপরীত সম্পর্কই ৪৬.১ রেখাচিত্রের d_x চাহিদা রেখার ঋণাত্মক ঢাল বা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামিতায় প্রতিফলিত। দু'একটি বিরল দৃষ্টান্ত ছাড়া সব সময়ই চাহিদা রেখা এরকম ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়। বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী চাহিদারেখার ব্যতিক্রম না থাকায় বৈশিষ্ট্যটিকে সাধারণভাবে চাহিদার সূত্র বা বিধি বলা হয়। অর্থাৎ ব্যক্তির আয়, রুচি, পছন্দ, বিকল্প দ্রব্যের দাম ইত্যাদি বিষয়গুলির অপরিবর্তিত অবস্থায় একটি দ্রব্যের দাম কমলে চাহিদা বাড়ে এবং দাম বাড়লে চাহিদা কমে। এ নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নেই বললেই চলে।

তবে, দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত (ceteris paribus) না থাকলে চাহিদা রেখা উপরের বা নিচের দিকে সরে যেতে পারে। আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলির পরিবর্তন ঘটলে একটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট দামেও চাহিদা কম বা বেশি হতে পারে। নির্দিষ্ট দামে চাহিদা কমলে রেখাটির স্থানান্তর ঘটবে নিচের বা রেখাচিত্রের উৎসবিন্দুর দিকে, চাহিদা বাড়লে রেখাটি উপরের দিকে, উৎসবিন্দু থেকে আরও দূরে সরে যাবে। এরকম ভাবে চাহিদা রেখা সরণকে চাহিদার পরিবর্তন বা change in demand বলে। একটি চাহিদা রেখা ধরে এক বিন্দু থেকে অন্য বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে দ্রব্যটির জন্য চাহিদার পরিবর্তনকে কিন্তু চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন বা change in quantity demanded বলা হয়। চাহিদার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটে; কিন্তু চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তন একই চাহিদা রেখার একবিন্দু থেকে অন্যবিন্দুতে সরণ বোঝায়।

বাজার চাহিদা রেখা ঃ

বাজারের একই দ্রব্য কিনতে ইচ্ছুক অনেক মানুষের চাহিদা মিলিত হয়। কাজেই X দ্রব্যের বিভিন্ন দামে বিভিন্ন ক্রেতার বিভিন্ন পরিমাণ চাহিদার পরিমাপ যোগ করে সেই সমষ্টি থেকে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিদের বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। বাজার চাহিদা রেখা বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদাসূচী অনুযায়ী দাম ও চাহিদার পরিমাণের বিভিন্ন সমন্বয়গুলিরই জ্যামিতিক চিত্ররূপ। X দ্রব্যের বিভিন্ন দাম অনুযায়ী A, B, C ইত্যাদি কিছু ক্রেতার চাহিদার পরিমাণের সমষ্টি Qd_x। এভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির X দ্রব্যের জন্য চাহিদা তালিকার (Qdx) আনুভূমিক সংযোজন করে ঐ দ্রব্যের বাজার চাহিদার রেখা পাওয়া যায়। ব্যক্তির চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন, বাজার চাহিদার ক্ষেত্রেও তেমনি দাম-চাহিদার বিপরীতমুখী সম্পর্কই প্রতিফলিত হয়। চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী ব্যক্তির চাহিদারেখাগুলি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন বলে বজার চাহিদা রেখাও (D_x) অবশ্যই বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হবে। ব্যক্তির চাহিদা রেখার স্থানান্তর ঘটলে বাজার চাহিদা রেখাও সরে যাবে। সময়ের সঙ্গে বাজারে X দ্রব্যের ক্রেতার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটলেও চাহিদার পরিবর্তন ঘটবে।

৪৬.২.৩ চাহিদাসূত্রের ব্যতিক্রম

একটি দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণে বিপরীতমুখী সম্পর্কের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে যদি উভয়ের সমপর্ক একমুখী হয়ে ওঠে অর্থাৎ দাম ও চাহিদার একই সঙ্গে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে। এরকম একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা ‘গিফেন দ্রব্যে’র ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। আয়ারল্যান্ডের অধ্যাপক রবার্ট গিফেন প্রথম ঘটনাটি উল্লেখ করেন। গিফেন দ্রব্যের ক্ষেত্রে দামবৃদ্ধির সঙ্গে দ্রব্যটির চাহিদাও বেড়ে যায়। পাশ্চাত্যের দরিদ্র, শ্রমিক পরিবারগুলির খাদ্যতালিকায় পাঁউরুটি গুরুত্বপূর্ণ। পাঁউরুটির দামবৃদ্ধি পেলে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় কমে যায়। স্থির আয়ের শ্রমিক দল তখন মাংস বা অন্য প্রোটিনজাতীয় দ্রব্যের জন্য চাহিদা ও অর্থব্যয় কমিয়ে সেই অর্থ দিয়ে আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ রুটি কেনে। ফলে দামবৃদ্ধি সত্ত্বেও পাঁউরুটির চাহিদা বেড়ে যায়। একই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা যায় ফাটকা কারবারীর ক্ষেত্রে। ভবিষ্যতে আরও মূল্যহ্রাসের আশায় ফাটকা কারবারী কমদামে বর্তমানে শেয়ার ক্রয় স্থগিত রাখতে পারে, ফলে কম দামে আবার ভবিষ্যতে আর মূল্যবৃদ্ধি পাবে মনে করলে বর্তমানে বেশি দাম দিয়ে শেয়ার ও দ্রব্য ক্রয় বাড়তে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদারেখার ঋণাত্মক ঢালের রূপ নিয়ে ঊর্ধ্ব ও ডানমুখী হয়ে উঠতে পারে। এসব ক্ষেত্রে চাহিদা রেখার স্বাভাবিক রূপ পাল্টে একধরনের মোড় বা নির্ভরণ (Regression) দেখা দেয়।

আর এক ধরনের ব্যতিক্রম ঘটে জাঁকজমকপূর্ণ মণিমুক্তা বা হীরার অলংকারের ক্ষেত্রে। এসব অলংকারের ব্যবহার ঐশ্বর্যের প্রচার ও সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য ব্যবহার হয়, উপযোগিতার জন্য নয়। এই বিশেষ

মানসিকতা বা রুচি-পছন্দ সম্পন্ন মানুষ বেশি দামে বেশি চাহিদা করে। চাহিদার নিয়মের এরকম ব্যতিক্রম অবশ্য কিন্তু মানুষের রুচি পছন্দের পরির্বতনের ব্যাপার। অর্থাৎ বেশি দামে জাঁকজমপূর্ণ জিনিস কেনার ক্ষেত্রে 'স্থির বিষয়' সংক্রান্ত চাহিদাসূত্রের অনুমানটি লঙ্ঘিত হওয়াই মূল কারণ। এভাবে দেখলে, নিকৃষ্ট ও গিফেন দ্রব্য ছাড়া চাহিদার নিয়মের অন্য কোনও ব্যতিক্রম নেই।

৪৬.৩ সারাংশ

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফার্ম পণ্যসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রয় পরিকল্পনা রচনা করে মূলত ঐসব পণ্যের জন্য বাজারের চাহিদার পরিমাণ ও প্রকৃতি বিচার করে। চাহিদা সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে, দ্রব্যের জন্য ব্যক্তিবিশেষের বা বাজারে চাহিদাসূচী বোঝা প্রয়োজন। আবার চাহিদার ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম জেনে সে অনুযায়ী চাহিদা রেখার জ্যামিতিক রূপটি সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা থাকা বিশেষ প্রয়োজনীয়। দাম ছাড়া অন্য যে-সব বিষয় দ্বারা একটি দ্রব্যের চাহিদা প্রভাবিত হয় সেগুলিরও উল্লেখ আমরা করেছি। বিরল হলেও, কখনও কখনও চাহিদার সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমও উপরে আলোচিত হয়েছে, অবশ্য সরল সংক্ষেপে। অর্থনৈতিক কাজে নিযুক্ত উৎপাদনকারী ব্যবসায়িক ফার্মগুলির কাছে চাহিদার আলোচনা মুনাফা অর্জন প্রচেষ্টার আলোচনার একটি দিক মাত্র।

৪৬.৪ অনুশীলনী

১। অভাব ও চাহিদার সম্পর্ক কি?

উঃ একটি দ্রব্যের চাহিদার মূলে আছে অভাব বোধ। দ্রব্যের অভাবপূরণ ক্ষমতা থেকেই ভোগের ইচ্ছা দেখা দেয়। কিন্তু অভাবপূরণের প্রয়োজন ও ভোগের ইচ্ছা থাকলেই দ্রব্যের প্রকৃত চাহিদা সৃষ্টি হয় না। অর্থনৈতিক চাহিদার জন্য প্রয়োজন ভোগের ইচ্ছা এবং দ্রব্য ক্রয়ের সামর্থ্য। শুধু অভাব বোধ থেকেই চাহিদা সৃষ্টি হয় না।

২। ভোগ ও অভাবের সম্পর্ক কি?

উঃ দ্রব্য বা সেবা ভোগ করলে অভাব মেটে বা তৃপ্তি লাভ হয়। তবে দ্রব্যের উপযোগ নষ্ট হয়।

৩। তৃপ্তি ও চাহিদার সম্পর্ক লক্ষ্য করুন।

উঃ ক্রয়ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ অভাব মেটাতে সম্ভাব্য তৃপ্তি অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা করে।

৪। কোনটি ঠিক? ক) তৃপ্তির স্তর বিন্যাস করা যায়; খ) তৃপ্তির পরিমাণ অর্থব্যয় দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

৫। ২.১ সারণির সূত্রে ব্যক্তির চাহিদা ও বাজার চাহিদা তালিকার সম্বন্ধ মনে রাখুন। অন্য তথ্য সাজিয়ে দাম চাহিদার বিভিন্ন সমন্বয় গঠন করুন।

৬। দাম-চাহিদার তথ্য থেকে চাহিদা রেখা গঠনের চেষ্টা করুন।

৭। স্বাভাবিক ও গিফেন দ্রব্যের চাহিদা রেখা দুটির মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করুন।

৮। দাম ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি অপরিবর্তিত বা 'certeris paribus' কথাটির তাৎপর্য মনে রাখুন।

একক ৪৭ ◆ চাহিদা ভিত্তি ঃ মার্শালের পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্ব

গঠন

৪৭.০ উদ্দেশ্য

৪৭.১ মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা

৪৭.২ মূল্যের আপাতবিরোধ

৪৭.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম

৪৭.৪ একটি দ্রব্যের ভারসাম্য চাহিদা

৪৭.৫ সমপ্রান্তিক উপযোগিতা বিধি

৪৭.৬ বিভিন্ন দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়

৪৭.৭ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

৪৭.৮ মার্শালীয় তত্ত্বের অনুমান ও দুর্বলতা

৪৭.৯ সারাংশ

৪৭.১০ অনুশীলনী

৪৭.০ উদ্দেশ্য

আগের এককে ভোগকারীর তৃপ্তি ও চাহিদা সংক্রান্ত কয়েটি বিষয় পর্যালোচনা করে চাহিদার সাধারণ নিয়ম, চাহিদা রেখা এবং নিয়মের ব্যতিক্রম আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার মূলে আছে উপযোগ বা তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা। মানসিক ব্যাপার হলেও দ্রব্যসামগ্রীর বাস্তব চাহিদা এই উপযোগ বা তৃপ্তিসীমার অনুভূতির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার কীভাবে পরিমাপ করা যাবে সে সম্বন্ধে দুটি মূলতত্ত্ব প্রচলিত আছে। একটি ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদ অ্যালফ্রেড মার্শাল প্রদত্ত পরিমাণগত (cardinal) উপযোগিতা তত্ত্ব, অপরটি অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক প্যারেটো-হিক্স্-অ্যালন (Pareto-Hicks-Allen) প্রদত্ত ক্রমবাচক (ordinal) উপযোগিতা বা নিরপেক্ষতা তত্ত্ব। বর্তমান এককে আমরা মার্শালের পরিমাণগত তত্ত্বটির সাহায্যে ভোগকারীর চাহিদার ভিত্তি অনুসন্ধান করব। আগে আলোচিত দাম চাহিদার বিপরীত ভিত্তিটি বিশ্লেষণ করবো।

৪৭.১ মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা ঃ তুলনা

(i) একটি দ্রব্যের চাহিদার মূলে আছে তার তৃপ্তিদানের ক্ষমতা বা উপযোগ (utility)। ভোগকারী নির্দিষ্ট সময়ে একটি দ্রব্য ভোগ করে সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে চায়। দ্রব্যটির ভোগের একক যতই বাড়তে থাকে প্রাপ্ত

মোট উপযোগও ততই বাড়তে থাকে। তবে একটি সীমার পর দ্রব্যটিরও আরও বেশি একক ভোগ করলে মোট উপযোগ (total utility ro TU) কমে। কাজেই TU বৃদ্ধির একটা সীমা আছে। তবে TU ভোগের একক উপযোগ (marginal utility or MU) কিন্তু কমতে থাকে। কাজেই TU বলতে নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোগকারী একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ করে প্রাপ্ত মোট উপযোগের সমষ্টি বোঝায়। কিন্তু MU বা প্রান্তিক উপযোগ হল X দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক ভোগ বৃদ্ধি থেকে প্রাপ্ত উপযোগের ফলে মোট উপযোগ বৃদ্ধি বা ΔTUI। 'Δ' চিহ্নটি পরিবর্তন বোঝাচ্ছে। সুতরাং X দ্রব্যের ভোগের একক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারীর TU_x বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উপযোগ বা MU_x কমতে থাকে।

মার্শাল ও অন্যান্য পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, একটি দ্রব্যের ভোগ থেকে প্রাপ্ত একটি সংখ্যাবাচক কাল্পনিক একক 'ইউটিল' বা Util দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এভাবে উপযোগ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করে X ও Y দুটি দ্রব্যের তৃপ্তির পার্থক্য বিচার করলে কোনটি বেশি কাম্য তা স্থির করা যায়। যেমন X-এর উপযোগিতা ৪ ইউটিল এবং Y-এর ২টি ইউটিল হলে সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য একজন ভোগকারী X দ্রব্যটিকেই পেতে চাইবে। এরকম পরিমাপ থেকে উপযোগিতার তুলনা করে একটির তুলনায় অপরটির উপযোগিতা ঠিক কত বেশি বা কত কম তাও বিচার করা সম্ভব বলে প্রবক্তাগণ মনে করেন।

যাই হোক, কাল্পনিক একক ইউটিল দিয়ে X দ্রব্যের মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা ধারাবাহিক পরিবর্তন ও তার প্রকৃতি নিচে ৪৭.১ সারণিতে দেখানো হল।

৪৭.১ সারণি ঃ মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা

Q_X	TU_X	$MU_X (= \Delta TU_X)$
0	0	....
1	10	10
2	18	8
3	24	6
4	28	4
5	30	2
6	30	0
7	28	–2

সারণিতে Q_X শিরোনামে X দ্রব্যের বিভিন্ন একক, TU_X শিরোনামে ভোগের এককগুলি থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগিতার পরিমাণ এবং MU_X দিয়ে দ্রব্যটির বাড়তি এক একক থেকে পাওয়া অতিরিক্ত উপযোগিতা বা মোট উপযোগিতার পরিবর্তন ইউটিল নামক পরিমাণবাচক সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, ভোগকারী X দ্রব্যটির ভোগ যতই বৃদ্ধি করছে, ততই প্রাপ্ত TU_X বৃদ্ধি পাচ্ছে ৫ একক পর্যন্ত। MU_X সারিতে সাজানো তথ্যে বাড়তি একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তন ইউটিল ধরে সাজানো হয়েছে। এই সারির প্রতিটি সংখ্যা একক থেকে প্রাপ্ত ইউটিলের পরিমাণ বোঝাচ্ছে এবং প্রতিটি সংখ্যা বর্তমান ও ঠিক পূর্ববর্তী একক থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগিতার অন্তরফল। যখন X-এর ভোগ ১ একক থেকে বেড়ে ২ একক, তখন TU_X ১০ ইউটিল থেকে বেড়ে ১৮ একক। ফলে বাড়তি MU_X = ৮ ইউটিল।

এভাবে নির্দিষ্ট সময়ে সে মতোই X-এর ভোগ ক্রমশ বৃদ্ধি করছে ততই MU_X কমতে শূন্য বা তারপরে ঋণাত্মক হয়েছে।

৪৭.১ সারণিতে দেওয়া তথ্যকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করলে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্বন্ধ আরও স্পষ্ট হয়। নিচের ৪৭.১ রেখাচিত্রে এই সম্পর্ক দেখানো হলো। রেখাচিত্রের (ক) অংশে মোট উপযোগ বা TU_X এবং ঐ দ্রব্য ভোগ থেকে একক প্রতি প্রাপ্ত বাড়তি প্রান্তিক উপযোগ নিচের (খ) অংশে দেখা যাচ্ছে। X দ্রব্যের ভোগ ৫ থেকে ৬ একক বৃদ্ধি করলে YU_X সর্বাধিক বা সংতৃপ্তির বিন্দুতে সর্বাধিক ৩০ ইউটিল এবং স্থির মাত্রার। উদ্ভূত রেখাটিতে ৬ একক ভোগ থেকে প্রাপ্ত $MU_X = 0$-এর পরে আরও একক ভোগ করলে বাড়তি অনুপযোগিতা ঋণাত্মক মান দিয়ে—২ দেখানো হয়েছে। অবশ্য মোট উপযোগকে বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া MU_X-গুলির যোগফল হিসেবেও ধরা যায়। ৫ একক পর্যন্ত ভোগের ক্ষেত্রে YU_X = ৩০ ইউটিল এবং MU_X-গুলির যোগফলও ৩০ ইউটিল।

মোট উপযোগিতা
রেখাচিত্র ৪৩.১
(ক)

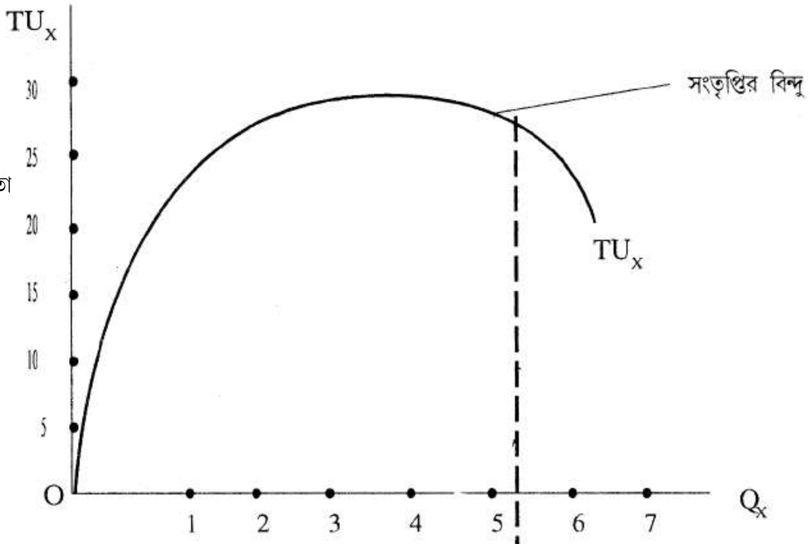

প্রান্তিক উপযোগিতা
রেখাচিত্র ৪৭.১
(খ)

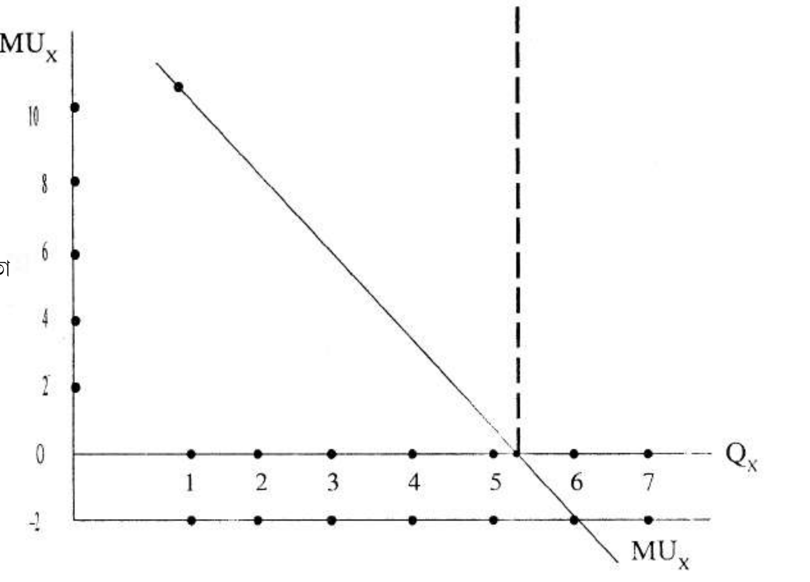

৪৭.২ মূল্যের আপাতবিরোধিতা ঃ

একটি দ্রব্যের MU ধারণাটি দ্রব্যটির মূল নিরূপণে TU অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যেমন মানুষের জীবনযাপনে জিবের তুলনায় জলের গুরুত্ব অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ জল অপেক্ষা হীরের জন্য অনেক গুণ বেশি দাম দিতে রাজি হয়। ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা এ ঘটনাকে মূল্যের আপাতবিরোধিতার এক উদাহরণ বলে মনে করতেন। জলের মোট উপযোগিতা অনেক বেশি হলেও হীরের তুলনায় তার মূল্য প্রায় কিছুই নয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা অবশ্য প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণাটির সাহায্যে এই 'জল-হীরার' মূল্যের সমস্যাটির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। প্রয়োজনের তুলনায় জলের যোগান প্রচুর বলে তার MU খুবই কম বা O-র কাছাকাছি। কিন্তু হীরের যোগান খুবই কম বলে MU খুব বেশি। দ্রব্যের বাজার দামে তার MU-র প্রতিফলন ঘটে এবং প্রান্তিক উপযোগিতা বেশি বলে দামও অনেক বেশি। এভাবে MU ধারণাটি 'মূল্যের আপাত বিরোধ' সমস্যাটির নিষ্পত্তি করেছে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহার থাকলে তার প্রান্তসীমাও পরিস্থিতির সঙ্গে ওঠানামা করতে পারে। যে বছর আমের ফলন ভালো হয়, সে বছর দাম কমে এবং আমের ব্যবহার গোটা হিসেবে খাওয়া ছাড়াও চাটনি, আমসত্ত্ব, আচার ইত্যাদি কম প্রয়োজনীয় কাজেও প্রসারিত হয়। তখন আমের প্রান্তিক উপযোগিতা কমে যায়। পক্ষান্তরে কম ফলনের বছরে আমের দাম বাড়ে ও আমের অংশবিশেষ টুকরো করে কখনও কখনও ভোগ করা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে আমের MU বৃদ্ধি পায়। কাজেই পরিস্থিতি ভেদে একটি দ্রব্যের MU ওঠানামা করতে পারে।

৪৭.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা ঃ

৪৭.৩ সারণি ও রেখাচিত্রে দেখেছি যে, X দ্রব্যটির TU বৃদ্ধি পেতে থাকলেও বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া MU_X ক্রমাগত কমে আসছে। বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া বাড়তি উপযোগিতা কমতে কমতে শূন্য বা তারও নিচে ঋণাত্মক হয়ে যাচ্ছে। ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা ষষ্ঠ একক পর্যন্ত বিস্তৃত যেখানে TU_X সর্বাধিক বা ৩০ ইউটিল। এর পরেও ভোগ করল প্রাপ্ত MU ঋণাত্মক মানবিশিষ্ট। বলা যায় যে, সর্বাধিক সংতৃপ্তির বিন্দুতে না পৌঁছনো পর্যন্ত মোট উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকে। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ থেকে তৃপ্তিলাভ যে সবসময়ই সর্বোচ্চ সংতৃপ্তির বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। দ্রব্যটির বিভিন্ন একক নির্দিষ্ট বাজার দামে কিনতে হবে। এর অর্থ এই যে, ভোগকারীকে দ্রব্যের জন্য অর্থ খরচ করতে হবে বা ত্যাগস্বীকার করতে হবে। আয় নির্দিষ্ট অবস্থায় তাকে সর্বাধিক উপযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে হবে যাতে তার আর্থিক ব্যয় বা ত্যাগস্বীকার দ্রব্যভোগের শেষ একক থেকে পাওয়া উপযোগিতার সমান হয়। মার্শাল প্রদত্ত বিখ্যাত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা বিধির মূল বক্তব্যও এইরকম। ক্রেতার আয়, রুচি, পছন্দ ইত্যাদি নির্দিষ্ট অবস্থায়, নির্দিষ্ট সময়ে, একটি দ্রব্যের ভোগ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে অতিরিক্ত একক থেকে পাওয়া বাড়তি প্রান্তিক উপযোগিতাও ততই কমতে থাকে। ৪৭.১ সারণি ও রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, X দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা (MU_X) ক্রমশ কমছে এবং রেখাচিত্রের 'খ' অংশে MU_X রেখাটি ক্রমশ নিম্নমুখী। অর্থাৎ X দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান। এক ধরনের উপলব্ধি বা স্বতঃলব্ধ জ্ঞানের (Introspection) ভিত্তিতে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ ও প্রান্তিক উপযোগিতার ক্রমহ্রাসমান সম্পর্কটি এরকম এক স্বতঃলব্ধ জ্ঞান।

অনুমান ঃ যে সব অনুমানের ভিত্তিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মটি রচিত, সেগুলি অনুভূতিগ্রাহ্য হলেও সবসময়ে যুক্তিগ্রাহ্য হয় না। প্রথমত, ধরা হয়েছে যে, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোগকারী একটি দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতা মাপতে পারে। কিন্তু তৃপ্তি এক মানসিক ধারণা, মনস্তত্ত্বনির্ভর বলে সঠিক পরিমাপযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, প্রান্তিক উপযোগিতা ভোগের প্রথম থেকেই যে ক্রমশ কমতে থাকবে, এমন নাও হতে পারে। তৃতীয়ত, ধরা আছে যে, একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ যোগ করে তার মোট উপযোগ পাওয়া যায়। আবার উপযোগিতা শুধু একটি দ্রব্যের সঙ্গেই যুক্ত, অন্য দ্রব্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন। চতুর্থত, ভোগের দ্রব্যটি ছোট ছোট পৃথক অংশে বিভাজ্য। বাস্তবে অনেক জিনিসই, যেমন ফ্ল্যাট বাড়ি, টি ভি সেট, মেশিন ইত্যাদি অনেক কিছুই অবিভাজ্য। পঞ্চম অনুমান, নির্দিষ্ট সময়ে ব্যক্তির রুচি, পছন্দ ইত্যাদি বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকবে। বেশি সমালোচিত ষষ্ঠ ও শেষ অনুমানটি হলো, অর্থের সাহায্যে উপযোগ মাপলেও অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা ভোগকারীর কাছে অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু যতই দ্রব্যের বেশি ক্রয় হয়, ততই ব্যক্তির কাছে অর্থের পরিমাণ কমে এবং এর উপযোগিতা বাড়ে। অর্থব্যয় বা দ্রব্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার প্রতি এককে সমান রাখতে হলে উপযোগিতার পরিমাপ হিসাবে অর্থখরচের মানবদণ্ডটির নিজ উপযোগ স্থির ধরতেই হয়। কিন্তু বাস্তবে ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের নিজস্ব উপযোগিতাও পরিবর্তিত হয়।

৪৭.৪ একটি দ্রব্যের ভারসাম্য চাহিদা

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মটির সাহায্যে একটি দ্রব্য ক্রয়ের ভারসাম্য চাহিদার পরিমাণ স্থির করা যায়। অন্যান্য বিষয় স্থির রেখে একজন ভোগকারী X দ্রব্যটির চাহিদা তত একক পর্যন্ত করবে যেখানে X-এর দাম (p_x) এবং প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা (MUx) সমান। সংক্ষেপে, MUx = Px এই সমতার বিন্দুতেই ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তিলাভের লক্ষ্যটিও পূর্ণ হয়। ঐ বিন্দুতেই দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাপ বা ভারসাম্য ক্রয়ও নির্ধারিত হয়। এই ভারসাম্য অবস্থা নিচের ৪৭.২ রেখাচিত্রে স্পষ্ট করা হলো।

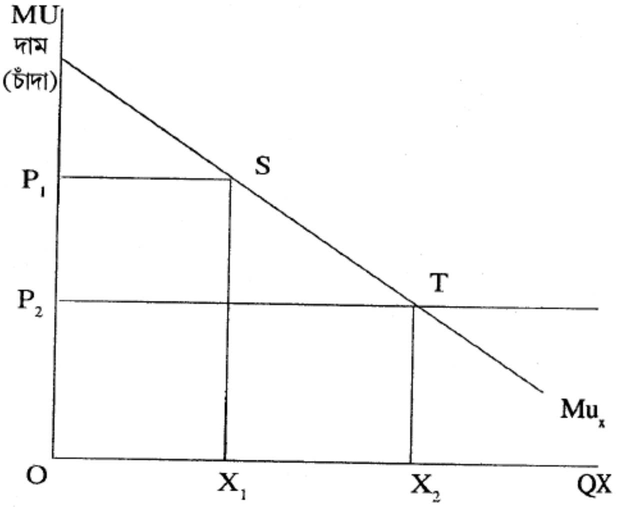

রেখাচিত্র ৪৭.২

MU_x রেখাটি X দ্রব্য থেকে পাওয়া ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বোঝাচ্ছে। উল্লম্ব অক্ষে একই সঙ্গে X-এর দাম p_x এবং বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া প্রান্তিক উপযোগ দেখানো হয়েছে। অনুভূমি অক্ষে দ্রব্যটির পরিমাণ ধরা হয়েছে। O বিন্দু থেকে এ-অক্ষ ধরে যতই ডানদিকে Q_x-র দিকে অগ্রসর হওয়া যাবে ততই দ্রব্যটির ভোগ ও ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে বুঝতে হবে।

সর্বাধিক তৃপ্তির জন্য ভোগকারী X-দ্রব্যের সেই একক পর্যন্ত কিনবে যেখানে দ্রব্যটির MU = Px। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে

যে দাম, যখন P_1 তখন S বিন্দুতে এই সমতা ঘটছে। S বিন্দুতে ক্রয়ের পরিমাণ OX_1 দাম কমে P_2 হলে T ছেদবিন্দুতে ক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে OX_2 পরিমাপ। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ভোগকারী এভাবেই সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা ও তার দামের মধ্যে সমতা বিচার করে ক্রয়ের পরিমাণ স্থির করে। S বা T বিন্দুতে চাহিদার পরিমাণ ঠিক হয়ে যায়। উৎপাদকারী ফার্মকেও এরকম ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ ও দ্রব্যের দামের ধারণা থেকে চাহিদার পরিমাপ বিচার করে তার উৎপাদন পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। এ-উপায়ে গৃহীত উৎপাদন পরিকল্পনাই যথাযথ ও যুক্তিপূর্ণ। কাজেই একটি দ্রব্যের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্রটি ধরে ঐ দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দামে চাহিদার পরিমাপও জানা যায়।

৪৭.৫ সমপ্রান্তিক উপযোগিতা বিধি

একাধিক দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের পরিবর্ততার নিয়ম ঃ এ পর্যন্ত আমরা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়মের সাহায্যে একটিমাত্র দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাপ আলোচনা করেছি। বাস্তবে একজন ভোগকারী নির্দিষ্ট আয় কয়েকটি দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে থাকে। দ্রব্যের সংখ্যা বেশি হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি কি প্রয়োগ হবে? উপযোগিতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও ভোগকারী একই সূত্র অনুযায়ী তার নির্দিষ্ট আয় ব্যয় করে সর্বাধিক তৃপ্তির স্তরে দ্রব্যগুলির ভারসাম্য ক্রয় বা চাহিদা স্থির করতে পারবে। প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান তত্ত্ব থেকে উদ্ভুত এই সূত্রটি বিভিন্ন দ্রব্যের ভোগের ক্ষেত্রে পরিবর্ততার নিয়ম বা সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত।

৪৭.৬ বিভিন্ন দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়

নির্দিষ্ট সময়ে একজন ভোগকারী তার নির্দিষ্ট আয় বিভিন্ন দ্রব্যক্রয়ে এমনভাবে বিলি করবে যাতে ঐ ব্যয় থেকে তার মোট উপযোগ সর্বাধিক হতে পারে। X এবং Y দুটি দ্রব্যের দাম (P_x, P_y) এবং ক্রেতার আয় (M) নির্দিষ্ট অবস্থায় সে দ্রব্যগুলির মধ্যে তার সীমিত আয় বণ্টনের জন্য প্রতিটি দ্রব্যের দাম ও প্রান্তিক উপযোগের অনুপাতগুলি পরস্পরের সমান করবে। সর্বাধিক তৃপ্তির স্তরে ক্রেতার ভারসাম্যর সূত্রটি নিম্নরূপ ঃ

$$\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y} = ...$$

যেক্ষেত্রে ভোগকারীর সীমিত আয় হলো $P_xQ_x + P_yQ_y + ... = M$

অর্থাৎ ভোগকারী তার আয়ের সবটাই দ্রব্যগুলির আয়ে ব্যয় করবে যতক্ষণ না অর্থের এককপিছু দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হচ্ছে, ততক্ষণ X-এর এককের পরিবর্ত y-এর এককের পরিবর্ততা চলতে থাকবে। এরকম পরিবর্ততার মধ্য দিয়েই শেষপর্যন্ত দ্রব্যক্রমে সর্বাধিক তৃপ্তির বিন্দুতে ক্রয়ের ভারসাম্য চলতে থাকবে। এরকম পরিবর্ততার মধ্য দিয়েই শেষপর্যন্ত দ্রব্যক্রমে সর্বাধিক তৃপ্তির বিন্দুতে ক্রয়ের ভারসাম্য আসবে। X বা Y-এর পরিবর্ততার মধ্য দিয়ে অনুপাতগুলির সমতা আসে বলে সূত্রটিকে বিভিন্ন দ্রব্যভোগের ক্ষেত্রে পরিবর্ততার নীতিও বলে। $\frac{MU_x}{P_x} > \frac{MU_y}{P_y}$ যদি হয়, তবে y-এর তুলনায় x দ্রব্য থেকে বেশি প্রান্তিক উপযোগ বোঝায়। তখন ক্রেতা y-এর পরিমাণ কম কিনে X-এর ক্রয় বৃদ্ধি করলে তার মোট

উপযোগ বাড়ে। এই পরিবর্তনতার নীতি অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত একটি পর্বে এসে $\frac{MU_x}{P_x} > \frac{MU_y}{P_y}$ হয়, সে মোট উপযোগ সর্বাধিক করতে পারে।

৪৭.৭ ভোগকারীর উদ্বৃত্ত

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতা সূত্র থেকে মার্শাল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত উপযোগিতা সংক্রান্ত অন্য একটি ধারণার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উপরিউক্ত আলোচনা আমরা দেখেছি যে, একটি দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে একজন ক্রেতা দ্রব্যটির $MU_x = P_x$ বা X এককের প্রান্তিক উপযোগ ও তার দামের সমতার বিন্দুতে সর্বোচ্চ তৃপ্তিলাভ ও ভারসাম্য অর্জন করে। কিন্তু সমতার বিন্দুতে পৌঁছবার আগে সে প্রত্যেক এককের জন্য উপযোগ অনুযায়ী বেশী অর্থ খরচ করতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু বাজারে X দ্রব্যের প্রকৃত দাম কম হওয়ায় একই দামে সবকটি একক ক্রয় করতে পারছে। সেজন্য প্রকৃত দামে সবকটি এককের জন্য মোট ব্যয় তাঁর প্রত্যাশিত মোট উপযোগ অনুযায়ী সম্ভাব্য মোট ব্যয় থেকে বাজার দামে দ্রব্যটির জন্য প্রকৃত ব্যয় বিয়োগ করে পাওয়া যায়। মনে রাখতে হবে, টাকায় ইউটিল মাপা হচ্ছে এবং টাকার উপযোগ অপরিবর্তিত থাকছে। চলতি একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, ৩০ টাকা দিয়ে একটি জিনিস কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বাজারে গিয়ে যদি ২০ টাকা ব্যয় করে প্রকৃত দামে সেটি কিনতে পারে, তবে তার ভোগোদ্বত্তের পরিমাপ হবে ১০ টাকার সমান। একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও তার বাজার দামের সমতার বিন্দু থেকে ঐ দ্রব্যের চাহিদা রেখার উপরের দিকে ত্রিভুজসদৃশ অংশটি এই উদ্বৃত্তের পরিমাণ বোঝায়। নিচের ৪৭.৩ রেখাচিত্রে চাহিদা রেখা দিয়ে অংশটি দেখানো হ'ল।

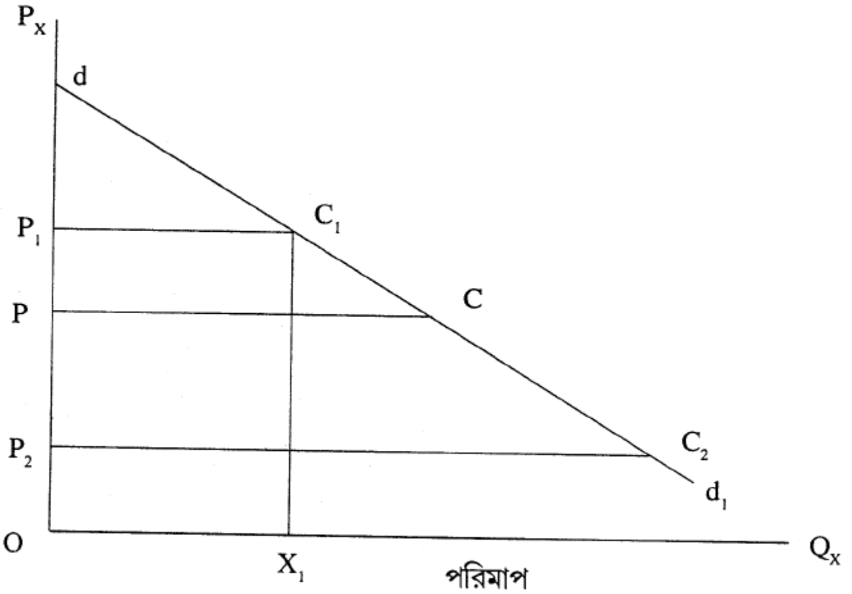

রেখাচিত্র ৪৭.৩ ঃ ভোগোদ্বৃত্ত ও দামের সঙ্গে সম্পর্ক

রেখাচিত্রে dd' চাহিদা রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম অনুযায়ী x-এর প্রকৃত দাম ও তার বিভিন্ন একক থেকে পাওয়া প্রান্তিক উপযোগিতার সমতার বিন্দুগুলি নিয়ে গঠিত হয়েছে। উল্লম্ব অক্ষে

P_1, P ও P_2 বিন্দুগুলি প্রকৃত দাম বোঝাচ্ছে। dd' রেখার ওপর C_1, C এবং বিন্দুগুলি $P_x = Mu_x$-এর বিন্দু এখানে টাকার প্রান্তিক উপযোগ স্থির ধরা আছে। যখন প্রকৃত দাম P_1 এবং ক্রয়ের পরিমাণ p_1c_1 তখন প্রত্যাশিত মোট তৃপ্তির পরিমাপ Odc_1x_1 কিন্তু প্রকৃতি দাম অনুযায়ী মোট ব্যয় $Op_1C_1X_1$ কাজেই ভোগোদ্বৃত্ত সম্ভাব্য মোট তৃপ্তি প্রকৃত ব্যয়।

অথবা, $Odc_1x_1 - Op_1c_1x_1 = p_1dc_1$ ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল। ৪৭.৩ রেখাচিত্রে আর একটি বিষয়ও স্পষ্ট। p_x বৃদ্ধি পেলে উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমে এবং p_x কমলে ঐ পরিমাণ বাড়ে। উল্লম্ব অক্ষের p, p_1 বা p_2 দাম ধরে c,c_1 বা c_2 সমতার বিন্দুগুলির সঙ্গে যুক্ত করলে dd_1 চাহিদা রেখার নিচে ত্রিভুজ আকৃতিবিশিষ্ট অংশগুলির ক্ষেত্রফল হ্রাস বা বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ দাম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত তৃপ্তির পরিমাপও পরিবর্তিত হয়।

৪৭.৮ মার্শালীয় তত্ত্বের অনুমান ও দুর্বলতা

মার্শাল প্রদত্ত ব্যাখ্যার অনুমানগুলিই তত্ত্বটির প্রধান দুর্বলতা। এসব অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় অনুমানগুলি viii অংশে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণাটি ব্যাখ্যার সময় আলোচনা করা হয়েছে। মানসিক উপযোগিতার পরিমাপ যোগ্যতা ও অর্থের অপরিবর্তিত প্রান্তিক উপযোগিতা অনুমান দুটি তার মধ্যে প্রধান। পরবর্তীকালে Pareto-Edgeworth-Hicks-Allen প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ক্রমবাচক উপযোগিতা বা নিরপেক্ষতা রেখার ব্যবহার করে ভোগকারীর চাহিদা তত্ত্বকে আরও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই আধুনিক ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বটি পরবর্তী এককে বিশ্লেষণ করা হবে।

৪৭.৯ সারাংশ

ভোগকারীর চাহিদা তত্ত্বের বিশ্লেষণ যে-দুটি মূলস্রোতে প্রবাহিত, তাদের অপেক্ষাকৃত পুরানো হলো মার্শালের পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্ব। ভোগ বা তৃপ্তি মানসিক ধারণা হলেও অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য ধরে মার্শাল একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা ও সেগুলি যোগ করে দ্রব্যটির ভোগ থেকে প্রাপ্ত মোট উপযোগিতার হিসাব করেছেন। একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ থেকে ব্যক্তি ক্রমশ যে বাড়তি উপযোগ পায়—প্রান্তিক উপযোগ—ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু দ্রব্যটির মোট উপযোগ বৃদ্ধি পায় ক্রমহ্রাসমান হারে। মোট ও প্রান্তিক উপযোগের ধারণার পৃথক বিশ্লেষণ দিয়েই আধুনিক অর্থনীতিবিদরা হীরে ও জলের মূল্যের মধ্যে 'আপাত বিরোধ' সমস্যাটির সমাধান করেছেন। যোগান খুব কম বলে হীরের প্রান্তিক উপযোগ জলের তুলনায় খুব বেশি। ক্রেতা প্রান্তিক উপযোগের সমান দাম দেয় বলেই হীরার উচ্চমূল্য। অন্যদিকে চাহিদার মূলে ভোগের ইচ্ছা থাকলেও ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে অর্থনৈতিক তাৎপর্য থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত আয় ব্যয় করে একজন একটি দ্রব্যের ক্রয়ক্ষমতা না থাকলে অর্থনৈতিক তাৎপর্য থাকে না। নির্দিষ্ট সময়ে সীমিত আয় ব্যয় করে একজন একটি দ্রব্যের কত একক কিনবে সেটাই দ্রব্যটির চাহিদারেখা। একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও তার দামের সমতার বিন্দুই চাহিদারেখার গঠনের মূলে। এভাবে একাধিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন ভোগকারী সর্বাধিক উপযোগ লাভের উদ্দেশ্যে এমনভাবে তাঁর আয় বিলি করবে যাতে প্রতিটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও দামের অনুপাত সর্বক্ষেত্রে সমান হয়। সীমিত আয় একাধিক দ্রব্য ক্রয়ে এরকমভাবে ব্যয় করলে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ নিশ্চিত হয়। এ নিয়মটি ভোগের

ক্ষেত্রে পরিবর্ততার নীতি বা সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত।

মার্শালের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার তত্ত্ব থেকে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত তত্ত্বটিও পাওয়া যায়। একটি দ্রব্যের প্রকৃত বাজার দাম এবং সেই দ্রব্য থেকে প্রত্যাশিত মোট উপযোগ সমান নাও হতে পারে। প্রত্যাশিত উপযোগ অর্থের পরিমাপে হিসেব করে সেই মোট উপযোগ থেকে প্রকৃত দাম দেওয়ার খরচ বাদ দিলেই উদ্বৃত্তের পরিমাপ মাপা যায়। অবশ্য অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপরিবর্তিত ধরতে হবে।

পরিমাপগত উপযোগিতা তত্ত্বের মার্শাল প্রদত্ত ব্যাখ্যার দুর্বলতাগুলি এই অংশে বলা হয়েছে। ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ধারণাটি মানসিক ব্যাপার। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাছাড়া আছে উপযোগের পরিমাপযোগ্যতা, বিশেষ করে অর্থের মানদণ্ড ইত্যাদি বিষয়গুলির বাস্তবতা সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদগণ সন্দিহান। যদিও কেউ কেউ সরকারী কর আরোপের, একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণের কাজে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ হিসাব করতে বা এরকম কিছু কাজে ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি ব্যবহার করা যেতে পারে মনে করলেও সূক্ষ্ম বিচারে সে-সব প্রয়োগ অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে। তাছাড়া ভোগকারীর চাহিদা-তত্ত্বের আলোচনায় মার্শাল ব্যবহৃত অনুমানগুলি ছাড়াও চাহিদার যুক্তিপূর্ণ ও বাস্তব ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে বলে ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বের প্রবক্তাগণ মনে করেন। ক্রমবাচক তত্ত্বটিই পরবর্তী এককের আলোচ্য বিষয়।

৪৭.১০ অনুশীলনী

১। ভোগের ইচ্ছা, প্রয়োজন ও চাহিদার পার্থক্য মনে রাখুন।

২। মোট ও প্রান্তিক উপযোগের সম্পর্কটি লক্ষ্য করুন।

৩। প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমহ্রাসমান বলতে কী বোঝায়?

৪। সংতৃপ্ত উপযোগের বিন্দুটি কি?

৫। জল ও হীরের দামের পার্থক্যের ধাঁধা হয় কেন?

৬। ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটি ও প্রকৃত বাজার দামের সঙ্গে তার সম্পর্কটি বিচার করুন।

৭। উপযোগিতা কী পরিমাপযোগ্য?

৮। একাধিক দ্রব্যের জন্য ভোগকারীর নির্দিষ্ট আয় কী সূত্রে ও কী উদ্দেশ্যে ব্যয় হয়?

সমপ্রান্তিক বিধিটি লক্ষ্য করুন এবং সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ লক্ষ্যটি মনে রাখুন।

৯। পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বের মূল দুর্বলতাগুলি মনে রাখুন। ৩ ও সারাংশের শেষ অনুচ্ছেদ দেখুন।

একক ৪৮ ◆ চাহিদার ভিত্ত ঃ ক্রমবাচক উপযোগিতা বা নিরপেক্ষতা তত্ত্ব ঃ

গঠন

৪৮.০ উদ্দেশ্য

৪৮.১ পছন্দক্রম, তৃপ্তির স্তর ও নিরপেক্ষতা

৪৮.১.১ পছন্দক্রম

৪৮.১.২ নিরপেক্ষতা রেখা

৪৮.১.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততা

৪৮.১.৪ নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্য

৪৮.২ বাজেট রেখা

৪৮.৩ ভোক্তার ভারসাম্য ক্রয়

৪৮.৪ আয় প্রভাব ঃ এঞ্জেল রেখা

৪৮.৫ পরিবর্ত প্রভাব, দাম প্রভাব ও চাহিদা রেখা

৪৮.৫.১ পরিবর্ত প্রভাব

৪৮.৫.২ দাম প্রভাব

৪৮.৫.৩ দাম প্রভাব ও চাহিদা রেখা

৪৮.৬ ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বের অনুমান ও মূল্যায়ন

৪৮.৭ সারাংশ

৪৮.৮ অনুশীলনী

৪৮.০ উদ্দেশ্য

প্যারেটো-হিক্স্-এজওয়ার্থ প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ ভোগকারীর চাহিদা তত্ত্বটিকে পরিমাণগত উপযোগিতার বদলে ক্রমবাচক বা উপযোগিতা বা পছন্দের ক্রম অনুযায়ী নিরপেক্ষতা তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ভোগকারীর পছন্দক্রম (choice or preference) বিচারের সময় মানসিক উপযোগিতার পরিমাপ, বা দুটি এককের মধ্যে উপযোগের পার্থক্য, বিচারের প্রয়োজন হয় না। তাছাড়া মার্শালের ব্যাখ্যায় অন্যান্য যে কয়টি অবাস্তব ও বিতর্কিত অনুমান ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোও অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আলোচ্য বিভাগে আমরা চাহিদা তত্ত্বের ভিত্তি হিসাবে ভোগকারীর পছন্দক্রম ও নিরপেক্ষতার ধারণা বিশ্লেষণ করে তা থেকে

চাহিদারেখা নির্ধারণ করার চেষ্টা করবে। এ বিশ্লেষণের বিভিন্ন পর্যায়ে চাহিদা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধ্যান-ধারণার উপর আলোকপাত করতে পারবো। মানসিক উপযোগের পরিমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করেও পছন্দতত্ত্বে চাহিদা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির আলোচনা মার্শালের তত্ত্বের তুলনায় অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে ভোগকারীর চাহিদা তত্ত্বের আলোচনায় পছন্দ তত্ত্বটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত।

৪৮.১ পছন্দক্রম, তৃপ্তির স্তর ও নিরপেক্ষতা

৪৮.১.১ পছন্দক্রম

দ্রব্য ভোগ করে তৃপ্তিলাভ হয় বলে তার চাহিদার সৃষ্টি হয়। তবে তৃপ্তির মানসিক অনুভূতি বলে স্পষ্টভাবে মাপা যায় না, কিন্তু বিভিন্নদ্রব্য সমন্বয় থেকে বেশি বা কম তৃপ্তিদায়ক সমন্বয়গুলিকে পরপর সাজালে পছন্দক্রম বোঝা যায়। কিছু সমন্বয় অন্য সমন্বয়গুলি থেকে কম তৃপ্তিদায়ক, আবার অন্য কিছু সমন্বয় থেকে বেশি তৃপ্তিদায়ক হয়, এই কম বা বেশি তৃপ্তির মাত্রা বুঝতে প্রত্যেক দ্রব্য সমন্বয়ে প্রতিটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক থেকে প্রাপ্ত উপযোগ পরিমাপের প্রয়োজন হয় না। শরীরচর্চার সময় মাঠে বেশ কিছুসংখ্যক মানুষকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেই তাঁদের উচ্চতার তারতম্য বোঝা যায়। এজন্য প্রত্যেকের উচ্চতা আলাদাভাবে মাপার দরকার হয় না। বিভিন্ন দ্রব্য সমন্বয় থেকে তৃপ্তির স্তরক্রম সাজানোর ক্ষেত্রেও তেমনি উপাযোগিতা বা তৃপ্তির আশা করে, সেসব সমন্বয়কে সে কম তৃপ্তিদায়ক অন্য সমন্বয় থেকে বেশি পছন্দ করবে। আবার, দ্রব্যের কিছু সমন্বয় থেকে সে যদি সমান তৃপ্তি বা উপযোগ লাভের প্রত্যাশা করে, তবে সেসব সমতৃপ্তিদায়ক সমন্বয়গুলির প্রসঙ্গে নিরপেক্ষ থাকে, কারণ এরকম প্রতিটি সমন্বয় সমতৃপ্তিদায়ক। উদাহরণ হিসেবে X ও Y দুটি দ্রব্যের A এবং B নামক দুটি সমন্বয়ের মধ্যে তৃপ্তির তারতম্য বিচার করতে তিনটি সমভাব্য পছন্দ সম্পর্কের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

এক ঃ $A > B$,

দুই ঃ $A < B$,

এবং তিন ঃ $A = B$।

প্রথম দুটি ক্ষেত্রে সমন্বয় দুটির মধ্যে আক্ষরিক অর্থেই পছন্দের সম্পর্ক বা indifference relataion কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে সমন্বয় দুজির নিরপেক্ষতার সম্পর্ক বা indifference relation নির্দেশিত হয়েছে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, আক্ষরিক অর্থে প্রকৃতপক্ষে এগুলি একই পছন্দ বা নিরপেক্ষতার সম্পর্ক দু'টি পৃথক নয়, প্রকৃত পক্ষে এগুলি একই পছন্দের (Choice) দুটি দিক মাত্র। একাধিক দ্রব্যসমন্বয় থেকে পছন্দ ও নিরপেক্ষতার সম্পর্ক ধরে তৃপ্তির স্তরক্রম সাজানো চলে। উপযোগ পরিমাপ না করেও একজন স্বাভাবিক ভোগকারীর এরকম দ্রব্য নির্বাচনের কাজই ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য। এখানেও অবশ্য মনস্তত্ত্বের উপর কিছুটা নির্ভরতা রয়ে গেছে।

৪৮.১.২ নিরপেক্ষতা রেখা

দ্রব্য নির্বাচনে একজন ভোগকারীর পছন্দ ও নিরপেক্ষতা বিচার করে তৃপ্তির স্তর বিন্যাস প্রক্রিয়া নিচের রেখাচিত্রে আরও স্পষ্ট করা হ'ল। ৪৮.১ রেখাচিত্রে ধরা হয়েছে যে ব্যক্তি X ও Y দুটি দ্রব্য নিয়ে নিজ পছন্দক্রম সাজাচ্ছে। অনুভূমিক OX অক্ষে X দ্রব্যটির পরিমাণ এবং উল্লম্ব OY অক্ষে X দ্রব্যটির বিভিন্ন পরিমাণ ধরা হয়েছে। দুই অক্ষ দ্বারা চিহ্নিত জায়গায় ঐ দুটির দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয় হতে পারে। কোনও

সমন্বয়ে Y বেশি কিন্তু X কম পরিমাণ, আবার অন্য সমন্বয়ে Y কম কিন্তু X বেশি।

রেখাচিত্রে Qy ও Qx অক্ষ দুটি দিয়ে চিহ্নিত ক্ষেত্রটিতে দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয় হতে পারে। আমরা এখানে কয়েকটি সমন্বয় যেমন A, B, C উল্লেখ করেছি। পছন্দের সম্পর্ক বিচারে A বিন্দুতে 6 একক Y এবং 9 একক x দ্রব্যের সমন্বয় ঘটেছে। কিন্তু নিচে, B বিন্দুতে 5 একক Y ও 6 একক, X, C বিন্দুতে 6একক

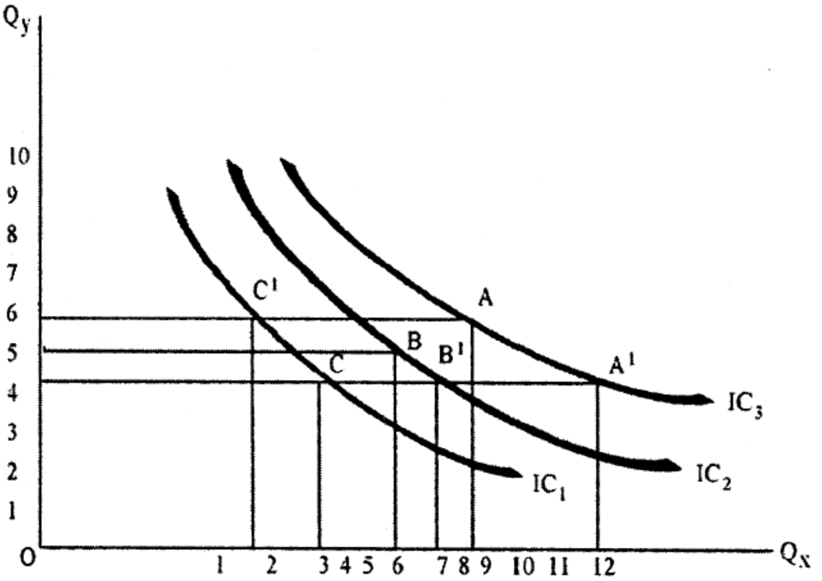

রেখাচিত্র ৪৮.১ ঃ পছন্দ ও নিরপেক্ষতার সম্পর্ক

Y ও 2 একক X-এর সমন্বয় দেখাচ্ছে। A বিন্দুতে দুটি দ্রব্যেই বেশি এককের সমন্বয়, কিন্তু নিচে B বিন্দুতে দুটিরই A-র তুলনায় কম পরিমাণ X এবং Y দ্রব্যের সমন্বয় ঘটেছে। C বিন্দুর সমন্বয়টি আরও কম একক দ্রব্য পাওয়া যাচ্ছে। ভোগকারী বিচক্ষণ, সে কম থেকে বেশি দ্রব্যের সমন্বয় থেকে অধিক তৃপ্তি পায় বলে A>B এবং B>C পছন্দের সম্পর্ক নির্দেশ করে। এভাবে বেশি বা কম তৃপ্তির মাত্রা অনুযায়ী স্তরক্রম সাজানোকেই পছন্দের স্তরক্রম বা scales of preference বলে। C অপেক্ষা B এবং B অপেক্ষা A বিন্দু অধিক তৃপ্তির স্তর নির্দেশ করছে। লক্ষণীয় যে, দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতা না মেপেও এভাবে বেশি বা কম তৃপ্তির স্তরক্রম সাজানো যায়। এবার আসা যাক সমতৃপ্তি বা নিরপেক্ষতার সম্পর্কের কথায়। আগেই বলা হয়েছে যে, A ও B দুটি সমন্বয় থেকে তৃপ্তির মাত্রা যদি সমান হয় তবে এ দুটি সমতৃপ্তির স্তরে বলে এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায়। ৪৮.১ রেখাচিত্রে A এবং A_1, B এবং B_1 ও C এবং C_1 সমন্বয় বিন্দুগুলির প্রতিটি জোড় (অর্থাৎ A এবং B এবং B_1 ইত্যাদি) তৃপ্তির বিভিন্ন স্তরে ভোগকারীকে সমান তৃপ্তি দান করে। কাজেই $A = A_{1,}$ $B = B_1$ এবং $C = C_1$ সমন্বয় বিন্দুগুলির এক একটির জোড়ার মধ্যে নিরপেক্ষতার সম্পর্ক বর্তমান। রেখাচিত্রে AA_1, BB_1 ইত্যাদি সমন্বয় বিন্দুগুলিকে রেখা দ্বারা যুক্ত করে সম্প্রসারিত করলে আমরা IC_3, IC_2, IC_1 নামের বিভিন্ন তৃপ্তির স্তরসূচক নিরপেক্ষতা রেখা পাই। IC_1, IC_2 থেকে উপরের দিকে গেলে তৃপ্তির স্তর বৃদ্ধি পায়। কাজেই, $1C_1$ রেখার ওপর C_1,C ইত্যাদি যতগুলি সমন্বয় বিন্দুই হোক না কেন, প্রত্যেকটি থেকে প্রাপ্ত তৃপ্তি একই IC_1 স্তরের। একইভাবে উপরের IC_2 রেখার ওপর BB_1 ইত্যাদি যতগুলি সমন্বয় বিন্দু হোক না কেন,

প্রত্যেকটির তৃপ্তি একই IC_2 স্তরের। এভাবে যতই উপরের দিকের IC রেখায় যাওয়া যাবে ততই বেশি তৃপ্তির স্তর হবে। নিচের রেখা থেকে উপরের রেখায় যে কোনও বিন্দু বেশি তৃপ্তির বলে প্রত্যেকটি রেখা একটি পৃথক তৃপ্তির স্তর দেখায়। তাই দুটি নিরপেক্ষতা রেখায় অর্থাৎ তৃপ্তির দুইটি স্তরে দুটি পৃথক দ্রব্য সমন্বয়ের মধ্যে রয়েছে strict preference relation বা ঋজু পছন্দের সম্পর্ক। কিন্তু একই IC রেখার ওপর দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়ের মধ্যে ভোগকারীর রয়েছে নিরপেক্ষতার সম্পর্ক। যে-সব সমন্বয় থেকে ভোগকারী সমান তৃপ্তি পায়, সে-সব বিন্দুগুলি একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে আমরা নিরপেক্ষতা রেখা পাই। রেখাচিত্রে IC_1 বা IC_2 এরকম নিরপেক্ষতা রেখা। অন্যভাবে বলা যায় যে, একটি নিরপেক্ষতা রেখা হ'ল দুটি দ্রব্যের সমতৃপ্তির সমন্বয় বিন্দুগুলির সঞ্চারপথ।

নিরপেক্ষতা রেখাগুলি রেখাচিত্রের IC রেখাটির মতো দূরত্বসম্পন্ন না হয়ে পরস্পরের কাছাকাছি ঘন সন্নিবিষ্টও হতে পারে। A,B বা IC দ্রব্যসমন্বয়গুলির মতো যত বেশি সংখ্যক সমন্বয় গঠন করা হবে, ততই IC রেখাগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে তৃপ্তির স্তরের ব্যবধান কমিয়ে দেবে। তবে একটি রেখা থেকে অন্য একটি রেখায় তৃপ্তির কিছু ব্যবধান থাকবেই। IC রেখাগুলির একপ্রান্তে যে সংখ্যাগুলি লেখা হয়েছে, সেগুলির পরিমাণগত তাৎপর্য নেই, শুধু কম বা বেশি বোঝাচ্ছে। কিন্তু, একটি থেকে অন্যরেখায় তৃপ্তি কত বেশি বা কত কম, সেটা বোঝায় না। এজন্য তৃপ্তির স্তরের সূচক 1,2,3 IC রেখাগুলির সংখ্যা 5,7,20 ইত্যাদিও ধরা চলে। তবে উচ্চতর কোনও IC রেখা নিচের যে কোনও IC রেখার স্তরসূচক থেকে অবশ্যই একটি বড় সংখ্যা দিয়ে বোঝাতে হবে।

আর একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। রেখাচিত্রে প্রতিটি IC রেখায় CC_1, BB_1, বা AA_1 নামক মাত্র দুটি করে সমন্বয় বিন্দু দেখানো হয়েছে অথচ প্রতিটি রেখা ধারাবাহিক ও মসৃণ রেখা। আসলে দু'টি দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয় বিন্দু হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমতৃপ্তির সমন্বয়বিন্দুগুলি পরস্পরের খুব কাছাকাছি হবে। ঐসব বিন্দুগুলি মিলে এক একটি মসৃণ IC রেখা গড়ে তুলবে। এখানে বিশ্লেষণের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে IC রেখায় অল্প কয়েকটি করে সমন্বয় বিন্দু ধরা হয়েছে। সংক্ষেপে বলা হয় যে, নিরপেক্ষতা রেখাগুলি ধারাবাহিক বা নিশ্ছিদ্র।

নিরপেক্ষতা রেখার মানচিত্র ঃ

X ও Y এর বিভিন্ন সমন্বয় নিয়ে অনেকগুলি তৃপ্তির স্তরের সূচক নিরপেক্ষতা রেখাগুলি একই রেখাচিত্রে সাজালে আমরা একটি নিরপেক্ষতার মানচিত্র indifference map পাই। ৪৮.১ রেখাচিত্রের আরও কয়েকটি একই আকৃতির নিরপেক্ষতা রেখা আঁকলে এবং কম বা বেশি তৃপ্তির মাত্রা অনুযায়ী ছোট বা বড় সংখ্যা লিখলে প্রদত্ত রেখাচিত্রটিকেও একজন ভোগকারীর নিরপেক্ষতার মানচিত্র বলে বর্ণনা করা যাবে। প্রতিটি বিন্দু সমান উপযোগিতাসম্পন্ন বলে নিরপেক্ষতা রেখাকে সমতৃপ্তির বা iso-utility curve বা রেখাও বলা হয়।

৪৮.১.৩ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তা

ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বে Hicks পরিমাণগত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার পরিবর্তে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার ধারণাটি ব্যবহার করেছেন। X ও Y দুটি দ্রব্যের ব্যবহার থেকে ভোগকারীর নিরপেক্ষতা রেখা ৪৮.১ রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে। একটি IC ধরে ক্রমশ নিচের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই Y-এর কিছু একক ত্যাগ করে X-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হয়। Y-এর ত্যাগ ভোগকারীর Y থেকে প্রাপ্ত উপযোগিতা যতটা হ্রাস করে, X-এর ব্যবহার বৃদ্ধি করে সেই ক্ষতি পূরণ করতে হয়। অন্যথায় নিরপেক্ষতা রেখায় সমতৃপ্তির স্তর বজায় রাখা অসম্ভব। দুটি দ্রব্যের সমন্বয়

থেকে একটি দ্রব্যের ভোগ কমে গেলেও তৃপ্তিও কমবে। অপরিবর্তিত তৃপ্তি লাভ করতে একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে লাভ করতে অপর দ্রব্যটির কিছুটা ছাড়তে হবে। দ্রব্যের এক একক ছাড়লে X-এর যে একক সংখ্যা বাড়িয়ে ক্ষতিপূরণ করতে হয় তাকেই প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হাল বা marginal rate of substitution সংক্ষেপে MRSxy বলে। IC রেখার ঢাল থেকে এই পরিবর্তনশীলতার হার বোঝা যায়।

রেখাচিত্রে ভোগকারী Y এর পরিবর্তে X দ্রব্য ব্যবহার করছে। Y-এর হ্রাস Y এবং X-এর বৃদ্ধির একক +ΔX দিয়ে প্রকাশ করলে ৪৮.২ রেখাচিত্রের A থেকে S বিন্দুতে Y-এর ত্যাগ = –Δy এবং X-এর বৃদ্ধি = +ΔXA থেকে S বিন্দুর ঢাল,

$$\frac{AR}{RS} = \frac{-\Delta Y}{+\Delta X} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_x}{MU_y}$$

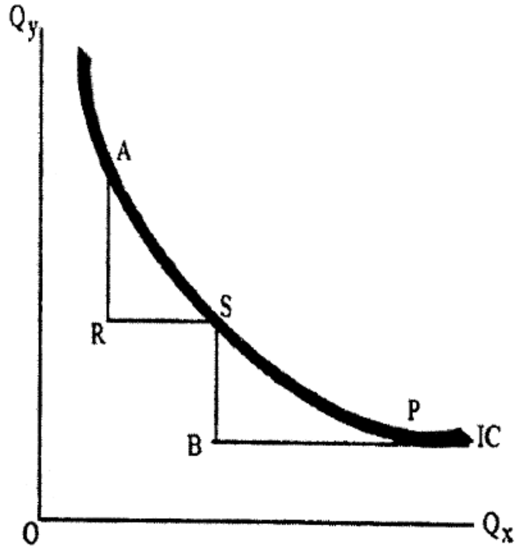

রেখাচিত্র ৪৮.২ ঃ ক্রম হ্রাসমান পরিবর্তনীয়তার হার

এভাবে Y-এর হ্রাসের ফলে ত্যাগস্বীকার ও X-র ক্ষতিপূরণ যতই চলতে থাকে, ততই ঢালটি কমতে থাকে। Y কমতে থাকায় তার প্রান্তিক উপযোগ বাড়ে, এবং X-এর একক বৃদ্ধি পাওয়ায় তার প্রান্তিক উপযোগ (MUx) কমতে থাকে। IC রেখার ঢাল ঋণাত্মক বলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ এর আগে চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। কাজেই ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন IC রেখা থেকে রেখা থেকে MRxy বা পরিবর্ততার হার ক্রমহ্রাসমান বোঝা যায়।

৪৮.১.৪ নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্য

X ও Y দুটি দ্রব্যের সম-উপযোগসম্পন্ন সমন্বয়গুলি নিয়ে গঠিত নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্টগুলি নিচে উল্লেখ করা হবে। তবে ক্রমবাচক তত্ত্বের মূল স্বতঃসিদ্ধ হ'লো যে, অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় একজন স্বাভাবিক ভোগকারীর পছন্দ-সম্পর্কে 'সংক্রমিতা' '(Transitivity)' থাকতে হবে। অর্থাৎ তিনটি বিকল্প দ্রব্য সমন্বয়ের ক্ষেত্রে প্রথম জোড়ের মধ্যে (অর্থাৎ A এবং B) ভোগকারীর যে পছন্দ সম্পর্ক (অর্থাৎ > অথবা =) বর্তমান, দ্বিতীয় জোড়ের (ধরা যাক B এবং C) মধ্যেও যদি সেই একই পছন্দ সম্পর্ক বর্তমান থাকবে। অর্থাৎ, যদি সে A,B,C তিনটি সমন্বয়ের মধ্যে তৃপ্তির দিক থেকে A > B এবং B > C মনে করে, তবে নিশ্চয়ই A > C হবে। ভোগকারীর আচরণের এই সংক্রমী ক্রমবাচক তত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত।

এই প্রসঙ্গে নিরপেক্ষতা রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি হ'লো

প্রথম বৈশিষ্ট্য ঃ নিরপেক্ষতা রেখাচিত্রের বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী বা ঋণাতমক ঢালসম্পন্ন। পূর্ববর্তী 'গ' অংশে দুটি দ্রব্যের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার ব্যাখ্যায় এ বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। দুটি স্বাভাবিক বিকল্প দ্রব্য হ'লে একটির পরিমাণ হ্রাস পেলে অপরটির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয় যাতে সম-উপযোগিতা পাওয়া যায়। কাজেই C রেখা হ'লো নিম্নমুখী ৪৮.১ রেখাচিত্রে আঁকা বক্ররেখার

মতো। অন্যভাবে বলা যায় যে নিম্নমুখী না হলে IC রেখা ৪৮.৩ রেখাচিত্রের AC রেখার মতো আনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল; অথবা AB রেখার মতো উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল অথবা AD রেখার মতো উর্ধ্বমুখী হতে পারে। আমরা ভোগকারীর যুক্তিসম্মত সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে, সে কম থেকে বেশি পরিমাণ দ্রব্যের সমন্বয় পছন্দ করবে। রেখাচিত্রে D > A বলে সমন্বয় দুটির মধ্যে ভোগকারীর নিরপেক্ষতার সম্পর্ক হতে পারে না। তৃপ্তির বিচারে বলা যায় যে, উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল A ও B দুটি সমন্বয় বিন্দুতে B > A, কারণ A-র তুলনায় B সমন্বয়ে সমপরিমাণ X থাকলেও Y দ্রব্যের পরিমাণ বেশি। কাজেই, দুটি সমন্বয় থেকে সমান উপযোগিতা হতে পারে না। একই সূত্রে বিচার করলে A ও C সমন্বয় দুটিও সমতৃপ্তির হতে পারে না। AB, AD বা AC রেখাগুলি থেকে নিরপেক্ষতার সম্পর্ক পাওয়া যায় না। কাজেই এই রেখা নিম্নমুখী হবে।

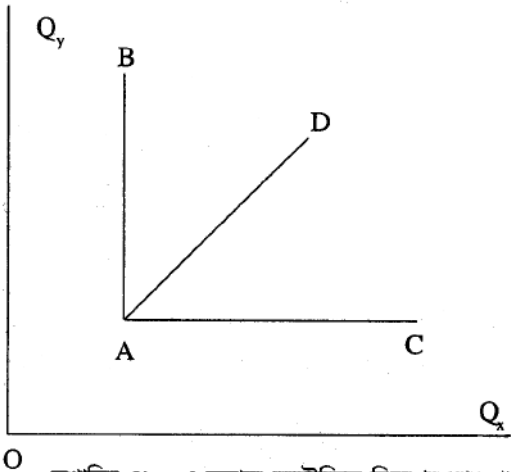

রেখাচিত্র ৪৮.৩ ঃ সম্ভাব্য অযৌক্তিক নিরপেক্ষতারেখা

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ IC রেখা উৎসবিন্দুর দিকে উত্তল বা convex, ৪৮.১ রেখাচিত্রে IC_1, IC_2 বা IC_3 রেখাগুলির মতো। ক্রমহ্রাসমান MRSxy-এর ধারণাটিতে দেখেছি যে, দুটি পরিবর্তন দ্রব্যের মধ্যে একটির পরিমাণ কমালে, তৃপ্তির স্তর অপরিবর্তিত রাখতে, অপর দ্রব্যটির পরিমাণ কয়েক একক বৃদ্ধি করতে হয়। X ও Y দুটি দ্রব্যের হ্রাসবৃদ্ধি 'Δ' দিয়ে প্রকাশ করলে Y এর পরিবর্তে X এর ব্যবহারের অনুপাতটি হলে $\frac{\Delta Y}{\Delta X}$ বা উভয় দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হার (MRSxy)। দ্রব্য দুটি পরস্পরের অসম্পূর্ণ বিকল্প বলে সমপরিমাণ Y-এর বদলে ক্রমশ বেশি একক X পেতে হবে। অর্থাৎ পরিবর্ততার অনুপাতগুলি হ্রাস পেতে থাকবে। তখন IC রেখা উৎস বিন্দুর দিকে উত্তল হয়ে যাবে।

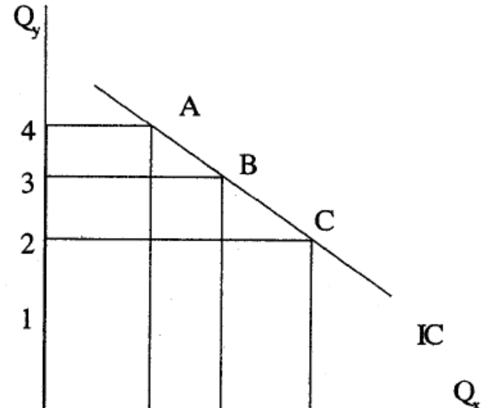

রেখাচিত্র ৪৮.৪ ঃ সমহার পরিবর্তনীয়তায় উত্তল IC রেখা

অবশ্য দ্রব্যদুটি পরস্পরের সম্পূর্ণ বিকল্প (perfect substitutes) হলে MRSxy সমহারে পরিবর্তিত হয় এবং IC রেখা উৎসবিন্দুর দিকে উত্তল হলেও বক্ররেখা না হয়ে ৪৮.৪ রেখাচিত্রের IC রেখাটির মতো সরলরেখা হবে। MRSxy ক্রমহ্রাসমান ধরে ৪৮.১ রেখাচিত্রের IC রেখার সঙ্গে ৪৮.৩ চিত্রে IC রেখাটির পার্থক্য স্পষ্ট করতে অনেকে প্রথম IC রেখাটিকে কঠোরভাবে উত্তল বা 'Strictly Convex' বলে উল্লেখ করে থাকেন। সম্পূর্ণ বিকল্প দ্রব্য হিসেবে ব্রিটানিয়া কোম্পানির ম্যারি ও অন্যান্য কোম্পানির একই বিস্কুটের উদাহরণ দেওয়া হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ বিকল্প দ্রব্য পাওয়া যায় না বললেই চলে। কাজেই IC রেখাও সরলরৈখিক না হলো কঠোরভাবে কিছুটা উত্তল হয়ে থাকে।

আবার, দুটি দ্রব্য যদি পরস্পরে পরিপূরক হয় তবে IC রেখা 'L' বা সমকোণ আকৃতির হতে পারে। যেমন একজন ভোগকারী প্রতি কাপ চায়ে দুই চামচ চিনি নেন। ২ কাপ চা খেলে তিনি ৪ চামচ চিনিই পছন্দ করবেন; তিন চামচও নয় বা ৫ চামচও নয়। এক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের ব্যবহার বেশি হলে সঙ্গে অপরটিরও ব্যবহার একটি নির্দিষ্ট হার (a : b) বৃদ্ধি করতে হয়। সেক্ষেত্রে ৪৮.৪ রেখাচিত্রের IC রেখা দিয়ে পরিপূর্ণ পরিপূরক উপযোগিতা বোঝাতে হবে।

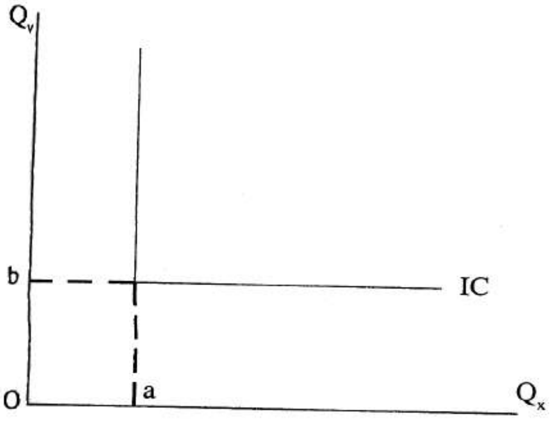

রেখাচিত্র ৪৮.৫ ঃ পরিপূরক দ্রব্যের IC রেখা

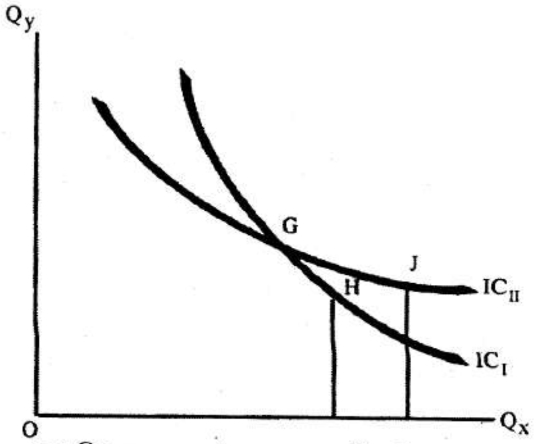

রেখাচিত্র ৪৮.৬ ঃ পরস্পর ছেদ্‌কারী দুটি IC রেখায় পছন্দের অসঙ্গতি বা স্ববিরোধ

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ঃ দুটি IC রেখা কখনও পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। ছেদ করলে ঘটনাটি ভোগকারীর আচরণের অসঙ্গত বা স্ববিরোধ বোঝায়। ৪৮.৫ রেখাচিত্রে এ-অসঙ্গতিটি দেখানো হল।

৪৮.৫ রেখাচিত্রে IC_1 ও IC_{11} রেখা দুটি পরস্পরকে G বিন্দুতে ছেদ করেছে। IC_1 রেখায় GH দুটি সমন্বয় বিন্দুতে ভোগকারী সমতৃপ্তি পায়। আবার, G ও J দ্রব্য সমন্বয় বিন্দু দুটি উচ্চতর IC_{11} নিরপেক্ষতা রেখায় আছে এবং এ দুটি সমন্বয় থেকেও ভোগকারী সমান তৃপ্তি লাভ করছে। সুতরাং মানতেই হয় যে, H ও J বিন্দু দুটিও একই রেখায় অবস্থিত এবং সমতৃপ্তির, H=J। কিন্তু গোড়াতেই আমরা ধরেছি যে, IC_1 এবং IC_{11} দুটি পৃথক তৃপ্তির স্তর বোঝাচ্ছে। দুটি পৃথক তৃপ্তির স্তর এক বিন্দুতে এসে হঠাৎ পরস্পরের সমান হয়ে উঠতে পারে না; ৭ এবং ৫ সংখ্যা দুটি যেমন ৭ = ৫ হতে পারে না। 'যাহা বাহান্ন তাহাই তিপ্পান্ন' উক্তিটিতে যে অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ উপস্থিত, দুটি IC রেখার পরস্পরকে ছেদ করলেও সেই একই পরিস্থিতি দেখা দেয়। কাজেই দুটি নিরপেক্ষতা রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না।

৪৮.২ বাজেট রেখা

X ও Y দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয়গুলিকে পছন্দক্রম ও নিরপেক্ষতার সম্পর্ক অনুযায়ী সমতৃপ্তি রেখার মানচিত্রে সাজানো হলেও কোন্ দ্রব্যের কতটা একজন সীমিত আয় ও নির্দিষ্ট রুচি, পছন্দের ভোগকারী চাহিদা করবে জানতে প্রয়োজন তাঁর ক্রয়ক্ষমতার বা আয় ও দুটি দ্রব্যের দাম (Px, Py) সম্পর্কিত তথ্য।

সে কম না বেশী তৃপ্তির স্তরে কোন্ দ্রব্যের কতটা চাহিদা করে সর্বোচ্চ তৃপ্তির স্তর লাভ করবে জানতে ক্রেতার আয় বা M এবং দ্রব্যদুটির দাম জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। বিষয়টি নিচের ৪৮.৭ রেখাচিত্রে দেখানো হ'লো।

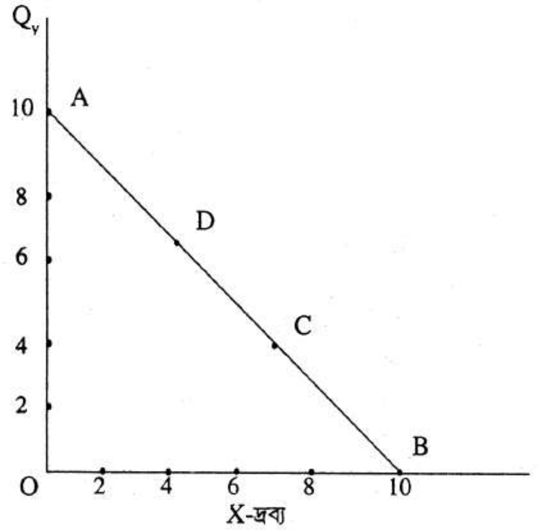

রেখাচিত্র ৪৮.৭ ঃ বাজেট বা ভোগ-সম্ভাবনা রেখা

বাজারে X দ্রব্যের দাম Px এবং Y এর Py এবং ক্রেতার সীমিত আয়, M=Rs. 100 উভয় দ্রব্যের দাম একক প্রতি ১০ টাকা এবং ক্রেতা সীমিত আয়ের পুরোটাই দ্রব্য দুটি ক্রয়ে ব্যয় করছে, কিছুই সঞ্চয় করছে না। ভোগকারী নির্দিষ্ট সময়ে M ব্যয় করে ১০ একক Y দ্রব্য কিনতে পারে। কাজেই ব্যক্তির বাজেট রেখা হলো AB। অন্যভাবে বলা যায় যে, সীমিত আয় (Rs. 100) ব্যয় করে সে $\frac{M}{Py}$ পরিমাণ দ্রব্য অথবা $\frac{M}{Px}$ পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করতে পারে। এ দুটি বিন্দু A এবং B কে সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে AB রেখাটি পাওয়া গেছে। এই রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুতে দ্রব্য সমন্বয়গুলি মোট ক্রয় হলো D বিন্দুতে 6 একক Y এবং 4 একক X C বিন্দুতে 2 একক Y এবং 8 একক X ইত্যাদি। AB রেখার উপর প্রত্যেক বিন্দুতে দুটি দ্রব্যের সমন্বয়গুলি যেমনই হোক না কেন, মোট ব্যয় Rs. 100 (=M)। এই সমন্বয় বিন্দুগুলো। AB সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। কাজেই বাজেট রেখাটিকে সমব্যয় রেখাও বলা চলে। আবার রেখাটি রোগ-সম্ভাবনা রেখাও বটে। কারণ রেখাটির প্রতিটি বিন্দুতে দ্রব্য সমন্বয় থেকে ক্রেতা সর্বোচ্চ Rs. 100 এর সমান দ্রব্য ভোগ করতে পারছে।

৪৮.৭ রেখাচিত্রের AB বাজেটরেখার ঢাল = $\frac{OA}{OB} = OA \div OB = \frac{M}{P_y} \div \frac{M}{P_x} = \frac{M}{P_y} \times \frac{P_x}{M} = \frac{M}{P_y}$

(বিঃ দ্রঃ বাজেট রেখা যেহেতু ঋণাত্মক ঢালবিশিষ্ট, তাই $\frac{P_x}{P_y}$-এর পূর্বে সাধারণত ঋণাত্মক চিত্রে দেওয়া হয়)

অর্থাৎ বাজেট রেখার দুটি দ্রব্যের দামের অনুপাত বা $\frac{P_x}{P_y} \cdot P_x$ দামে X দ্রব্য ক্রয় করতে ব্যয় = XP_x এবং Py দামে Y দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় YP_y কাজেই দুটি দ্রব্যের জন্য মোট ব্যয় $X.P_x+Y.P_y$। এখন, ক্রেতার মোট ব্যয় মোট আয়ের সমান। কাজেই বাজেট সীমার সমীকরণ ঃ

$X.P_x + Y.P_y = M$

ক্রয়ক্ষমতা সীমিত বলে ক্রেতা বাজেট রেখার আরও উপরে কোনও বিন্দুতে দ্রব্য সমন্বয় কিনতে পারবে না। আবার, সে আয় থেকে কিছু সঞ্চয় না করায় AB রেখার নিচে কোনও বিন্দুতে দ্রব্য সমন্বয় কিনতে

পারে না। সুতরাং, রুচি, পছন্দ ও আয় নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্রেতার ভোগ-সম্ভাবনা বাজেট রেখার উপর কোনও এক বিন্দুতে স্থির হবে।

বাজেট রেখার অবস্থান ঠিক কি রকম হবে তা দুটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। একটি ক্রেতার আয়, অপরটি দুটি দ্রব্যের দাম। অন্যান্য বিষয় স্থির অবস্থায় ক্রেতার আয় বাড়লে বা কমলে বাজেট রেখাও উপরের বা নিচের দিকে সরে যাবে। অন্যদিকে, শুধু একটি দ্রব্যের দামে পরিবর্তন ঘটলে বাজেট রেখার ঢাল পরিবর্তিত হবে। এ বিষয় দুটি বর্তমান বিভাগের পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

৪৮.৩ ভোক্তার ভারসাম্য ক্রয়

X, Y দুটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ক্রেতার পছন্দ তাঁর নিরপেক্ষতার মানচিত্রে প্রতিফলিত। আয় ও দুটি দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট থাকলে ক্রেতা সর্বাধিক তৃপ্তিলাভের লক্ষ্যে এমন ভাবে ব্যয় করবে যাতে উভয় দ্রব্য থেকে সর্বোচ্চ নিরপেক্ষতা রেখায় ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছতে পারে। এই ভারসাম্য বিন্দুটি পেতে আমরা নিচের ৪৮.৮ রেখাচিত্রে ভোগকারীর নিরপেক্ষতার মানচিত্র এবং তাঁর বাজেট রেখা এই চিত্রে ব্যবহার করেছি।

৪৮.৮ রেখাচিত্রে X,Y দ্রব্য দুটির দাম একক প্রতি ১০ টাকায় নির্দিষ্ট, ক্রেতার আয় ১০০ টাকা—যার সবটাই সে ঐ দুটি দ্রব্যের জন্য ব্যয় করছে। AB রেখাটি বাজেট রেখা বা দ্রব্য দুটির দামের অনুপাত বোঝাচ্ছে সে E বিন্দুতে ৫ একক y এবং 6 একক X দ্রব্য সমন্বয় ক্রয় করে ভারসাম্য লাভ করেছে।

E বিন্দুটি IC_{11} নিরপেক্ষতা রেখায়। ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতা সীমিত এবং দাম নির্দিষ্ট হওয়ায় সে উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে IC_{111} রেখায় পৌঁছতে পারছে না। H বিন্দুতে দ্রব্য সমন্বয় ক্রয় করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আবার সর্বনিম্ন IC_1 রেখার ওপর R বা S বিন্দু দুটিও ভারসাম্যের হতে পারে না। কারণ R ও S বিন্দু দুটি AB বাজেট রেখায় হলেও সমন্বয় দুটির কোনটিই সর্বোচ্চ তৃপ্তির স্তর বোঝায় না। সে তার সীমিত আয় ব্যয় করে সর্বাধিক তৃপ্তি পেতে চায়। R বিন্দুর ডানদিকে বা S বিন্দুর বাঁ দিকে বাজেট রেখা বরাবর E বিন্দুটির দিকে অগ্রসর হলে সে উভয় দ্রব্যেরই বেশী একক কিনে উচ্চতর তৃপ্তির স্তরে ভারসাম্য লাভ করতে পারে। কাজেই তাঁর কাছে IC_{11} রেখাটিই সর্বোচ্চ তৃপ্তির স্তর এবং E বিন্দুটিতে ৫ একক X ও ৫ একক Y দ্রব্য সমন্বয় তাঁর ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাণ।

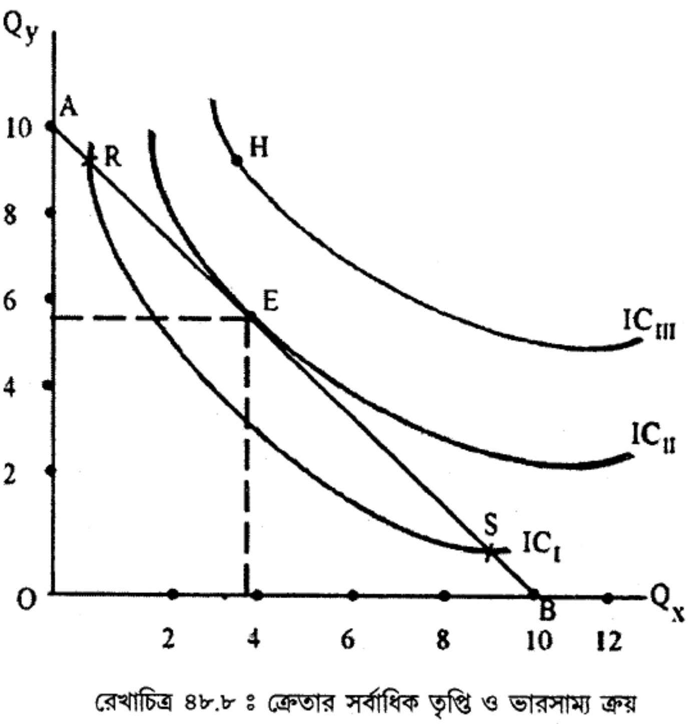

রেখাচিত্র ৪৮.৮ ঃ ক্রেতার সর্বাধিক তৃপ্তি ও ভারসাম্য ক্রয়

E ভারসাম্য বিন্দুতে লক্ষণীয় যে

বাজেট রেখাটি একটি IC রেখার সঙ্গে স্পর্শক হয়েছে। কাজেই ঐ বিন্দুতে বাজেট রেখার ঢাল ও IC_{11} রেখার ঢাল পরস্পরের সমান। আমরা জানি যে IC_{11} রেখার ঢাল দ্রব্যদুটির প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার MRSxy হার, এবং AB বাজেট রেখার ঢাল দ্রব্য দুটির দামের (P_xP_y) অনুপাত $\frac{P_x}{P_y}$ (ঢালের বিশুদ্ধ মান বা absolute slope বোঝাচ্ছে)।

৪৮.৮ রেখাচিত্র অনুযায়ী E বিন্দুতে,

$$MRSxy = \frac{P_x}{P_y}$$

কাজেই ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বে একজন ভোগকারীর দুটি দ্রব্য ক্রয়ে ভারসাম্যের প্রথম শর্ত হলো—

$$MRSxy = \frac{P_x}{P_y}$$

$P_xQ_x+P_yQ_y$(যেখানে ভোগকারী তার সীমিত আয় অর্থাৎ যখন নিরপেক্ষতা রেখা উৎস বিন্দুর দিকে উত্তল।)

একাধিক দ্রব্য ক্রয়ে ক্রেতার এই ভারসাম্য অবস্থার সঙ্গে বিভাগের ৩v অংশে আলোচিত পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বের সমপ্রান্তিক উপযোগিতার বিধিটির সাদৃশ্য লক্ষণীয়। X, Y, দুটি দ্রব্যের প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হারকে দ্রব্য দুটির পরিবর্তনীয়তার (Δ) হার দিয়েও প্রকাশ করা যায়। অর্থাৎ $MRS_{xy} = \frac{\Delta Y}{\Delta X}$। একটি নিরপেক্ষতা রেখার বাদিক থেকে নীচে ক্রমশ অগ্রসর হলে y-এর একক হ্রাসজনিত প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস, x-এর অতিরিক্ত একক পেয়ে পূরণ হয়ে যায়। সাংকেতিক দিয়ে প্রকাশ করলে,

$$-\Delta Y.MUy = \Delta X.MUx$$

পুনর্বিন্যাস করে পাই ঃ $\frac{\Delta Y}{\Delta X} = -\frac{MU_x}{MU_y}$

কাজেই, $MRS_{xy} = \frac{\Delta Y}{\Delta X} = -\frac{MU_x}{MU_y} = -\frac{P_x}{P_y}$

অথবা, $\frac{MU_x}{P_x} = \frac{MU_y}{P_y}$

সুতরাং, ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বে ভারসাম্য মূলশর্তটি পরিমাণগত তত্ত্বে বর্ণিত ভারসাম্য শর্তটির মতই। উভয়ের কোনও অমিল নেই।

মার্শাল প্রান্তিক উপযোগ পরিমাপযোগ্য ধরে সে সমপ্রান্তিক উপযোগ বিধির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। নিরপেক্ষতা তত্ত্বে উপযোগিতা পরিমাপযোগ্য না ধরেও একই সিদ্ধান্ত পৌঁছনো যায়।

এর মধ্যে তার এই শর্ত পূরণ করে। যদিও এটি মনে রাখা দরকার যে প্রান্তিক পরিবর্তনীয় তার হারকে প্রান্তিক উপযোগের অনুপাত দ্বারা প্রকাশ করা হলেও ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি কার্যকর হলেও তা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার বিধি কার্যকরী করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় (necessary) ও যথেষ্ট

(sufficient) শর্ত নয়। সাধারণভাবে, প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হারের (অর্থাৎ MRS_{xy}) সাথে দ্রব্য দুটির দামের অনুপাত (অর্থাৎ $\frac{P_x}{P_y}$) ভোগকারীর ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত (necessary Condition) হলেও যথেষ্ট শর্ত (sufficient condition) নয়। নিরপেক্ষতা রেখা উৎসবিন্দুর দিকে হলে যথেষ্ট শর্তটিও পূরণ হয়।

৪৮.৪ আয় প্রভাব ঃ এঙ্গেল রেখা

পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বের সঙ্গে তুলনায় নিরপেক্ষতা তত্ত্বের পদ্ধতিতে ভোগকারীর চাহিদা বিশ্লেষণের সুবিধা এই যে, এ পদ্ধতিতে আমরা সহজেই দুটি দ্রব্য ক্রয়ের ওপর একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের প্রভাব অথবা ক্রেতার আয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া স্পষ্টভাবে আলাদা আলাদা অনুধাবন করতে পারি। এখানে আমরা প্রথমে ক্রেতার রুচি, পছন্দ এবং দ্রব্য দু'টির দাম স্থির অবস্থায় শুধুমাত্র আয় পরিবর্তনের ফলে তাঁর X, Y দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়স্তরের পরিবর্তন আলোচনা করবো। এ আলোচনা থেকে ক্রেতার আয় ভোগরেখা (ICC) পাওয়া যায়। আবার, শুধু আয় পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয় বলে এটি 'আয় প্রভাব' বলেও উল্লেখ করা হয়। নিচে ৪৮.৯ রেখাচিত্রে আয় প্রভাব ও ICC রেখা গঠন করা হ'লো।

৪৮.৮ রেখাচিত্রে ক্রেতার অপরিবর্তিত রুচি-পছন্দ IC নিরপেক্ষতাগুলো দিয়ে তাঁর নিরপেক্ষতার মানচিত্রে দেওয়া হয়েছে। দুটি X ও Y দ্রব্যদুটির পরিমাণ, নির্দিষ্ট দামে ধরা হয়েছে। দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে সে উভয়ে দ্রব্যেরই ক্রমশ বেশি কিনে উচ্চতর নিরপেক্ষতা রেখায় ভারসাম্য লাভ করবে। এখানে প্রথম বাজেট রেখা AB এবং IC_1 প্রথম নিরপেক্ষতা রেখা E_1 বিন্দুতে স্পর্শক। কাজেই E_1 প্রথম ভারসাম্যের বিন্দুতে সে Y দ্রব্যের OY_1 ও OX_1 পরিমাণের সমন্বয় ক্রয় করে IC_1 তৃপ্তির স্তরে আছে। এখন দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় আয় বৃদ্ধি পেলে বাজেটে রেখাটি সমান্তরালভাবে উপরের দিকে সরে নতুন রেখা হবে A_1B_1 এবং এটি উচ্চতর IC_2 রেখার সঙ্গে E_2 বিন্দুতে স্পর্শক। এই নতুন ভারসাম্য বিন্দুতে সে Y দ্রব্যের Y_1Y_2 পরিমাণ এবং X দ্রব্যের X_1X_2 পরিমাণ বেশি কিনতে পারছে। এখানে Y এবং X দ্রব্য দুটির উপর আয় প্রভাব যথাক্রমে Y_1Y_2 এবং X_1X_2। দ্রব্যদুটির ওপর আয়প্রভাব ধনাত্মক বলে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রয়ের পরিমাণও বাড়ছে। একই কারণে দুটি দ্রব্যই স্বাভাবিক দ্রব্য বা normal goods.

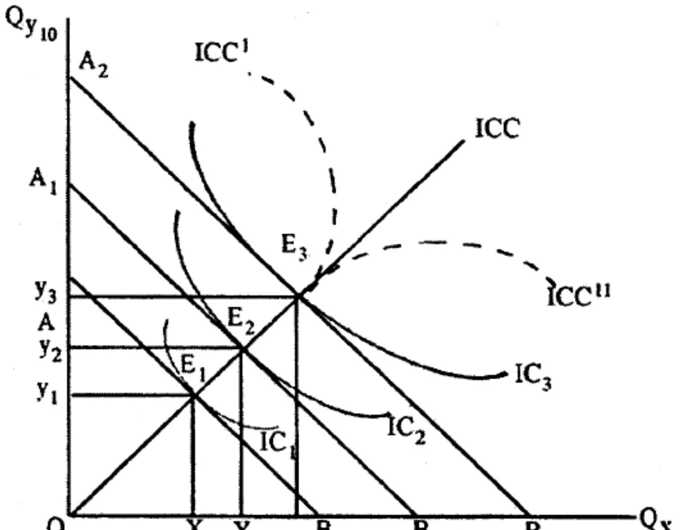

রেখাচিত্র ৪৮.৯ ঃ আয় প্রভাব ও আয়-ভোগ রেখা (ICC)

এইভাবে আয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে, এবং দুটি দ্রব্যই স্বাভাবিক দ্রব্য হলে, ক্রেতার বাজেট রেখাগুলি ক্রমশ উপরের দিকে সরে উচ্চতর নিরপেক্ষতা

রেখায় স্পর্শবিন্দুতে নতুন ভারসাম্যের সৃষ্টি করবে। আয়বৃদ্ধির সঙ্গে ভারসাম্য ক্রয়ের $E_1E_2E_3$ ইত্যাদি বিন্দুগুলি রেখাচিত্রের উৎসবিন্দু O-এর সঙ্গে রেখা দিয়ে যুক্ত করলে আমরা ক্রেতার ICC নামক আয়ভোগ রেখাটি পাই। ICC রেখাটি সবসময় অবশ্য উৎস বিন্দু থেকে সকল রেখায় (চিত্রে প্রদর্শিত) থাকে না। আয়ের পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রেতার ভারসাম্য ক্রয়ের পরিবর্তন ICC রেখা থেকে বোঝা যায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, ICC বা আয়ভোগ রেখা দুটি দ্রব্য ক্রয়ে ক্রেতার আয় প্রভাবজনিত ভারসাম্য বিন্দুগুলির সঞ্চার পথ। ঐ পথের প্রতিটি বিন্দুতে

$MRS_{xy} = \frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$ ভারসাম্যের শর্তটি পূর্ণ হয়।

নিকৃষ্ট দ্রব্য ঃ তবে মনে রাখা দরকার যে, সবসময় সব দ্রব্যের ক্ষেত্রেই আয়প্রভাব এরকম ধনাত্মক বা ICC রেখাটি বরাবর ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন ঊর্ধ্বমুখী রেখা নাও হতে পারে, Q_yOQ_x কোণটিকে সমানভাবে দু'ভাগ নাও করতে পারে। আয় বৃদ্ধির একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর আরও বৃদ্ধি হলে X বা Y কোনও একটি দ্রব্য তাঁর কাছে নিকৃষ্ট বা inferior মনে হতে পারে। আয় বাড়লে এক সময় মোটা কাপড়, মোটা চাল ইত্যাদি নিকৃষ্ট মনে করায় ক্রয়ের পরিমাণ বা সেগুলোর জন্য ব্যয়ের পরিমাণ কমতে পারে। ৪৮.৮ রেখাচিত্রে A_2B_2 বাজেট রেখার পর আয় বেড়ে গেলে যদি X দ্রব্যটি নিকৃষ্ট মনে করে, করে, তবে ICC^1 রেখাটি E_3 বিন্দু থেকে OQ_y অক্ষের দিকে মোড় নেবে। ICC^1 রেখাটি এ-অংশে ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়ে যায়। আবার Y নিকৃষ্ট দ্রব্য মনে হলে আয়ভোগ রেখাটি মোড় নিয়ে OQ_x অক্ষের দিকে ICC^{11} রেখার মতো ঝুঁকে পড়বে। এভাবে ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন আয়ভোগ রেখা আয়বৃদ্ধির ফলে নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস বোঝায়। কাজেই আয়প্রভাব স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধনাত্মক হয় কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঋণাত্মক হয়ে থাকে।

এঙ্গেল রেখা ঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জার্মান রাশিবিজ্ঞানী Ernst Engel বিভিন্ন পরিবারের আয় ও ব্যয়ের ধরন পরীক্ষা করে দেখেছিলেন যে, অপেক্ষাকৃত কম আয়ের দরিদ্র পরিবারগুলি আয়ের বড় অংশই অত্যাবশ্যক পণ্যের জন্য ব্যয় করে। অন্যদিকে বেশি আয়ের ধনী পরিবারগুলি তাঁদের আয়ের বড় অংশ বিলাস বা আরামপ্রদ দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে। এঙ্গেলের সূত্র ধরে বোঝা যায় যে আয়স্তরের সঙ্গে

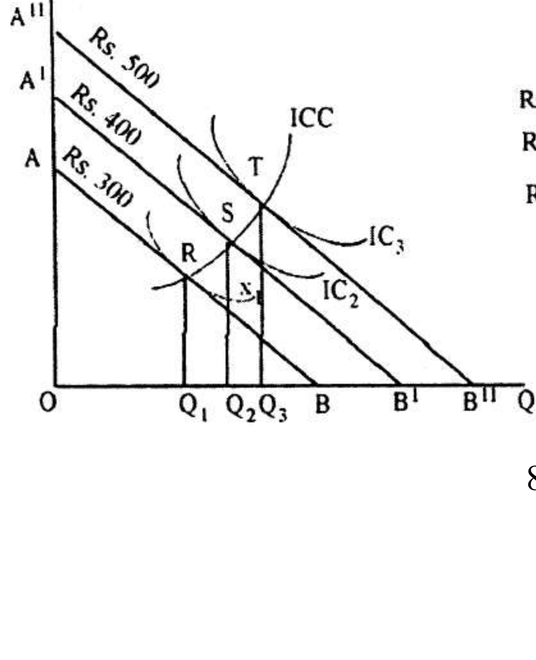

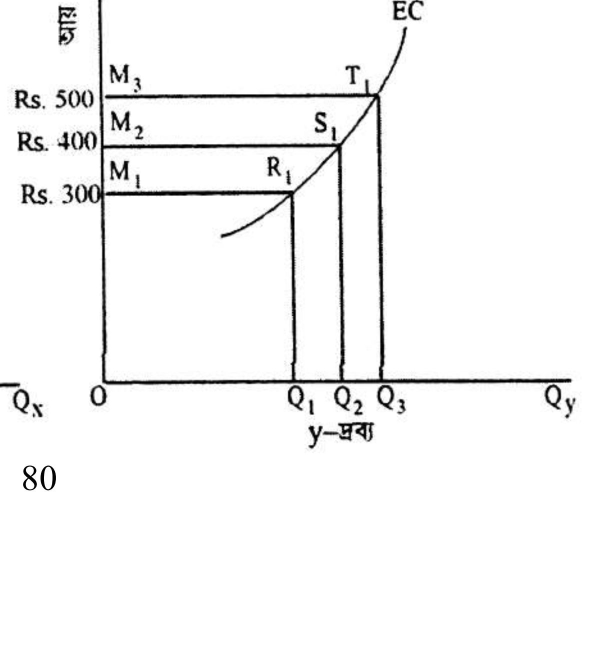

পরিবারের ব্যয়ের বা দ্রব্যের ক্রয়ের এক বিশেষ সম্পর্ক আছে। উপরে আয়ভোগ বা ICC রেখায় আয়বৃদ্ধির সঙ্গে দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের পরিবর্তন বা উভয়ের সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ ব্যক্তির আয় পরিবর্তনের সঙ্গে একটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের পরিবর্তন এঙ্গেল রেখা দিয়েই ব্যাখ্যা করেন। এখানে দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত ধরা হয়। নিচে ৪৮.১০ রেখাচিত্রের 'ক' অংশে পরিচিত ICC রেখার সঙ্গে পাশের 'খ' অংশে একটি এঙ্গেল রেখার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

'ক' অংশে ক্রেতার আয়বৃদ্ধি AB, A^1B^1 ইত্যাদি বাজেটরেখাগুলি দিয়ে আয়ের পরিবর্তনের প্রভাবে X, Y দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয়ের বিন্দুগুলো R,S,T একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে ICC আয়ভোগ রেখাটি পাওয়া গেছে। দাম স্থির অবস্থায় দুটি দ্রব্যেরই ক্রয়বৃদ্ধি পাচ্ছে। ICC রেখার এ সম্পর্ক থেকে পাশের 'খ' অংশে আমরা Y নামক একটি দ্রব্যের ক্রয়বৃদ্ধির পরিমাণগুলি এঙ্গোল বা EC রেখায় স্থাপন করেছি। যখন আয় ৩০০ টাকা তখন Y দ্রব্যটি ক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 এবং R_1 বিন্দুটি পাওয়া যায়। এ বিন্দুটি 'ক' রেখাচিত্রে ICC রেখার R ভারসাম্য বিন্দুটির অনুরূপ। আয়স্তর ৩০০ টাকা = OB_1 এবং 'খ' অংশে OM অক্ষে M_1 দিয়ে বোঝানো হয়েছে। এখানেও Y দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ OQ_1। এইভাবে দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ টাকা বা ৫০০ টাকা হলে 'খ' অংশে Y দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে OQ_2 বা OQ_3 হবে। M_2 আয়স্তরে বিন্দুটি S^1 এবং M_3 আয়স্তরে $T^1.R^1.S^1$ বিন্দুগুলি 'ক' অংশের R,S,T ভারসাম্য বিন্দুগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'খ' অংশের $R^1S^1T^1$ বিন্দুগুলি রেখাদ্বারা যুক্ত করে আমরা বিভিন্ন আয়স্তরে Y দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণসূচক এঙ্গোল রেখা বা EC পাই। এঙ্গেল রেখা একটি চাহিদা ও আয়স্তরের সম্পর্ক, অন্যান্য বিষয় স্থির অবস্থায় নির্দেশ করে। স্বাভাবিক দ্রব্যের এঙ্গেল রেখা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন উর্ধ্বমুখী হয়। অর্থাৎ আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটির চাহিদাও বাড়ে।

এঙ্গোল রেখা দিয়ে স্বাভাবিক, বিলাস দ্রব্য, বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ করা যায়। ৪৮.১১ রেখাচিত্রে EC_1 এঙ্গোল রেখাটি বিলাস দ্রব্যের। এখানে X বিলাস দ্রব্য এবং OM অক্ষে আয়বৃদ্ধির সঙ্গে দ্রব্যটির ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশ OQ_1 থেকে এবং OQ_3 পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু পাশের ৪৮.১২ রেখাচিত্রে EC_F এঙ্গো ল রেখাটি ক্রমশ বাঁদিকে ঝুঁকছে। অর্থাৎ আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে X দ্রব্যের ক্রয়ের পরিমাণ OQ_1 থেকে কমে OQ_2 এবং আরও কমে OQ_3 হচ্ছে। আয়প্রভাব ঋণাত্মক বলে X দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য, আয় বাড়লে চাহিদা কমে।

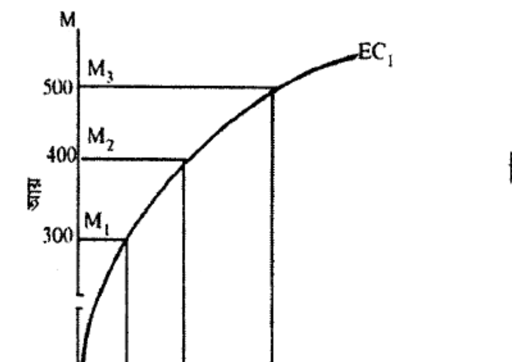

রেখাচিত্র ৪৮.১১ ঃ বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রে

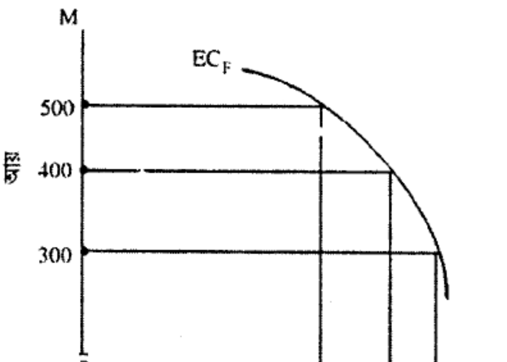

রেখাচিত্র ৪৮.১১ ঃ নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে

৪৮.৫ পরিবর্তপ্রভাব, দামপ্রভাব ও চাহিদারেখা

৪৮.৫.১ পরিবর্তন প্রভাব

ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বের সাহায্যে এমন দুটি দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয় পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্য ক্রয়ের পরিবর্তন স্পষ্ট করে বোঝা যায়, তেমনি X, Y দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির আপেক্ষিক দাম পরিবর্তিত হলেও ভোগকারীর ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাণে প্রতিক্রিয়ার স্পষ্ট বিশ্লেষণ করা যায়। দু'টি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামের প্রতিক্রিয়া পরিবর্ত প্রভাব দিয়ে বোঝা যায়। আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের এই পরিবর্তপ্রভাবটি আমরা অধ্যাপক হিক্সের পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করবো।

Y দ্রব্যের দাম (P_y) অপরিবর্তিত রেখা X দ্রব্যের দাম (P_x) কমে গেলে ক্রেতার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ P_x হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতা আগের থেকে কম ব্যয় করেও সমপরিমাণ X দ্রব্য কিনতে পারে। অন্যভাবে P_x কমার ফলে ক্রেতার কাছে কিছুটা অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা থেকে যায় যা প্রকৃত আয়প্রভাবের মতোই। আমরা আয়বৃদ্ধির এ-অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র P_x পরিবর্তনের প্রভাবটিই আলোচনা করব। প্রথমে আমরা X-এর দামের হ্রাস ধরে আপেক্ষিক দামের পরিবর্তন এবং ভারসাম্যের পরিবর্তন নিচের ৪৮.১৩ রেখাচিত্রে দেখবো।

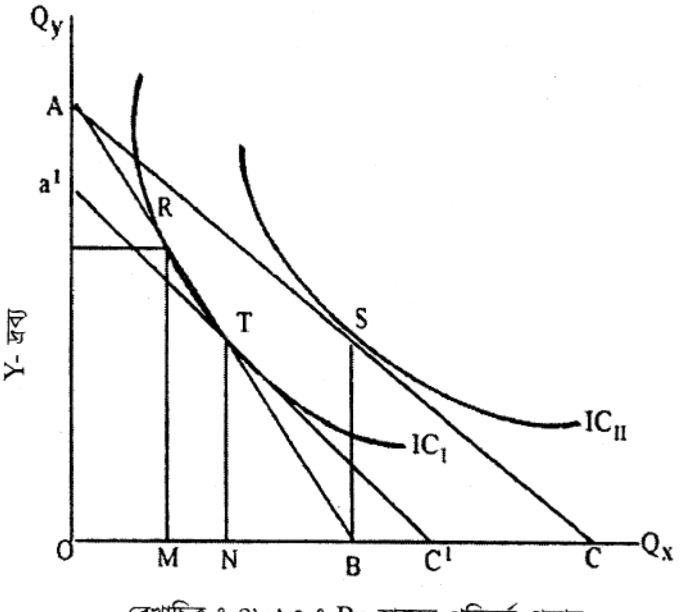

রেখাচিত্র ঃ ৪৮.১৩ ঃ Px হ্রাসের পরিবর্ত প্রভাব

৪৮.১৩ রেখাচিত্রে ক্রেতার প্রথম ভারসাম্য বিন্দু AB বাজেট রেখার উপর R বিন্দুতে এবং বিন্দুটি IC_1 রেখার সঙ্গে AB বাজেট রেখার স্পর্শবিন্দু। প্রথম বাজেট রেখা ও নিরপেক্ষতা রেখার ঢাল ঐ বিন্দুতে পরস্পরের সমান। এখন P_y অপরিবর্তিত রেখে P_x কমলে বাজেট রেখার ঢাল কমে নতুন AC রেখা হবে। অর্থাৎ P_x কমে যাওয়ায় ক্রেতার প্রকৃত আয় বেড়েছে। সে বর্ধিত আয় দিয়ে কম দামের X ক্রয় করে উচ্চতর IC_{11} রেখার S বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য লাভ করতে পারে। দাম কমে যাওয়ায় X দ্রব্যের ক্রয় MB পরিমাণ বাড়তে পারে। MB হচ্ছে P_x হ্রাসের সম্পূর্ণ দামপ্রভাব। কিন্তু বিশুদ্ধ পরিবর্তপ্রভাব পৃথক করতে দামপ্রভাব থেকে প্রকৃত আয়বৃদ্ধির প্রভাব বাদ দিতে হবে। অতিরিক্ত প্রকৃত আয় বাদ দিতে ধরা গেল যে, ঐ বৃদ্ধির সমান অংশ করের মাধ্যমে সরিয়ে নেওয়া হলো। ফলে ক্রেতার নতুন কল্পিত বাজেট রেখা হলো a^1c^1 ভগ্ন রেখাটি। সমপরিমাণ বাজেট রেখাটির T বিন্দুতে IC_1 রেখায় ভারসাম্য নেমে আসবে। এক্ষেত্রে হিক্সের পদ্ধতিতে ততখানিই অতিরিক্ত প্রকৃত আয় বাদ দিতে হয় যাতে ভোগকারী তার পূর্বের তৃপ্তির স্তর (অর্থাৎ IC_1) অর্জন

করতে পারে। আয়প্রভাব বাদ দেওয়া সত্ত্বেও P_x কমে যাওয়ায় ভোগকারী কম দামের X দ্রব্যটি MN পরিমাণ বেশি কিনছে। কিন্তু তাঁর IC_1 নিরপেক্ষতা রেখায় অপরিবর্তিত থাকছে। কাজেই এখানে পরিবর্তপ্রভাব MN পরিমাণ। X-এর ক্রয়বৃদ্ধির ফলে তাঁর তৃপ্তির স্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে না। এখানে পরিবর্তন প্রভাবটি ঋণাত্মক হওয়ায় কম দামের X দ্রব্যটির চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে। বিপরীত অবস্থায়, P_x বাড়লে বাজেট রেখা A বিন্দুতে উল্লম্ব অক্ষের কাছাকাছি সরে আসবে এবং নিচের একটি IC রেখায় স্পর্শবিন্দুতে কম তৃপ্তির স্তরে ভারসাম্য হবে। P_x বৃদ্ধির ফলে X-ক্রয় বা চাহিদা কমে যাবে। কিন্তু প্রকৃত আয় হ্রাসের প্রভাব বাদ দিতে ক্রেতাকে সমপরিমাণ আয় ভরতুকি দিলে তাঁর কল্পিত নতুন বাজেট রেখা সমান্তরালভাবে উপরের দিকে সরে যাবে। আয়ের এই সম্পূর্ণাত্মক পরিবর্তন (Compensating variation) হওয়ায় সে আগের নিরপেক্ষতা রেখায় একই তৃপ্তির স্তরে কম পরিমাণ X দ্রব্য ক্রয় করে নতুন ভারসাম্য লাভ করবে। এক্ষেত্রেও পরিবর্তন প্রভাব ঋণাত্মক। আয়কর বা ভরতুকির সাহায্যে প্রকৃত আয়স্তর অপরিবর্তিত রাখায় পরিবর্তনপ্রভাবটি P_x হ্রাস বা বৃদ্ধি—উভয়ক্ষেত্রেই ঋণাত্মক। অর্থাৎ আয় ও অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায় একটি দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদা বাড়ে বা দাম বাড়লে চাহিদা কমে। পরিবর্তপ্রভাব থেকে দাম-চাহিদার বিপরীত সম্পর্কটি পাওয়া যায়।

৪৮.৫.২ দাম প্রভাব

৪ii ছ ও জ অংশে আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের পৃথক আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে P_y অপরিবর্তিত অবস্থায় শুধু P_x অপরিবর্তিত হলে একদিকে ক্রেতার প্রকৃত আয় ও অন্যদিকে দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দামও পরিবর্তিত হয়। ধনাত্মক আয়প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় ভোগকারীর তৃপ্তির স্তর ভিন্ন নিরপেক্ষতা রেখায় সরে যায়। আবার, প্রকৃত আয়স্তর অপরিবর্তিত রেখে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন ঘটলে তাঁর ভারসাম্য ক্রয় একই তৃপ্তির স্তরে একই IC রেখার ভিন্ন বিন্দুতে সরে যায়। যদি P_x কমে, তবে কম দামের X দ্রব্যের বেশি পরিমাণ কিনে সে সমান তৃপ্তি পায়। লক্ষণীয় যে, P_x এর পরিবর্তনের কারণে দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম ও প্রকৃত আয় একই সঙ্গে বাড়ে বা কমে। আয়কর বা ভর্তুকি না দিলে P_x এর পরিবর্তনের জন্য X দ্রব্য ক্রয়ের উপর মোট যে প্রভাব দেখা দেয়, তাকেই দামপ্রভাব বা P_x পরিবর্তনের মোট প্রভাব বলে। P_x কমলে কম দামে বেশী কেনে, আবার প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির জন্য একই দ্রব্য আরও বেশি কেনে। এভাবে বিভিন্ন দামে X-এর ভারসাম্য ক্রয়ের বিন্দুগুলি রেখা দ্বারা যুক্ত করে আমরা ভোগকারীর X দ্রব্যের দাম ভোগরেখা বা Price-Consumption Curve, PCC পাই। PCC রেখাটি মূলত বিভিন্ন দামে X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণেরই সূচক। তবে PCC রেখার ক্ষেত্রে ভোগকারীর নির্দিষ্ট নিরপেক্ষতার মানচিত্র ও বাজেট রেখার স্পর্শবিন্দুগুলি থেকে দ্রব্যটির চাহিদা রেখা পাওয়া যায়।

'জ'-অংশে ৪৮.১৩ রেখাচিত্রে P_x হ্রাস পাওয়ায় ভোগকারী ক্রয়ের উপর মোট প্রভাবে ভারসাম্য বিন্দু R থেকে S বিন্দুতে IC_{11} রেখায় সরেছে। কিন্তু এই মোট দামপ্রভাব ঘটেছে দুই ধাপে। প্রথমে ঋণাত্মক পরিবর্ত প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় সে IC_1 রেখায় R থেকে T বিন্দুতে ভারসাম্য লাভ করেছে। প্রকৃত আয় অপরিবর্তিত অবস্থায় পরিবর্তপ্রভাব MN পরিমাণ X দ্রব্যের ক্রয়বৃদ্ধির সমান। এ-সঙ্গে ধনাত্মক আয়প্রভাব যুক্ত হওয়ায় তাঁর ভারসাম্য ক্রয় উচ্চতর তৃপ্তির IC_{11} রেখার S বিন্দুতে। কাজেই T থেকে S বিন্দুতে ভারসাম্য পরিবর্তন আয় প্রভাব সূত্রে। এখানে ধনাত্মক আয় প্রভাব NB পরিমাণ X দ্রব্যের সমান।

কাজেই P_x হ্রাসের দাম প্রভাব = পরিবর্তপ্রভাব ± আয়প্রভাব।

পরিবর্তপ্রভাব সর্বদাই ঋণাত্মক ও শক্তিশালী হলেও আয়প্রভাব ধনাত্মক বা ঋণাত্মক উভয়েই হতে পারে।

এজন্য আয়প্রভাবের আগে ± চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

এখান, ৪৮.১৩ রেখাচিত্র অনুসারে ঃ

মোট দাম প্রভাব = MB = MN + NB

অর্থাৎ, দামপ্রভাব পরিবর্ত ও আয়প্রভাবের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া।

৪৮.৫.৩ দামপ্রভাব ও চাহিদারেখা ঃ

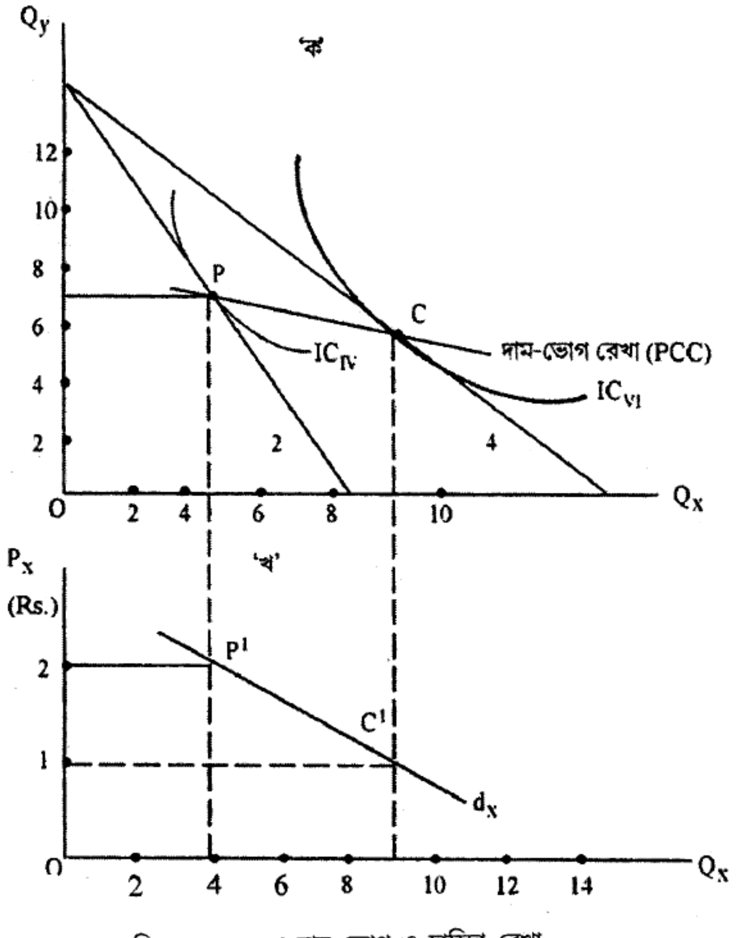

রেখাচিত্র ঃ ৪৮.১৪ ঃ দাম-ভোগ ও চাহিদা রেখা

৪৮.১৪ রেখাচিত্র উপরের 'ক' অংশে ভোগকারীর প্রথম ভারসাম্য বিন্দু IC_{IV} ও ২নং বাজেট রেখার স্পর্শ বিন্দুতে P তে। এখন Y-এর দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় X দ্রব্যের দাম কমে ২ টাকা থেকে ১ টাকা হলে নতুন বাজেট রেখা হবে ৪নং রেখাটি। ফলে ভোগকারীর নতুন ভারসাম্য বিন্দু উপরের IC_{VI} রেখার C বিন্দুতে সরে যাবে। P ও C বিন্দু দুটি এটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে আমরা X দ্রব্যের দাম ভোগ বা PCC রেখার অংশবিশেষ পাই। PCC রেখার সঙ্গে সম্পর্কিত ভারসাম্য বিন্দু থেকে নিচের 'খ' অংশে X দ্রব্যের চাহিদা রেখার অংশ বিশেষ d_x রেখাটি পাই। লক্ষণীয় যে, এই 'খ' অংশে উল্লম্ব অক্ষে P_x বা X-এর দাম ২ টাকা থেকে কমে ১ টাকা হওয়ায় চাহিদার পরিমাণও বেড়ে দ্বিগুণ পরিমাণ হয়েছে (P^1 ও C^1 বিন্দুর মধ্যে)

। এক্ষেত্রে X-এর চাহিদা সংবেদনশীল বা স্থিতিস্থাপক। অর্থাৎ দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, নির্দিষ্ট সময়ে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত অবস্থায়। এভাবে ‘ক’ অংশের PCC রেখাকে দুই দিকে প্রসারিত করে প্রতিবিন্দু সম্পর্কিত ভারসাম্য ক্রয়কে (X দ্রব্যের) ‘খ’ অংশের d_x রেখার সঙ্গে যুক্ত করে রেখাটি উভয় দিকে প্রসারিত করলে আমরা PCC রেখা থেকে একটি দ্রব্যের চাহিদারেখা পেতে পারি। স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে চাহিদারেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে। কাজেই বলা যায় যে, একটি দ্রব্যের PCC রেখা এবং ঐ দ্রব্যের চাহিদারেখা দ্রব্যটির দাম ও চাহিদার পরিমাণ সম্পর্কে প্রায় একই তথ্য প্রকাশ করে।

রেখাচিত্রের ‘ক’ অংশে P বিন্দু থেকে C বিন্দুর মধ্যে $MRS_{xy} = MU_x/MU_y$ কমছে। কিন্তু MU_x/MU_y অনুপাতটি হ্রাস পাওয়ার অর্থ MU_x/MU_y-এর হ্রাস নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত MU_x-এর বৃদ্ধি MU_y-এর বৃদ্ধির চেয়ে কম ততক্ষণ MU_x/MU_y অনুপাতটি কমতে পারে। সুতরাং MRS_{xy} ক্রমহ্রাসমান হওয়ার এই অর্থ এই নয় যে MU_x এবং MU_y দুটিও ক্রমহ্রাসমান হবে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার (MU) ধারণাটি ছাড়াই ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন চাহিদারেখা পাওয়া যায়।

৪৮.৬ ক্রমবাচক প্রতিযোগিতা তত্ত্বের অনুমান ও মূল্যায়ন ঃ

এককের ‘ক’ থেকে ‘ঝ’ অংশ পর্যন্ত হিক্স প্রদত্ত ক্রমবাচক তত্ত্বের মূল কয়েকটি ধারণার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জানা গেল যে ৩ এককে আলোচিত মার্শালের পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বে ভোগকারীর চাহিদা সংক্রান্ত সবকটি সিদ্ধান্তই এই বিকল্প ব্যাখ্যায় অর্থ দিয়ে উপযোগের পরিমাপ বা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগের ধারণা বাদ দিয়েও বিশ্লেষণ করা যায়। অবশ্য, মানসিক উপযোগিতা কম না বেশি এ-সম্বন্ধে একটা অনুভব করা চলে। কাজেই ক্রমবাচক তত্ত্বটিও মানসিক অনুভূতির উপলব্ধির (introspection) সঙ্গে জড়িত। আবার, এটাও ধরে নিতে হয় যে, বিচক্ষণ একজন ভোগকারী দ্রব্য ভোগ করার সময় জটিল কয়েকটি অনুপাতের হিসাব করে ভারসাম্য ক্রয়ের পরিমাণ ঠিক করে। দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয়গুলোকে সমতৃপ্তি বা কম-বেশি তৃপ্তির স্তরক্রম অনুযায়ী সাজানোর কাজটিও জটিল প্রক্রিয়া; কারণ পছন্দক্রম দু’রকমের— সমতৃপ্তির স্তর এবং কম বা বেশি তৃপ্তির স্তর। একারণে হিক্স-তত্ত্বে পছন্দক্রমটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল বা 'Weak ordering' ধরনের। বাস্তবের দ্রব্যক্রয়ের সময় ক্রেতা বিজ্ঞাপন বা প্রতিবেশীর পছন্দ অনুযায়ীও কেনাকাটা করে। ক্রমবাচক তত্ত্বে এ-সব বিষয়ের স্বীকৃতি নেই বললেই চলে। অবশ্য পরিমাণগত উপযোগিতা তত্ত্বেও অবাস্তব অনুমানগুলির সংখ্যা অনেক বেশি। তুলনায় ক্রমবাচক তত্ত্বের ভোগকারীর সঙ্গতিপূর্ণ আচরণের অনুমানটি দিয়েই চাহিদার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ভোগকারীর আচরণের দুটি বিকল্প ব্যাখ্যার তুলনাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ডি. এইচ,. রবার্টসন (D. H. Robertson), উপমা দিয়ে একবার বলেছিলেন যে বাস্তবে চার পা বিশিষ্ট কুকুর কখনও কখনও দু’পা দিয়েই হাঁটতে পারে; তবে এ-আচরণের অর্থ এমন বলা ঠিক হবে না যে, প্রাণীটির পক্ষে দু’পাই যথেষ্ট। যাইহোক, বর্তমান বিকল্প তত্ত্ব দু’টি নিয়ে বিতর্কের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে। চাহিদা তত্ত্বের বিশ্লেষণে দু’টিই আলোচিত হলেও ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বটির ব্যবহারই সর্বাধিক। যে কোনও বৈজ্ঞানিক আলোচনা কিছু অনুমানের ভিত্তিতেই অগ্রসর। অনুমানগুলির বাস্তবতা বা সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। সেজন্য কোনও তত্ত্বই সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায় না। বিভিন্ন পরীক্ষা পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়েই বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রসার ঘটে। ভোগকারীর চাহিদার ভিত্তি সম্পর্কে আলোচিত দুটি বিকল্প তত্ত্ব সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

৪৮.৭ সারাংশ

এককের 'ক' থেকে 'ত' অংশগুলিতে আমরা মার্শালের পরিমাণগত উপযোগিতার বিকল্প হিসেবে প্যারেটো হিক্স-এজওয়ার্থ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের রচিত ক্রমবাচক পছন্দতত্ত্বের বিভিন্ন আলোচনা করেছি। পরিমাপযোগ্য উপযোগিতা বা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার ধারণা ব্যবহার না করেও ভোগকারীর চাহিদা সংক্রান্ত আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ভিত্তির উপর দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয় নিয়ে কম বা বেশি তৃপ্তির পছন্দক্রম এবং সমতৃপ্তির স্তরের ধারণা রেখাচিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে। একজন ভোগকারীর দুটি দ্রব্য ক্রয়ের ভারসাম্য পরিমাণ জানতে আমরা তার বাজেট রেখা ব্যবহার করেছি। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয় পরিবর্তনের প্রভাব, একটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের আপেক্ষিক পরিবর্তপ্রভাব, এবং উভয়ের সমষ্টিগত দাম প্রভাব জেনেছি। আমরা জেনেছি যে, দাম ভোগরেখা থেকেই একটি স্বাভাবিক দ্রব্যের চাহিদা-রেখাও পাওয়া যায়। আবার আয়-ভোগ রেখা থেকে আয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে ভোগকারীর বিলাস দ্রব্য, প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে ব্যয়ের ধরনও এঙ্গেল রেখা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। এ-ভাবে দুটি বিকল্প তত্ত্বের আলোচনা থেকে দেখা গেল যে, উভয় ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্তগুলি প্রায় একই ধরনের। তবে মার্শালের ব্যাখ্যার তুলনায় হিক্সের ব্যাখ্যায় ভোগকারীর আচরণগত অনুমানগুলি সংখ্যায় কম। তাছাড়া দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ থেকে আমরা আয় ও পরিবর্ত প্রভাবের প্রতিক্রিয়া পৃথক ও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি। দুটি তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ থাকলেও চাহিদার ব্যাখ্যায় ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বটিই বহুল ব্যবহৃত।

৪৮.৮ অনুশীলনী

১। ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বের মূল অনুমানগুলি মনে রাখুন।

২। দুটি দ্রব্যের অসংখ্য সমন্বয় কোন্ কোন্ সূত্রে পছন্দক্রম অনুযায়ী সাজানো চলে?

উঃ। কম বা বেশি তৃপ্তির স্তর অনুযায়ী এবং সমতৃপ্তির সূত্রে।

৩। নিরপেক্ষতার মানচিত্র আঁকার অভ্যাস করুন।

৪। স্বাভাবিক বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয়-ভোগ রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখুন।

উঃ ৪ii ছ অংশ দেখুন।

৫। আয়ভোগ ও এঙ্গেল রেখার ৪৮.৯ রেখাচিত্রে দুটি রেখার গঠনে পার্থক্য লক্ষ্য করুন।

৬। বিলাস বা নিকৃষ্ট দ্রব্যের এঙ্গেল রেখা দুটির আকৃতিগত পার্থক্য মনে রাখুন।

৭। বাজেট রেখা রেখাচিত্রে কিভাবে আঁকা হয়?

৮। দুটি দ্রব্যের ভারসাম্য ক্রয় বোঝাতে নিরপেক্ষতা রেখা বাজেট রেখাকে কবার ছেদ করে এবং কেন? ব্যাখ্যাটি অনুধাবন করুন।

উঃ। ৪ii চ অংশের ৪৮.৭ রেখাচিত্রটি দেখুন।

৯। ৪ii জ অংশে ৪৮.১২ রেখাচিত্রে পরিবর্তন প্রভাবের ব্যাখ্যায় ক্রেতার প্রকৃত আয় বা দুটি দ্রব্যের আপেক্ষিক দাম পরিবর্তনের বিষয়টি ভাল করে বোঝার চেষ্টা করুন।

১০। ৪ii ঝ অংশে ৪৮.১২ রেখাচিত্রটির দু'টি অংশ ধরে PCC রেখা ও চাহিদারেখা আঁকার প্রণালী অভ্যাস করুন।

একক ৪৯ ◆ চাহিদার স্থিতিস্থাপতা

গঠন

৪৯.০ উদ্দেশ্য
৪৯.১ চাহিদার নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা
৪৯.১.১ সংজ্ঞা ও পরিমাপ
৪৯.১.২ স্থিতিস্থাপতার বিভিন্ন মান সম্পন্ন চাহিদারেখা
৪৯.১.৩ চাহিদারেখার ঢাল ও স্থিতিস্থাপতা
৪৯.২ আয়গত স্থিতিস্থাপকতা
৪৯.২.১ পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা
৪৯.২.২ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়
৪৯.৩ সারাংশ
৪৯.৪ অনুশীলনী

৪৯.০ বিভাগের উদ্দেশ্য

২য় এককে আমরা চাহিদাগত তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে দুটি বিকল্প বিশ্লেষণ করেছি। প্রতিটি ব্যাখ্যার শেষে ভোগকারীর ভারসাম্য ক্রয় থেকে আমরা একটি করে চাহিদারেখা পেয়েছি। নির্দিষ্ট সময়ে ভোগকারীর রুচি, পছন্দ, অন্যান্য দ্রব্যের দাম, ক্রেতার আয় ইত্যাদি বিষয়গুলি স্থির ধরে একটি দ্রব্যের পরিবর্তন ও তার চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের আলোচনা থেকে দেখছি যে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ তার নিজ দামের প্রতি সংবেদনশীল। অর্থাৎ, দাম কমলে চাহিদা বাড়ে, দাম বাড়লে চাহিদা কমে। দাম চাহিদার এরকম বিপরীত ধরনের সংবেদনশীলতা চাহিদার সূত্র।

ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ফার্মের লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন। এই মুনাফা বিক্রির বা ক্রেতার চাহিদার উপর নির্ভরশীল। একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তন তার চাহিদার পরিমাণকে কীভাবে কতটা প্রভাবিত করে, সেটার স্পষ্ট পরিমাপও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। একটি দ্রব্যের দামের হ্রাসবৃদ্ধি তার চাহিদাকে ঠিক কতটা প্রভাবিত করবে জানতে না পারলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও বিক্রয় পরিকল্পনা সফল হয় না। এজন্য চাহিদার নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ প্রয়োজন হয়। আবার একটি জিনিসের চাহিদা শুধুমাত্র দাম ছাড়া অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ের পরিবর্তন দ্বারাও প্রভাবিত হয়। যেমন, ক্রেতার আয় বা বিকল্প দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের প্রভাবেও বিশেষ একটি দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তিত হতে পারে, ফার্মের কাছে এগুলোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আলোচ্য বিভাগে আমরা চাহিদার সংবেদনশীলতা বুঝতে দামের পরিবর্তন, আয়ের পরিবর্তন বা বিকল্প দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের প্রভাবে চাহিদার সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ, যা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলে অভিহিত, তা বিশ্লেষণ করব।

৪৯.১ চাহিদার নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতা

৪৯.১.১ সংজ্ঞা ও পরিমাপ

দ্রব্যের দাম কমলে বাড়লে অন্যান্য বিষয়গুলোর স্থির অবস্থায়, দ্রব্যটির চাহিদার বৃদ্ধি বা হ্রাসজনিত সংবেদনশীলতা দামের শতকরা পরিবর্তন ও চাহিদার পরিমাণের শতকরা পরিবর্তনের অনুপাত দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সেই অনুযায়ী দামগত স্থিতিস্থাপকতা হলো ঃ

$$ep = \frac{\text{X-এর চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তন}}{\text{X-এর দামের শতকরা পরিবর্তন}}$$

দ্রব্যটির দাম ১০% হ্রাস পাওয়ায় চাহিদার পরিমাণ ২০% বৃদ্ধি পেলে ep=২ হবে। মূল্যহ্রাস ঋণাত্মক চিহ্ন এবং চাহিদা বৃদ্ধি ধনাত্মক চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করলে ep-র মান ঋণাত্মক। যদিও চিহ্নটি এখানে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ শুধু ধনাত্মক রাশি ব্যবহার করে ep-র মান বেশি না কম বোঝা সহজ। এ সুবিধা থেকেই ঋণাত্মক চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়নি।

D = চাহিদা, দ্রব্যের দাম = P, চাহিদার পরিমাণ = Q, এবং ‘Δ’ চিহ্নটি দিয়ে পরিবর্তন বোঝালে দামের শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta P}{P}.100$ এবং চাহিদার শতকরা পরিবর্তন $= \frac{\Delta D}{D}.100$

D-এর বদলে Q লিখলে, $ep = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta P}{P}} = -\frac{\Delta Q}{\Delta P}.\frac{P}{Q}$ (এখানে বিয়োগ চিহ্নটি ব্যবহৃত)

এভাবে একটি দ্রব্যের দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান দুটি চূড়ান্ত সীমার মধ্যে থাকে। একটি সর্বাধিক, অপরটি সর্বনিম্ন মান। প্রথমটি ep = α, বা অনন্ত, দ্বিতীয়টি ep = o দিয়ে বোঝানো হয়। অবশ্য কোনও সংখ্যার মান অনন্ত (α) হয় না, অনন্তর দিকে যেতে পারে। কাজেই, সর্বাধিক বা সর্বনিম্ন—এ দুটি সীমায় ep যথাক্রমে

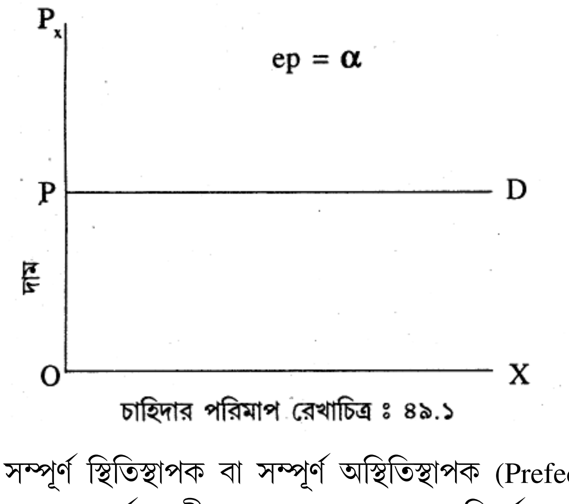

চাহিদার পরিমাপ রেখাচিত্র ঃ ৪৯.১

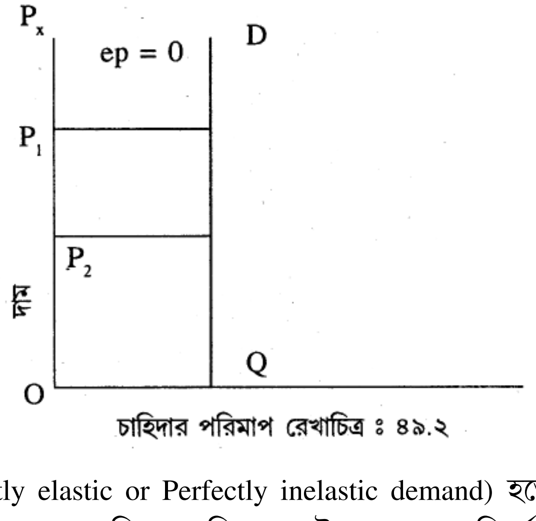

চাহিদার পরিমাপ রেখাচিত্র ঃ ৪৯.২

সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (Prefectly elastic or Perfectly inelastic demand) হতে পারে। সর্বোচ্চ সীমায় দামের প্রায়শূন্য পরিবর্তনের প্রভাবে চাহিদার পরিমাণের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বোঝায়। অর্থাৎ দাম সামান্য পরিবর্তনের প্রভাবে চাহিদা খুব বেশি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দামের যে কোনও পরিবর্তনে চাহিদা সংবেদনশীল নয়, সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এ-দুই ক্ষেত্রে চাহিদারেখার আকৃতি নিচের ৪৯.১ ও ৪৯.২ রেখাচিত্রে দেখানো হ'লো।

৪৯.১.২ স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান সম্পন্ন চাহিদা রেখা

৪৯.১ এবং ৪৯.২ রেখাচিত্রে আনুভূমিক অক্ষে X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম P_x ধরা হয়েছে। প্রথম OP দাম স্থির। এই দামে যে কোনও পরিমাণ X দ্রব্যটির চাহিদা হতে পারে। কাজেই PD চাহিদা রেখাটির স্থিতিস্থাপকতার মান বা α, বা অনন্ত। কিন্তু পাশের ২ নং রেখাচিত্রে QD চাহিদারেখাটি OX অক্ষের উপর Q বিন্দুতে লম্ব। যখন দাম OP_1 তখন X-এর চাহিদার পরিমাণ OQ^1। দাম কমে OP_2 হলেও চাহিদার পরিমাণ একই বা OQ থাকছে। অর্থাৎ দামের হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাবে চাহিদা সংবেদনশীল নয়। কাজেই ep = 0, চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। এভাবে দেখা যে, আনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল চাহিদারেখায় দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান অনন্ত স্বরূপ; অন্যদিকে উল্লম্ব অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় ঐ মান শূন্যের সমান। প্রথমটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক, দ্বিতীয়টি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক।

৩.১i অংশে বলা হয়েছে যে, দামগত স্থিতিস্থাপকতা অনন্ত বা শূন্য সংখ্যাদুটির মধ্যে সীমিত থাকে। এই সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান এককের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়। এভাবে প্রকাশ করলে ঃ

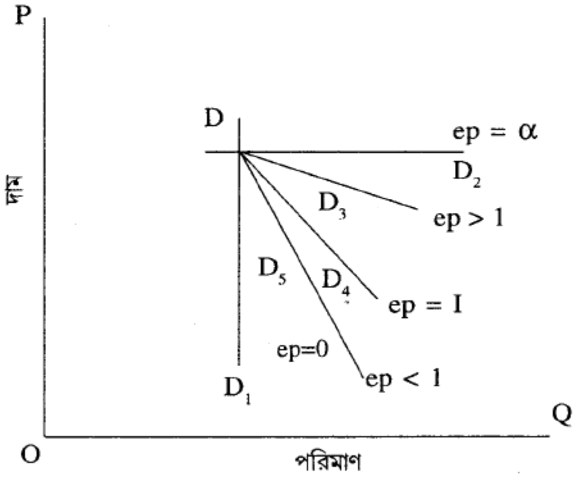

রেখাচিত্র ঃ ৪৯.৩ ঃ বিভিন্ন মানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন চাহিদা রেখা

ক) যখন ep=I তখন দামে যে-হারে বাড়ে বা কমে, চাহিদার পরিমাণও সমান হারে কমে বা বাড়ে। দাম ও চাহিদার পরিমাণে এরকম সংবেদনশীলতা থেকে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা বোঝা যায়।

খ) দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান এককের বেশি বা ep>I, হলে দামের পরিবর্তনের হার অপেক্ষা চাহিদার পরিমাণে পরিবর্তনের হার বেশি হয়ে থাকে। এরকম সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে চাহিদাকে দামগতভাবে স্থিতিস্থাপক বলা হয়।

গ) আর একদিকে আছে অস্থিতিস্থাপক চাহিদা বা price-inelastic demand, চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করলে ep<I। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রে দাম যে-হারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় চাহিদার পরিমাণ তার থেকে কম হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়।

দামগত স্থিতিস্থাপকতার সম্ভাব্য বিভিন্ন মান সম্বন্ধে উপরের আলোচনা থেকে বিভিন্ন মানের চাহিদারেখার বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে ধারণা করতে পারি। তুলনার সুবিধার জন্য নিচের ৪৯.৩ রেখাচিত্রে পাঁচটি সম্ভাব্য মানসম্পন্ন পাঁচটি চাহিদা রেখা একসঙ্গে দেখানো হ'ল।

রেখাচিত্রে স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন সম্ভাব্য মান অনুসারে বিভিন্ন ঢালসম্পন্ন পাঁচটি চাহিদারেখার অংশগুলি দেখানো হয়েছে। উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল DD_1 রেখায় চাহিদা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বা ep=O। এটি ep-র ন্যূনতম সীমা। সর্বোচ্চ সীমায় আছে অনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল DD_2 চাহিদারেখা। DD_2 সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক চাহিদারেখায় ep=α। এই দুই সীমার মধ্যে আছে বিভিন্ন মানের স্থিতিস্থাপকসম্পন্ন তিনটি, D_3, D_4 ও D_5 চাহিদারেখার অংশগুলি। D_3 রেখার একই বিন্দুতে দ্রব্যটির চাহিদা খুবই সংবেদনশীল হলেও সীমাহীন নয়।

এক্ষেত্রে ep > α কিন্তু ep > I, রেখাটির খাড়াই কম। D_4 রেখার একই বিন্দুতে দ্রব্যের দাম চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তন একই হারে বলে ep = I আবার, D_5 রেখাটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ep < I কিন্তু ep > 0। অর্থাৎ, দ্রব্যটির দাম পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রেতার মোট ব্যয় (দ্রব্যটির জন্য) কমে কিন্তু শূন্য হয় না। কাজেই ep > I কিন্তু ep > 0। চাহিদা রেখার অংশটির খাড়াই (steepness) বেশী। এক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদারেখার ঢাল বা খাড়াই থেকে স্থিতিস্থাপকতার ধারণা করা যায়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, রেখাটি যতই রেখাচিত্রের উৎসবিন্দু 'O'-এর কাছাকাছি সরে আসবে, ততই খাড়াই বাড়বে কিন্তু স্থিতিস্থাপকতা কমবে। অন্যদিকে, চাহিদা রেখা যতই উৎসবিন্দু থেকে, ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ভাবে, দূরে সরে যাবে ততই স্থিতিস্থাপকতা বাড়বে কিন্তু খাড়াই কমবে।

একটি বক্র চাহিদা রেখায় একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার মান দ্রব্যটি ক্রয়ে ব্যয় বা E দিয়ে দেখানো যায়। নিচে ৪৯.৪ রেখাচিত্রে একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা রেখার এরকম সম্বন্ধটি দেখানো হ'লো।

কম দামে X দ্রব্যের বেশি পরিমাণ চাহিদা হয়। এজন্য OE চাহিদারেখা বামদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। রেখাচিত্রে X-এর দাম OK থেকে কমে OL হলে চাহিদার পরিমাণ OQ_1 থেকে OQ_2 হয়েছে। ক্রেতার ব্যয় $OK.OQ_1=OKAQ_1$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। দাম কমে OL হলে চাহিদার পরিমাণ OQ_2 এবং মোট ব্যয় বা $E = OL . OQ_2 = OLBQ_2$ আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল। এইভাবে DE চাহিদারেখায় বিভিন্ন দামে দ্রব্যটির ক্রয়ের পরিমাণ ও মোট ব্যয় আয়তক্ষেত্র দিয়ে বোঝানো যায়। এখানে $OKAQ_1$ ও $OLBQ_2$ আয়তক্ষেত্র দুটি পরস্পরের সমান। এইভাবে একক স্থিতিস্থাপকতাসম্পন্ন চাহিদারেখার বিভিন্ন বিন্দুতে ব্যয় সমান হয়। এরকম বক্ররেখার আকৃতিকে আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত বলে। ep=1 হওয়ায় সমীকরণে প্রকাশ করলে P_x, Q_x=K। সমীকরণের বাঁদিকের অংশ বিভিন্ন দামে X দ্রব্য এবং ডান দিকের অংশ K মোট ব্যয়। K একটি ধ্রুবক।

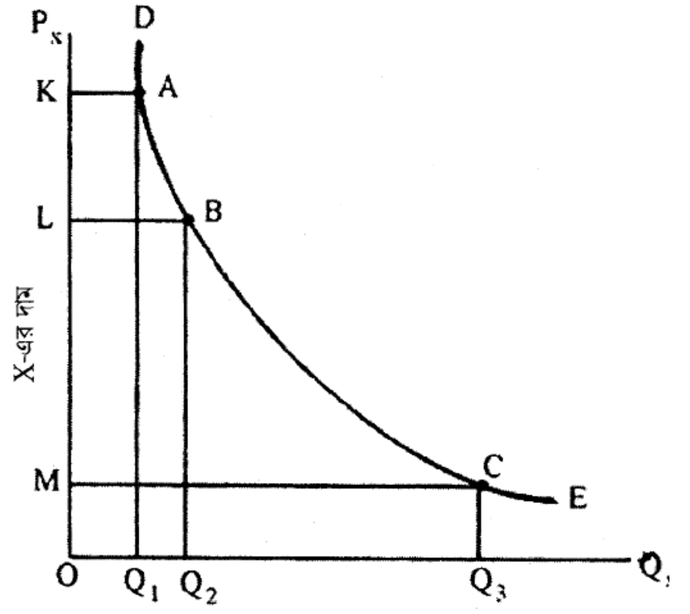

রেখাচিত্র ৪৯.৪ ঃ একক স্থিতিস্থাপক চাহিদা

X দ্রব্যের দাম (P_x) ক্রয়ের পরিমাণ (Q_x) বাড়বে। কিন্তু মোট ব্যয় (P_xQ_x) কীভাবে পরিবর্তিত হবে জানা দরকার।

একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের প্রভাবে ক্রেতার ব্যয় কী পরিবর্তন হবে সেটা চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভরশীল। প্রথমক্ষেত্রে ep>I হলে দাম ও ক্রেতার ব্যয়ের পরিবর্তন বিপরীতমুখী। অর্থাৎ X-এর দাম কমলে এই দ্রব্যের ক্রয়ে ক্রেতার ব্যয় বাড়ে এবং দাম বাড়লে কমে। দ্বিতীয়ত, ep = I হলে দামের হ্রাসবৃদ্ধি

হয় ক্রেতার ব্যয়ে পরিবর্তন ঘটায় না। সর্বশেষ অবস্থায় $ep < I$ হলে দাম কমলে ব্যয় কমে এবং দাম বাড়লে ক্রেতার ব্যয়ও বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে দাম ও ব্যয়ের পরিবর্তনের একমুখী সম্পর্ক দেখা যায়।

৪৯.১.৩ চাহিদা রেখার ঢাল ও স্থিতিস্থাপকতা

একটি চাহিদারেখা সরলরেখার আকৃতির হ'লে তার সব বিন্দুতেই ঢাল সমান থাকতে পারে। কিন্তু ঐ সব বিন্দুতে স্থিতিস্থাপকতার মান বিভিন্ন হবে। কাজেই ঢাল ও স্থিতিস্থাপকতার মান বিভিন্ন বিষয়। একই চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে এই মান বিভিন্ন প্রকার। নির্দিষ্ট বিন্দুর স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সূত্র ঃ

$\frac{\Delta q}{q} \div \frac{\Delta p}{p}$ (p = পুরনো দাম, q = পুরনো দাম, Δ= পরিবর্তন) অন্যভাবে সাজালে, $\frac{\Delta q}{\Delta p} . \frac{p}{q}$ ।

$\frac{\Delta q}{\Delta p}$ বলতে চাহিদারেখার ঢালের বিপরীত অনুপাত বোঝায়, অর্থাৎ হলো স্থিতিস্থাপকতার নির্ণায়ক। অন্য অংশটি একটি অবস্থান বা $\frac{p}{q}$ বোঝায়। একটি চাহিদারেখায় বিভিন্ন স্থিতিস্থাপকতার মানের বিভিন্ন চাহিদারেখার রৈখিক স্থিতিস্থাপকতা দেখানো হল।

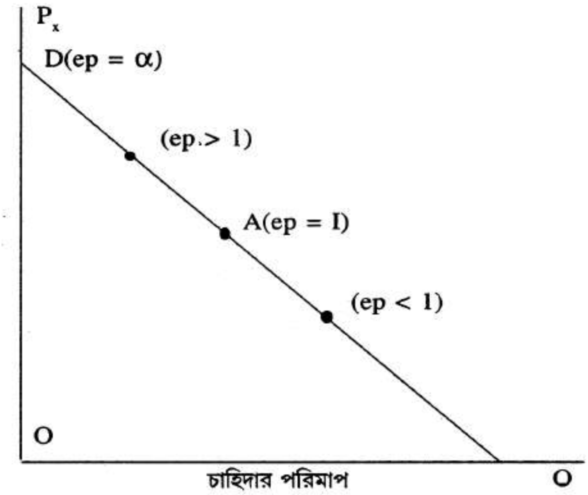

৪৯.৫ রেখাচিত্রের DD^1 চাহিদারেখায় A বিন্দুটি মধ্যবিন্দু, অর্থাৎ $DA=D^1A$। A বিন্দুতে $ep=\frac{D^1A}{DA}$, এবং ep = I, কিন্তু A বিন্দুর বামদিকে ep > I। মধ্যবিন্দুর ডানদিকে ep<I। D এবং D^1 প্রান্তবিন্দুর স্থিতিস্থাপকতার মান দুটি যথাক্রমে $ep = \alpha$ এবং $ep = 0$ সুতরাং দেখা গেল যে একই চাহিদার বিভিন্ন বিন্দুতে দামগত স্থিতিস্থাপকতার মানও বিভিন্ন হয়ে থাকে।

৪৯.২ আয়গত স্থিতিস্থাপকতা

এতক্ষণ নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ ও দ্রব্যটির দামের পরিবর্তনের সম্পর্কটি দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান দিয়ে বিশ্লেষণ করা হচ্ছিল। এক্ষেত্রে ক্রেতার আয়, অন্যান্য দাম, রুচি ইত্যাদি বিষয়গুলি অপরিবর্তিত ধরা ছিল। কিন্তু দামও অপরিবর্তিত অবস্থায় ক্রেতার আয়ের সামান্য পরিবর্তনের প্রভাব চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, তা আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বা e_M-এর সাহায্যে নিরূপণ করা হয়। শতকরা হিসেবে প্রকাশ

করে বলা হয় যে, ক্রেতার আয়ের (M) এক শতাংশ পরিবর্তনের ফলে চাহিদার যে হারে পরিবর্তন হয়, তাকেই আয়গত স্থিতিস্থাপকতা বলে। সূত্রাকারে প্রকাশ করলে,

$e_M \dfrac{\text{চাহিদার শতকরা পরিবর্তন}}{\text{আয়ের শতকরা পরিবর্তন}}$ M-এর শতকরা পরিবর্তন $= \dfrac{\Delta M}{M}.100$ এবং চাহিদার ঐ পরিবর্তন

$\dfrac{\Delta D}{D}.100$ ধরে

$$e_M = \frac{\frac{\Delta D}{D}.100}{\frac{\Delta M}{M}.100} = \frac{\Delta D}{D}.\frac{M}{\Delta M} = \frac{M}{D}.\frac{\Delta D}{\Delta M}$$

অতএব, $e_M = \dfrac{\text{মূল আয়}}{\text{মূল চাহিদা}} \times \dfrac{\text{চাহিদার পরিবর্তন}}{\text{আয়ের পরিবর্তন}}$

আয়বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বাড়লে e_M ধনাত্মক। আয় ও চাহিদার পরিবর্তন একমুখী হলে e_M ধনাত্মক। কিন্তু আয় বাড়লে যদি চাহিদা কমে, অথবা আয় কমলে যদি চাহিদা বাড়ে, তবে এই বিপরীত সম্পর্ক ঋণাত্মক। সাধারণভাবে বলা যায় যে, স্বাভাবিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে $e_M>0$ হয়ে থাকে। কিন্তু নিকৃষ্ট দ্রব্যের ক্ষেত্রে আয় বাড়লে চাহিদা কমে বলে $e_M<0$। তবে বিলাস দ্রব্যের আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান I-এর বেশি বা $e_M>I$। আয়গত স্থিতিস্থাপকতার ধারণা দিয়ে আমরা দ্রব্যের তিনরকম শ্রেণীবিভাগ করতে পারি ঃ

ক = যখন e_M ঋণাত্মক, দ্রব্যটি নিকৃষ্ট দ্রব্য।

খ = যখন e_M ধনাত্মক, স্বাভাবিক দ্রব্য।

গ = প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে e_M একের কম হবে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, একটি দ্রব্য ব্যক্তির নিম্ন আয়স্তরে বিলাস দ্রব্য, উঁচু মধ্যবর্তী আয়স্তরে প্রয়োজনীয়, কিন্তু বেশি আয়ের উঁচু স্তরে সেটাই নিকষ্ট দ্রব্য হয়ে উঠতে পারে।

৪৯.২.১ পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা (Cross eleasticity of demand) :

এক দ্রব্যের চাহিদা নিজদাম ও ক্রেতার আয় ছাড়াও সম্পর্কযুক্ত অন্য দ্রব্যে সমূহের দামের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত হয়। এক্ষেত্রে সম্পর্কযুক্ত অন্য একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের প্রভাবে নির্দিষ্ট দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণের যে হারে পরিবর্তন হয় তাকেই চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বলে। X এবং Y দুটি দ্রব্যের মধ্যে প্রথমটির দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় Y-এর দাম কম বা বেশি হলে X-এর চাহিদার পরিমাণে যে পরিবর্তন হয়, সেই শতকরা হিসাব থেকে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার (e_{xy}) মান জানা যায়। উদাহরণ হিসাবে, কফির দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় চায়ের দাম বাড়লে কফি ক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে। এ দুটি পরস্পরের বিকল্প দ্রব্য ধরা যায়। আবার পরিপূরক বা Complements দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একটির সঙ্গে অপরটির চাহিদার একই রকম হেরফের হয়ে থাকে। টর্চের দাম বাড়লে ঐ সঙ্গে ব্যবহৃত ব্যাটারির চাহিদাও কমে যায়, কারণ এই দু'টি পরস্পরের পরিপূরক দ্রব্য। পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণার সাহায্যে বিভিন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিকল্প বা পরিপূরক সম্পর্কটি বোঝা যায়।

X দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ Qx এবং Y দ্রব্যের দাম Py দিয়ে, আয় পরিবর্তন 'Δ' চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করলে,

$$e_{xy} = \frac{\frac{\Delta Qx}{Qx}}{\frac{\Delta Py}{Py}} = \frac{\Delta Qx}{\Delta Py}.\frac{Py}{Qx}$$

যদি X ও Y দ্রব্য দুটি পরস্পরের পরিবর্ত হয় তবে ধনাত্মক হবে। কিন্তু দু'টি দ্রব্য পরস্পরের পরিপূরক হলে e_{xy} হবে ধনাত্মক মান বিশিষ্ট, অর্থাৎ Y এর দাম বাড়লে অপরটির চাহিদাও কমবে। দুটি দ্রব্যের মধ্যে এরকম কোনও সংবেদনশীলতা না থাকলে $e_{xy}=0$ হবে। চা এবং কফি এই দুটি পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদনকারী সংস্থার বা টর্চ ও ব্যাটারি দুটি পরিপূরক দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতার ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৪৯.২.২ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়

দাম পরিবর্তনের প্রভাবে দ্রব্যের চাহিদার সংবেদনশীলতা সবক্ষেত্রে এক রকম হয় না। স্থিতিস্থাপকতা অনেকগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমত, দ্রব্যের প্রকৃতি। প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক জিনিসের ক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়। কাপড়, চিনি, কেরোসিন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণকে বিশেষ প্রভাবিত করে না। বিলাস বা শৌখিন দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক। এসব ক্ষেত্রে দামের পরিবর্তন চাহিদার পরিমাণে বেশী পরিবর্তন আনে।

দ্বিতীয়ত, চাহিদার সংবেদনশীলতা দ্রব্যের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। গাড়ি, টিভি ইত্যাদি দ্রব্য অনেকদিন ধরে ভোগ করা চলে। এক্ষেত্রে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু অধিকাংশ আহার্য বা পানীয় অস্থায়ী। অস্থায়ী দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

তৃতীয়ত, দ্রব্যের বহুব্যবহার থাকলে কম দাম দ্রব্যটির ব্যবহার ও চাহিদা বৃদ্ধি করে। দাম কমলে চাহিদা সংকুচিত হয়। যেমন বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার। বহু ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

চতুর্থত, ভোগ বিরতির সম্ভাবনা থাকলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক। যেমন, বিভিন্ন বিলাসদ্রব্য। কিন্তু ওষুধ ব্যবহার বিরতি দেওয়া যায় না বলে রকম জিনিসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

পঞ্চমত, একটি দ্রব্যের অনেক পরিবর্ত বা বিকল্প থাকলে চাহিদা স্থিতিস্থাপক হবে। একটির দাম বাড়লে ক্রেতা অপেক্ষাকৃত কম বা অপরিবর্তিত দামের বিকল্প দ্রব্য ব্যবহার করবে, বর্ধিত দামের জিনিসটির চাহিদা কমে যাবে। কিন্তু লবণের বিকল্প না থাকায় চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

সর্বোপরি, দেখতে হবে যে, দাম পরিবর্তনের পরিমাণ সামান্য না বেশি। পানের দাম প্রতি একশোতে পাঁচ টাকা বাড়লে ক্রেতা সেটা সামান্যই মনে করে চাহিদার পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখতে পারে। ফলে চাহিদা অস্থিতিস্থাপক। কিন্তু দামের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদারও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে স্থিতিস্থাপকতা বাড়ে।

তবে স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী উপরোক্ত বিষয়গুলির মূলে আছে ক্রমবাচক নিরপেক্ষতা তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আলোচিত দামপ্রভাব বা আয় ও পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টিগত প্রক্রিয়া। প্রধানত দামপ্রভাবের ফলেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার তারতম্য ঘটে। এই সঙ্গে ক্রেতার আয়ের কত অংশ বিশেষ দ্রব্যের জন্য ব্যয় করে এবং দেশে সাধারণ মূল্যস্তর কম না বেশি—এ দুটিও স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে।

৪৯.৩ সারাংশ

একটি দ্রব্যের দাম ও তার চাহিদার পরিমাণের সম্পর্ক বিচার উভয়ের সংবেদনশীলতারও পরিচয় দেয়। ব্যবসায় ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের প্রভাবে চাহিদার পরিমাণ কতটা পরিবর্তিত হতে পারে তার পরিমাপ প্রয়োজন। একটি দ্রব্যের নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারণ করার পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। দাম সামান্য

পরিবর্তন হলে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন না হলে স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য বা সর্বাধিক অনন্তের সমান হতে পারে। সর্বনিম্ন শূন্য এবং সর্বোচ্চ অনন্ত—এই দুই সীমার মধ্যে স্থিতিস্থাপকতার মান ep=I, ep>I, ep<I ইত্যাদি হতে পারে। চাহিদারেখা সরল রেখা আকৃতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি বিন্দুতে সূত্রের সাহায্যে সংবেদনশীলতা স্থির করা যায়।

অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন ঘটলেও চাহিদার পরিবর্তন হয়। আয়ের শতকরা পরিবর্তনের সঙ্গে চাহিদার পরিমাণে শতকরা পরিবর্তনের হিসাব থেকে আয়গত স্থিতিস্থাপকতার মান পাওয়া যায়। এই মান থেকে দ্রব্যটি কী প্রকৃতির ধারণা করা যায়। প্রকৃতি অনুযায়ী একটি দ্রব্য কখনও স্বাভাবিক, কখনও বিলাস দ্রব্য, আবার কখনও নিকৃষ্ট দ্রব্য হয়ে উঠতে পারে। সাধারণভাবে এই মান ধনাত্মক হলেও অনেক সময় ঋণাত্মকও হয়ে থাকে।

আবার x, y দুটি দ্রব্যের মধ্যে একটির দাম পরিবর্তন অন্যটির চাহিদার পরিমাণেও পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা বিচারের প্রয়োজন হয়। এখানেও পারস্পর স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারণের সূত্রটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই ভিত্তিতে দুটি দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তনীয় বা পরিপূরক সম্পর্ক বোঝা যায়।

এইভাবে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ধারণকারী বিষয়গুলিও বোঝা যায়। প্রয়োজনীয় বা শৌখিন দ্রব্য ছাড়াও, দ্রব্যের স্থায়িত্ব, বহু ব্যবহার, ভোগ-বিরতির সম্ভাবনা, দাম পরিবর্তনের পরিমাণ, আয়ের কত অংশ দ্রব্যটির জন্য ব্যয় হচ্ছে এবং দেশের সাধারণ মূল্যস্তর ইত্যাদি বিষয়ও দামগত স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে। মোট কথা, চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মান আয় ও পরিবর্ত প্রভাবের সমষ্টিগত প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

৪৯.৪ অনুশীলনী

১। একটি দ্রব্যের নিজ দামগত স্থিতিস্থাপকতার মান নির্ধারণের সূত্রটি মনে রাখুন।

২। চাহিদারেখার খাড়াই থেকে চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বোঝবার চেষ্টা করুন। (৪৯.৩ রেখাচিত্র)।

৩। দাম ছাড়া অন্য দুটি এমন বিষয় উল্লেখ করুন যেগুলির প্রতি দ্রব্যের সংবেদনশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

উঃ। আয়গত ও পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা দেখুন।

৪। স্থিতিস্থাপকতার ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে দ্রব্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা চলে কি?

উঃ। স্বাভাবিক, নিকৃষ্ট, বা শৌখিন দ্রব্য এবং বিকল্প বা পরিপূরক দ্রব্যের আলোচনা দেখুন।

একক ৫০ ◆ যোগানের নিয়ম স্থিতিস্থাপকতা

গঠন

৫০.০ উদ্দেশ্য

৫০.১ ফার্মের যোগান রেখা ও যোগানের নিয়ম

৫০.১.১ যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম

৫০.২ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

৫০.৩ সারাংশ

৫০.৪ অনুশীলনী

৫০.০ উদ্দেশ্য

নির্দিষ্ট সময়ে একটি ফার্ম X দ্রব্যের ঠিক কত একক বিক্রি করতে চাইবে সেটা দ্রব্যের চাহিদার মতো কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। X দ্রব্যটির দাম, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দ্রব্যগুলির দাম, X-এর উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদানগুলির দাম, প্রযুক্তি এবং কখনও উৎপাদকের পছন্দ বা রুচির উপর নির্ভর করে। চাহিদার নিয়মের ক্ষেত্রে দামছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির ধরে একটি দ্রব্যের যোগানকে শুধু তার দামের পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বলা হয়। X দ্রব্যের দাম, px এবং তার যোগানের পরিমাণের S_x এসম্পর্ক থেকে যোগান অপেক্ষকটি প্রস্তুত করে যোগানের নিয়ম জানা যায়। আবার, চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন P_x-এর পরিবর্তনের প্রভাবে Q_x-এর সংবেদনশীলতা হিসেব করা হয়, যোগানের ক্ষেত্রেও তেমনি S_x সঙ্গে দ্রব্যটির P_x-এর পরিবর্তনের সম্বন্ধ পরিমাপ করতে হয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান বিচার করে। আলোচ্য ৫০.১ এককে আমরা প্রধানতঃ দ্রব্যের যোগানের দিকের নিয়ম এবং যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথম পর্যায়ে দাম ব্যবস্থার কার্যাবলী আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, বাজারে চাহিদা ও যোগানের প্রতিক্রিয়া থেকেই ভারসাম্য ক্রয় ও বিক্রয় হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা দেখছি যে, ভোগকারী চাহিদা ও তার সংবেদনশীলতা দাম ব্যবস্থার একটি দিক। আলোচ্য বিভাগে আমরা যোগানের দিকটির কয়েকটি বিষয় বিশ্লেষণ করবো। এভাবে যোগানরেখার প্রকৃতিটি বোঝা যাবে। অবশ্য ফার্মের দ্রব্য উৎপাদন ও যোগান পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনার বিষয়।

৫০.১ ফার্মের যোগানরেখা ও যোগানের নিয়ম

নির্দিষ্ট সময়ে X দ্রব্যের দাম নির্দিষ্ট অবস্থায় বিক্রেতা দ্রব্যটির যে-পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত তার সমন্বয়ে থেকে বিক্রেতার যোগানসূচী পাওয়া যায়। অর্থের সাহায্যে দ্রব্যের দাম বা P_x এবং যোগানের পরিমাণ S_x দ্বারা প্রকাশ করে বিভিন্ন p_x ও S_x-এর সমন্বয়গুলি রেখাচিত্রে দুটি অঙ্কে চিহ্নিত করে আমরা

বিক্রেতার যোগানসূচী বা যোগানরেখা আঁকতে পারি। পদ্ধতিটি চাহিদা রেখা অঙ্কনের মতো। নিচে এরকম কল্পিত যোগানসূচী ও বিক্রেতার যোগানরেখা ৫০.১ রেখচিত্রে আঁকা হয়েছে।

রেখাচিত্রে QS_x, রেখাটি X দ্রব্যের যোগানরেখা। P_x অক্ষে X-এর দাম যত বাড়ছে, আনুভূমিক অক্ষে বিক্রেতার যোগানের পরিমাণও (S_x) ততই বাড়ছে। P_x ও S_x এর সম্পর্ক একমুখী বলে যোগানরেখা বামদিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বমুখী বা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন। বেশি দামে যোগান বাড়ে, কম দামে কমে। চাহিদারেখার ক্ষেত্রে যেমন বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদা যোগ করে বাজার চাহিদা রেখা পাওয়া যায়, তেমনি বিক্রেতার ক্ষেত্রেও একটি দ্রব্যের সব বিক্রেতার যোগানের সমষ্টি বাজার যোগান রেখা। বাজার যোগান রেখাও উর্ধ্বমুখী ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন। দাম বাড়লে যোগান বাড়ে। এ-সম্পর্কই যোগানের নিয়ম।

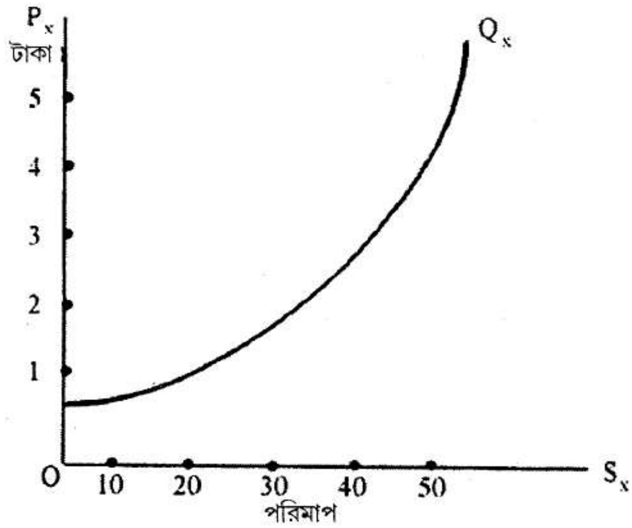

রেখাচিত্র ৫০.১ ঃ X-এর যোগন রেখা

একটি দ্রব্যের যোগানের মূলে দুটি বিষয় বিচার্য। একটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়, অপরটি মুনাফার অংশ। উৎপাদন ব্যয়ের তুলনায় বাজার বেশি হ'লে বিক্রেতার মুনাফা বাড়ে, যোগান বৃদ্ধির উৎসাহ সৃষ্টি হয়। বিপরীত অবস্থায়, বাজারদাম উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা কম হলে মুনাফা কমে, বিক্রেতার উৎসাহ কমে, যোগানও হ্রাস পায়। দ্রব্য বিক্রয়ের সবদিক বিবেচনা করে ফার্ম একটি সর্বনিম্ন দাম হিসেব করে রাখে। দ্রব্যটির বাজার দাম এরকম সর্বনিম্ন দামেরও কম হ'লে বিক্রেতারা ঐ কম দামে বিক্রি বন্ধ করে দেবে। দাম-মুনাফা ব্যবস্থার প্রভাবেই যোগানরেখা। রেখাচিত্রের S_x রেখাটির মতো ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়, যোগানের সূত্রটি কার্যকর হয়। যে দ্রব্যের দাম বাড়ে, ফার্ম বা বিক্রেতাগণ সে-দ্রব্য বেশি উৎপাদন ও সরবরাহে উৎসাহিত হয়, যোগান বাড়ে।

৫০.১.১ যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম

যোগানের নিয়মটি সাধারণভাবে কার্যকর হলেও ব্যতিক্রমও দেখা যায়। শ্রমের বাজারে মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি না পেয়ে কমে যেতে পারে। দিনের বেশি সময় ধরে কাজ করার অর্থ শ্রমিকের বিশ্রামের সময় হ্রাস। মজুরির হার বাড়লে কম সময় কাজ করেও শ্রমিক সমান সময় ধরে কাজ করে আগের থেকে বেশি বা সমপরিমাণ অর্থ উপায় করতে পারে। তখন, উচ্চ মজুরির হার শ্রমিককে কম সময় ধরে কাজ করে বেশি সময় ধরে বিশ্রামে প্রেরণা দিতে পারে।

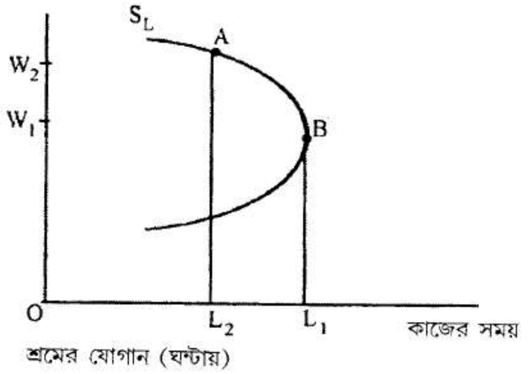

রেখাচিত্র ৫০.২ ঃ পশ্চাদগামী যোগান রেখা

ফলে শ্রমের দাম বৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগান কমে যেতে পারে। ফলে মজুরির হার বাড়লেও শ্রমের যোগানরেখা ঊর্ধ্বমুখী না হয়ে বাঁদিকে ঝুঁকে যেতে পারে। একে পশ্চাদ্‌গামী যোগানরেখা বলে। ৫০.২ রেখাচিত্রে এরকম যোগানরেখা দেখানো হ'ল।

এখানে উল্লম্ব অক্ষে মজুরির হার এবং আনুভূমিক অক্ষে ঘণ্টা হিসেবে শ্রমের যোগান ধরা হয়েছে। S_1 রেখাটি শ্রমের যোগানরেখা। S_1 রেখায় B বিন্দু পর্যন্ত, বা W_1 মজুরির হার পর্যন্ত শ্রমের যোগান রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন। কিন্তু মজুরির হার আরও বেড়ে OW_2 হলে শ্রমের যোগান OL_1 থেকে কমে OL_2 হবে। অর্থাৎ, B পরেও মজুরির হার বৃদ্ধির অর্থ কাজের সময় বা শ্রমের যোগান হ্রাস। এরকম ক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। আবার দীর্ঘকাল একটি শিল্পে সমব্যয়ের নিয়মটি কার্যকর হলে যোগানরেখা আনুভূমিক অক্ষের সমান্তরাল একটি সরলরেখার রূপ নিতে পারে। নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। ফলে, উৎপাদনের উপকরণগুলির দাম অপরিবর্তিত থাকলে একই ব্যয়ে দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রে যোগানের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। সর্বোপরি, একটি দ্রব্যের যোগান যদি একটি মাত্র এককের বেশি না হয়, যেমন প্রসিদ্ধ শিল্পকর্ম 'মোনালিসা' ছবিটি দাম যতই বাড়ুক যোগান স্থির। এরকম নির্দিষ্ট যোগানের ক্ষেত্রে যোগানের ক্ষেত্রে যোগান রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের উপর লম্ব এবং উল্লম্ব অক্ষের সমান্তরাল রেখা হবে।

৫০.২ যোগানের স্থিতিস্থাপকতা

দ্রব্যের চাহিদা যেমন তার দাম পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল, যোগানও তেমনি দামের প্রতি সংবেদনশীল। দামের সামান্য পরিবর্তনের প্রভাবে যদি একটি দ্রব্যের যোগান খুব বেশি পরিবর্তিত হয়, তবে দ্রব্যটির যোগান স্থিতিস্থাপক। অন্যদিকে, দামের সামান্য পরিবর্তন যদি দ্রব্যটির যোগানে সমান অপেক্ষা কম পরিবর্তন আনে, তবে দ্রব্যটির যোগন অস্থিতিস্থাপক বলা হয়। একই যোগানরেখার এক বিন্দু থেকে অন্য

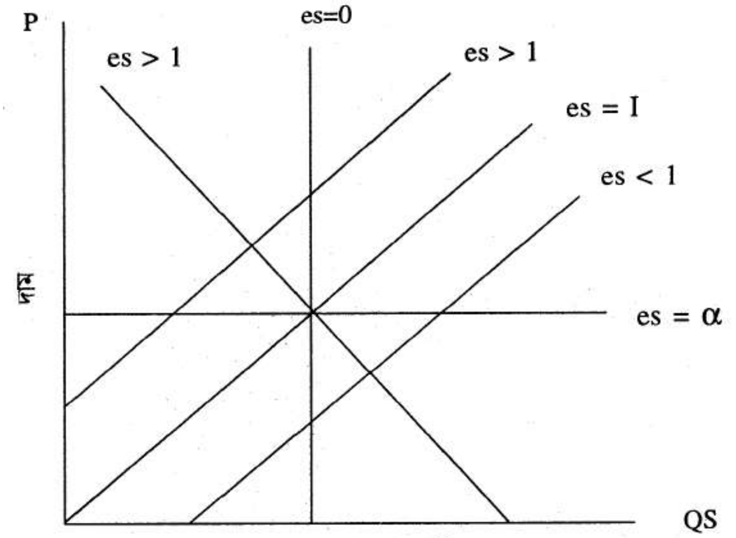

রেখাচিত্র ৫০.৩ ঃ স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মান সম্পন্ন যোগান রেখা

বিন্দুতে পরিবর্তন থেকে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান (e_x) পরিমাপ করা যায়। কাজেই,

$$e_x = \frac{\text{যোগান পরিবর্তনের হার}}{\text{দাম পরিবর্তনের হার}} = \frac{\text{যোগান পরিবর্তন}}{\text{মূল যোগান}} \div \frac{\text{দামের পরিবর্তন}}{\text{মূল দাম}}$$

q = যোগান, p = দাম, এবং Δ= পরিবর্তন ধরলে

$$e_s = \frac{\Delta q}{q} \div \frac{\Delta p}{q} \times \frac{p}{\Delta p} = \frac{p}{q} \times \frac{\Delta q}{\Delta p}$$

উদাহরণ হিসেবে, যদি দ্রব্যের মূল্য ৪০০ টাকা থেকে বেড়ে ৫০০ টাকা হওয়ায় যোগান ২০০০ একক থেকে বেড়ে ৩০০ একক হয়, তবে, e_s-এর মান ঃ

$$= e_s = \frac{400}{2000} \times \frac{1000}{100} = 2$$

দুই অক্ষবিশিষ্ট রেখাচিত্রে বিভিন্ন মান অনুযায়ী বিভিন্ন সরলরৈখিক যোগানরেখা নিচে দেখানো হ'লো।

রেখাচিত্রে $e_s = 0$, মান সম্পন্ন যোগানরেখায় স্থিতিস্থাপকতা শূন্য। দাম যাই হোক না কেন, যোগানের পরিমাণ স্থির। বিপরীত মেরুতে $e_s = a$ রেখায় যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বা অনন্ত। এই দুই সীমার মধ্যে e_s-এর মান $e_s = 1e_s > I$, $e_s < 0$, বা $e_s < 0$ (ঋণাত্মক) হতে পারে। ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন যোগারেখায় দ্রব্যের দাম বাড়লে বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পায়। e_s-এর মান যাই হোক না কেন। আবার, দাম কমলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় কমে যাবে যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান যাই হোক না কেন।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতার ক্ষেত্রে সময়ের গুরুত্ব অসীম। দাম পরিবর্তনের সঙ্গে যোগানের পরিমাণের পরিবর্তন সময়সাপেক্ষ। দাম ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে যথেষ্ট সময় পাওয়া গেলে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কৃষিপণ্য উৎপাদন মরশুমী ব্যাপার বলে অল্প সময়ের মধ্যে যোগান বৃদ্ধি সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ে যোগান অস্থিতিস্থাপক, e_s=0। কিন্তু বেশি সময়ের মধ্যে কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি করে যোগান বৃদ্ধি করা চলে, তখন যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপাদানগুলি সহজে পাওয়া গেলে দাম বাড়ার প্রায় একই সঙ্গে যোগানও বাড়তে পারে। অর্থাৎ যোগান স্থিতিস্থাপক হতে পারে।

তৃতীয়ত, চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য করতে কত সময় প্রয়োজন, তাও যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে। একাজে উৎপাদন-কৌশলের প্রয়োগ কতটা সময়সাপেক্ষ, তাও স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করে।

চতুর্থত, কারখানার যন্ত্রপাতি যদি সহজেই অন্য দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার সম্ভব হয়, তবে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়।

এইসব বিষয়, বিশেষ করে প্রযুক্তির পরিবর্তন ও সময় যোগানরেখার স্থান পরিবর্তন বা অপসারণের মূল শক্তি।

৫০.৩ সারাংশ

ফার্মের বা বিক্রেতার কাছে দ্রব্যের চাহিদার মতো যোগানও গুরুত্বপূর্ণ। চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যের যোগান দিতে পারলেই মুনাফার সম্ভাবনা। যদিও বেশি দামে বেশি যোগান দেওয়া সম্ভব। একটি দ্রব্যের দাম ও তার

যোগানের পরিমাণের সম্পর্ক থেকে যোগানের নিয়ম পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে দাম ও যোগানের একমুখী সম্পর্ক থেকে বিক্রেতার ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন ঊর্ধ্বমুখী যোগানরেখা পাওয়া যায়। তবে যোগানের এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম আছে শ্রমের যোগানরেখার ক্ষেত্রে। উচ্চ মজুরির হারে অতিরিক্ত ঘণ্টা পরিশ্রম অপেক্ষা বিশ্রাম পছন্দ হ'লে শ্রমের মজুরি বৃদ্ধি হলেও তার যোগান কমে যাবে। যোগানরেখাটি একটি পর্বে পশ্চাদ্‌গামী হবে।

চাহিদার মতো যোগানও দাম পরিবর্তনের সঙ্গে সংবেদনশীল। যোগানের সংবেদনশীলতা বা স্থিতিস্থাপকতাও দাম ও যোগানের পরিবর্তনের শতকরা হিসেব করে পাওয়া যায়। e_s-এর মান অনুযায়ী $e_s=0$, $e_s=\alpha$, $e_s=1$, $e_s<I$, $e_s>I$ ইত্যাদি মানসম্পন্ন বিভিন্ন যোগানরেখা পাওয়া যায়। একই রেখাচিত্র বিভিন্ন মানের স্থিতিস্থাপকতা সম্পন্ন যোগানরেখাগুলো আঁকলে এগুলির তুলনা স্পষ্ট হয়। দাম ছাড়া অন্যান্য কিছু বিষয় যোগানের স্থিতিস্থাপকতাকে প্রভাবিত করলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হ'লো সময়।

৫০.৪ অনুশীলনী

১। বিক্রেতার যোগানরেখা অঙ্কন অভ্যাস করুন।

২। দাম ও যোগানের একমুখী সম্পর্কটি মনে রাখুন।

৩। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা পরিমাপের সূত্রটি মনে রাখুন।

৪। স্থিতিস্থাপকতার বিভিন্ন মানসম্পন্ন আলাদাভাবে কয়েকটি যোগানরেখা অঙ্কনের অভ্যাস করুন।

একক ৫১ ◆ উৎপাদনের নিয়ম ঃ স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল

গঠন

৫১.০ উদ্দেশ্য

৫১.১ স্বল্পকালীন উৎপাদনের নিয়ম

৫১.১.১ স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক

৫১.১.২ মোট গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

৫১.১.৩ পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম

৫১.১.৪ উৎপাদনের তিনটি পর্যায়

৫১.২ দীর্ঘকালীন উৎপাদনের নিয়ম

৫১.২.১ সমোৎপাদন রেখা

৫১.২.২ সমব্যয় রেখা

৫১.২.৩ ফার্মের ভারসাম্য

৫১.৩ কব ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক

৫১.০ উদ্দেশ্য

মানুষের অভাব মেটাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সেবা উৎপন্ন করে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি। উৎপাদনের কাজে প্রয়োজন হয় জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি উপকরণের বিভিন্ন সমন্বয়। কোন উপাদানের মতো একক ব্যবহার করে একটি দ্রব্যের কত পরিমাণ উৎপন্ন করা যেতে পারে, তার অনেকটাই ফার্মের প্রযুক্তি নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত। চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন ভোগকারীর লক্ষ্য সর্বাধিক তৃপ্তিলাভ, উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ফার্মের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে ফার্মকে বিভিন্ন উপকরণ ও প্রযুক্তির এমন সমাবেশ গ্রহণ করতে হয় যাতে উপকরণগুলির ব্যবহার সর্বোত্তম, বা ন্যূনতম ব্যয়ে সর্বাধিক উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্ম দ্রব্যের দামকে বিশেষ প্রভাবিত করতে পারে না। কাজেই সর্বাধিক মুনাফার লক্ষ্য পূরণ হতে পারে উৎপাদন ব্যয় যতটা সম্ভব কম ক'রে। ব্যয় কম করতে হলে উপকরণগুলির ব্যবহার ও প্রযুক্তি নির্বাচন এমন হতে হবে যাতে কম ব্যয়ে বেশি উৎপন্ন করা সম্ভব হয়। বেশি পরিমাণ উৎপন্ন ও বিক্রি করে ফার্মের আয় বাড়ে। কাজেই দ্রব্য উৎপাদনের সময় ফার্মের প্রযুক্তি নির্বাচন ও উপকরণ সমাবেশ বিষে গুরুত্বপূর্ণ। উপকরণ সমাবেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম হতে পারে। সময়ের তারতম্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রভাব ফেলে উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায়। তৃতীয় পর্যায়ের শেষে আমরা দেখেছি যে, স্বল্পকালে দ্রব্যের যোগান কম পরিবর্তনশীল হলেও দীর্ঘকালে অনেক বেশী পরিবর্তনশীল।

উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তেমনি উপাদান সমাবেশের কাজে পরিবর্তনীয়তার সম্ভাবনা স্বল্পকালে সীমিত। কিন্তু দীর্ঘকালে এ-সম্ভাবনা অনেক বেশি। উপাদানগুলির একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহারের, অথবা কয়েকটির ব্যবহার হ্রাসবৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের সাধারণ নিয়ম কার্যকর হয়। বর্তমান পর্যায়ে আমরা উপাদান ব্যবহার ও উৎপন্নের সাধারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করবো।

উৎপাদন বলতে বাস্তব দ্রব্যসামগ্রী বা বিভিন্ন সেবা সৃষ্টি বোঝায়। এখানে আমরা বাস্তব বা বস্তুগত উৎপাদন নিয়েই আলোচনা করবো, বিশ্লেষণের সুবিধার জন্য। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাড়াতে হলে ফার্ম দু'ভাবে কাজ করতে পারে। নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন বাড়াতে ফার্ম প্রথমে একটি বা দুটি উপকরণ বেশি, অন্যগুলির ব্যবহার অপরিবর্তিত রেখে, অগ্রসর হতে পারে। কৃষক শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে জমির পরিমাণ স্থির রেখে সার, বীজ, জলসেচ ইত্যাদির বেশি ব্যবহার করতে অতিরিক্ত মূলধন ব্যবহার বা কয়েকজন বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে পারে। শিল্পক্ষেত্রেও ফার্ম মেশিন, যন্ত্রপাতির পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে বেশী শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারে। স্বল্পকালে কৃষি বা শিল্প—উভয় ক্ষেত্রেই কিছু উপকরণ স্থির এবং কিছু পরিবর্তনশীল। প্রযুক্তিও অপরিবর্তিত থাকে। আর একটি উপায় হলো, সময়সাপেক্ষে, ফার্ম উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রয়োজনমতো বৃদ্ধি করতে প্রায় সব উপাদানের ব্যবহার বাড়িয়ে উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তন করতে পারে। একাজে প্রযুক্তির পরিবর্তনও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। উৎপাদনের মাত্রাগত পরিবর্তন স্বল্পকালে সম্ভব হয় না, দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই দ্রব্য উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন উপকরণের বিভিন্ন ব্যবহার থেকে স্বল্প ও দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদনের নিয়মগুলি বিচার করা ফার্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ফার্মের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে উপকরণগুলির পরিমাণের বিভিন্ন সম্পর্কের প্রয়োজনীয় কয়েকটি দিক আমরা বিশ্লেষণ করবো।

৫১.১ স্বল্পকালীন উৎপাদনের নিয়ম

এই পর্যায়ে আলোচিত বিভাগের গঠনশৈলী নিম্নরূপ।

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক

মোট, গড়, ও প্রান্তিক উৎপাদন

পরিবর্তনশীল অনুপাতের নিয়ম

উৎপাদনের তিন পর্যায়

৫১.১.১ স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক

নির্দিষ্ট সময়ে ফার্ম কিছু পরিমাণ উৎপাদনের উপাদান ও বিশেষ কারিগরি কৌশলের ব্যবহার করে সময়ের এককপ্রতি একটি দ্রব্যের সর্বাধিক যে পরিমাণ উৎপন্ন করতে পারে, সে সম্বন্ধই উৎপাদন তত্ত্বে আলোচিত হয়। কাজেই X দ্রব্যের উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণের সময় অনুযায়ী ব্যবহার বোঝাতে উৎপাদন অপেক্ষকের ধারণাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট পরিমাণ X দ্রব্য উৎপন্ন করতে। নির্দিষ্ট কারিগরি কৌশল অনুযায়ী উপকরণের কত একক ব্যবহার করা চলে, সেই ক্রিয়াগত সম্পর্ক একটি উৎপাদন অপেক্ষক প্রকাশ করে থাকে। যদি দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধি একটি মাত্র উপকরণের ব্যবহার বৃদ্ধি করেই সম্ভব

হয়, তবে X-এর উৎপাদন অপেক্ষকটি নিচের সাংকেতিক রূপ নিতে পারে ঃ

$$x = f(\bar{N},L),$$

এখানে, X = উৎপন্ন দ্রব্য, N = ব্যবহৃত জমি, L = শ্রম, এবং f = কারিগরি সৌশলের প্রকৃতি বোঝাচ্ছে। জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট বা স্থির বোঝাতে N বর্ণটির উপরে মাত্রা চিহ্নটি দেওয়া হয়েছে। অপেক্ষকটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে শ্রম নিয়োগ করতে X দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ কতটা হবে তা বোঝা সম্ভব হতে পারে। এখানে ধরা আছে যে, ফার্ম নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি ও উৎপাদন কৌশলের সঙ্গে বিভিন্ন একক শ্রম নিয়োগ করে দ্রব্যটি উৎপন্ন করতে পারে। অর্থাৎ উৎপাদনের সময়সীমার মধ্যে শুধু শ্রমের ব্যবহার পরিবর্তনশীল, অন্যান্যগুলি স্থির উপাদান।

পরিবর্তনশীল বা স্থির উপকরণের ধারণাটি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বল্পকালে উৎপাদনে ফার্মের কাছে কিছু উপকরণের ব্যবহার স্থির। আর কিছু উপকরণ ব্যবহার সহজেই হ্রাসবৃদ্ধি করা চলে। সাধারণত জমি, মেশিন যন্ত্রপাতি, সংগঠকের সেবা ইত্যাদি স্বল্পকালে স্থির থাকে। এই সময়ের ব্যপ্তির মধ্যে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা বাড়লে কিছু একক শ্রমের ব্যবহার বা নিয়োগ বৃদ্ধি করে চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখা যায়। কলকারখানায় একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে দৈনিক আট ঘণ্টার সঙ্গে আরও কিছু সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে আর এক শিফ্‌ট চালু করে উৎপাদন বাড়ানো যায়। কম উৎপন্নের প্রয়োজন হলে শিফ্‌ট কমিয়ে কম শ্রম ব্যবহার করা যেতে পারে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট জমিতে বেশি শ্রম নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি বা কম শ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন হ্রাস করা চলে। শিল্প বা কৃষি কোন ক্ষেত্রেই স্বল্পকালে মেশিন, যন্ত্রপাতি বা জমির পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব হয়না। কাজেই স্বল্পকালীন অবস্থায় উৎপাদনের কিছু উপকরণ স্থির, কিছু পরিবর্তনশীল। দীর্ঘকালেই বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী সব উপকরণের সমাবেশে ফার্ম উৎপাদনের পরিমাণে যথাযথ পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উপরে X দ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষকটি স্বল্পকালীন। এখানে জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ (N) কিন্তু শ্রমের (L) ব্যবহার পরিবর্তনশীল।

৫১.১.২ মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

ইতিপূর্বে ২ পর্যায়ে ভোগকারীরা চাহিদা তত্ত্বের ভিত্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা একটি দ্রব্যের বিভিন্ন এককের ভোগ থেকে প্রাপ্ত উপযোগ বা দুটি দ্রব্যের বিভিন্ন সমন্বয় থেকে তৃপ্তির স্তরক্রম সাজানোর ক্ষেত্রে মোট ও প্রান্তিক উপযোগের ধারণার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। সেখানে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ভোগ থেকে ভোগকারীর তৃপ্তির বৃদ্ধি বা হ্রাস বোঝার চেষ্টা হয়েছে। ফার্মের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তেমনি একটি দ্রব্যের উৎপন্নের পরিমাণ ও উপকরণ ব্যবহারের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মোট ও প্রান্তিক উৎপাদনের (TP, MP) পরিবর্তনের ধারণা দুটি জানা প্রয়োজন। উৎপাদনে আর একটি প্রাসঙ্গিক ধারণা হল গড় উৎপাদন বা AP। ভোগ বা উৎপাদনের বিশ্লেষণে এ সাদৃশ্য থাকলেও মনে রাখতে হবে যে, উভয়ের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য আছে। ভোগের ক্ষেত্রে উপযোগের হ্রাসবৃদ্ধি নির্দিষ্টভাবে মাপা যায় না। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবহার পরিবর্তনের ফলে দ্রব্যের উৎপাদনে হ্রাসবৃদ্ধি বাস্তব উৎপাদনের পরিবর্তন দিয়ে নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা যায়। উৎপন্ন দ্রব্যের পরিবর্তন পরিমাপে সেরকম জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই।

যাই হোক স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক অনুযায়ী L উপকরণটির ব্যবহার পরিবর্তনীয়। জমির পরিমাণ স্থির অবস্থায় ক্রমশ বেশি একক L ব্যবহার করে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণে যে প্রতিদানের নিয়মটি কার্যকর

হয় তা নিজের সারণিতে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে মোট, গড় ও প্রান্তিক প্রতিদানের হিসাব থেকে বোঝা যায়।

উৎপাদন অপেক্ষকে জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং শ্রম পরিবর্তনীয় উপাদান ধরা হয়েছে। নির্দিষ্ট জমিতে শ্রম নিয়োগ করে যে পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন বা TP_2 বলে। আবার শ্রমের ব্যবহারের ফলে TP_2 এর পরিমাণকে ব্যবহৃত শ্রমের একক (যেমন কত ঘণ্টা শ্রম ব্যবহৃত হলো ইত্যাদি) সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে শ্রমের একক পিছু উৎপাদন বা গড় উৎপাদন (AP_2) পাওয়া যায়।

অঙ্কের হিসাবে,

$$AP_2 = \frac{TP_2}{\text{শ্রমের একক সংখ্যা}}$$

আবার, নির্দিষ্ট জমিতে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পায় তাকে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন বা MP_2 বলা হয়। Δ চিহ্নটি দিয়ে পরিবর্তন বোঝালে MP_L-এর হিসাব নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।

$$MP_L = \frac{\Delta TP}{\Delta L} = \frac{\text{মোট উৎপাদনের পরিবর্তন}}{\text{শ্রমের পরিমানের পরিবর্তন}}$$

স্থির উপকরণের সঙ্গে একটি পরিবর্তনীয় উপকরণ ব্যবহার করে নির্দিষ্ট সময়ে মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্ক নিচে ৫১.১ সারণিতে সাজানো হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে প্রতিবারেই ১০ ধরা হয়েছে।

সারণি ঃ ৫১.১

শ্রমের নিয়োগ ও মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

উপকরণের পরিমাপ		উৎপাদন			
শ্রমের একক (i)	ভূখণ্ড (ii)	TP (iii)	AP_L (iv)	MP_L (v)	প্রতিদানের প্রকৃতি (vi)
		O			
১	১০	৪	৪	৪	শ্রমের ক্রমবর্ধমান প্রতিদান
২	১০	১০	৫	৬	
৩	১০	২১	৭	১১	
৪	১০	৪০	১০	১৯	ক্রম হ্রাসমান প্রতিদান
৫	১০	৫৫	১১	১৫	
৬	১০	৬০	১০	৫	
৭	১০	৬৩	৯	৩	
৮	১০	৬৪	৮	১	
৯	১০	৬৩		-১	শ্রমের ঋণাত্মক প্রতিদান

৫১.১ সারণিতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পরিবর্তনশীল উপকরণ শ্রমের বিভিন্ন একক নিয়োগ করে TP_1, AP_1, MP_1-এর পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। (vi) নং সারিতে গড় উৎপাদন বা AP_L সূচকের প্রতিটি সংখ্যা (i) নং সারির ১-৯ একক পর্যন্ত শ্রম নিয়োগের সংখ্যা দিয়ে (iii) নং সারির মোট উৎপাদন বা TP-র সূচক প্রতিটি সংখ্যাকে ভাগ করে পাওয়া গেছে। (v) নং সারিতে সংশ্লিষ্ট শ্রমের নিয়োগ থেকে TP-র পরিমাণ

রেখাচিত্র ৫১.১ 'ক' : মোট উৎপাদন

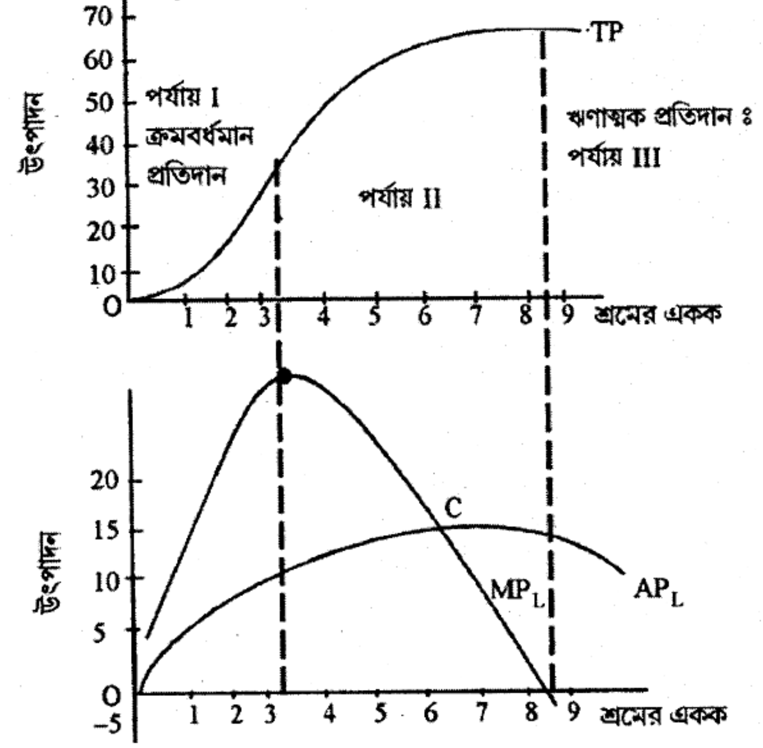

রেখাচিত্র ৫১.১ 'খ' : প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন

অনুযায়ী সংখ্যাগুলি, অর্থাৎ মোট উৎপাদনে অতিরিক্ত এক একক শ্রমের সংযোজন করা হয়েছে। AP_1, MP_1, TP-র সংজ্ঞা অনুযায়ী এই মানগুলি পাওয়া গেছে। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রথমে ১ একক শ্রম নিয়োগ করে TP = ৪ একক। অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করে TP = ১০ একক। কাজেই দ্বিতীয় একক শ্রম নিয়োগের থেকে বাড়তি উৎপাদন বা MP_L = ১০ - ৪ = ৬ একক। অতিরিক্ত এক একক শ্রমের এটাই প্রান্তিক উৎপাদন।

কৃষি উৎপাদনে স্বল্পকালে নির্দিষ্ট জমিতে ক্রমশ অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগ করলে উৎপাদন এভাবে পরিবর্তিত হয়। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রেও স্বল্পকালে মূলধনের (K) ব্যবহার স্থির থাকে, সহজে পরিবর্তন করা যায় না। তখন শিল্পক্ষেত্রেও উৎপাদনের K নির্দিষ্ট অবস্থায় রেখে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব। এখানেও TP, AP_L, MP_L-এর পরিবর্তন একই ধরনের হয়ে থাকে।

৫১.১ সারণির তথ্যকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করে স্বল্পকালীন উৎপাদনে নির্দিষ্ট উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনশীল উপকরণের ব্যবহার ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের সম্পর্কটি আরও স্পষ্ট করা যায়।

৫১.১ রেখাচিত্রের 'ক' অংশে TP রেখাটি শ্রম নিয়োগের সঙ্গে মোট উৎপাদনে পরিবর্তন বোঝাচ্ছে। প্রথম দিকে কম একক L নিয়োগের পর্যায়ে TP দ্রুত বাড়ছে। I পর্যায় ধরে TP বৃদ্ধির হার ক্রমবর্ধমান। তার পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রম নিয়োগ বাড়তে থাকলে TP-ও বাড়ে তবে ক্রম হ্রাসমান হারে। ৮ একক শ্রম নিয়োগ পর্যন্ত TP-র বৃদ্ধি সর্বোচ্চ স্তরে। আরও বেশি শ্রম নিয়োগ TP রেখাকে নিম্নমুখী করে। পরিবর্তনীয় উপাদানটির অতিরিক্ত নিয়োগ তখন মোট উৎপাদনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

রেখাচিত্রের 'খ' অংশে AP_L ও MP_L রেখাদুটির সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। এখানে উভয়ের সম্পর্ক গাণিতিক নিয়মের সঙ্গে জড়িত। এই গাণিতিক নিয়ম অনুসারে,

প) পূর্বের তুলনায় AP_L বাড়লে, $MP_L > AP_L$ এবং প্রথম রেখাটি দ্বিতীয় রেখার উপরে থাকে;

ফ) আবার, পূর্বের তুলনায় AP_L কমলে, $MP_L < AP_L$ এবং প্রথমটি দ্বিতীয় রেখার নিচে থাকে;

ব) একমাত্র AP_L রেখার সর্বোচ্চ বিন্দুতে $MP_L = AP_L$, 'খ' অংশে C বিন্দুতে এই সমতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে পরিবর্তনশীল উপকরণটির MP শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারলেও AP_L সেরকম কমতে পারে না TP ধনাত্মক। বাস্তবে মুনাফাসন্ধানী ফার্ম কখনও পরিবর্তনীয় উপকরণের ব্যবহার এ-বিরূপ-পর্ব পর্যন্ত অগ্রসর হবে না। কাজেই, শূন্য বা ঋণাত্মক মানের MP তাৎপর্যহীন।

এখন প্রশ্ন হলো, পরিবর্তনীয় উপকরণ ব্যবহার ও উৎপাদনের পরিমার এরকম পরিবর্তনশীলতার কারণ কি? পরবর্তী অংশে সে কারণ অনুসন্ধান করবো।

৫১.১.৩ পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (Law of variable proportions)

সারণি ও রেখাচিত্র দেখে বোঝা যায় যে, স্থির ও পরিবর্তনীয় উপকরণ ব্যবহারে সামঞ্জস্যহীনতা বা আনুপাতিক সম্পর্ক পরিবর্তিত হলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার কখনও বেশী বা কখনও কম হয়ে থাকে। স্বল্পকালীন উৎপাদনে কৃষির খামারে ভূমিখণ্ড এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানে মেশিন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি মূলধনের ব্যবহার স্থির রেখে শ্রম নিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকলে স্থির ও পরিবর্তনীয় উপকরণগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ ঘটতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত স্থির উপকরণের তুলনায় পরিবর্তনীয় উপকরণের ব্যবহার কম, ততক্ষণ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ MP_L ও AP_L উভয়ই বৃদ্ধি করবে। এই সীমার পরও অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগ করলে প্রথমে MP_L, পরে AP_L কমে রেখা দুটি নিম্নগামী হবে। উৎপাদন পরিবর্তনের এই প্রকৃতিকে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা Diminishing Returns বলা হয়। তবে স্থির উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপকরণের অনুপাত সামঞ্জস্যহীন হওয়ার কারণে পরবর্তী একটি পর্যায়ে উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হওয়ায় উৎপাদনের সাধারণ নিয়মটি পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম বা Law of variable proportions বলা হয়। ৫১.১ সারণিতে অনুপাতের এই পরিবর্তনের প্রভাবে প্রতিদানের বৃদ্ধি বা হ্রাস vi সারিতে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল বিষয় এই যে, ফার্ম দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন উপকরণের এমন সমাবেশ বা সমন্বয় ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে যাতে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুযোগ সর্বোত্তম করা যায়। কৃষিকাজে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, শিল্পে নির্দিষ্ট মূলধনের, সঙ্গে শ্রমের নিয়োগবৃদ্ধি করতে থাকলে বিশেষীকরণের সুযোগ হ্রাস পেয়ে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানবিধি

কার্যকর হবে। এর কম না হয়ে MP_L যদি সবসময় একই থাকতো তবে নির্দিষ্ট জমিতে শুধু বেশি শ্রম নিয়োগ করেই দেশের খাদ্যের প্রয়োজন মেটানো যেত। বাস্তবে সেটা সম্ভব হয় না, কারণ তার মূলে আছে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানবিধি বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধির কার্যকারিতা।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের প্রবণতার ধারণাটি অষ্টাদশ শতকের হলেও উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে Malthus ও Recardo ধারণাটিকে পরিমার্জিত রূপে ব্যাপক আলোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এই দুই অর্থনীতিবিদ প্রধানত কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেই বিধিটির প্রয়োগ করেন। এখন প্রায় সব উৎপাদনের ক্ষেত্রেই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বা পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়মটির কার্যকারিতার সম্ভাবনা স্বীকার করা হয়।

৫১.১.৪. উৎপাদনের তিনটি পর্যায় (Stages of Production) :

জমি স্থির অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপকরণ শ্রমের একক ব্যবহার বৃদ্ধি করলে উৎপাদনে TP, AP_L, MP_L-এর পরিবর্তনের সম্পর্ক বিচার করে স্বল্পকালীন উৎপাদনের তিনটি পর্যায় (Stages) স্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়।

৫১.১ সারণি ও রেখাচিত্রে পরিবর্তনীয় শ্রম নিয়োগের ফলে উৎপাদন পরিবর্তনের পর্যায় তিনটি 'ক' অংশে I, II, III দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখানে ৫১.২ রেখাচিত্রে পর্যায় তিনটির বর্ণনা আরও স্পষ্ট বা নিখুঁত করে দেখানো হলো।

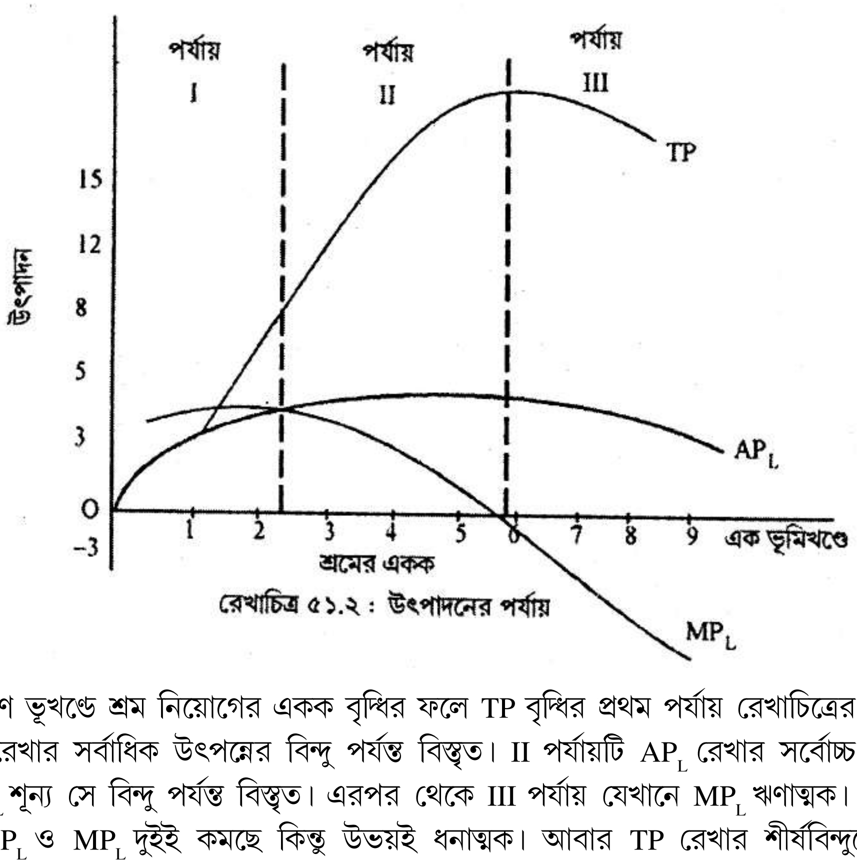

রেখাচিত্র ৫১.২ : উৎপাদনের পর্যায়

সমপরিমাণ ভূখণ্ডে শ্রম নিয়োগের একক বৃদ্ধির ফলে TP বৃদ্ধির প্রথম পর্যায় রেখাচিত্রের উৎসবিন্দু 0 থেকে AP_L রেখার সর্বাধিক উৎপন্নের বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। II পর্যায়টি AP_L রেখার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে যেখানে MP_L শূন্য সে বিন্দু পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর থেকে III পর্যায় যেখানে MP_L ঋণাত্মক। লক্ষণীয় যে, II পর্যায়ে AP_L ও MP_L দুইই কমছে কিন্তু উভয়ই ধনাত্মক। আবার TP রেখার শীর্ষবিন্দুতে উৎপাদন অপরিবর্তিত। ফলে MP_L = O। এরপরে শ্রমের নিয়োগ থেকে MP_L ঋণাত্মক হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ে

শ্রমের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান, দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান। উৎপাদন প্রতিষ্ঠান কখনওই তৃতীয় পর্যায়ে শ্রমনিয়োগ করে উৎপাদন করতে চাইবে না। কারণ এ পর্যায় অপেক্ষা কম শ্রম, কিন্তু নির্দিষ্ট জমি, ব্যবহার করে বেশি উৎপাদন সম্ভব। কাজেই বিচক্ষণ ফার্ম দ্বিতীয় পর্যায় পর্যন্তই উৎপাদন সীমাবদ্ধ রাখবে।

৫১.২ দীর্ঘকালীন উৎপাদনের নিয়ম

৫১.২.১ সমোৎপাদন রেখা ঃ দীর্ঘকালীন উৎপাদন (Iso-quants or Equal Product Curves):

দীর্ঘকালীন ফার্ম দুটি বা তারও বেশি উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপকরণ বৃদ্ধি করবে। স্বল্পকাল স্থির উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপকরণ ব্যবহার কম হলেও দীর্ঘকাল সব উপকরণই পরিবর্তনীয়। কাজেই এখানে উৎপাদন অপেক্ষক দীর্ঘকালে পরিবর্তনীয় উপকরণ নিয়ে গঠিত। সময়সাপেক্ষে ফার্ম শ্রম (L) ও মূলধন (K) দুটি উপকরণের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে পারে।

ধরা গেল যে, ফার্ম K এবং L দুটি পরস্পরের পরিবর্ত উপাদান ব্যবহার করছে। উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তন করতে দুটিরই ব্যবহারে প্রয়োজনীয় বৃদ্ধি বা হ্রাস করা চলে। এরকম দুটি পরিবর্তনীয় উপকরণের ব্যবহার ও একটি দ্রব্যের উৎপাদনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে ফার্মের উৎপাদক-অপেক্ষক সংশ্লিষ্ট সমোৎপাদন রেখা বা উৎপাদন নিরপেক্ষতা রেখার (Production indifference curves) ব্যবহার করা যায়।

ক্রমবাচক উপযোগিতা তত্ত্বে একজন ভোগকারীর তৃপ্তির স্তর ক্রম বিচার করতে যেমন সমতৃপ্তি বা নিরপেক্ষতা রেখার প্রয়োগ করা হয়েছিল, K এবং L দুটি উপকরণের অজস্র সমন্বয়গুলিকেও তেমনি একটি উৎপাদনের স্তর সূচক সমোৎপাদন রেখা দ্বারা বোঝানো যায়। আবার, বেশি বা কম তৃপ্তির স্তরসূচক সমোৎপাদন রেখার মানচিত্রও গঠন করা যায়। পরিবর্তনীয় দুটি উপকরণের সমাবেশ করতে ফার্ম বিভিন্ন সমন্বয়গুলিকে সমোৎপাদন সূচক একটি করে রেখা দিয়ে যুক্ত করতে পারে। উৎপাদনের স্তর বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে উভয় উপকরণেরই বেশি বা কম ব্যবহার করতে হবে। এরকম বেশি বা কম উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমোৎপাদন রেখাগুলি পরিমাণ অনুযায়ী উপরের বা নিচের দিকে সরে যাবে। তবে, তৃপ্তির বস্তুরক্রম বোঝাতে বেশি বা কম তৃপ্তির যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয়, সেগুলি শুধু ক্রমবাচক সংখ্যা, কারণ তৃপ্তি পরিমাপ করা যায় না। কিন্তু পরিবর্তনীয় উপকরণের বিভিন্ন সমাবেশ থেকে বিভিন্ন পরিমাণ উৎপন্নের নির্দিষ্ট হিসাব করা চলে। বেশি বা কম উৎপন্নের মধ্যে পার্থক্যের পরিমাণও হিসাব করা চলে। কাজেই ভোগকারীর সমতৃপ্তি বা নিরপেক্ষতা রেখার সঙ্গে ফার্মের সমোৎপাদন রেখার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। কিন্তু পরিমাপযোগ্যতার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।

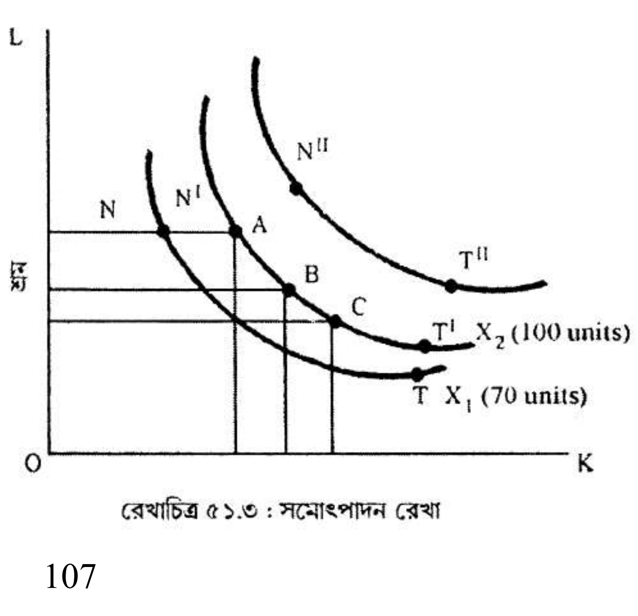

রেখাচিত্র ৫১.৩ : সমোৎপাদন রেখা

সমোৎপাদন রেখার বর্ণনা থেকে এবারে আমরা নিচের ৫১.৩ রেখাচিত্রে এই রেখার মানচিত্র এঁকে রেখার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করবো। রেখাচিত্রে অনুভূমিক OK অক্ষে K উপকরণ ও উলম্ব OL অক্ষে L-এর বিভিন্ন একক ধরা হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন স্তরে, যেমন X_1 রেখায় ৭০ একক, দুটি এককের বিভিন্ন সমাবেশ থেকে উৎপন্ন হতে পারে। উপকরণের সমন্বয় বিন্দুগুলোকে একটি রেখা দিয়ে যুক্ত করে সমোৎপাদন রেখা পাওয়া যায়। এভাবে বিভিন্ন উৎপাদন স্তরে ১০০ একক ১৩০ একক উৎপন্ন করতে দুটি উপকরণের সমাবেশগুলি X_2 এবং X_3 রেখা দিয়ে যুক্ত করে বেশি উৎপন্নের উপকরণ সমন্বয়গুলির সূচক আরও উপরের দিকে ভিন্ন ভিন্ন সমোৎপাদন রেখা পাওয়া যায়। X_1, X_2, X_3 এরকম তিনটি সমোৎপাদন রেখা।

১০০ একক দ্রব্য উৎপাদন করতে K এবং L-এর তিনটি সমাবেশ A, B, C চিহ্নিত X_2 রেখার উপর আছে। এই রেখার যে কোনও বিন্দুতে উৎপন্নের ১০০ একক। কাজেই X_2 রেখার একটি বিশেষ বিন্দুর প্রতি ফার্মের আকর্ষণের প্রশ্ন আসে না। একটি রেখার উপর বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে উৎপাদক সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। এই কারণে সমোৎপাদন রেখাকে উৎপাদনের নিরপেক্ষতা রেখাও বলে। উপরের দিকে X_3 বা নিচের X_1 রেখায় উৎপাদনের বেশি বা কম স্তর ১৩০ বা ৭০ একক ধরে বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়েছে।

একটি সমোৎপাদন রেখা ধরে নিচের দিকে অগ্রসর হলে K ও L-এর মধ্যে প্রান্তিক প্রযুক্তিনির্ভর পরিবর্তনীয়তার হার এবং উপকরণ দুটির মধ্যে পরিবর্তনীয়তার সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ। X_1, X_2, X_3 প্রতিটি রেখার উপর উপকরণ দুটির বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক সমাবেশ সমোৎপাদন রেখাগুলির উপরে দুটি নির্দিষ্ট বিন্দুর সীমার মধ্যে থাকে। X_1 রেখার এই প্রান্তবিন্দু দুটি N-T, X_2 রেখায় N"T" এবং X_3 রেখায় N"-T" প্রত্যেক জোড়া বিন্দুর অন্তর্বর্তী অংশটুকুই ফার্মের উপাদান সমাবেশের প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ। উৎসবিন্দু থেকে উপরের দিকে N, N, N" যেখানে $MP_L=0$ এবং নিচের দিকে T, T', T" যেখানে $MP_K=0$ বিন্দুগুলিকে দুটি রেখা দিয়ে যুক্ত করলে রেখা দুটিকে সমোৎপাদনের প্রান্তরেখা বা Ridge lines বলা যায়। প্রান্তরেখা দুটির মধ্যবর্তী অংশই উৎপাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত। সমোৎপাদন রেখার দুই প্রান্তে K, L উভয়ের পরিমাণ বেশি ব্যবহার করলেও উৎপাদন সমান থাকে। কোনো ব্যবসা বুদ্ধিসম্পন্ন উদ্যোক্তা ঊর্ধ্বমুখী অংশে উৎপন্নে আগ্রহী হবে না। উৎপাদনের ঐ তৃতীয় পর্যায় বর্জনীয়। প্রান্তরেখা দিয়ে সমোৎপাদন রেখাগুলির দুই দিকে বর্জনীয় অংশগুলি চিহ্নিত করা যায়। এখানে অবশ্য N, N', N" এবং আর এক দিকে T, T',T" বিন্দুগুলি দিয়ে উপাদনের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিধির বিস্তৃত উল্লেখ করা হয়েছে। সমোৎপাদন রেখার এই বিস্তৃতির মধ্যেই ফার্ম নির্দিষ্ট স্তরের দ্রব্য উৎপাদনের গণ্য দুটি উপকরণের সমাবেশ ঘটাবে।

বৈশিষ্ট্য ঃ ভোগকারীর তৃপ্তির স্তর সংক্রান্ত সমতৃপ্তি বা নিরপেক্ষতা রেখার সঙ্গে সমোৎপাদন রেখার প্রাসঙ্গিক অংশের সাধারণ গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলির সাদৃশ্য নিম্নরূপ ঃ

ক) প্রাসঙ্গিক সীমার মধ্যে সমোৎপাদন রেখার ঢাল ঋণাত্মক;

খ) সমোৎপাদন রেখাও উৎসবিন্দুর দিকে উত্তল;

গ) দুটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করে না।

নিচে ৫১.৪ রেখাচিত্রে দুটি উপকরণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য ও সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো।

অনুভূমিক অক্ষে K এবং উলম্ব অক্ষে L উপকরণের বিভিন্ন পরিমাণ ধরা হয়েছে। X_1, X_2, X_3 তিনটি উৎপাদন স্তরের সমোৎপাদন রেখা। এই রেখার উপরের দিকে N, N', N" এবং নিচে T, T', T" বিন্দুগুলি উৎপাদনের প্রান্তসীমা বোঝাচ্ছে।

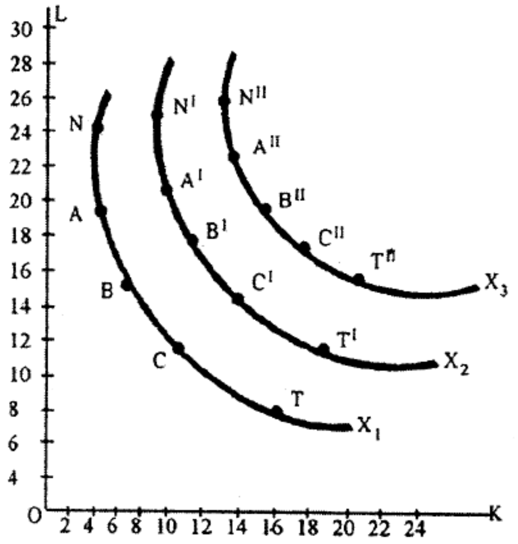

রেখাচিত্র ৫১.৪ : সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য

প্রথম X_1 রেখায় N থেকে A বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে N বিন্দুতে উপকরণ দুটির সমাবেশ ÷ (2K,16L), পরের A বিন্দুতে : (4K,10L)। অর্থাৎ L-এর ব্যবহার ৬ একক কমিয়ে K-র অতিরিক্ত 2 ব্যবহার করে সমান বা X_1 মাত্রার রাখা যেতে পারে। কাজেই উপকরণ দুটির মধ্যে, গৃহীত প্রযুক্তি সাপেক্ষে, পরিবর্তনীয়তার সম্পর্ক আছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুটি উপকরণের পরিবর্তনীয়তার হার বা Marginal rate of technical substitution of K for L, সংক্ষেপে $MRTS_{KL}$, বলে। ভোগের ক্ষেত্রে সমতৃপ্তির স্তরে দুটি দ্রব্যের পরিবর্তনীয়তার হার (MRS_{xy}) আমরা আগেই জেনেছি। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুটি উপকরণের মধ্যে পরিবর্তনীয়তা ব্যবহৃত উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে। কাজেই এটি উৎপাদন কৌশল সংক্রান্ত একটি কারিগরি সম্পর্ক।

যা হোক, X_1 রেখায় N থেকে বিন্দুতে $MRTS_{KL} = \frac{-\Delta L}{\Delta K} = \frac{-6}{2} = -3$

আবার AB অংশে,

এভাবে সমোৎপাদন রেখার যে-কোনো দুটি বিন্দুর মধ্যে একটি রেখার ঢাল হবে $\frac{-\Delta L}{\Delta K}$। কাজেই একটি সমোৎপাদন রেখার প্রাসঙ্গিক অংশে দুটি বিন্দুর মধ্যে ঢাল L-এর বদলে K-র প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হারের সমান। প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্কে প্রকাশ করলে K-র প্রান্তিক উৎপাদন $=MP_k$,L-এর প্রান্তিক উৎপাদন = MP_L ধরে,

$$\frac{-\Delta L}{\Delta K} = \frac{MP_k}{MP_L}$$

সংজ্ঞা থেকে, $\frac{-\Delta L}{\Delta K} = MRTS_{KL}$

অতএব, $MRTS_{KL} = \frac{-MP_k}{MP_L}$

উৎপাদনের স্তর সমান রাখতে সামান্য কম পরিমাণ L, পরিবর্তে K-এর পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা চলে।

এই কারণে প্রাসঙ্গিক অংশে সমোৎপাদন রেখার ঢাল, সমতৃপ্তিরেখার ক্রমহ্রাসমানতার মতোই, ঋণাত্মক হতে হবে। এটাই সমোৎপাদন রেখার প্রথম বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা।

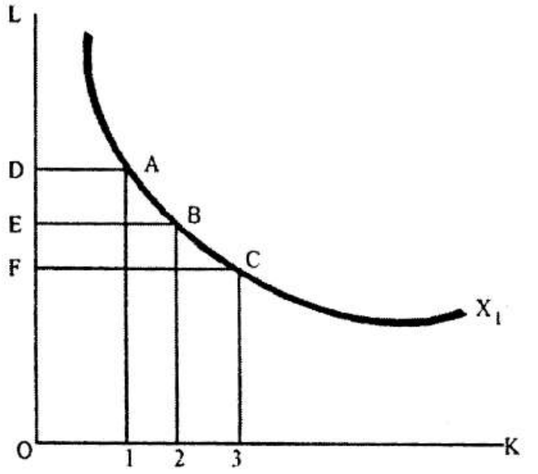

রেখাচিত্র ৫১.৫ : উত্তল সমোৎপাদন রেখা

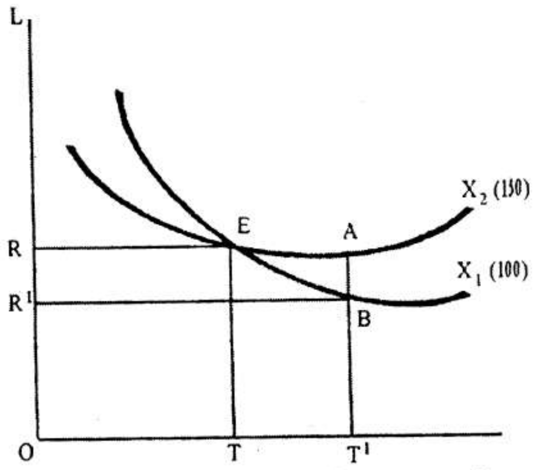

রেখাচিত্র ৫১.৬ : পরস্পর ছেদ্কারী রেখায় অসংগতি

সমোৎপাদন রেখার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী এ-রেখা উৎসবিন্দুর দিকে উত্তল। একটি উপকরণ কখনও অপরটির সম্পূর্ণ বিকল্প হয় না বলে উভয়ের পরিবর্তনীয়তা সীমিত হতে বাধ্য। ফলে $MRTS_{KL}$ ক্রমহ্রাসমান। সমপরিমাণ K-পরিবর্তে L-এর নিয়োগ ক্রমাগত বাড়াতে হয়। নিচে ৪.৫ রেখাচিত্রের সাহায্যে উত্তল সমোৎপাদন রেখার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো। X_1 স্তরের সমোৎপাদন রেখায় A, B, C বিন্দু তিনটি K ও L দুটি উপকরণের তিনটি সমাবেশ বোঝাচ্ছে।

A বিন্দুতে, L-এর OD এবং K-র ১ একক, B বিন্দুতে, L-এর OE এবং K-র ২ একক।

আর C বিন্দুতে L-এর OF, কিন্তু K উপকরণটির এককের সমাবেশ ঘটেছে। X_1 রেখা ধরে A থেকে B বিন্দুর দিকে গেলে,

আবার, B থেকে C বিন্দুর দিকে গেলে,

$$MRTS_{KL} = \frac{OE - OF}{3 - 2} = OE - OF = EF$$

যেহেতু DE>EF হওয়ায় বোঝা যায় যে L-এর পরবর্তি হিসাবে K-র নিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই $MRTS_{KL}$ কমে যাচ্ছে। এই ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা থেকেই সমোৎপাদন রেখাটি উত্তল আকৃতির।

তিনটি বৈশিষ্ট্যের তৃতীয়টি ঃ দুটি রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না। ছেদ করলে ভোগের নিরপেক্ষতা রেখার যেমন অসংগতি ঘটে, সমোৎপাদন রেখায়ও তেমনি। ৫১.৬ রেখাচিত্রে অসংগতিটি দেখানো হলো।

৫১.৬ রেখাচিত্রে X_1, X_2 দুটি পৃথক স্তরের সমোৎপাদনরেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E বিন্দুতে K উপকরণের OT পরিমাণের সঙ্গে L উপকরণের OR পরিমাণ সমাবেশ থেকে দ্রব্য উৎপাদনের দুটি আলাদা স্তর, ১০০ বা ১৫০ একক, উৎপাদনের ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। পৃথক সমোৎপাদন রেখায় A এবং B বিন্দুতে উৎপাদন স্তর আলাদা হলেও, E ছেদবিন্দুতে ১০০ = ১৫০ হতে হয়, যেটা কোন নিয়মেই হতে পারে না। কাজেই দুটো পৃথক সমোৎপাদন রেখা পরস্পরকে ছেদ করতে পারে না।

৫১.২.২ সমব্যয় রেখা : (Iso-cost line)

উপকরণ নিয়োগ ফার্মের মোটব্যয় (C) নির্দিষ্ট ধরে L ও K দুটি উপকরণের জন্য তার ব্যয় সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। ফার্মের লক্ষ্য সমোৎপাদন রেখার উপর উপকরণ সমাবেশের এমন একটি বিন্দু স্থির করা যেখানে ন্যূনতম ব্যয়ের উপকরণ সমাবেশ করা সম্ভব হয়। এজন্য উপকরণ দুটির দাম P_K এবং P_L হিসেব করতে হয়। C এর সবটাই K-ব্যবহারের জন্য ব্যয় করলে উপাদান সমাবেশ K-এর $\frac{C}{P_k}$ একক আর L এর O একক। অন্য দিকে C-এর সবটাই L-এর জন্য ব্যয় করলে উপকরণ সমাবেশ হবে L-এর $\frac{C}{P_L}$ একক আর K-র O একক। নিচে ৫১.৭ রেখাচিত্রের দুটি অক্ষে আগের মতো উপকরণদুটির এককগুলি ধরে প্রত্যেক অক্ষে $\frac{C}{P_L}$ বা $\frac{C}{P_k}$ দুটি সীমা নির্দেশ করা যায়। দুটি সীমা সরলরেখা দিয়ে যুক্ত করে সমব্যয় বা Iso-cost রেখা পাওয়া যায়।

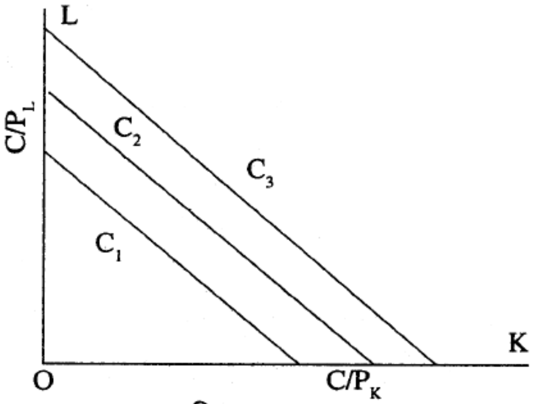

রেখাচিত্র ৫১.৭ ঃ সমব্যয় রেখা

C_1,C_2,C_3 রেখাগুলি এরকম সমব্যয় রেখা। একটি C_1 রেখার যে কোন বিন্দুতেই দুটি উপকরণ সমাবেশের মোট ব্যয় C পরিমাণ অর্থ। সমব্যয় রেখার ঋণাত্মক ঢাল হয় কারণ K ক্রয় করতে বেশি ব্যয় করলে L-এর জন্য ব্যয় কমাতে হয়, না হলে মোট ব্যয় সমান রাখা যায় না। P = দাম ধরে C_1 রেখার ঢালঃ

$$\frac{\frac{C}{P_L}}{\frac{C}{P_K}} = \frac{P_K}{P_L}$$

অর্থাৎ $\frac{\text{K-এর দাম}}{\text{L-এর দাম}}$

উচ্চতর C_2 বা C_3 রেখায় ব্যয়স্তর বেশি। উপকরণ দুটির দাম স্থির ধরায় এগুলির ঢালও $\frac{P_K}{P_L}$ এবং রেখাগুলি সমান্তরাল।

৫১.২.৩ ফার্মের ভারসাম্য ঃ

ফার্মের লক্ষ্য সর্বাধিক মুনাফা অর্জন। এ লক্ষে পৌঁছতে ন্যূনতম ব্যয় উৎপাদন করতে হবে। বিভিন্ন উপাদানের বিভিন্ন সমাবেশ থেকে এমন সমব্যয়সম্পন্ন উপকরণ সমাবেশ স্থির করতে হবে যাতে ফার্ম মোটব্যয় থেকে সর্বাধিক মুনাফা লাভ করে দ্রব্য উৎপাদনে ভারসাম্য লাভ করতে পারে। একটি দ্রব্য উৎপাদনে দুটি উপকরণের ব্যবহারে ফার্মের এই ভারসাম্য অবস্থা নিচের ৫১.৮ রেখাচিত্রে সমোৎপাদন ও সমব্যয় রেখা একসঙ্গে ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে।

রেখাচিত্রে X_1 সমোৎপাদন রেখাটি একই স্তরের উৎপাদন বোঝাচ্ছে। C_1, C_2 এবং C_3 রেখা তিনটি

সমব্যয় রেখা এবং $C_3>C_2>C_1$। ফার্মের নির্দিষ্ট ব্যয় C_2 রেখা অপরিবর্তিত C_2 রেখার উপর কোনো এক বিন্দুতে ফার্ম ন্যূনতম ব্যয়ের উপকরণ সমাবেশ ঘটাতে চেষ্টা করবে।

প্রথমে সমোৎপাদন রেখার A বিন্দুতে দুটি উপকরণের ব্যবহার সম্ভব নয় কারণ বিন্দুটি বেশি ব্যয় সম্পূর্ণ C_3 রেখায় অবস্থিত। আরও ডানদিকে B বিন্দুতে দুটি উপকরণ ব্যবহারের ব্যয় C_2 অপেক্ষা বেশি। আরও ডানদিকে E বিন্দুর দিকে অগ্রসর হয়ে L-এর পরিবর্তে K-র ব্যবহার বাড়ালে ফার্ম E বিন্দুতে OL_1 পরিমাণ L এবং OK_1 পরিমাণ K উপকরণ সমাবেশ করলে এই স্পর্শবিন্দুই তার ন্যূনতম ব্যয় বা ভারসাম্যের বিন্দু হবে। A থেকে X_1 রেখা ধরে ক্রমশ E বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে উপকরণ সমাবেশের ব্যয় কমে। আবার, E বিন্দুর ডান দিকে ব্যয় বৃদ্ধি পায়। একমাত্র E বিন্দুতেই।

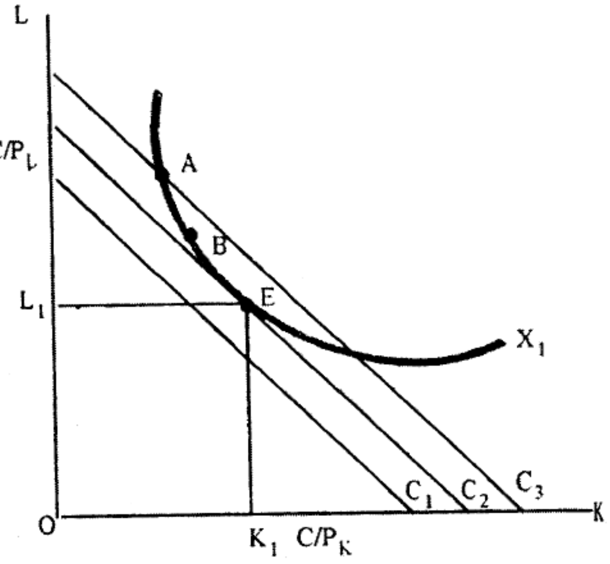

রেখাচিত্র ৫১.৮ : উপকরণ সমাবেশে ভারসাম্য

C_2 সমবায় রেখার ঢাল = X_1 সমোৎপাদন রেখার ঢাল। আবার E বিন্দুটি দুটি রেখার স্পর্শবিন্দু। কাজেই এই বিন্দুতে উপকরণ দুটির প্রান্তিক পরিবর্তনীয় তার হার উপকরণ দুটির দামের অনুপাত সমান। অর্থাৎ, E বিন্দুতে সমোৎপাদন ও সমব্যয় রেখা দুটির ঢাল সমান। সুতরাং মোটব্যয়ের নির্দিষ্ট স্তরে ফার্মের সুবিধাজনক উপকরণ সমাবেশ ও ভারসাম্য E বিন্দুতে হবে। উপকরণের দাম স্থির অবস্থায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ বাড়লে সমব্যয় রেখা সমান্তরালভাবে উপরের সরে উচ্চস্তরের উৎপাদনের কোনো এক সমোৎপাদনরেখার নির্দিষ্ট এক বিন্দুতে স্পর্শক হবে। অর্থাৎ, ব্যয় বৃদ্ধি হলে উপকরণ নিয়োগে ফার্মের ভারসাম্য বিন্দুগুলি উপরের দিকে সরে যাবে। এই সঞ্চার পথই ফার্মের প্রসার পথ বা expansion path.। সবক্ষেত্রেই দুটি উপকরণ সমাবেশে ফার্মের ভারসাম্যের সূত্রটি হবে ঃ

$METS_{KL} = MP_K/MP_L=P_K/P_L$ (দামের অনুপাত)

৫১.৩ উৎপাদন অপেক্ষক (Linearly Homogeneus Production Function)

৫১.১.২ অংশে দুটি উপকরণের একটি স্থির অপরটি পরিবর্তনীয় ধরে একটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকালে সবকটি উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তনীয় ধরলে অপেক্ষকের রূপ কিছুটা পরিবর্তিত হয়। সব উপকরণের ব্যবহার একসঙ্গে পরিবর্তন করতে থাকলে উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তনের প্রভাবে উৎপাদনের পরিমাণ কখনও সমহারে, কখনও ক্রমবর্ধমান হারে, অথবা ক্রমহ্রাসমান হারে পরিবর্তিত হতে পারে। উপাদান ব্যবহারে মাত্রাবৃদ্ধির ফলে উৎপাদন স্তরও এই তিনটি নিয়মে প্রভাবিত হতে পারে। উপকরণ সমাবেশের এক বিশেষ অবস্থায় L এবং K দুটি উপকরণ ব্যবহার ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে যদি উৎপাদন স্তরও ঠিক একই অনুপাতে বেড়ে যায় তবে সমহার প্রতিদান

বিধি কার্যকর বুঝতে হবে। এরকম সমমাত্রিক হারে উপকরণ ব্যবহার ও উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটলে সমহার প্রতিদান বিধির এই বিশেষ অবস্থাকে সরলরৈখিকভাবে সমজাতীয় উৎপাদন-অপেক্ষক বা Linearly homogeneous peoduction function বলে। এক্ষেত্রে সমহার প্রতিদান বিধিটি কার্যকর বলে সব উপকরণের নিয়োগ যে হারে বৃদ্ধি হবে উৎপাদনের পরিমাণও একই হারে বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কটি নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় ঃ দুটি উপকরণ K এবং L ধরলে, আর Q দিয়ে মোট উৎপাদনের পরিমাণ বোঝালে, mQ = f (mk, ml), এখানে m একটি প্রকৃত সংখ্যা।

সাধারণভাবে প্রকাশ করে অপেক্ষকটি নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়,

$Qm^k = f\ (mk, ml)$

এখানে K ধ্রুবক। এ সম্পর্কটি সরলরৈখিক ভাবে K মাত্রার সমজাতীয়। যদি k = I হয়, তবে অপেক্ষকটি প্রথম মাত্রার সমজাতীয়। আবার, যদি k>I হয় তবে উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানবিধি, এবং যদি k<I হয়, তবে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বিধি, কার্যকর হবে।

সরলরৈখিকভাবে প্রথম মাত্রার সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন বলে অর্থনীতিবিদগণ অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ ও ব্যবহার করে থাকেন। এরকম সমহার প্রতিদান বিধির সঙ্গে যুক্ত বৈশিষ্ট্যই এর ব্যবহার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত করেছে।

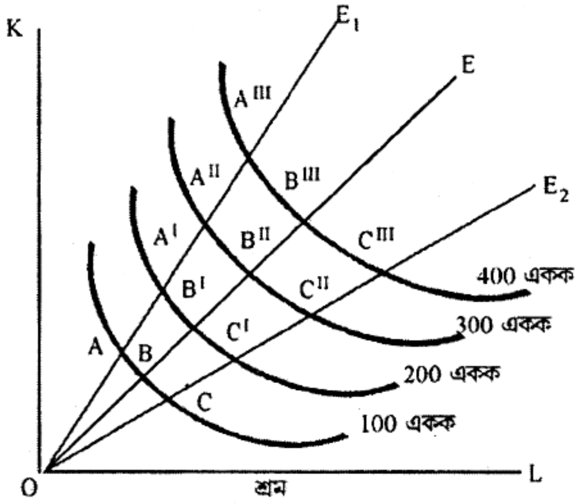

রেখাচিত্র ৫১.৯ : সমহার প্রতিদান বিধি ও প্রসারপথ

রেখাচিত্রে সমোৎপাদন রেখার সাহায্যে প্রকাশ করলে সরলরৈখিক সমজাতীয় একমাত্রার সম্পর্কটি রেখাচিত্রে উৎসবিন্দু থেকে উৎপন্ন একটি সরলরেখা দিয়ে বোঝানো যায়। উপকরণের দাম নির্দিষ্ট অবস্থায়, যে স্তরের উৎপাদনই হোক না কেন, নিয়োগ বৃদ্ধির হার সর্বদা একই থাকে।

৫১.৯ রেখাচিত্রে ফার্ম K এবং L দুটি উপকরণ নিয়োগ করে একটি দ্রব্যের বিভিন্ন স্তরের উৎপাদন করছে। সমোৎপাদন রেখাগুলির ১০০, ২০০ বা ৩০০ একক উৎপাদনের পরিমাণ বোঝাচ্ছে। E_1, E এবং E_2 সরলরেখাগুলি উপকরণ সমাবেশে ফার্মের প্রসারপথ। লক্ষণীয় যে, উৎপাদন স্তর নির্দেশক সমোৎপাদন রেখা কয়টি পরস্পরের সমদূরত্বে আছে।

উৎসবিন্দু O থেকে OE, OE_1, OE_2 উর্ধ্বমুখী সরলরেখা আঁকলে মধ্যবর্তী OE প্রসাররেখায় $OB=BB^1 = B^1B^{II} = B^{II}B^{III}$। অনুরূপভাবে OE_1 বা OE_2 দুটি সরলরৈখিক প্রসারপথেও যথাক্রমে $AA^1=A^1A^{11}$ এবং $CC^1 = C^1C^{11}$ ইত্যাদি। প্রসারপথ ধরে উপরের দিকে অগ্রসর হলে সমোৎপাদন রেখাগুলি পরস্পরের সমদূরত্বসম্পন্ন। অর্থাৎ দুটি উপকরণ নিয়োগের অনুপাত নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করে দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি একই হারে ঘটলে সমহার প্রতিদান বিধিটি (Constant returns to scale) কার্যকর হয়। ৫১.৯ রেখাচিত্রে সরলরৈখিক প্রসার পথে উপকরণ ব্যবহার দ্বিগুণ করায় দ্রব্য উৎপাদন ও বৃদ্ধি পেয়ে দ্বিগু পরিমাণ হয়েছে। এরকম অবস্থায় উৎপাদন অপেক্ষক সরলরৈখিকভাবে সমমাত্রিক। ফার্মের কাছে এরকম উৎপাদন অপেক্ষক

ধরে অগ্রসর হওয়াই সরল ও সুবিধাজনক প্রসার পথ। উপাদানগুলির দাম অপরিবর্তিত অবস্থায় একবার সেগুলির সর্বোত্তম নিয়োগের অনুপাত স্থির করলেই উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে উপকরণ সমাবেশের অনুপাত সম্বন্ধে পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না।

সমজাতীয় উৎপাদন অপেক্ষকগুলির মধ্যে সর্বাধিক ব্যবহৃত উৎপাদন অপেক্ষকটি হলো (Cobb-Douglas) উৎপাদন অপেক্ষক (যায় উৎপাদক হলেন যৌথভাবে পল ডগলাস নামে এক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ এবং চার্লস কব নামে বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ) এরকম একটি উৎপাদন অপেক্ষক নামে পরিচিত। বৃহদায়তন শিল্পে দ্রব্য উৎপাদনের বাস্তব পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া কব-ডগলাস অপেক্ষকটি, উৎপাদনে শ্রম (L) ও মূলধন (C) দুটি উপকরণ ব্যবহার করে দ্রব্য উৎপাদনে সরলরৈখিক রূপে প্রকশ করলে আমরা পাই ঃ

$$Q = KL^{a}C^{1-a}$$

এখানে Q = শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ, L = শ্রমের পরিমাণ, C = মূলধনের পরিমাণ, এবং K আর a দুটি ধ্রুবক কিন্তু ধনাত্মক ($a<1$) সংখ্যা, এই অপেক্ষকের মূল বক্তব্য এই যে, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির ৭৫% শ্রমের অবদান, বাকি ২৫% বৃদ্ধি মূলধনের। এ অনুপাতে শিল্প উৎপাদনে বেশ কিছু সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ C ও L নির্দিষ্ট g অনুপাতে বাড়ালে, Q বা উৎপাদনের পরিমাণ ও g পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সমহার প্রতিদানের বিধি উপরে উল্লিখিত কম-ডগলাস অপেক্ষকে প্রতিষ্ঠিত।

Mrs. Robinson, Kaldor, Knight প্রমুক অর্থনীতিবিদরা মনে করেন যে, উপকরণগুলি ছোট ছোট অংশে বিভাজ্য ধরে তাদের নিয়োগ হ্রাসবৃদ্ধি করা যদি সহজ হয়, তবে সমহার প্রতিদান বিধিটি কার্যকর না হওয়ার কোন কারণ নেই। উৎপাদনের বিধিটি বাস্তবানুগ ও সহজসরল বলে কব-ডগলাস অপেক্ষকটি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত।

৫১.৪ উৎপাদন মাত্রা পরিবর্তনের প্রতিদান (Returns to scale)

দীর্ঘকালে ফার্ম উপকরণ নিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি করে আয়তন বৃদ্ধি করতে পারে। বেশি মাত্রায় উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদনের আয়তন বৃদ্ধির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শুধু সমহার প্রতিদান বিধিটিই কার্যকর হয় না। উপাদানের মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদনের বিভিন্ন নিয়মের কার্যকারিতা আলোচনাই মাত্রা পরিবর্তনের প্রতিদান বা Returns to scale-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বেশি উৎপাদন করতে একটার জায়গায় দুটো বা তিনটে একই দ্রব্য উৎপাদন সংস্থা স্থাপন করতে যেতে পারে। সেটা না করে এক ছোট সংস্থায় উপকরণগুলির নিয়োগের মাত্রা বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র থেকে বৃহদায়তন শিল্প সংস্থার রূপ দিলে বিশেষীকরণ থেকে উপকরণ ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, উপাদান সমাবেশ অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠতে পারে। ফলে উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি জনিত নানা ব্যয় সংক্ষেপের সুবিধা সৃষ্টি হয়। মাত্রা পরিবর্তনের এসব বৈশিষ্ট্য থেকেই উৎপাদনের তিনটি পৃথক নিয়মের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি নিয়মের ক্ষেত্রেই ধরা হয় যে, উৎপাদনগুলির দাম অপরিবর্তিত। নির্দিষ্ট দামে যে কোনো পরিমাণ উপকরণ সমাবেশ ঘটানো সম্ভব।

মাত্রা পরিবর্তনের প্রতিদান সংক্রান্ত প্রথম নিয়মটি সমহার প্রতিদান বিধি। এ নিয়মটি ৫১.১.৮ অংশে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞগণ এই নিয়মটিই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। নিয়মটির মূল বক্তব্য ঃ K এবং L দুটি উপকরণের নিয়োগের অনুপাত যদি ১০ শতাংশ হারে বাড়ানো যায়, তবে উৎপাদন স্তরও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। উপাদান দুটির দাম স্থির বলে ফার্মের গড়

প্রান্তিক ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হবে না। এই বিশেষ পরিস্থিতিতে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হয় এবং উৎপাদন অপেক্ষকটি সরলরৈখিকভাবে একমাত্রার সমজাতীয় হয়ে থাকে। ৫১.৯ রেখাচিত্রে ফার্মের প্রসার পথ ধরে এ নিয়মটি দেখানো হয়েছে।

মাত্রা পরিবর্তনের দ্বিতীয় নিয়মটি ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বিধি বা Increasing returns to scale নামে পরিচিত অর্থনীতিবিদ চেম্বারলিন (Chamberlin) মনে করেন ফার্মের আয়তন বৃদ্ধি ঘটতে থাকলে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের মাত্রার প্রসার ঘটে, বিশেষীকরণ প্রক্রিয়া আরও নিবিড় করা চলে, শ্রমের

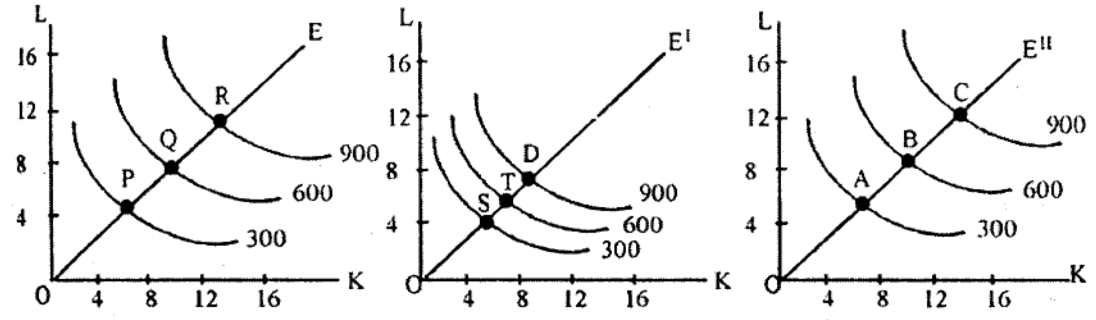

১. সমহার বিধি   ২. ক্রমবর্ধমান প্রতিদান   ৩. ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান

দক্ষতা বাড়ে, আয়তন বৃদ্ধির প্রভাবে আগের চেয়ে উন্নত যন্ত্রপাতি, উৎপাদন কৌশলের প্রয়োগ সম্ভব হয়। আয়তন বৃদ্ধি নানাভাবে উপাদান ব্যবহারে সাশ্রয় করে দ্রব্য উৎপাদনে গড় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই হ্রাস করে। আয়তন বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মটি সৃষ্টি করে, উপাদান নিয়োগের হার বৃদ্ধির হার দশ শতাংশ হলে উৎপাদন দশ শতাংশ থেকে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকর হওয়ায় এ পরিস্থিতি দেখা দেয়।

আবার কিছু অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির কোন এক পর্বে উৎপাদন নিয়োগের হার বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যায় না। এক্ষেত্রে প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আগের তুলনায় বেশি উপকরণের প্রয়োজন পড়ে, গড় ও প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মাত্রা পরিবর্তনের এক নির্দিষ্ট সীমার পর ফার্মের আয়তন আরও বাড়ালে এই ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের বিধিটি কার্যকর হয়ে থাকে। অন্যান্য উপকরণ বিভাজ্য ধরা গেলেও উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপনা অবিভাজ্য বলা যায়। আয়তন বৃদ্ধির একটি সীমা পর্যন্ত ব্যবস্থাপনা সুদক্ষ থাকতে পারে, একজন উদ্যোক্তা উৎপাদনের সব দিকে সমান তত্ত্বাবধান করতে পারে। কিন্তু দৈত্যাকৃতির বিশাল সংগঠন উদ্যোক্তা বা ব্যবস্থাপকের কাজে ত্রুটিবিচ্যুতি বা অসংগতি দেখা দিতেই পারে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান হয়ে যেতে পারে।

৫১.১০ রেখাচিত্রের প্রথম অংশে OE রেখাটি ফার্মের প্রসার পথ। L ও K দুটি উপকরণের সমাবেশ বিন্দুগুলি P, Q, R দিয়ে চিহ্নিত। প্রতিবিন্দুতে উপকরণের ব্যবহার সমান পরিমাণ বৃদ্ধি করে উৎপাদন প্রতি বারেই ৩০০ একক করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। OE রেখার ঢাল থেকে উপকরণ দুটি ব্যবহার বৃদ্ধির অনুপাত ১ঃ১ হয়েছে। আবার,

$$OP = PQ = QR$$

কাজেই এখানে সমহার প্রতিদান বিধিটি কার্যকর।

২য় অংশে ক্রমশ কম উপকরণ সমাবেশ থেকে উৎপাদন সমান বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই OE[1] প্রসার পথে,

OS>ST>TD

মাত্রা পরিবর্তনের ফলে শ্রমবিভাগ বা বিশেষীকরণ নিবিড় হলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। তাছাড়া উৎপাদন মাত্রা বৃদ্ধি করতে পূর্বাপেক্ষা উন্নত ধরনের মেশিন, যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব হতে পারে। ফলে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়।

শেষ ও ৩য় অংশে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বিধিটি কার্যকর হয়েছে। দ্বিগুণ বেশি উৎপন্ন করতে উপকরণ দুটির ব্যবহার দ্বিগুণের বেশি বৃদ্ধি করতে হয়েছে। কাজেই,

OA<AB<BC

বিশাল আয়তন উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করা উদ্যোক্তার পক্ষে দুরূহ হয়ে পড়তে পারে। বিভিন্ন বিভাগের তথ্য সংগ্রহ ও কাজের সামঞ্জস্যবিধান জটিল হলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমহ্রাসমান হয়ে পড়ে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, উৎপাদন স্তর বৃদ্ধির প্রথম দিকে স্বল্পমাত্রার উৎপাদনের ক্ষেত্রে ফার্ম ক্রমবর্ধমান প্রতিদান বিধির প্রভাবাধীন হলেও, মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে কিছু সময় সমাহার প্রতিদানের প্রভাবাধীন থাকলেও, শেষ পর্যন্ত ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বিধির প্রভাবধীন হয়ে পড়ে। একই ফার্মে উৎপাদনের দীর্ঘকালে তিনটি নিয়মের প্রতিফলন ঘটতে পারে।

স্বল্প বা দীর্ঘকালীন উৎপাদনের নিয়মের উপরোক্ত আলোচনায় বিভ্রান্তি এড়াতে মনে রাখা দরকার যে, স্বল্পকালে উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধির মূলে আছে পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধি। এ সময় কিছু উপকরণ স্থির আর কিছু পরিবর্তনীয় বলে উপকরণ নিয়োগের অনুপাত পরিবর্তনের কারণে কখনও পরিবর্তনীয় উপকরণের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান বা ক্রমহ্রাসমান। কিন্তু দীর্ঘকালে প্রতিদানে বৃদ্ধির বা হ্রাস উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত।

৫১.৫ সারাংশ

উৎপাদনের ফার্মের উপকরণ ব্যবহার ও উৎপন্নের সম্পর্ক বর্তমান এককে স্বল্প ও দীর্ঘকাল—এই দুই পর্বে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে। স্বল্প ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষককে স্থির উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপকরণের ব্যবহার হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ প্রথম দিকে বাড়লেও কিছু পরে স্থির থাকে, এবং শেষ পর্যন্ত মোট গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। এভাবে স্বল্পকালে ক্রমবর্ধমান, সমান, বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বৃদ্ধির তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা গেছে। স্থির উপকরণের সঙ্গে পরিবর্তনীয় উপকরণের ব্যবহার ঘটলে উপকরণ ব্যবহারের অনুপাতিক হার পরিবর্তিত হওয়ায় এরকম পরিবর্তনশীল উৎপাদন হয়। কাজেই স্বল্পকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম কার্যকর হয়।

দীর্ঘকালে সব উৎপাদনের উপকরণের ব্যবহার পরিবর্তনীয় ধরলে উৎপাদন অপেক্ষকের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। দুটি উপকরণের পরিবর্তনীয় ব্যবহার থেকে উৎপাদনের পরিমাণ জানতে সমোৎপাদনরেখার ব্যবহার করা হয়। ভোগকারীর নিরপেক্ষতা রেখার সঙ্গে উৎপাদনের সমোৎপাদনরেখার গঠনগত সাদৃশ্য আছে। বিভিন্ন মাত্রার উৎপাদনের সূচক রেখাগুলি ভোগ নিরপেক্ষতা রেখার মতোই বাঁ দিক থেকে ডান

দিকে নিম্নমুখী, উৎসবিন্দুর দিকে উত্তল। তবে একই রেখার বিভিন্ন বিন্দুর মধ্যে দুটি উপকরণের পরিবর্তনীয়তার সম্পর্ক উৎপাদন-কৌশল নির্ভর কারিগরি সম্পর্ক। এ সম্পর্কটি ক্রমহ্রাসমান $MRTD_{KL}$ অনুপাতটির হিসেব করে বোঝা যায়, ভোগ নিরপেক্ষতা রেখার মতোই দুটি উৎপাদন নিরপেক্ষতা রেখার পরস্পরকে ছেদ করে না। ফার্মের উপকরণ সমাবেশে ভারসাম্য জানতে তার সমব্যয় রেখাটিও গুরুত্বপূর্ণ। ভারসাম্য বিন্দুতে ফার্মের সমোৎপাদন রেখাটি সমব্যয় রেখার নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্পর্শক হবে। ভারসাম্য বিন্দুতে উপকরণের দামের অনুপাত ও তাদের প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হার (M R T S) পরস্পরে সমান হবে।

উপকরণ সমাবেশ ও উৎপাদন বৃদ্ধির মাত্রা পরিবর্তনের সম্পর্কের দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা দুটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন অপেক্ষক ফার্মের প্রসার পথ ধরে আলোচিত। একটি সাধারণ নিয়মের সরলরৈখিক ভাবে সমজাতীয় অপেক্ষক, অপরটি বাস্তবনির্ভর বহুব্যবহৃত কব-ডগলাস উৎপাদন অপেক্ষক। দুই ক্ষেত্রেই মাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সমহার প্রতিদানের নিয়মের সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘকালে উৎপাদনের মাত্রা পরিবর্তনের প্রতিদানের তিনটি নিয়ম পৃথক ভাবে সমোৎপাদন রেখা ও প্রসারপথ ধরে তিনটি রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে। তবে সমহার ক্রমবর্ধমান এবং ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানবিধি একই ফার্মের উৎপাদন প্রসারপথেও কার্যকর হতে পারে। কোন উৎপাদন পর্বে কোন নিয়মটি কার্যকর হবে, সেটা বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করবে।

৫১.৬ অনুশীলনী

১। স্বল্প ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের পার্থক্য মনে রাখুন।

২। মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদনের সম্পর্কের রেখাচিত্র আঁকার অভ্যাস করুন।

৩। স্বল্পকালীন উৎপাদনের তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে AP_1, MP_1, ও TP_L-এর সম্পর্কটি মনে রাখুন।

৪। পরিবর্তনীয় অনুপাতের বিধিটির বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির হার কিরূপ হয়ে থাকে?

৫। সমোৎপাদন রেখা এবং এই রেখার প্রাসঙ্গিক অংশ বলতে কী বোঝায়?

৬। দুটি ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হার (MRS_{xy}) এবং দুটি উপকরণের প্রযুক্তি নির্ভর প্রান্তিক পরিবর্তনীয়তার হারের ($MRTS_{LK}$) ধারা দুটির পার্থক্য মনে রাখুন।

৭। ফার্মের একটি প্রসার পথ ধরে অগ্রসর হলে উপাদানগুলি ব্যবহারের অনুপাত কি পরিস্থিতিতে একই থাকে ভাল করে লক্ষ্য করুন।

৮। দীর্ঘকালে উপকরণ ব্যবহার ও উৎপাদন মাত্রাবৃদ্ধির তিনটি সম্পূর্ণ রেখাচিত্রে প্রকাশের অভ্যাস করুন।

একক ৫২ ◆ উৎপাদন ব্যয়

গঠন

৫২.০ উদ্দেশ্য

৫২.১ উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

৫২.২ বিভিন্ন ধরনের ব্যয় ঃ স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, মোট ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়

৫২.৩ প্রান্তিক ব্যয় ও স্থির ব্যয়

৫২.৪ স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি

৫২.৫ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক

৫২.৬ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি

৫২.৬.১ দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার সম্পর্ক

৫২.৭ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক

৫২.৮ সারাংশ

৫২.৯ অনুশীলনী

৫২.০ উদ্দেশ্য

একটি দ্রব্য কতটা পরিমাণে উৎপাদন করা হবে এবং কি দামে তা বাজারে বিক্রি করা হবে তা বাজারে দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করে। যোগানের পিছনে কাজ করে উৎপাদন ব্যয়। প্রত্যেকটি ফার্মের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্যই হলো মোট মুনাফা। সুতরাং উৎপাদক উৎপাদন ব্যয়কে যথাসম্ভব কম রেখেই উৎপাদন করতে চেষ্টা করবে।

উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ ঃ

উৎপাদন ব্যয় প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে—

ক) উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপাদানের সমষ্টি ও অনুপাত ঃ

কোন দ্রব্য বা সেবাকার্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে (শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠন) ব্যবহার করতে হয়। সাধারণভাবে বলা যায়, দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদন যত বেশি হবে এই উপাদানগুলিকেও তত বেশি পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে এবং উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণও তত বেশি হবে। উপাদানগুলি আবার কি অনুপাতে ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপরও এই উৎপাদন ব্যয় নির্ভর করে। উপাদানগুলি উপযুক্ত বা কাম্য অনুপাতে ব্যবহার করা হলে ব্যয়ের পরিমাণ কম হবে।

খ) উপাদানসমূহের দক্ষতা ঃ

উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলির উৎপাদনশীলতা অথবা দক্ষতা যত বেশি হবে ততই একটি দ্রব্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদন করতে উপাদানগুলিকে কম পরিমাণে ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং উৎপাদন ব্যয়ও কম হবে। উপাদানগুলির দক্ষতা কম হ'লে এই উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ অধিক হবে।

গ) উপাদানগুলির দাম ঃ

উপাদানগুলির দাম হ'লে উৎপাদন ব্যয় নির্ধারণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উপাদানগুলি কম দামে পাওয়া গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের মোট ব্যয় কম হবে। আমার শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের সুদ, কাঁচামালের দাম, জ্বালানির দাম অধিক হলে মোট ব্যয়ও অধিক হবে। উৎপাদনগুলির দাম বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যটি একই পরিমাণে উৎপাদন করতে মোট ব্যয়ও বৃদ্ধি পাবে।

(ঘ) উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ঃ

উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে উপাদানগুলিকে অধিকতর দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা সম্ভব হয় এবং মোট উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়। কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি প্রাচীন হলে এবং প্রযুক্তি অনুন্নত হলে সমপরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে অধিক ব্যয় বহন করতে হবে। স্বল্পকালে উৎপাদনের কয়েকটি উপাদান স্থির থাকে এবং বাকি উপাদানগুলি পরিবর্তনশীল হয়। কয়েকটি উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুন স্বল্পকালে উপাদানগুলিকে কাম্য বা সর্বোত্তম অনুপাতে ব্যবহার করা যায় না। ফলে উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তিটিও যথাযথ হয় না। দীর্ঘকালে যেহেতু যাবতীয় উপাদানই পরিবর্তনশীল এবং সকল উপাদানই প্রয়োজনমতো সহজলভ্য, তাই কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই সঠিক এবং সর্বোত্তম উৎপাদন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি অনুসরণ করা সম্ভব।

(ঙ) অন্যান্য বিষয় ঃ

বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে সরকারী নীতি, সরকারী কর ও ভরতুকি ব্যবস্থা, শিল্প সংরক্ষণ নীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি প্রভৃতির উপরও একটি দ্রব্য বা সেবাকার্যের উৎপাদন ব্যয় নির্ভর করে।

৫২.১ উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা

অর্থবিদ্যায় উৎপাদন ব্যয়ের ধারণাটিকে তিনদিক থেকে দেখা যেতে পারে। (ক) আর্থিক উৎপাদন ব্যয় (খ) প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় এবং (গ) সুযোগ ব্যয়।

ক) আর্থিক উৎপাদন ব্যয় (Money cost of production) **ঃ**

যখন উৎপাদক কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে চায়, তখন তাকে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন উপাদান নিয়োগ করতে হয়। উৎপাদনকার্যে ব্যবহৃত ঐ সকল উপাদানের উৎপাদক যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে, তাই হ'ল আর্থিক উৎপাদন ব্যয়। জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিককে দেয় খাজনা বা কারখানা বাড়ির জন্য বাড়ির মালিককে দেয় ভাড়া, শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামলের দাম, ঋণমূলধনের জন্য দেয় সুদ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদি বাবদ ব্যয় ইত্যাদির সমষ্টি হলো মোট আর্থিক উৎপাদন ব্যয়।

উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফাকে উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কারণ, স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে না পারলে উদ্যোক্তা উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করতে সম্মত

হবে না। স্বাভাবিক মুনাফা বলতে উৎপাদক বা উদ্যোক্তা অন্য কোন বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বাধিক যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে তাকেই বোঝায়।

অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার কিছু নিজস্ব উপকরণ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন, নিজস্ব জমি বা বাড়ি, মূলধন, পরিচালনা কার্য ইত্যাদি। এই উপকরণগুলির জন্য উদ্যোক্তাকে সরাসরি কোন ব্যয় বহন করতে হয় না। উৎপাদন ব্যয়ের হিসাবের সময় উৎপাদকের নিজস্ব এই উপকরণগুলির জন্য অনুমিত ব্যয় হিসেব করে তা মোট উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। উদ্যোক্তার বাজারের অবস্থা অনুযায়ী জমি বাবদ যে খাজনা হতে পারে, মূলধন বাবদ যে সুদ হতে পারে এবং পরিচালনা ফার্ম বাবদ যে বেতন হতে পারে তা উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে ধরতে হবে।

খ) প্রকৃত উৎপাদন ব্যয় (Real cost of production) **ঃ**

বৃহত্তর সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃত ব্যয়ের ধারণাটি মার্শাল নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ ব্যাখ্যা করেছেন। উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানকে যে দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ, অনুপযোগ (disutility) ইত্যাদি স্বীকার করতে হয়, তাই হ'ল উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়। যেমন, কোন শ্রমিক যখন কাজ করে তখন তাকে বিশ্রাম (leisure) ত্যাগ করতে হয়, আবার মূলধনের মালিক যখন উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করে তখন তাকে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত হওয়ার মধ্যে কিছু কষ্টস্বীকার বা ত্যাগের ব্যাপার হয়ে (abstinence) সঞ্চয় করতে হয়। এই বিশ্রাম থেকে বা ভোগ থেকে বিরত হয়েছে। এটাই হ'ল উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়।

তবে বর্তমানে এই প্রকৃত ব্যয়ের ধারণাটি একরূপ পরিত্যক্ত হয়েছে। কারণ, ত্যাগ, কষ্টস্বীকার, ভোগবিরতি ইত্যাদি হলো মানসিক ধারণা এবং এগুলি পরিমাপ করা বা অর্থমূল্যে প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গ) সুযোগ ব্যয় (Opportunity cost) **ঃ**

সমাজের উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণ সীমাবদ্ধ এবং ধরা যাক, এই উপাদানগুলির পূর্ণ নিয়োগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে অন্য কোন ক্ষেত্র থেকে উপাদানগুলিকে সরিয়ে নিয়ে এসে ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন করতে হয়। ফলে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন কমে যায়। এই যে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে অন্য আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করার সুযোগ পরিহার করতে হয় (অর্থাৎ অন্য আর একটি দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়) তাই হ'ল প্রথম দ্রব্যটির উৎপাদনের সুযোগ ব্যয়।

ধরা যাক, কোন একটি জমিতে ধান ও গম উভয় দ্রব্যই উৎপাদন করা সম্ভব। জমিটি থেকে ৫০ কুইন্টাল ধান অথবা ৬০ কুইন্টাল গম উৎপাদন করা যায়। কিন্তু জমিতে যদি একটি ফসল ফলান হয়, তবে অন্য ফসলটি আর পাওয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে ৫০ কুইন্টাল ধানের সুযোগ ব্যয় হবে ৬০ কুইন্টাল গম অথবা ৬০ কুইন্টাল গমের সুযোগ ব্যয় হবে ৫০ কুইন্টাল ধান।

সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি টাকাকড়ির অঙ্কেও প্রকাশ করা যায়। কোন একজন শ্রমিক একাধিক কাজে নিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু একসঙ্গে তাকে সকল ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যায় না। ঐ শ্রমিককে কোন একটি ক্ষেত্র নিয়োগ করা হ'লে অন্যান্য ক্ষেত্রের নিয়োগ থেকে তাকে সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে ঐ শ্রমিকের সুযোগ ব্যয় হবে বিভিন্ন বিকল্প ক্ষেত্রের নিয়োগের মধ্যে সেক্ষেত্রে সে সর্বাধিক পারিশ্রমিক পেতে পারত সেই ক্ষেত্রের পারিশ্রমিকের সমান। ধরা যাক, একজন শ্রমিক গম উৎপাদনে ৫০ টাকা, ধান উৎপাদনে ৪০ টাকা, পাট উৎপাদনে ৩৫ টাকা, কারখানার শ্রমিক হিসাবে ৩০

টাকা ইত্যাদি মজুরী পেতে পারে। নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকলে শ্রমিক অবশ্যই গম উৎপাদনেই নিযুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে গম উৎপাদনে শ্রমিকের সুযোগ ব্যয় হবে ৪০ টাকা, কারণ গম ছাড়া অন্যান্য বিকল্প দ্রব্য উৎপাদনের মধ্যে ধান উৎপাদনে ৪০ টাকা মজুরীই হলো সর্বাধিক মজুরী।

৫২.২ বিভিন্ন ধরনের ব্যয় ঃ স্থির ব্যয়, পরিবর্তনশীল ব্যয়, গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়

কোন একটি ফার্মের মোট উৎপাদন ব্যয়কে মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। মোট স্থির ব্যয় হ'ল উৎপাদনের সেই সকল ব্যয় যার সঙ্গে মোট উৎপাদনের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নেই। মোট উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ফার্মকে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় বহন করে যেতে হয়। এমনকি উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলেও ফার্মকে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় চালিয়ে যেতে হয়। মোট স্থির ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হ'ল, কারখানা বাড়িভাড়া, লাইসেন্স ফি, পরিচালক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয়ের সেই অংশ যা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর অর্থাৎ মোট উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয় ইত্যাদি।

মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় হ'ল উৎপাদনের সেই সকল ব্যয় বা মোট উৎপাদন পরিমাণের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে এই ব্যয় বেড়ে যায় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে গেলে এই ব্যয় কমে যায়। মোট উৎপাদন সাময়িকভাবে অপরিবর্তিত থাকলে কোন পরিবর্তনশীল ব্যয় বহন করতে হয় না। মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের দৃষ্টান্ত হল ঃ অস্থায়ী শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরী, কাঁচামালের জন্য ব্যয়, বিদ্যুৎ জ্বালানি ইত্যাদি বাবদ ব্যয়, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি জনিত ব্যয়ের সেই অংশ যা যন্ত্রপাতির ব্যবহারের উপর অর্থাৎ মোট উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল (user cost) ইত্যাদি।

মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে এই পার্থক্য কেবল মাত্র স্বল্পকালেই সম্ভব। দীর্ঘকালে যাবতীয় ব্যয়ই হ'ল পরিবর্তনশীল ব্যয়। স্বল্পকালে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ফার্ম তার স্থির উপকরণগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মোট উৎপাদন বাড়াতে সচেষ্ট হয়। অন্যদিকে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা কমে গেলে ফার্ম স্থির উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রেখে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি কম পরিমাণ ব্যবহার করে উৎপাদন কমাতে চেষ্টা করে। কিন্তু স্বল্পকালে যে চাহিদার পরিবর্তন ঘটেছে তা স্থায়ী হ'ল দীর্ঘকালে ফার্ম কেবলমাত্র তার পরিবর্তনশীল উপাদানগুলিই নয়, স্থির উপাদানগুলিরও পরিবর্তন ঘটিয়ে চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে উৎপাদনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করে—এই অর্থে দীর্ঘকালে যাবতীয় ব্যয়ই হ'ল পরিবর্তনশীল ব্যয়।

স্থির ব্যয় এবং পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে এই পার্থক্য কারখানার অনুষ্ঠিত নীতিরউপর অনেক অংশে নির্ভরশীল। যেমন, সাধারণত শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী হ'ল পরিবর্তনশীল ব্যয়, কিন্তু কারখানায় যদি একদল স্থায়ীকর্মচারী নিয়োগ করা হয়, তবে তার মজুরী হ'ল স্থির ব্যয়। অনুরূপভাবে সাধারত কাঁচামালের জন্য ব্যয় হ'ল পরিবর্তনশীল ব্যয় কিন্তু যথাসময়ে কাঁচামাল পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকলে কারখানার মালিক কাঁচামাল সরবরাহকারীর সঙ্গে একটি দীর্ঘকালীন চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে কাঁচামালের জন্য ব্যয় হ'ল স্থির ব্যয়।

কেবলমাত্র দীর্ঘকালেই স্থির ব্যয় প্রকৃত ব্যয় হয়ে দাঁড়ায়। স্বল্পকালে কোন একটি ফার্মের দ্রব্যের দাম নির্ধারণে অথবা লোকসান হতে থাকলে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া হবে না উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থির ব্যয়ের কোন ভূমিকা নেই। ফার্ম যদি তার পরিবর্তনশীল ব্যয় তুলে নিতে পারে, তবে লোকসান হতে থাকলেও উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া হবে। তবে দীর্ঘকালে ফার্মকে তার যাবতীয় ব্যয়ই তুলে নিতে হবে। কারণ লোকসান স্বীকার করে কোন ফার্মই দীর্ঘকালে উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না, এমন কি স্বল্পকালে যে ব্যয়গুলি স্থির ব্যয় ছিল, ফার্মকে সেইগুলিও তুলে নিতে হবে। এই অর্থে দীর্ঘকালে স্থির ব্যয়গুলি প্রকৃত ব্যয় হয়ে দাড়ায়।

নিচের দৃষ্টান্তে একটি ফার্মের মোট স্থির ব্যয়, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়, মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, গড় মোট ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় কি হবে তা দেখানো হ'ল ঃ

উৎপাদনের পরিমাণ	**মোট স্থির ব্যয় (TFC)**	**মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)**	**মোট ব্যয় (TC)**	**গড় স্থির ব্যয় (AFC)**	**গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC)**	**গড় মোট ব্যয় (ATC)**	**প্রান্তিক ব্যয় (MC)**
০	১০.০০	০	১০	০-	০	—	০
১	১০.০০	৫.০০	১৫.০০	১০	৫.০০	১৫.০০	৫.০০
২	১০.০০	৯.০০	১৯.০০	৫.০০	৪.৫০	৯.৫০	৪.০০
৩	১০.০০	১২.০০	২২.০০	৩.৩৩	৪.০০	৭.৩৩	৩.০০
৪	১০.০০	১৪.০০	২৪.০০	২.৫০	৩.৫০	৬.০০	২.০০
৫	১০.০০	১৫.০০	২৫.০০	২.০০	৩.০০	৫.০০	১.০০
৬	১০.০০	১৮.০০	২৮.০০	১.৬৭	৩.০০	৪.৬৭	৩.০০
৭	১০.০০	২২.৬৭	৩২.৬৭	১.৪৩	৩.২৪	৪.৬৭	৪.৬৭
৮	১০.০০	৩০.০০	৪০.০০	১.২৫	৩.৭৫	৫.০০	৭.৩৩
৯	১০.০০	৪৫.০০	৫৫.০০	১.১১	৫.০০	৬.১১	১৫.০০
১০	১০.০০	৭০.০০	৮০.০০	১.০০	৭.০০	৮.০০	২৫.০০

(i) মোট ব্যয় (TC) = মোট স্থির ব্যয় (TFC) + মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)

(ii) গড় স্থির ব্যয় (AFC) = $\dfrac{\text{মোট স্থির ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$

(iii) গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) = $\dfrac{\text{মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$

(iv) গড় মোট ব্যয় (ATC) = $\dfrac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$ = AFC + AVC

(v) প্রান্তিক ব্যয় = X একক উৎপাদনের মোট ব্যয় – একক (X-১) একক উৎপাদনের মোট ব্যয়।
(MC)

TC = Total Cost ; TFC = Total Fixed Cost; TVC = Total Variable Cost; AFC = Average Fixed Cost; AVC = Average Veriable Cost; ATC = Average Total Cost; MC = Marginal Coast.

উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, মোট স্থির ব্যয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে মোট স্থির ব্যয় রেখা (TFC) আনুভূমিক হয়। উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় স্থির উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রেখে যত বেশি বেশি পরিমাণে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি ব্যবহার করা হবে, ততই বৃহৎ-আয়তন উপাদানের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা (শ্রমিবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধা) পাওয়া যায়। এর ফলে যে হারে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির নিয়োগ বাড়ানো হয়, মোট উৎপাদন তার তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানগুলির দাম যদি নির্দিষ্ট থাকে তবে যে হারে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তার তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পাবে। এই কারণে উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা আনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর মোট উৎপাদনের পরিমাণ যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির উপকরণের সঙ্গে ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে বৃহৎ আয়তন উৎপাদনের সুবিধার পরিবর্তে নানাবিধ অসুবিধা (কারখানা-বাড়িতে স্থানাভাব, পরিচালকের পক্ষে সবদিকে নজর রাখার অসুবিধা, যন্ত্রপাতির উপর অত্যধিক চাপ পড়ায় উৎপাদনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি) সৃষ্টি হয়। এবং ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন কার্যকর হয়, এর ফলে যেহারে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, মোট উৎপাদন তার তুলনায় কম হারে বাড়ে। অন্যভাবে বলা যায়, উপাদানগুলির দাম নির্দিষ্ট থাকলে যে হারে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তার তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর TVC রেখা আনুভূমিক অক্ষের দিকে উত্তল হয়। মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি হ'ল মোট ব্যয়। তাই TVC রেখা এবং TFC রেখা লম্বালম্বি যোগ করলে TC রেখা পাওয়া যাবে। যে কোন পরিমাণ উৎপাদনে TFC যেহেতু অপরিবর্তিত থাকে তাই TC রেখা ও TVC রেখার মধ্যে উলম্ব পার্থক্য সর্বদা একই হবে।

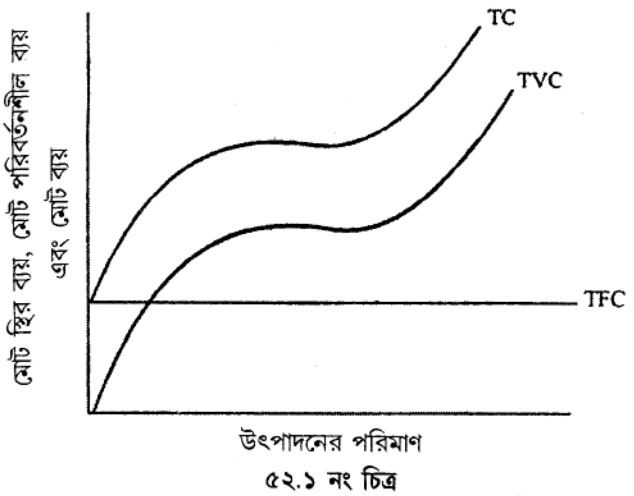

৫২.১ নং চিত্র

৫২.৩ প্রান্তিক ব্যয় ও স্থির ব্যয়

কোন দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করা হ'লে ফার্মের মোট ব্যয় যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় তাই হ'ল প্রান্তিক ব্যয়। উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ফার্মের মোট স্থির ব্যয় যেহেতু

সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে, তাই দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করা হ'লে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যতটা বাড়বে মোট ব্যয়ও ঠিক ততটা বাড়বে। এই কারণে আমরা একথা বলতে পারি যে, প্রান্তিক ব্যয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে স্থির ব্যয়ের কোন উপাদান নেই। উপরের সারণিতে ধরা যাক উৎপাদনের পরিমাণ ৫ একক বাড়িয়ে ৬ একক করা হ'ল। এর ফলে মোট ব্যয় ২৫.০০ টাকা থেকে বেড়ে ২৮.০০ টাকা হ'ল এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ১৫.০০ টাকা থেকে বেড়ে ১৮.০০ টাকা হ'ল। উভয় ক্ষেত্রেই মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটল ৩.০০ টাকা। অর্থাৎ মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি বা মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বৃদ্ধি যে ভাবেই দেখা হোক না কেন, প্রান্তিক ব্যয় হ'ল ৩.০০ টাকা।

নিম্নলিখিত সরল বীজগণিতের মাধ্যমেও বিষয়টিকে দেখা যেতে পারে—

প্রান্তিক ব্যয় = x একক উৎপাদনের মোট ব্যয় – (x–1) একক উৎপাদনের মোট ব্যয়

= [x একক উৎপাদনের TFC + x একক উৎপাদনের TVC – [(x–1)] একক উৎপাদনের TFC + (x–1) একক উৎপাদনের TVC একক]

= x একক উৎপাদনের TFC + x একক উৎপাদনের TVC – (x–1) একক উৎপাদনের TFC (x–1) একক উৎপাদনের TVC

= x একক উৎপাদনের TVC – (x–1) একক উৎপাদনের TVC

= কোন দ্রব্যের পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করা হ'লে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের বৃদ্ধি

[উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন মোট স্থির ব্যয় *(TFC)* সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে, x একক উৎপাদনের *TFC = (x–1)* একক উৎপাদনের *TFC*

৫২.৪ স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি

স্বল্পকালে একটি ফার্মের মোট ব্যয়কে মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, মোট স্থির ব্যয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই কারণে, উৎপাদনের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায় তত স্থির ব্যয় (= মোট স্থির ব্যয়/উৎপাদনের পরিমাণ) ততই হ্রাস পায়। তাই গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়। শুধু তাই নয়, AFC রেখাটি সমপরাবৃত হয়। AFC রেখার বিভিন্ন বিন্দুর ভুজ ও কোটি নিয়ে আয়তক্ষেত্রগুলি পাওয়া যায়, তার সবগুলির ক্ষেত্রফল একই হবে।

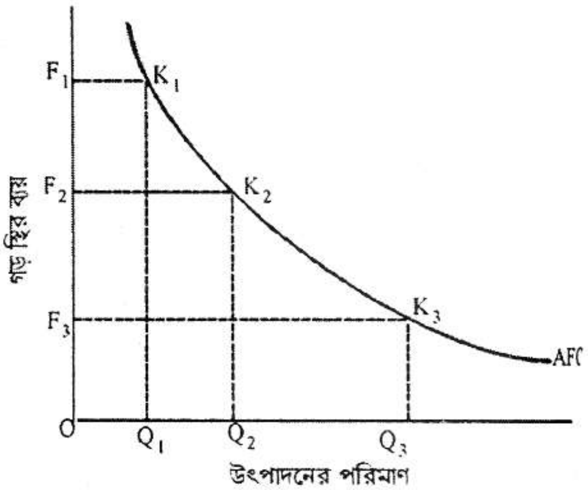

৫২.২নং চিত্র

উৎপাদনের পরিমাণ যখন OQ_1 গড় স্থির ব্যয়, তখন মোট স্থির ব্যয় Q_1K_1 এবং মোট স্থির ব্যয় $OQ_1K_1F_1$; আবার উৎপাদনের

পরিমাণ যখন OQ_2 গড় স্থির ব্যয় তখন Q_2K_2 এবং মোট স্থির ব্যয় হ'ল $Q_2K_2F_2$; আবার উৎপাদনের পরিমাণ যখন OQ_3 গড় স্থির ব্যয় তখন Q_3K_3 এবং মোট স্থির ব্যয় $OQ_3K_3F_3$। এখন $OQ_1K_1F_1$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $OQ_2K_2F_2$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = $OQ_3K_3F_3$ আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল, কারণ প্রতিটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল একই পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় নির্দেশ করে। এই কারণে, AFC রেখাটি সমপরাবৃত্ত হবে।

উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহদায়তন উৎপাদনের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা (শ্রমবিভাগ এবং বিশেষীকরণের সুবিধা) পাওয়া যায়। এর ফলে যে হারে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, মোট উৎপাদন তার তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির দাম নির্দিষ্ট থাকলে যে হারে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তার তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পায়। এই কারণে উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা (AVC) বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপাদনের পর স্থির উপাদানগুলি অপরিবর্তিত রেখে যত বেশি বেশি পরিমাণে পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, ততই উৎপাদন ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদনের নানাবিধ সুবিধার পরিবর্তে অসুবিধা (কারখানা-বাড়িতে স্থানাভাব, পরিচালনা সংক্রান্ত অসুবিধা, যন্ত্রপাতির ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি) দেখা দেয়। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়। এর ফলে যে হারে পরিবর্তনশীল উৎপাদনগুলির নিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, মোট উৎপাদন তার তুলনায় কম হারে বৃদ্ধি পায়। অন্যভাবে বলা যায়, মোট উৎপাদন যে হারে বৃদ্ধি পায়, মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তার তুলনায় বেশি হারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বাড়তে থাকে। এই কারণে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টি হ'ল গড় মোট ব্যয়। উৎপাদনের প্রথম অবস্থায় গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে। গড় স্থির ব্যয় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ক্রমাগত হ্রাস পায়, ফলে গড় মোট ব্যয় ও প্রথমাবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। এই কারণে প্রথম দিকে গড় মোট ব্যয় (ATC) রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর AFC রেখা নিম্নগামী হলেও AVC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। এর ফলে গড় মোট ব্যয় (ATC) উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে বাড়বে না কমবে তা AVC কি হারে বৃদ্ধি পায়, তার আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে। AVC যখন প্রথমে বাড়তে শুরু করে তখন তা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, কিন্তু AFC তখনও তুলনামূলকভাবে দ্রুত হারে হ্রাস পায়

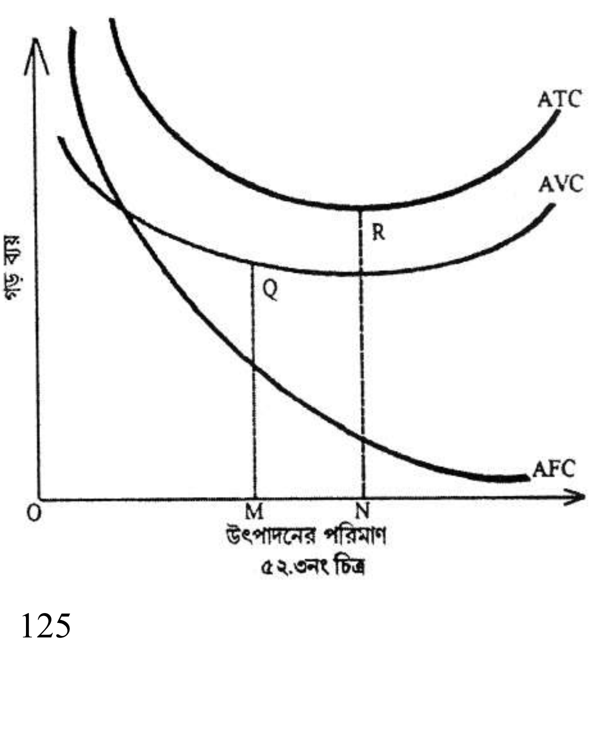

৫২.৩নং চিত্র

ফলে AVC রেখা ঊর্ধ্বগামী হলেও ATC রেখা কিন্তু নিম্নগামীই হবে। নিচের চিত্রে OM পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে AVC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। কিন্তু ON পরিমাণ উৎপাদন পর্যন্ত ATC রেখা কিন্তু নিম্নগামী, তবে ON পরিমাণ উৎপাদনের পর উৎপাদন যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে AFC যে হারে হ্রাস পায়, AVC তার তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে ON পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে ATC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল, যে পরিমাণ উৎপাদনে AVC সর্বনিম্ন হয়, তার তুলনায় বেশি পরিমাণ উৎপাদনে ATC সর্বনিম্ন হবে। এই কারণে ATC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু (R বিন্দু) AVC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর (Q বিন্দুর) ডানদিকে অবস্থান করে।

৫২.৫ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

(ক) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় ব্যয়—গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অথবা গড় মোট ব্যয়—যদি হ্রাস পায়, তবে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হবে। উপরের সারণিতে 5 একক পরিমাণ উৎপাদন পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা কম হয়। আবার 6 একক পরিমাণ উৎপাদন পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় মোট ব্যয় হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয়। রেখাচিত্রের মাধ্যমে বলা যায়, গড় ব্যয় রেখা যখন নিম্নগামী প্রান্তিক ব্যয় রেখা তখন গড় ব্যয় রেখার নিচে অবস্থান করে। তবে প্রান্তিক ব্যয় রেখা যে তখন নিম্নগামী হবেই এমন কোন কথা নেই। নিচের চিত্রে OM পরিমাণ উৎপাদন পর্যন্ত AVC রেখা নিম্নগামী এবং MC রেখা তখন AVC রেখার নিচে অবস্থান করে, যদিও OL পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে MC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। আবার ON পরিমাণ উৎপাদন পর্যন্ত ATC রেখা নিচে অবস্থান করছে।

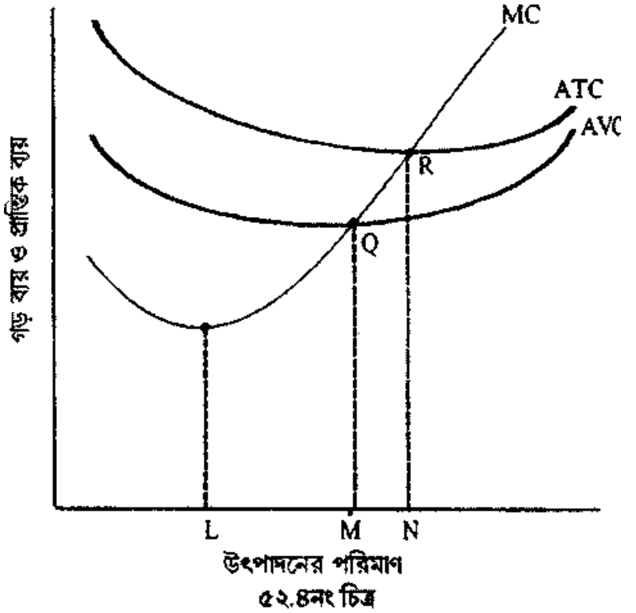

৫২.৪নং চিত্র

(খ) উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও গড় ব্যয়ের যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হবে। উপরের সারণিতে উৎপাদনের পরিমাণ পাঁচ একক থেকে ছয় একক করা হলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়। আবার উৎপাদনের পরিমাণ ৬ একক থেকে বাড়িয়ে ৭ একক করা হলে গড় মোট ব্যয়ের পরিবর্তন হয় না এবং প্রান্তিক ব্যয় ও গড় মোট ব্যয় পরস্পর সমান হয়।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে বলা যায়, গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে গড় ব্যয় সাময়িকভাবে অপরিবর্তিত থাকে এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে। উপরের চিত্রে Q বিন্দু এবং R বিন্দু হ'ল যথাক্রমে AVC রেখা এবং ATC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু। MC রেখা যথাক্রমে Q বিন্দু এবং R বিন্দুতে AVC রেখাকে এবং ATC রেখাকে ছেদ করেছে।

(গ) উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় ব্যয় যদি বৃদ্ধি পায় তবে প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে। উপরের সারণিতে ৬ একক পরিমাণ উৎপাদনের পর উৎপাদন যদি আরও বাড়ানো হয়, তবে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় বাড়তে থাকে এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। আবার ৭ একক পরিমাণ উৎপাদনের পর গড় মোট ব্যয় উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে বলা যা, গড় ব্যয়রেখা যখন ঊর্ধ্বগামী, প্রান্তিক ব্যয়রেখা তখন গড় ব্যয়রেখার উপরে অবস্থান করে। উপরের চিত্রে OM পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে AVC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এবং MC রেখা তখন AVC রেখার উপরে অবস্থান করছে। আবার ON পরিমাণ উৎপাদনের পর থেকে ATC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে এবং MC রেখা তখন ATC রেখার উপরে অবস্থান করছে।

৫২.৬ দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি

দীর্ঘকালীন সময়ে একটি ফার্ম তার স্থির উপাদানগুলির পরিবর্তন করতে পারে। স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদা বাড়লে অথবা কমলে স্থির উপাদানগুলি (যন্ত্রপাতি, কারখানা-বাড়ির আয়তন, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি) অপরিবর্তিত রেখে আগের চেয়ে বেশি অথবা কম পরিমাণে পরিবর্তনীয় উপাদানগুলি (শ্রম, বিদ্যুৎশক্তি, কাঁচামাল ইত্যাদি) ব্যবহার করে একটি ফার্ম চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণের সামঞ্জস্য বিধান করে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে (অর্থাৎ স্বল্পকালীন সময়ে চাহিদার যে পরিবর্তন ঘটেছে তা স্থায়ী হ'লে) ফার্ম তার উৎপাদনের মাত্রার (অর্থাৎ কারখানার আয়তন, যন্ত্রপাতির পরিমাণ ও অন্যান্য স্থির উপাদানের) পরিবর্তন ঘটিয়ে চাহিদার পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজের উৎপাদনের পরিমাণ ও উৎপাদন ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। একটি স্বল্পকালীন সময় হ'ল এক একটি পৃথক স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার উৎপত্তি হয়। অনেকগুলি স্বল্পকালীন সময়ের সমষ্ট হ'ল একটি দীর্ঘকালীন সময়; তাই অনেকগুলি স্বল্পকালীন ব্যয়রেখার সমষ্টি হ'ল দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখা।

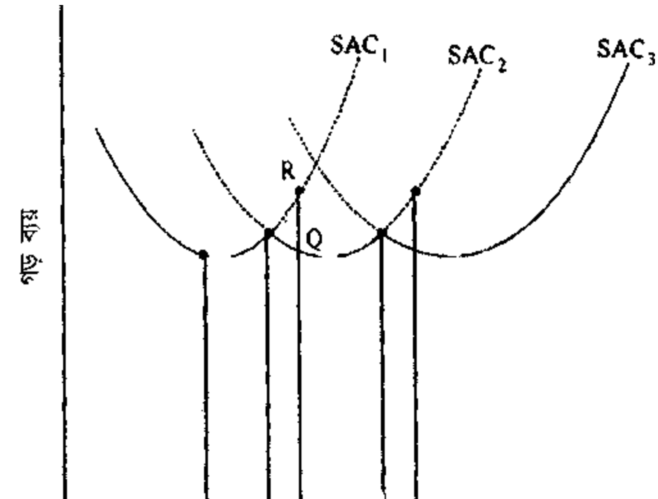

৫২.৫ নং চিত্র

ধরা যাক, ফার্ম কেবলমাত্র তিনটি পৃথক মাত্রায় উৎপাদন করতে পারে—ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন মাত্রা, মাঝারি আয়তনের উৎপাদন মাত্রা এবং বৃহদায়তন উৎপাদন মাত্রা—এই তিনটি পৃথক উৎপাদন মাত্রা অনুযায়ী তিনটি পৃথক স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা পাওয়া যাবে। SAC_1 রেখা, SAC_2 রেখা, SAC_3 রেখা দীর্ঘকালে ফার্ম যে কোন মাত্রায় উৎপাদন করতে পারে বা একটি মাত্রা থেকে অপর একটি মাত্রায় সরে যেতে পারে।

ফার্ম কোন মাত্রায় অবস্থান করবে তা নির্ভর করে দীর্ঘকালে কি পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে তার উপর। উৎপাদনের পরিমাণ যদি OX_1 হয় তবে ফার্ম অবশ্যই SAC_1 রেখার দ্বারা নির্দেশিত উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন করবে। ফার্ম যদি OX_1 পরিমাণ উৎপাদন করতে চায় তবে SAC_1 উৎপাদন মাত্রা অথবা SAC_2 মাত্রার যে কোনটি বেছে নিতে পারে। একইরকমভাবে যদি OX_2 পরিমাণ উৎপাদন করতে চায় তবে SAC_2 উৎপাদন মাত্রা অথবা SAC_3 উৎপাদন মাত্রার যে কোনটি বেছে নিতে পারে, কারণ যে মাত্রাটিই বেছে নেওয়া হোক না কে, গড় ব্যয় সমান হবে। তবে ভবিষ্যতে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এরূপ প্রত্যাশা থাকলে ফার্ম OX_1 পরিমাণ উৎপাদন SAC_2 উৎপাদন মাত্রায় এবং OX_2 পরিমাণ উৎপাদন SAC_3 উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন করবে। ফার্ম যদি OX_2 পরিমাণ উৎপাদন করতে চায় তবে অবশ্যই SAC_2 উৎপাদন মাত্রাটি বেছে নেওয়া হবে। কারণ SAC_1 রেখা অনুযায়ী OX_2 পরিমাণ উৎপাদন করতে চায় তবে অবশ্যই SAC_2 উৎপাদন মাত্রাটি বেছে নেওয়া হবে। কারণ SAC_1 রেখা অনুযায়ী OX_2 পরিমাণ উৎপাদনের গড় ব্যয় (X_2R) অপেক্ষা SAC_2 রেখা অনুযায়ী ঐ পরিমাণ উৎপাদনের গড় ব্যয় (X_2Q) কম। অনুরূপভাবে ফার্ম যখন OX_3 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে যাবে তখন SAC_3 রেখার দ্বারা নির্দেশিত উৎপাদনের মাত্রা ব্যবহার করবে। এ অবস্থায় ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা SAC_1 রেখা, SAC_2 রেখা এবং SAC_3 রেখার মোটা দাগের অংশগুলি নিয়ে গঠিত। উপরের চিত্রেরর SAC রেখাগুলির ভাঙা দাগের (dotted line) অংশ হলো অপ্রয়োজনীয় অংশ, কারণ ফার্ম দীর্ঘকালে কখনই ঐ ভাঙা দাগের অংশে উৎপাদন করবে না।

কেবলমাত্র তিনটি নির্দিষ্ট ও পৃথক উৎপাদন মাত্রার পরিবর্তে ফার্ম যদি অসংখ্য উৎপাদন মাত্রার মধ্যে থেকে যে কোন একটি উৎপাদন মাত্রা বেছে নিতে পারে তবে কেবলমাত্র তিনটি SAC রেখার পরিবর্তে ফার্মের সামনে অসংখ্য SAC রেখা থাকবে। এই রেখাগুলির প্রত্যেকটি স্পর্শ করে যে লেফাফা রেখা (Envelope) পাওয়া যায়, তাই হল দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা।

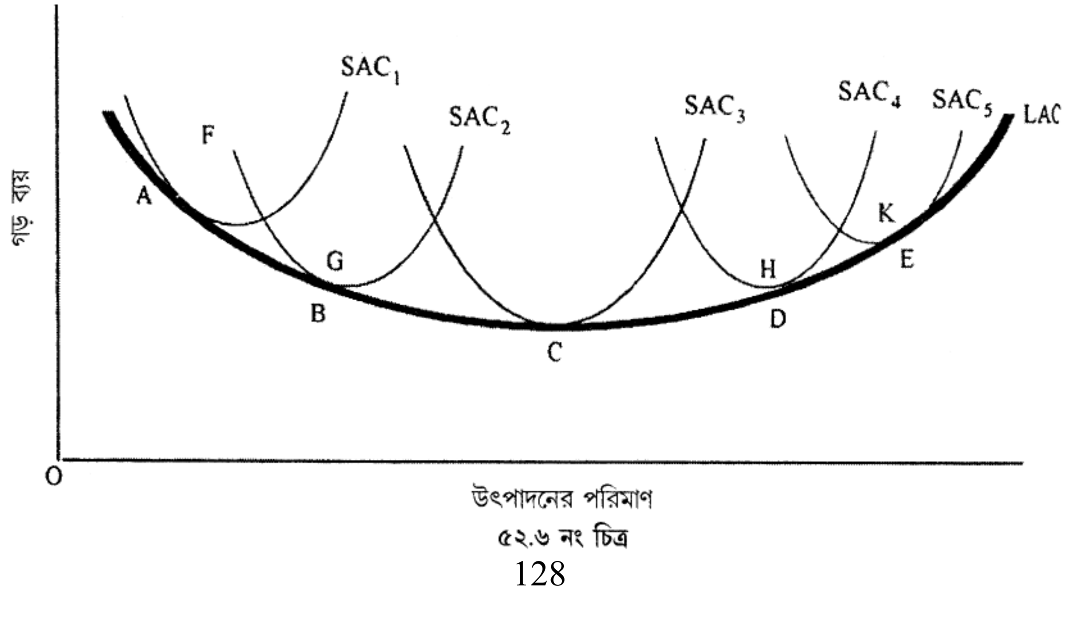

৫২.৬ নং চিত্র

উপরের ৬নং চিত্রে অসংখ্য উৎপাদনের মাত্রার মধ্যে কেবলমাত্র ৫টি উৎপাদনমাত্রা বেছে নিয়েছি। এই ৫টি উৎপাদন মাত্রা অনুযায়ী ৫টি SAC রেখা পাওয়া গেল। এই রেখাগুলিকে যথাক্রমে A, B, C, D, E বিন্দুতে স্পর্শ করে যে লম্বা রেখা পাওয়া গেল, তাই হলো দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় (LAC) রেখা।

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে তা নির্ভর করে আমরা কি ধরনের স্বীকার্য (hypothesis) বিষয় গ্রহণ করি, তার উপর। যদি যাবতীয় উৎপাদনের উপাদান দীর্ঘকালে সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য এবং পরিবর্তনশীল হয়, তবে দীর্ঘকালে যে পরিমাণই উৎপাদন করা হোক না কেন, সর্বদাই উপাদানগুলির সর্বোত্তম সমন্বয় সম্ভব। সেক্ষেত্রে যে কোন পরিমাণ উৎপাদনের দীঘকালীন গড় ব্যয় একই হবে এবং ফার্মের দীর্ঘকালে কোনরূপ ব্যয়-সংকোচ বা ব্যয়বাহুল্য ঘটবে না। ফলে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা আনুভূমিক হবে এই LAC রেখা প্রতিটি SAC রেখাকে রেখাটির সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে।

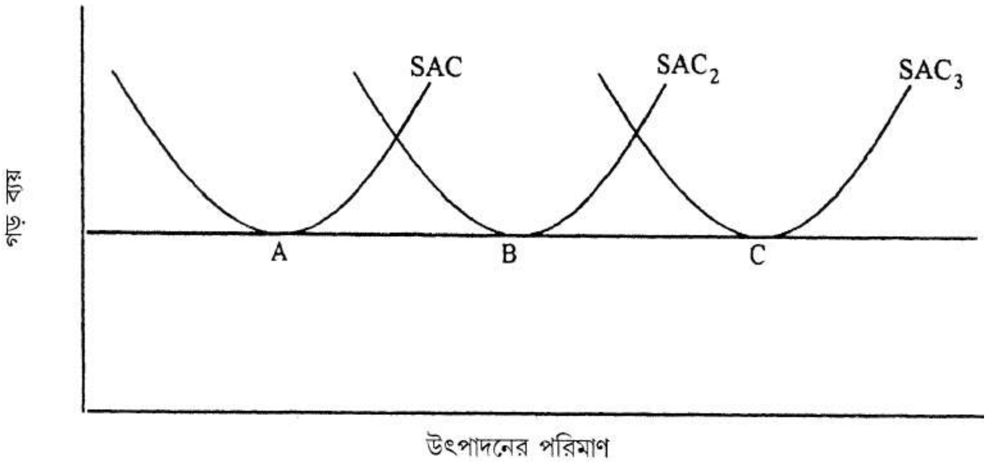

৫২.৭ নং চিত্র

কিন্তু বাস্তবে এরূপ ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম। দীর্ঘকালেও সকল উপাদান সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য এটা কিছুতেই মনে করা চলে না। বিশেষভাবে পরিচালন ব্যবস্থা কখনই সম্পূর্ণ বিভাজ উপাদান হতে পারে না। তাই প্রথম দিকে উৎপাদন যত বাড়ানো হবে, ততই অপেক্ষাকৃত স্থির এবং অবিভাজ্য উপাদানগুলির অধিকতর সদ্ব্যবহারের ফলে দীর্ঘকালেও বৃহদায়তন উৎপাদনের কিছু কিছু ব্যয়সংকোচ ঘটবে এবং তার ফলে LAC রেখাও প্রথম দিকে নিম্নগামী হবে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট মাত্রার পর উৎপাদন আরও বাড়ানো হ'লে পরিচালন ব্যবস্থা ক্রমশ অযোগ্য হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি উপাদানের সীমাবদ্ধতার দরুন দীর্ঘকালেও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যয়বাহুল্য ঘটে। ফলে এই নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর LAC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

অতএব আমরা দেখলাম যে, স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার ন্যায় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাও সাধারণত ইংরাজি 'U' অক্ষরের মতো হয়। কিন্তু এটা স্বল্পকালীন রেখাগুলির তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত (flatter) হয়। স্বল্পকালীন ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় গড় স্থিরব্যয় দ্রুত হ্রাস পায় এবং একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের পর উৎপাদন আরও বাড়ানো হলে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। ফলে গড় মোট ব্যয় যখন হ্রাস পায়, তখন তা অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে হ্রাস পায় এবং গড় মোট ব্যয় যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় সব ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং দীর্ঘকালে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের মাত্রারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়।

তাই দীর্ঘকালে গড় ব্যয় যখন হ্রাস পায়, তখন তা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, এবং গড় ব্যয় যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তা অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এই কারণে SAC রেখাগুলির তুলনায় LAC রেখা অধিকতর বিস্তৃত হয়।

৫২.৬.১ দীর্ঘকালীন ও স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার সম্পর্ক

(১) দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র কিছু নয়। এটা আসলে অসংখ্য স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার স্পর্শক রেখামাত্রা। LAC রেখার প্রতিটি বিন্দু কোন না কোন SAC রেখারও একটি বিন্দু।

(২) দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা কোনও স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখাকে ছেদ করতে পারে না। এর কারণ হল কোনও একটি দ্রব্যের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় কখনই স্বল্পকালীন গড় ব্যয় থেকে বেশি হতে পারে না।

(৩) LAC রেখা প্রত্যেকটি SAC রেখাকে একটি মাত্র বিন্দুতে স্পর্শ করে কিন্তু এই বিন্দুটি যে সংশ্লিষ্ট SAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু হবে এমন কোন কথা নেই। LAC রেখা যখন আনুভূমিক, তখন LAC রেখা প্রত্যেকটি SAC রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করে (৭নং চিত্র দ্রষ্টব্য) কিন্তু LAC রেখা যখন 'U' আকৃতিসম্পন্ন, তখন রেখাটির নিম্নগামী অংশে রেখাটি বিভিন্ন SAC রেখাকে তাদের সর্বনিম্ন বিন্দুর বাম দিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে (যেমন—উপরের ২নং চিত্রে LAC রেখা SAC_1 রেখা এবং SAC_2 যথাক্রমে A বিন্দু এবং B বিন্দুতে স্পর্শ করে অথচ SAC_1 রেখার এবং SAC_2 রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু হলো যথাক্রমে F বিন্দু এবং G বিন্দু।) এবং LAC রেখার ঊর্ধ্বগামী অংশে রেখাটি বিভিন্ন SAC রেখাগুলিকে তাদের বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে স্পর্শ করবে (যেমন ২নং চিত্রে LAC রেখা SAC_4 এবং SAC_5 রেখাকে যথাক্রমে D বিন্দু এবং E বিন্দুতে স্পর্শ করেছে, অথচ ঐ রেখাদুটির সর্বনিম্ন বিন্দু হ'ল যথাক্রমে H বিন্দু এবং K বিন্দু।) LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে (C বিন্দু) LAC রেখা অবশ্য সংশ্লিষ্ট SAC রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করবে। (C বিন্দু হ'ল SAC_3 রেখারও সর্বনিম্ন বিন্দু)।

৫২.৭ স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক

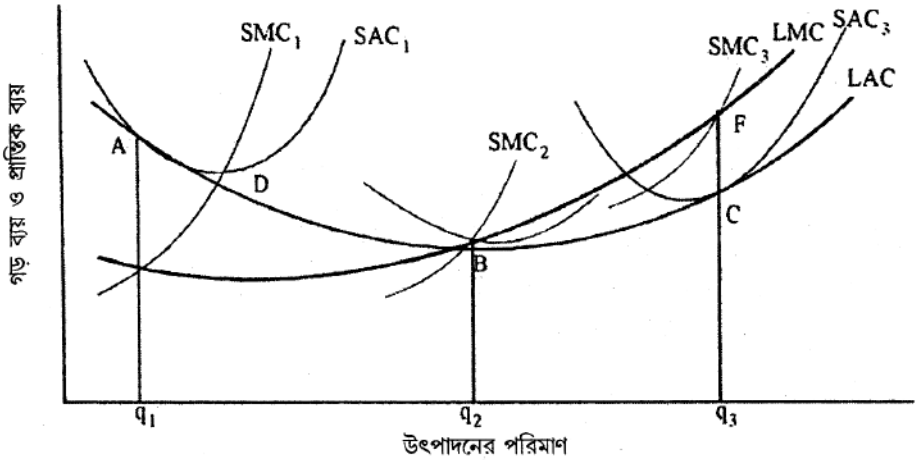

৫২.৮ নং চিত্র

যে পরিমাণ উৎপাদনে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় ও স্বল্পকালীন গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয়, ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদনেই স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়ও পরস্পর সমান হবে। অর্থাৎ যে পরিমাণ উৎপাদনের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখাকে স্পর্শ করে, ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদনেই স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে। উপরের চিত্রে A বিন্দু, B বিন্দু এবং C বিন্দু—এই তিনটি বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা (LAC রেখা) তিনটি পৃথক স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখাকে (SAC_1, SAC_2 এবং SAC_3 রেখা) স্পর্শ করেছে। এবং B এবং F বিন্দুতে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় (LMC)-রেখা যথাক্রমে তিনটি পৃথক স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় (SMC_1, SMC_2 এবং SMC_3 রেখা)-রেখাকে ছেদ করেছে। যে পরিমাণ উৎপাদনে SAC রেখা এবং LAC পরস্পরকে স্পর্শ করে, তার তুলনায় কম পরিমাণ উৎপাদনে LMC অপেক্ষা SMC কম হবে এবং তার তুলনায় বেশি পরিমাণ উৎপাদনে LMC অপেক্ষা SMC বেশি হবে। অর্থাৎ যে বিন্দুতে SMC ও LMC রেখা পরস্পরকে ছেদ করে, তার তুলনায় কম পরিমাণ উৎপাদনে SMC রেখা LMC রেখার নিচে অবস্থান করবে এবং তার তুলনায় বেশি পরিমাণ উৎপাদনে SMC রেখা LMC রেখার উপরে অবস্থান করবে।

পাটীগণিতের সাহায্যে ব্যাখ্যা

এখানে STC (= Short-run total cost) = স্বল্পকালীন মোট ব্যয়

LTC (= Long-run total cost) = দীর্ঘকালীন মোট ব্যয়

SAC (= Short-run average cost) = স্বল্পকালীন গড় ব্যয়

LAC (= Long-run average cost) = দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়

SMC (= Short-run marginal cost) = স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়

LMC (= Long-run marginal cost) = দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়

মনে করি, Oq_1 = ১০ একক

দ্রব্যটি যখন Oq_1 = ১০ একক উৎপাদন করা হয়, তখন LAC এবং SAC পরস্পর সমান হয় এবং STC ও LTC ও পরস্পর সমান হয়। মনে করি, এখানে SAC = LAC = ৫.০০ টাকা।

সেক্ষেত্রে STC = ৫.০০ টাকা × ১০ একক ৫০.০০ টাকা।

এবং LTC = ৫.০০ টাকা × ১০ একক = ৫০.০০ টাকা

এখন দ্রব্যটি যদি Oq_1 একক অপেক্ষা ১ একক কম উৎপাদন করা হয় (অর্থাৎ ৯ একক উৎপাদন করা হয়) তবে LAC অপেক্ষা SAC বেশি হয়। ধরা যাক, তখন SAC = ৫.২০ টাকা এবং LAC = ৫.১০ টাকা। তখন,

STC = ৫.২০ টাকা × ৯ একক = ৪৬.৮০ টাকা

এবং LTC = ৫.১০ টাকা × ৯ একক = ৪৫.৯০ টাকা

এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ যদি ৯ একক থেকে বাড়িয়ে ১০ একক করা হয়,

তবে SMC = ১০ একক উৎপাদনের STC – ৯ একক উৎপাদনের STC

= ৫০.০০ টাকা – ৪৬.৮০ টাকা = ৩.২০ টাকা

এবং LMC = ১০ একক উৎপাদনের LTC – একক উৎপাদনের
= ৫০.০০ টাকা – ৪৫.৯০ টাকা = ৪.১০ টাকা

অতএব উৎপাদনের পরিমাণ যদি Oq_1 অপেক্ষা কম হয় তবে SMC < LMC। অপরপক্ষে দ্রব্যটি যদি Oq_1 একক অপেক্ষা ১ একক বেশি উৎপাদন করা হয় (অর্থাৎ ১১ একক উৎপাদন করা হয়) তবে সেক্ষেত্রেও LAC অপেক্ষা SAC বেশি হয়। ধরা যাক, এক্ষেত্রে SAC = ৪.৮০ টাকা এবং LAC = ৪.৭০ টাকা। Oq_2 পরিমাণ উৎপাদন যত বাড়ান হবে LAC এবং SAC ততই কম হবে।

এ অবস্থায় SMC = ১১ একক উৎপাদনের STC – ১০ একক উৎপাদনের LTC
= ৪.৮০ টাকা × ১১ একক – ৫.০০ × ১০ একক
= ৫২.৮০ টাকা – ৫০.০০ টাকা
= ২.৮০ টাকা।

এবং LMC = ১১ একক উৎপাদনের LTC – ১০ একক উৎপাদনের LTC
= ৪.৭০ টাকা × ১১ একক – ৫.০০ টাকা × ১০ একক
= ৫১.৭০ টাকা – ৫০.০০ টাকা
= ১.৭০ টাকা।

অতএব উৎপাদনের পরিমাণ যদি Oq_1 অপেক্ষা বেশি হয় তবে SMC > LMC।

একইরকমভাবে দ্রব্যটি যখন Oq_2 পরিমাণ অথবা Oq_3 পরিমাণ উৎপাদন করা হবে তখনও SMC এবং LMC-এর মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্কটি প্রযোজ্য হবে।

অতএব আমরা দেখলাম যে, দ্রব্যটি যখন Oq_1 পরিমাণ, Oq_2 পরিমাণ অথবা Oq_3 পরিমাণ উৎপাদন করা হয়, তখন SAC রেখা ও LMC রেখা পরস্পরকে স্পর্শ কর এবং SMC রেখা ও LMC রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। উৎপাদনের পরিমাণ যদি Oq_1, Oq_2 অথবা Oq_3 অপেক্ষা কম হয়, তবে সংশ্লিষ্ট SMC রেখা LMC রেখার নিচে অবস্থান করবে এবং উৎপাদনের পরিমাণ যদি Oq_1, Oq_2 এবং Oq_3 অপেক্ষা বেশি হয়, তবে সংশ্লিষ্ট SMC রেখা LMC রেখার উপরে অবস্থান করবে।

৫২.৮ সারাংশ

কোন দ্রব্য উৎপাদন করতে গেলে ফার্মের যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকেই উৎপাদন ব্যয় বলে। উপাদানের দাম বাবদ এই ব্যয়ের সৃষ্টি হয়—যেমন শ্রমিকের মজুরী, কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদির দাম, মূলধনের সুদ, জমি বা কারখানা-বাড়ির ভাড়া, উদ্যোক্তার ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে মুনাফা ইত্যাদি। স্বল্পকালে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা ফার্মকে দু'ধরনের ব্যয় বহন করতে হয়—স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়। স্বল্পকালে উৎপাদনের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়। স্থির উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন ঘটানো যায় না। কিন্তু দীর্ঘকালে যাবতীয় উপাদানই

পরিবর্তনশীল। স্থির উপাদানগুলির জন্য যে ব্যয় হয় তা হ'ল স্থিরব্যয় এবং পরিবর্তনশীল যে ব্যয় তা হ'ল পরিবর্তনশীল ব্যয়।

উৎপাদন ব্যয়ের আলোচনা করতে গেলে মোট ব্যয়, গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একটি সময়ে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে ফার্মের বিভিন্ন উপাদান বা উপকরণের পিছনে মোট যে ব্যয় হয়, তা হ'ল মোট ব্যয়। এই মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় গড় ব্যয়। এই গড় ব্যয় আবার গড় মোট ব্যয়, গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনশীল, এই তিন প্রকারের হতে পারে। দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করতে গেলে ফার্মের মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই প্রান্তিক ব্যয় বলে। এই প্রান্তিক ব্যয় কেবলমাত্র পরিবর্তন ব্যয় নিয়ে গঠিত। এতে স্থির ব্যয়ের কোন উপাদান নেই।

গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক রয়েছে। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে (ক) গড় ব্যয় যখন হ্রাস পায়, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়; (খ) গড় ব্যয় যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয় এবং (গ) গড় ব্যয় যখন বৃদ্ধি পায়, প্রান্তিক ব্যয় তখন গড় ব্যয় অপেক্ষা কম হয়।

স্বল্পকালীন গড় স্থির ব্যয়রেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সমপরাবৃত্ত হয়। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, গড় মোট ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়—এই তিনটি রেখাই ইংরাজী 'U' অক্ষরের মতো হয়। অর্থাৎ প্রথমে নিম্নগামী হয়, তারপর একটি সর্বনিম্ন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় এবং পরিশেষে ঊর্ধ্বগামী হয়। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা (যেটা আবার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখাও বটে, কারণ দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় বলে কিছু থাকে না) এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখাও সাধারণত 'U' আকৃতিসম্পন্ন হয়, তবে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা দু'টির তুলনায় দীর্ঘকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা দু'টি অধিকতর বিস্তৃত (flatter) হয়।

৫২.৯ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১। অর্থনীতিতে উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বোঝায়? ফার্মের মোট উৎপাদন ব্যয়রেখাগুলির আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

২। কোন ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের উপাদানগুলি কি? ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলির আকৃতি আলোচনা করুন।

৩। স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার আকৃতি ইংরাজী 'U' অক্ষরের মতো হয় কেন? স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

৪। স্থিরব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য করুন। নিম্নলিখিত ব্যয়গুলির কোন্‌টি স্থির এবং কোন্‌টি পরিবর্তনশীল তা যুক্তি সহযোগে ব্যাখ্যা করুন—

(i) জ্বালানি বাবদ ব্যয়। (ii) কোম্পানির বন্ডের উপর দেয় সুদ। (iii) যন্ত্রপাতির ব্যবহারজনিত ক্ষয়বাবদ রক্ষিত মূল্য। (iv) কার্যনির্বাহকবৃন্দের বেতন।

৫। ফার্মের আলোচনায় স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন সময়ের পার্থক্য কিরূপ করা হয়? ফার্মের স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। ফার্মের দীর্ঘকালীন ব্যয়রেখার আকৃতি সাধারণত কিরূপ হয়? স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক কি?

৭। স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার ন্যায় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাও সাধারণত 'U' আকৃতিসম্পন্ন হয়। কিন্তু স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখার তুলনায় দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা অধিকতর বিস্তৃত হয়—ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। দীর্ঘকালীন অবস্থায় সব রকমের ব্যয়ই পরিবর্তনশীল হয় কেন?

২। গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক দেখান।

৩। প্রান্তিক ব্যয় কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল ব্যয় নিয়েই গঠিত। ব্যাখ্যা করুন।

৪। কোন্ অবস্থায় একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা আনুভূমিক হবে?

৫। গড় ব্যয়রেখা আনুভূমিক হলে প্রান্তিক ব্যয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

৬। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক কি?

৭। কোন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদনের মোট ব্যয় দেওয়া থাকলে গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় কিভাবে পাওয়া যায় তা একটি দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৮। দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাকে ‘‘মোড়ক রেখা’’ বা ‘‘লেফাফা রেখা’’ বলা হয় কেন?

(গ) বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন

১। সুযোগ ব্যয় কি?

২। সুস্পষ্ট ব্যয় ও অন্তর্নিহিত ব্যয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। গড় স্থিরব্যয় কি কখনও শূন্য হতে পারে?

৪। স্বল্পকালীন গড় ব্যয় কি কখনও দীর্ঘকালীন গড় ব্যয় থেকে কম হতে পারে?

৫। গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় গড় মোট ব্যয় অপেক্ষা কম হয় কেন?

৬। প্রকৃত ব্যয় বলতে কি বোঝায়?

৭। গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় কখন পরস্পর সমান হয়?

৮। প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে কি স্থিরব্যয় ধরা হয়?

৯। নিম্নলিখিত ব্যয়গুলি স্থিরব্যয় না পরিবর্তনশীল ব্যয়?

(i) দ্বাররক্ষীর বেতন

(ii) উৎপাদন শুল্ক

(iii) পরিবহন খরচ

(iv) অবচয় ব্যয়

(v) কারখানার জন্য দেয় খাজনা।

১০। এটা কি ঠিক যে, গড় ব্যয়রেখা প্রান্তিক ব্যয়রেখার উপরে থাকলে প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নগামী অথবা ঊর্ধ্বগামী—উভয়ই হতে পারে?

একক ৫৩ ◆ বাজার ও আয় বিশ্লেষণ

গঠন

৫৩.০ উদ্দেশ্য

৫৩.১ বাজার ও তার শ্রেণীবিভাগ

৫৩.২ বাজারের পরিধি

৫৩.৩ বাজারের প্রকারভেদ

৫৩.৪ আয় বিশ্লেষণ—বিভিন্ন ধরনের আয়

৫৩.৫ গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা দুটির মধ্যে জ্যামিতিক সম্পর্ক

৫৩.৬ চাহিদার দাম—স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক

৫৩.৭ সারাংশ

৫৩.৮ অনুশীলনী

৫৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- বাজার কাকে বলে ও তার শ্রেণীবিভাগ কি কি
- বাজার পরিধি ও প্রকার
- বিভিন্ন ধরনের আয়—গড় আয় ও প্রান্তিক আয়
- গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক

৫৩.১ বাজার ও তার শ্রেণীবিভাগ

সাধারণ অর্থে 'বাজার' বলতে এমন একটি স্থানকে বুঝি যেখানে বিক্রেতাগণ কোন একটি দ্রব্য বা উপাদান বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এবং ক্রেতাগণ ঐ দ্রব্য বা উপাদানটি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে উপনীত হয়। যেমন, বড়বাজার, বৈঠকখানা বাজার, নিউমার্কেট, রাজাবাজার (এখানে বিশেষত শ্রম নামক উপাদানটির ক্রয়-বিক্রয় হয়) ইত্যাদি। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্যের বা কোন উপাদানের ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে লেনদেনের যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাকেই অর্থবিদ্যায় বাজার বলে। এই ক্রেতা ও বিক্রেতারা এক স্থানে এসে জড় হতে পারে অথবা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকতে পারে। টেলিফোন, ফ্যাক্স অথবা চিঠিপত্রের মাধ্যমে লেনদেন চলতে পারে। বেনহাম (Benham) বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত হবার ফলে এক স্থানের দ্রব্যমূল্য যদি অপর স্থানের দ্রব্যমূল্যের উপর কোনভাবে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে, তবে ঐ স্থান ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, বাজার বলে অভিহিত হবে।

বাজারের উপাদান : অর্থবিদ্যায় বাজারের কয়েকটি উপাদান বা বৈশিষ্ট্য থাকবে। প্রথমত, পৃথক পৃথক দ্রব্য বা উপাদানের জন্য পৃথক পৃথক বাজারের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন, মাছের বাজার, পাটের বাজার, কাঁচামালের বাজার, শ্রমের বাজার ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি দ্রব্য ও উপাদানের জন্য একদল ক্রেতা একদল বিক্রেতা থাকে। ক্রেতাদের লক্ষ্য হ'ল সবচেয়ে কম দামে দ্রব্যটি ক্রয় করা এবং বিক্রেতার উদ্দেশ্য হ'ল সবচেয়ে বেশি দামে দ্রব্যটি বিক্রয় করা। তৃতীয়ত, সাধারণ একটি নির্দিষ্ট দামেই বাজারে দ্রব্য বা উপাদানটির ক্রয়-বিক্রয় চলে। তবে বাজারে ক্রেতা বা বিক্রেতার সংখ্যা খুব কম হ'লে দ্রব্য বা উপাদানটির ক্রয় অথবা বিক্রয়ের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিয়ে তারা বাজার দামকে প্রভাবিত করতে পারে। চতুর্থত, বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের যে সম্পর্কটি বজায় থাকে তা হ'ল সহজ লেনদেনের সম্পর্ক।

৫৩.২ বাজারের পরিধি

বাজারের পরিধি বা আয়তন ছোট বা বড় হতে পারে। মাছ বা দুধের বাজার খুবই ক্ষুদ্র হয়, কিন্তু সোনা-রূপার বাজার, ঘড়ি বা ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যের বাজার, কাপড়ের বাজার বা এ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের বাজার বিশ্বব্যাপী হতে পারে। বাজারের পরিধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেগুলি হ'ল :

প্রথমত, যে দ্রব্যের চাহিদা যত ব্যাপক, তার বাজার ততই বিস্তৃত হবে। আধুনিক যুগে পরিবহন ও যোগাযোগ, ব্যাংক ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রসারের ফলে উপযুক্ত চাহিদা থাকলে যে কোন দ্রব্যের বাজার সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, যে দ্রব্যের স্থায়িত্ব যত বেশি, তার বাজারও তত বড়। পচনশীল দ্রব্যের (মাছ, দুধ ইত্যাদি) বাজার খুবই সঙ্কীর্ণ, কারণ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এই দ্রব্যগুলি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠাতে অসুবিধা হয়। কিন্তু কাপড়, যন্ত্রপাতি, খেলা ধুলার সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির বাজার খুবই বিস্তৃত, কারণ এ দ্রব্যগুলির স্থায়িত্ব বেশি এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রব্যটি পরিবহন করতে অনেকটা সময় লাগলেও তাতে দ্রব্যটির বিশেষ ক্ষতি হয় না।

তৃতীয়ত, দ্রব্যটির বহনযোগ্যতার উপরও বাজারের আয়তন নির্ভর করে। যে সকল দ্রব্য সহজে এবং অল্প ব্যয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাওয়া যায়, তার বাজার খুবই বড় হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হীরা, জহরত, ইলেকট্রনিক দ্রব্য ইত্যাদির বাজার খুবই বিস্তৃত হয়। অপরপক্ষে, ইটের বাজার, আসবাবপত্রের বাজার অত্যন্ত ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে, কারণ আয়তনের তুলনায় এসব দ্রব্যের মূল্য কম।

চতুর্থত, যে সকল দ্রব্য সহজে চেনা যায় এবং যাদের গুণাগুণ সহজেই যাচাই করা যায় (যেমন সোনা, মূল্যবান পাথর, দামী পোশাক ইত্যাদি), তাদের বাজারের আয়তন বড় হয়।

পঞ্চমত, যে সকল দ্রব্যের উৎকর্ষতার স্তরবিন্যাস করা যায় এবং সেই অনুযায়ী ক্রেতাদের কাছে ভাগে ভাগে দ্রব্যটি পাঠান যায়, তাদের বাজারের আয়তন বিস্তৃত হয়।

৫৩.৩ বাজারের প্রকারভেদ

বাজারের শ্রেণীবিভাগ নানাভাবে করা যেতে পারে :

১। পরিধি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ : ভৌগোলিক পরিধি অনুযায়ী বাজার স্থানীয় (Local), জাতীয়

(National) এবং আন্তর্জাতিক হতে (International) পারে। পচনশীল দ্রব্যের এবং যে দ্রব্যগুলির আয়তনের তুলনায় মূল্য কম সেই দ্রব্যগুলির বাজার হয় স্থানীয়। আবার যে দ্রব্যগুলি একটি দেশের সর্বত্র প্রায় একই দামে লেনদেন হয় এবং বিদেশে বিশেষ রপ্তানি হয় না, সেই দ্রব্যগুলির বাজার হ'ল জাতীয় বাজার (যেমন শিশুদের দুগ্ধজাত দ্রব্য, প্রসাধন দ্রব্য, টুথপেস্ট ইত্যাদির বাজার)। আধুনিক যোগাযোগ ও উন্নত পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অনেক দ্রব্যই এখন পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে সহজেই চালান দেওয়া যায়। এই দ্রব্যগুলির বাজার হ'ল আন্তর্জাতিক (যেমন পাটজাত দ্রব্য, চা, সুতীবস্ত্র, আকরিক লোহা ইত্যাদির বাজার)।

২। সময়-মেয়াদ অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ : অধ্যাপক মার্শাল সময়ের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী চার শ্রেণীর বাজার এবং চার শ্রেণীর দামের কথা আলোচনা করেছেন—অতি স্বল্পকালীন বাজার (Very short period market), স্বল্পমেয়াদী বাজার (Short period market), দীর্ঘমেয়াদী বাজার (Long period market) এবং অতি দীর্ঘমেয়াদী বাজার (Very long period market)।

অতি স্বল্পমেয়াদী বাজারে দ্রব্যের যোগান সম্পূর্ণ স্থির বা অপরিবর্তিত থাকে। তাই চাহিদার ওঠানামার ফলে এই বাজারে দামের ওঠা নামা ঘটে, এ ধরনের বাজারের দৃষ্টান্ত হ'ল মাছের বাজার, দুধের বাজার ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যের বাজার। সাধারণত একদিন বা দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ের বাজারকে স্বল্পমেয়াদী বাজার বলা যেতে পারে। স্বল্পমেয়াদী বাজারে উৎপাদক তার পরিবর্তনশীল উপাদাগুলির (শ্রম, কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদি) পরিবর্তন ঘটিয়ে দ্রব্যের যোগানের কিছুটা বাড়াতে বা কমাতে পারে, কিন্তু যন্ত্রপাতি, জমি বা কারখানা-বাড়ি ইত্যাদি স্থির উপাদানগুলির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেবলমাত্র যোগানের পরিবর্তন করতে পারে। সময় এত দীর্ঘ হয় যে, উৎপাদক দ্রব্যের যোগানের পরিবর্তনশীল উপাদাগুলিই নয়, তার স্থির উপাদানগুলিরও পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং নতুন নতুন ফার্ম ঐ দ্রব্যটি উৎপাদন বন্ধ করে দিতে পারে। অতি দীর্ঘমেয়াদী বাজারে সময়-মেয়াদ এত দীর্ঘ হয় যে, মানুষের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তন, মূলধন-গঠনের হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার, নতুন উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ, নতুন বাজার সৃষ্টি ইত্যাদির ফলে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন এবং যোগানের পরিবর্তন পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলে।

৩। দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ : কি জিনিস বিক্রি করা হয় তদনুযায়ী বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যেমন, দ্রব্যের বাজার (পাটের বাজার, সোনার বাজার ইত্যাদি), উপাদানের বাজার (শ্রমের বাজার, কাঁচা তুলার বাজার ইত্যাদি), শেয়ার ও স্টকের বাজার (কলকাতার শেয়ার বাজার, মুম্বাইয়ের শেয়ার বাজার ইত্যাদি) প্রভৃতি।

৪। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের বিভিন্ন রূপগুলি এখানে আলোচনা করা হ'ল—

(ক) পূর্ণ প্রতিযোগিতা (Perfect competition) : যখন বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি সমজাতীয় দ্রব্যের ক্রয়ে ও বিক্রয়ের ব্যাপারে লিপ্ত হয় এবং নতুন নতুন ফার্মের শিল্পে অবাধ প্রবেশ ও শিল্প থেকে অবাধ প্রস্থানের উপর আইনগত বা অন্য কোন বাধা থাকে না, তখনই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উদ্ভব হয়। ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা এমন হবে যাতে কোন একজন ক্রেতা বা কোন একজন বিক্রেতা দ্রব্যটির ক্রয় অথবা বিক্রয়ের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিযয় বাজার দামের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। প্রত্যেক ক্রেতা এবং প্রত্যেক বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা ক্রয় অথবা বিক্রয় করতে পারবে।

(খ) একচেটিয়া বাজার (Monopoly) : একচেটিয়া বাজারে কোন একটি দ্রব্যের একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, অন্য কোন ফার্মের ঐ কারবারে প্রবেশাধিকার থাকে না এবং বিক্রেতা যে দ্রব্যটি বিক্রি করে, তার কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্যের কোন অস্তিত্ব থাকে না। দ্রব্যটির যোগানের উপর বিক্রেতার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং দ্রব্যটির যোগানের পরিবর্তন ঘটিয়ে সে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

(গ) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার (Monopolistic competition) : পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবারের মধ্যবর্তী অবস্থা হ'ল একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা। বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার কদাচিৎ দেখা যায়। যা দেখা যায়, তা হ'ল প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া কারবার—এই দুই-এর সংমিশ্রণ। এ বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে, তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশি হয়, এ ধরনের বাজারে ততটা হয় না। বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকলেও বিক্রেতারা কিন্তু সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে না। পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্তন দ্রব্য নিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে।

(ঘ) ডুয়োপলি (Duopoly) : যে ক্ষেত্রে দুটি মাত্র ফার্ম দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে তখন সেই বাজারকে ডুয়োপলি বলে। এই দুজন বিক্রেতা সম্পূর্ণ সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করতে পারে, অথবা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত, কিন্তু সামান্য পৃথকীকৃত, দ্রব্যও বিক্রি করতে পারে।

(ঙ) অলিগোপলি (Oligopoly) : এই বাজারে অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠান কোন দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন আমাদের দেশে কয়েকটি মাত্র ফার্ম মোটরগাড়ি নির্মাণ করে। এ ধরনের বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা অন্যান্য বিক্রেতার দ্রব্যের প্রকৃতি, দ্রব্যের দাম, বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয়, ক্রেতাকে প্রদত্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সেই অনুযায়ী নিজের কার্যপদ্ধতি স্থির করে। এই কারণে এধরনের বাজারে বিক্রেতাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা খুব তীব্র হয়। এই বাজারে প্রত্যেক উৎপাদক যদি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে, তখন তা নিখুঁত অলিগোপলি হিসাবে গণ্য হয়। অপরপক্ষে উৎপাদকেরা যদি পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত, কিন্তু সমজাতীয় নয় এরূপ দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে সেই বাজারকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি বাজার চলে।

(চ) মনোপ্‌সনি বা একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony) : কোন দ্রব্যের বাজারে যখন একজন মাত্র ক্রেতা থাকে, কিন্তু বিক্রেতার সংখ্যা অনেক হয়, তখন ঐ বাজারকে মনোপ্‌সনি বলে। ভারতে রেলওয়ে ব্যবহৃত অনেক দ্রব্য বহু উৎপাদক যোগান দেয়, কিন্তু তা ক্রয় করে কেবলমাত্র ভারতীয় রেলওয়ে।

(ছ) দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার (Bilateral monopoly) : যে বাজারে কোন একটি দ্রব্য বা উপাদানের একজন মাত্র ক্রেতা ও একজন মাত্র বিক্রেতা থাকে, তখন সেই বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার বলে। শ্রমের বাজারে অনেক সময় এরূপ অবস্থায় দেখা যায় যে, কোন প্রতিষ্ঠানের শিল্পের শ্রমিকগণ যদি একটি শ্রমিক সংঘের (Trade Union) সদস্য হয় এবং সেই শ্রমিক সংঘ যদি একজন মালিক বা মালিকদের একটিমাত্র সংগঠনের সঙ্গে মজুরীর হার, বোনাস, কাজের শর্তাদি ইত্যাদি বিষয়ে দরকষাকষি করে, তবে দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজারের সৃষ্টি হয়।

৫৩.৪ আয় বিশ্লেষণ—বিভিন্ন ধরনের আয়

বিভিন্ন ধরনের আয় : মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়—

১। মোট আয় (Total revenue) : কোন প্রতিষ্ঠান বা ফার্ম তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে মোট যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তাকেই ঐ ফার্মের মোট আয় বলে। মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের

বাজার দাম দিয়ে গুণ করলেই বিক্রেতার মোট আয়ের পরিমাণ জানা যায়। সুতরাং মোট আয় = বিক্রয়ের পরিমাণ × দ্রব্যের প্রতি একক দাম। ধরা যাক, একটি ফার্ম ১০ টাকা দামে ৫০০টি কলম বিক্রি করল সেক্ষেত্রে বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় = ৫০০ একক × ১০ টাকা = ৫,০০০ টাকা।

দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যের দামের যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে (পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এরূপই ঘটে, তবে যে অনুপাতে দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে, বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়বে। কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের দাম যদি কমে যায় (যেমন একচেটিয়া বা অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ঘটে), তবে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ যে হারে বাড়ে, মোট বিক্রয়লব্ধ আয় তার তুলনায় কম অনুপাতে বাড়ে। বিক্রয়ের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমা ছাড়িয়ে গেলে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় কমেও যেতে পারে।

২। গড় আয় (Average revenue) : কোন ফার্মের গড় আয় বলতে প্রতি এককে গড় বিক্রয়লব্ধ আয়কে নির্দেশ করা হয়। যেমন কোন দ্রব্যের ৫০০ একক বিক্রি করে যদি মোট ৫০০০ টাকা পাওয়া যায় তবে গড় আয় হবে ১০ টাকা। সুতরাং

$$\text{গড় আয়} = \frac{\text{মোট আয়}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ}}$$

প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র (যেমন, নিখুঁত একচেটিয়া কারবারী যখন একই দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন এককের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করে) ছাড়া গড় আয় এবং দ্রব্যের বাজার দামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক বিক্রেতা বাজারে একটি সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে এবং বাজারে এই দ্রব্যটির ক্রেতার সংখ্যাও অনেক। এই অবস্থায় কোন একজন বিক্রেতা একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে; দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলেও তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয় না। এ অবস্থায় দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ যাই হোক না কেন, ফার্মের গড় আয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে এবং সেক্ষেত্রে গড় আয়রেখাটিও আনুভূমিক হবে। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে (ক্রেতা অথবা বিক্রেতার সংখ্যা যদি অল্প হয় অথবা বিক্রেতারা যদি সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি না করে বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে), তবে কোন একজন বিক্রেতা দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়। সেক্ষেত্রে কোন একটি ফার্মের গড় আয়রেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে।

৩। প্রান্তিক আয় (Marginal revenue) : কোন দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করা হ'লে বিক্রেতার মোট আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাই হ'ল প্রান্তিক আয়। একটি সমীকরণের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই যে

প্রান্তিক আয় = দ্রব্যটি × একক বিক্রি করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় - দ্রব্যটি (x –১) একক বিক্রি করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয়।

ধরা যাক, একজন বিক্রেতা একটি দ্রব্য ১১ একক বিক্রি করে ১১২ টাকা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হিসাবে অর্জন করে এবং ঐ দ্রব্যটি ১০ একক বিক্রি করে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হিসাবে ১০০ টাকা অর্জন করে। সেক্ষেত্রে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় = ১১২ টাকা – ১০০ টাকা = ১২ টাকা।

বিক্রেতা যদি একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে, তবে দ্রব্যটি যে পরিমাণই বিক্রি করা হোক না কেন, বিক্রেতার গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে এবং গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সর্বদা পরস্পর সমান হয়। সেক্ষেত্রে গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখাটি আনুভূমিক হবে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে বিক্রেতাকে যদি দ্রব্যের দাম কমাতে

হয়, তবে দ্রব্যটি যত বেশি পরিমাণে বিক্রি করা হবে, ততই একদিকে গড় আয় যেমন কমতে থাকবে, তেমনি প্রান্তিক আয় সর্বদাই গড় আয় অপেক্ষা কম হবে। গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয় রেখাই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে এবং প্রান্তিক আয়রেখা গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করবে।

দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করলেও দ্রব্যের দাম যখন কোন পরিবর্তন হয় না, তখন ফার্মের মোট আয়রেখা এবং গড় আয়রেখা ও প্রান্তিক আয়রেখা কিরূপ হবে, তা নিচের দুটি চিত্রে দেখা হয়েছে।

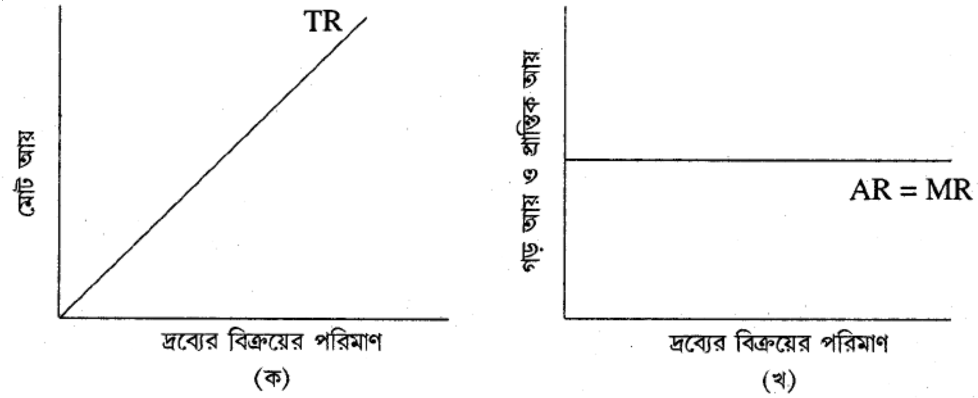

মোট আয় (TR) রেখাটি একটি মূলবিন্দুগামী ঊর্ধ্বগামী সরলরেখা হবে কারণ দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ এবং বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বদা সমানুপাতিক হবে। ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয় (AR = MR) রেখা যে অক্ষে দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে, সেই অক্ষরের সমান্তরাল অর্থাৎ আনুভূমিক হবে।

দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে বিক্রেতাকে যখন দ্রব্যের দাম কমাতে হয় তখন ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখাগুলির আকৃতি কিরূপ হবে তা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

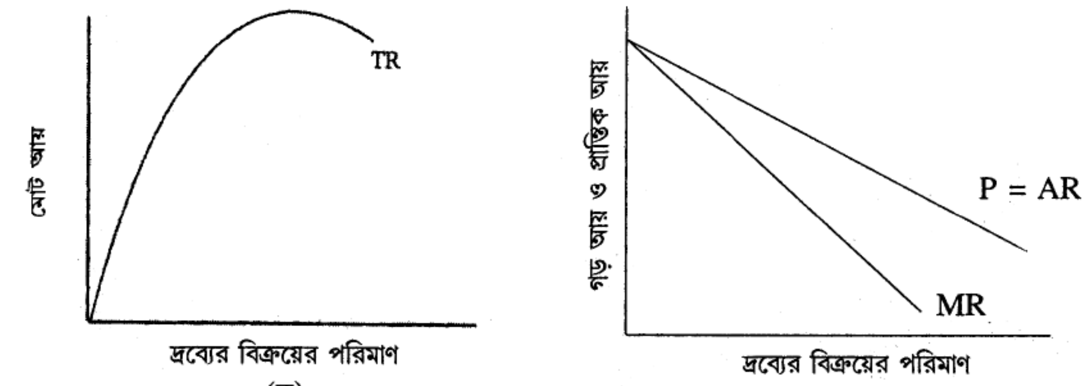

(ক) **৫৩.২ নং চিত্র** (খ)

দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে যেহেতু বিক্রেতাকে দ্রব্যের কাম কমাতে হয়, তাই মোট আয় (TR) রেখাটি যে অক্ষে দ্রব্যটির বিক্রির পরিমাণ পরিমাপ করা হচ্ছে, সেই অক্ষের দিকে অবতল (Concave) হবে। এমন কি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রয়ের পর TR রেখাটি নিম্নগামীও হতে পারে। দাম = গড় আয় (P = AR) রেখা এবং প্রান্তিক আয় (MR) রেখা—উভয় রেখাই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী অর্থাৎ ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে এবং MR রেখাটি সর্বদা P = AR রেখার নিচে অবস্থান করবে।

৫৩.৫ গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা দুটির জ্যামিতক সম্পর্ক

ধরা যাক, বিক্রেতা দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলই তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়। সেক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কিরূপ হবে তা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ একক	মোট আয় (টাকা) (PR)	দাম বা গড় আয় (P) (টাকা) (PR)	প্রান্তিক আয় (টাকা) (MR)
১	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২	১৯.০০	৯.০০	৯.০০
৩	২৭.০০	৯.০০	৮.০০
৪	৩৪.০০	৮.৫০	৭.০০
৫	৪০.০০	৮.০০	৬.০০

উপরের দৃষ্টান্তে যে দাম = গড় আয় (P = AR) রেখা ও প্রান্তিক ব্যয় ও (MR) রেখা পাওয়া যায়, সেই রেখা দুটি উভয়ই ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন সরলরেখা হবে এবং MR রেখা P = AR রেখার নিচে অবস্থান করবে। যেখানে এরূপ ঘটবে সেখানে উল্লম্ব অক্ষের (যে অক্ষে দাম, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরিমাপ করা হয়েছে) উপর P = AR রেখা থেকেই যদি কোন লম্ব টানা যায়, তবে MR রেখা ঐ লম্বটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করবে। নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

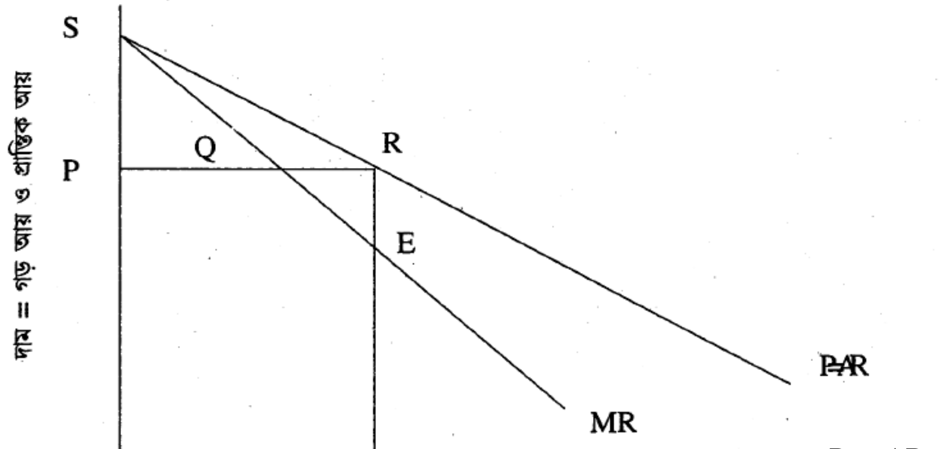

৫৩.৩ নং চিত্র

চিত্রে P = AR রেখা এবং MR রেখা হলো কোন বিক্রেতার যথাক্রমে দাম = গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা। এখানে উল্লম্ব অক্ষের উপর হয়েছে। MR রেখা এই PR লম্বটিকে Q বিন্দুতে ছেদ করেছে। অক্ষদের দেখাতে হবে যে PQ = QR.

বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে দুটি দিক থেকে দেখা যেতে পারে। একদিক থেকে মোট আয় = দ্রব্যের পরিমাণ × দ্রব্যের দাম। OP দামে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা হ'ল OL। সেক্ষেত্রে মোট আয় =

OP × OL = OPRL আয়তক্ষেত্র। আবার অন্যদিক থেকে মোট আয় = Σ প্রান্তিক আয়। সেক্ষেত্রে দ্রব্যটি যখন OL পরিমাণ বিক্রি করা হয় তখন মোট আয় = OSQEL ক্ষেত্র। যেমন দ্রব্যটি যখন ৪ একক বিক্রি করা হয় তখন প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী মোট আয় = ৪ একক × ৮.৫০ টাকা = ৩৪.০০ টাকা এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী মোট আয় = বিভিন্ন এককের প্রান্তিক আয়ের যোগফল = (১০.০০ + ৯.০০ + ৮.০০ + ৭.০০) টাকা = ৩৪.০০ টাকা। অতএব দেখা গেল যে, উভয় ক্ষেত্রেই মোট আয় = ৩৪.০০ টাকা। সেক্ষেত্রে OPRL আয়তক্ষেত্র = OSQEL ক্ষেত্র।

বা OPQEL ক্ষেত্র + ΔQRE = OPQEL ক্ষেত্র + ΔSPQ

বা ΔQRE = ΔSPQ

এখন এই QRE এবং SPQ ত্রিভুজ দুটির মধ্যে

∠SPQ = ∠QRE (এক সমকোণ)

∠SQP = ∠RQE (বিপ্রতীপ কোণ)

এবং ত্রিভুজ দুটির ক্ষেত্রফল সমান

∴ ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম

সেক্ষেত্রে PQ = QR

গড় আয়রেখাটি যদি উপরের দিক থেকে অবতল (Concave upwords) হয়, তবে উল্লম্ব অক্ষ থেকে গড় আয় রেখা পর্যন অঙ্কিত লম্বটিকে প্রান্তিক আয়রেখা লম্বটির মধ্য বিন্দুর বাঁদিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে ছেদ করবে। অপরপক্ষে গড় আয়রেখাটি যদি নিচের দিকে অবতল (Concave downwords) হয়, তবে উল্লম্ব অক্ষ থেকে গড় আয় রেখা পর্যন্ত অঙ্কিত লম্বটিকে প্রান্তিক আয়রেখা লম্বটির মধ্যবিন্দুর ডান দিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে ছেদ করবে। নিচের দুটি চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে।

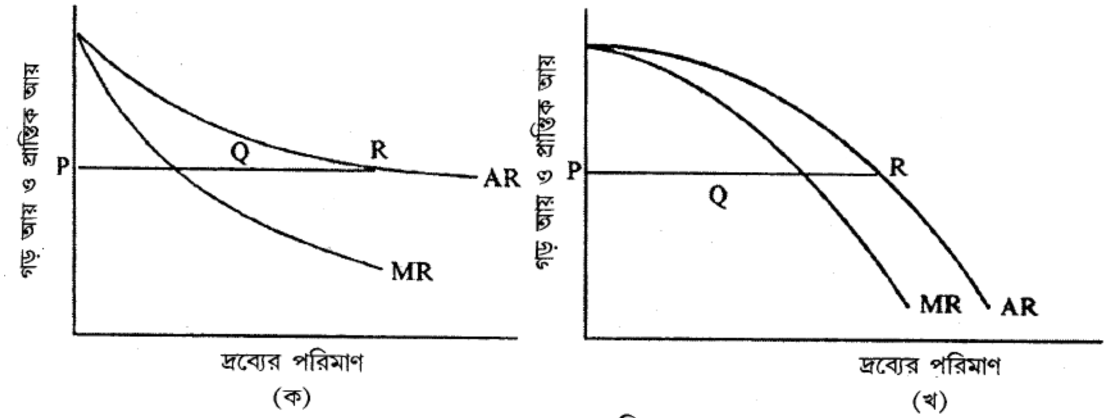

৫৩.৪ নং চিত্র

উপরের দুটি চিত্রেই PR লম্বটির মধ্যবিন্দু হ'ল Q বিন্দু। বাঁ দিকের চিত্রে AR রেখাটি উপরের দিকে অবতল হয়েছে। তাই MR রেখা লম্বটিকে Q বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে ছেদ করেছে। ডানদিকের চিত্রটিতে AR রেখাটি নিচের দিকে অবতল হয়েছে। তাই MR রেখা লম্বটিকে Q বিন্দুর ডানদিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে ছেদ করেছে।

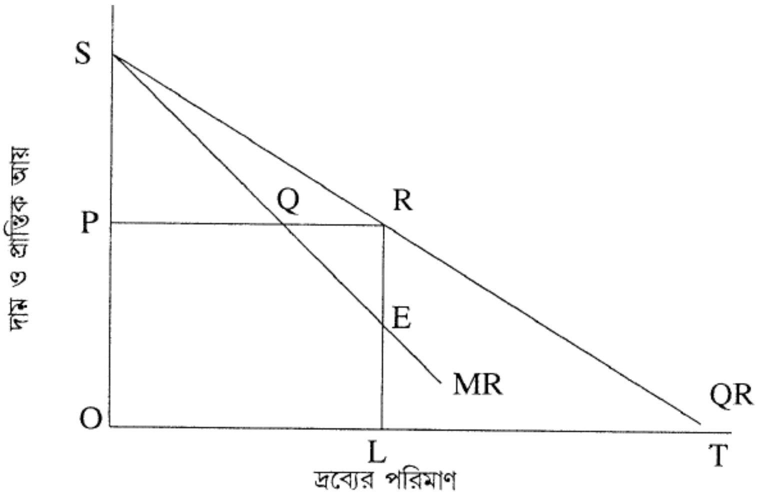

৫৩.৫ নং চিত্র

উপরের চিত্রে ST রেখা হ'ল ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন একটি সরলরৈখিক চাহিদারেখা বা গড় আয়রেখা (চাহিদা রেখা এবং গড় আয়রেখা একই রেখা, কারণ এই রেখা এক দিক থেকে বিভিন্ন দামে দ্রব্যের চাহিদা কি ভাবে তা এবং অন্যদিক থেকে দ্রব্যটি বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রি করলে বিক্রেতা কি বিভিন্ন দাম পাবে তা নির্দেশ করে)। এই গড় আয়রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন একটি সরলরৈখিক প্রান্তিক আয়রেখা।

আমরা জানি যে, চাহিদারেখা যদি একটি সরলরেখার হয়, তাহলে চাহিদারেখার কোন বিন্দুতে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা হবে :

$$e = \frac{\text{ঐ বিন্দু থেকে আনুভূমিক অক্ষ পর্যন্ত চাহিদরেখার অংশ}}{\text{ঐ বিন্দু থেকে উলম্ব অক্ষ পর্যন্ত চাহিদারেখার অংশ}}$$

OP দামে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

$$e = \frac{RT}{RS} (I)$$

এখন RLT এবং SPR এই ত্রিভুজদ্বয় সদৃশ।

অতএব $\frac{RT}{RL} = \frac{RS}{SP}$

বা $\frac{RT}{RS} = \frac{RL}{SP}$

(i) নং সমীকরণে $\frac{RT}{RS}$-এর পরিবর্তে $\frac{RL}{SP}$ বসিয়ে

পাই $e = \frac{RL}{SP}$

এখন SPQ এবং PQE এই ত্রিভুজদ্বয়ের

মধ্যে $\angle QRE = \angle SPQ$ (এক সমকোণ)

$\angle PQE = \angle SQP$ (বিপ্রতীপ কোণ)

এবং PQ =QR

AR রেখা এবং MR রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন সরলরেখা হ'লে দাম অক্ষ থেকে AR রেখা পর্যন্ত কোন লম্ব টানা হলে MR রেখা ঐ লম্বকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

(অতএব Q বিন্দু হ'ল PR রেখার মধ্যবিন্দু)

অর্থাৎ ত্রিভুজদ্বয় সর্বসম।

সেক্ষেত্রে SP = RE

(ii) নং সমীকরণে SP-র পরিবর্তে RE বসিয়ে

পাই,

$$e = \frac{RL}{RE}$$

বা, $e = \frac{RL}{RL - EL}$

বা, $e = \frac{AR}{AR - MR}$

(দ্রব্যের পরিমাণ যখন OL গড় আয় বা AR তখন RL এবং প্রান্তিক আয় বা MR তখন EL)

বা, e (AR – MR) = AR

বা, eAR – eMR = AR

বা, –err = – eAR + AR

বা, –eMR = –AR (e – 1)

বা, $MR = \frac{AR(e-1)}{e}$

বা, $MR = AR\left(\frac{e}{e} - \frac{1}{e}\right)$

বা, $MR = AR\left(1 - \frac{1}{x}\right)$

(i) নং দৃষ্টান্ত :— চাহিদা যখন সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক

(e = x)

সেক্ষেত্রে $MR = AR\left(1 - \frac{1}{x}\right)$ = AR (1–0)

= AR – 0

= AR

অর্থাৎ এখানে প্রান্তিক আয় ও গড় আয় পরস্পর সমান হবে।

(ii) নং :—চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক

$e > 1$

মনে করি, $e = \frac{3}{4} > 1$

সেক্ষেত্রে $MR = AR\left(1 - \frac{1}{\frac{3}{4}}\right)$

$= AR\left(1 - \frac{3}{4}\right)$

$= AR\left(\frac{4-3}{4}\right)$

$= AR\left(\frac{1}{4}\right) > 0$ (কারণ AR সর্বদাই ধনাত্মক)

অর্থাৎ চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক তখন প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হবে।

(iii) নং দৃষ্টান্ত :— চাহিদা যখন একক স্থিতিস্থাপক ($e = 1$)

সেক্ষেত্রে $MR = AR\left(1 - \frac{1}{1}\right)$

$= AR\ (1-1)$

$= AR\ (0)$

অতএব চাহিদা যখন একক স্থিতিস্থাপক তখন প্রান্তিক আয় 0 (শূন্য) হবে।

(iv) নং দৃষ্টান্ত :—চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক ($e < 1$)

মনে করি, $e = \frac{3}{4} \angle 1$

সেক্ষেত্রে $MR = AR\left(1 - \frac{1}{\frac{3}{4}}\right)$

$= AR\left(1 - \frac{4}{3}\right)$

$= AR\left(\frac{3-4}{3}\right)$

$= AR\left(-\frac{1}{3}\right) \angle 0$

অতএব চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক, তখন প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হবে।

৫৩.৭ সারাংশ

কোন দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ক্রেতা ও বিক্রেতার সমষ্টিকে সেই দ্রব্যের বাজার বলে। এই ক্রেতা ও বিক্রেতারা এক জায়গায় এসে উপনীত হতে পারে অথবা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকতে পারে। বাজারের পরিধি বা আয়তন ছোট অথবা বড় হতে পারে। বাজারের পরিধি যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে, সেগুলি হ'ল দ্রব্যটির চাহিদার ব্যাপকতা, দ্রব্যটির স্থায়িত্ব ও বহনযোগ্যতা, দ্রব্যটি সহজে চেনার উপায় ও তার গুণাগুণ যাচাই করার সম্ভাবনা এবং দ্রব্যটির উৎকর্ষতার স্তরবিন্যাস করার ক্ষমতা ইত্যাদি। বিভিন্নভাবে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। ভৌগোলিক পরিধি অনুযায়ী, বাজার স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হতে পারে। অধ্যাপক মার্শাল সময়ের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী অতি স্বল্পকালীন, স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী ও অতি দীর্ঘমেয়াদী—এই চার শ্রেণীর বাজারের কথা বলেছেন। দ্রব্যের প্রকৃতি অনুযায়ী ও বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়—যেমন দ্রব্যের বাজার, উপাদানের বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, একচেটিয়া বাজার, একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতায়, ডুয়োপলি, অলিগোপলি, ক্রেতার দিক থেকে একচেটিয়া বাজার বা মনোপ্সনি, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়া বাজার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

কোন ফার্ম তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে মোট যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তাকেই ঐ ফার্মের মোট আয় বা মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বলে। এই মোট আয় বা মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থকে দ্রব্যটির মোট বিক্রয়ের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায়, তাকে গড় আয় বলে। এই গড় আয় এবং দ্রব্যটির বাজার-দাম সমার্থক। আবার কোন দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করা হলে ফার্মের মোট আয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক আয় বলে। দ্রব্যটি যদি একটি নির্দিষ্ট দামে বিক্রেতা যত খুশি বিক্রি করতে পারে (যেমন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ঘটে থাকে), তাহলে ফার্মের মোট আয় দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণের সঙ্গে সমানুপাতিক হয় এবং গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে এবং এরা পরস্পর সমান হয়। এক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয়রেখা মূলবিন্দুগামী ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন একটি সরলরেখা হবে এবং গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা আনুভূমিক হবে। কিন্তু যদি এরূপ হয় যে, দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে বিক্রেতাকে অবশ্যই দ্রব্যের দাম কমাতে হবে তাহলে দ্রব্যটি যত বেশি বেশি পরিমাণে বিক্রি করা হবে ততই ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় হ্রাস পাবে এবং প্রান্তিক আয় অপেক্ষা কম হবে। গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা—উভয় রেখাই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হবে এবং প্রান্তিক আয়রেখা গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করবে। ফার্মের মোট আয় ক্রমহ্রাস হারে বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ মোট আয়রেখা আনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল হবে। এমন কি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রয়ের পর মোট আয়রেখা নিম্নগামীও হতে পারে।

গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা যখন ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন, সরলরেখা হবে তখন উলম্ব অক্ষ থেকে গড় আয়রেখা পর্যন্ত যদি কোন লম্ব টানা যায়, তবে প্রান্তিক আয়রেখা ঐ লম্বটিকে সমদ্বিখণ্ডিত করে। গড় আয়রেখাটি যদি উপরের দিক থেকে অবতল হয় তবে প্রান্তিক আয়রেখ ঐ লম্বটিকে তার মধ্যবিন্দু বাঁ দিকের একটি বিন্দুতে ছেদ করবে। অপরপক্ষে গড় আয়রেখাটি যদি নিচের দিকে অবতল হয়, তবে প্রান্তিক আয়রেখা লম্বটিকে তার মধ্যবিন্দুর ডান দিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে ছেদ করবে।

চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রান্তিক আয় ও গড় আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পর্কটি বজায় থাকে—

$$MR = AR\left(1-\frac{1}{e}\right)$$

এই সম্পর্কটি থেকে দেখা যায় যে, চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় ($e>1$) তবে প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হবে ($MR>0$); চাহিদা যদি একক-স্থিতিস্থাপক হয় ($e = 1$), তবে প্রান্তিক আয় শূন্যের সমান হবে ($MR = 0$) এবং চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় ($e<1$) তবে প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হবে ($MR < 0$)।

৫৩.৮ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন :

১। অর্থনীতিতে বাজার বলতে কি বোঝায়? বাজারের আয়তন কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

২। বাজারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন। পূর্ণাঙ্গ বাজার ও অপূর্ণাঙ্গ বাজারের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। বাজারের সংজ্ঞা নির্দেশ করুন। কয়েকটি দ্রব্যের বাজার বড় হয় কেন?

৪। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৫। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

৬। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রান্তিক আয় ও গড় আয়ের মধ্যে সম্পর্কটি নির্ধারণ করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। বাজারের উপাদানগুলি কি?

২। অধ্যাপক মার্শাল কিরূপে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করেছেন?

৩। প্রতিপ্তযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের শ্রেণীবিভাগ করুন।

৪। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা ও অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখার মধ্যে সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

৫। গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন সরলরেখা হ'লে দুটি রেখার মধ্যে জ্যামিতিক সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কোন অবস্থায় গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়?

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট আয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

৩। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মোট আয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

৪। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে গড় আয়রেখা ও প্রান্তিক আয়রেখার মধ্যে সম্পর্ক কি?

৫। স্থিতিস্থাপক চাহিদা হ'লে প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে?

৬। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কি হ'লে প্রান্তিক আয় শূন্য হবে?

৭। চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মান কি হ'লে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হয়?

একক ৫৪ ◆ পূর্ণ প্রতিযোগিতা

৫৪.০ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫৪.১ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়

৫৪.২ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য

৫৪.২.১ স্বল্পকালীন ভারসাম্য

৫৪.২.২ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৫৪.৩ স্বল্পকালে লোকসানের অবস্থায় ফার্মের ভারসাম্য

৫৪.৪ ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা

৫৪.৫ স্বল্পকালে ফার্মের যোগানরেখা এবং শিল্পের যোগানরেখা

৫৪.৬ ক্রমহ্রাসমান ব্যয় এবং পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্য

৫৪.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা

৫৪.৮ চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন এবং দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের উপর প্রভাব

৫৪.৯ সারাংশ

৫৪.১০ প্রশ্নাবলী

৫৪.০ পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

যে বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে সেই বাজারকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা যেতে পারে।

(ক) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা : বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা বলতে ঠিক কতজন ক্রেতা ও বিক্রেতা হবে তার কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। তবে ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা এমন হবে যাতে কোন একজন ক্রেতা বা কোন একজন বিক্রেতা দ্রব্যটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজার দামের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। প্রত্যেক ক্রেতা বাজারে দ্রব্যটি যে পরিমাণ যোগান বিক্রি করে, হয় তার অতি সামান্য অংশ ক্রয় করে। আবার প্রত্যেক বিক্রেতা বাজারে দ্রব্যটি মোট যে পরিমাণ যোগান দেওয়া হয় তার এক অতি সামান্য অংশ যোগান দেয়। এর ফলে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি নিদিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা ক্রয় অথবা বিক্রি করতে পারে। এই অর্থে প্রত্যেক ক্রেতা এবং বিক্রেতা হ'ল দামগ্রহিতা (Price-taker)।

(খ) সমজাতীয় দ্রব্য : প্রত্যেক বিক্রেতাই একই ধরনের সমগুণবিশিষ্ট দ্রব্য বিক্রি করে। বিভিন্ন বিক্রেতারা যে দ্রব্যগুলি বিক্রি করে কোন ক্রেতাই সেই দ্রব্যগুলির মধ্যে কোনরূপ বাস্তব বা কাল্পনিক পার্থক্য লক্ষ্য করে না। এর ফলে বিক্রেতাদের দ্রব্যগুলি একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্য হিসাবে গণ্য হয়। সেক্ষেত্রে সকল বিক্রেতাকেই বাজারে দ্রব্যটি একই দামে বিক্রি করতে হয়। অন্যান্য বিক্রেতারা যে দামে দ্রব্যটি বিক্রি করে, কোন একজন বিক্রেতা যদি তার তুলনায় সামান্যতম বেশি দামেও দ্রব্যটি বিক্রি করতে চায়, তবে সে আদৌ দ্রব্যটি বিক্রি করতে পারবে না, কারণ ক্রেতারা একই দ্রব্য অন্য বিক্রেতার নিকট থেকে কম দামে ক্রয় করে নেবে।

(গ) অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান : স্বল্পকালে বর্তমান ফার্মগুলি যদি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে, তবে দীর্ঘকালীন সময়ে নতুন নতুন ফার্ম বিনা বাধায় সংশ্লিষ্ট দ্রব্যটির উৎপাদন শুরু করে শিল্পে প্রবেশ করতে পারে। আবার লোকসানের আশঙ্কা দেখা দিলে যে কোন পুরনো ফার্ম দ্রব্যটির উৎপাদন বন্ধ করে সংশ্লিষ্ট শিল্প থেকে বেরিয়ে যেতে পারে।

উপরে উল্লিখিত তিনটি শর্ত বা অবস্থা বজায় থাকলে বাজারে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতা (Pure competition) আছে একথা বলা যায়। অর্থাৎ এ বাজারে একচেটিয়া কোন লক্ষণ নেই। অধ্যাপক চেম্বারলিন এভাবে বিশুদ্ধ প্রতিযোগিতার বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, এই তিনটি শর্ত ছাড়া আরও কয়েকটি শর্ত বা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকলে, যে বাজারের সৃষ্টি হয়, তাকেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Perfect competition) বলা যায়। এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল—

(i) বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিপূর্ণ জ্ঞান : প্রত্যেক ক্রেতা এবং বিক্রেতা বাজারে কোথায় কি দামে দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয় করা হচ্ছে, সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হবে। এর ফলে বাজারে দ্রব্যটির কেবলমাত্র একটি দামই বজায় থাকে, কারণ অন্যান্য বিক্রেতারা যে দামে দ্রব্যটি বিক্রি করে, কোন একজন বিক্রেতা যদি দ্রব্যটির জন্য তার তুলনায় সামান্যতম বেশি দাম দাবি করে, তা হ'লে সে দ্রব্যটি আদৌ বিক্রি করতে পারবে না। ক্রেতার অন্যান্য বিক্রেতার কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে দ্রব্যটি সংগ্রহ করে নেবে।

(ii) উপাদানের পূর্ণ সচলতা : উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ সচলতা হ'ল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ভৌগোলিক দিক থেকে বা বিভিন্ন নিয়োগের দিক থেকে প্রতিটি উপাদানের সকল একক সম্পূর্ণরূপে চলনশীল। কোন একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে বা কোন একটি বিশেষ স্থানে জমি, শ্রম বা মূলধনের দাম যদি অন্য উৎপাদন ক্ষেত্রে বা অন্য স্থানে উপাদানটিকে যে দাম দেওয়া হয়, তার তুলনায় বেশি হয়, তবে যে ক্ষেত্রে, উপাদানটির দাম কম সেই ক্ষেত্র থেকে যেক্ষেত্রে উপাদানটির দাম বেশি, সেই ক্ষেত্রে উপাদানটি অবাধে সরে আসবে। এর ফলে প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান কমে যাওয়ায় উপাদানটির দাম বেড়ে যাবে, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদার তুলনায় যোগান বেড়ে যাওয়ায় উপাদানটির দাম কমে যাবে। এইভাবে দুটি উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে কোন একটি উপাদানের দামের যে পার্থক্য ছিল, সেই পার্থক্য ধীরে ধীরে কমে আসবে। উপাদানের সম্পূর্ণ চলনশীলতা থাকলে শেষপর্যন্ত এমন একটি অবস্থা দেখা দেবে যখন প্রতিটি উৎপাদন ক্ষেত্রেই কোন একটি উপাদানের সকল একক একই দাম বা পারিশ্রমিক পাবে।

(iii) পরিবহন ব্যয়ের অনস্তিত্ব : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিভিন্ন ক্রেতা এবং বিক্রেতা পরস্পরের এত কাছে অবস্থান করে যে, দ্রব্যটি স্থানান্তরের কোন পরিবহন ব্যয় নেই এরূপ অনুমান করা হয়। পরিবহন ব্যয় থাকলে বাজারের বিভিন্ন অংশে দ্রব্যটির ভিন্ন ভিন্ন দাম হওয়ার কথা।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্য বাস্তব জগতে কোন দ্রব্যের বাজারে একরূপ দেখা যায় না বললেই চলে। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতা হলো একটি অবাস্তব ধারণা মাত্র। তবে কৃষিপণ্যের (যেমন—চাল, গম, পাট, চা তুলা ইত্যাদি) বাজারে বা প্রাকৃতিক দ্রব্যের (যেমন—আকরিক লোহা) বাজারে এই বৈশিষ্ট্যগুলি কম বেশি দেখা যায়। সুতরাং, এসকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার ধারণার কিছুটা বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব।

৫৪.১ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা করতে পারে। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতাই হ'ল দাম-গ্রহিতা। বাজারে সমগ্র শিল্পের দিক থেকে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্যের যে দাম নির্ধারিত হয়, শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম সেই দামটিকেই মেনে নেয় এবং ফার্ম দ্রব্যটির যে পরিমাণই বিক্রি করুক না কেন দামের কোন পরিবর্তন হয় না। এ অবস্থায় প্রত্যেক বিক্রেতার দাম (= গড় আয়) এবং প্রান্তিক আয় সর্বদা পরস্পর সমান হয় এবং এরা সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে (বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে মোট দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় আয় পাওয়া যায়। আবার দ্রব্যটি পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করলে বিক্রেতার মোট আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাকেই প্রান্তিক আয় বলে)।

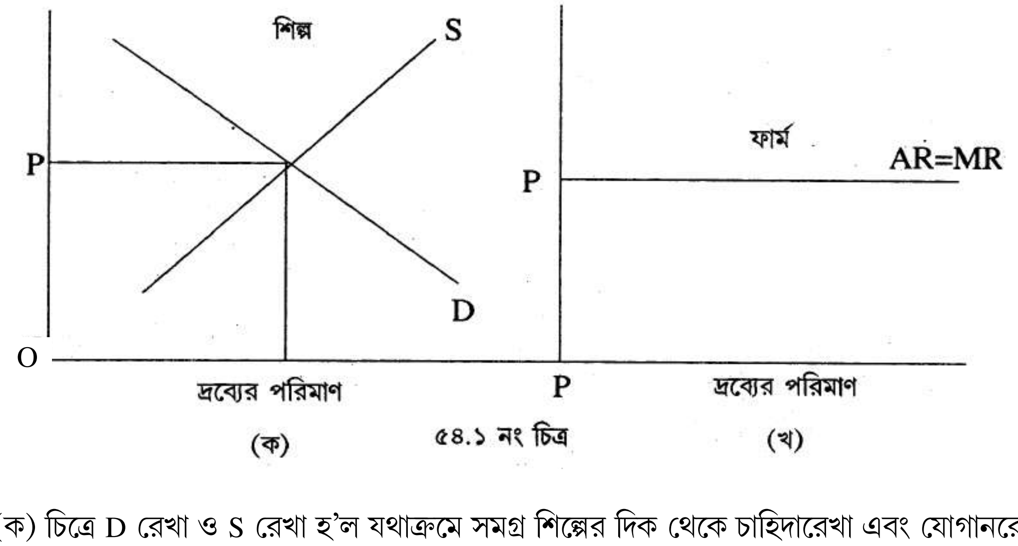

৫৪.১ নং চিত্র

১ (ক) চিত্রে D রেখা ও S রেখা হ'ল যথাক্রমে সমগ্র শিল্পের দিক থেকে চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। এই রেখাদুটির ছেদবিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম হবে OP। শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম এই দামটিকেই মেনে নেবে এবং দ্রব্যটি যে পরিমাণই বিক্রি করা হোক না কেন, দাম এবং প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে এবং অপরিবর্তিত থাকবে। ১ (খ) চিত্রে আনুভূমিক AR = MR রেখার সাহায্যে এটি দেখানো হয়েছে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে যেহেতু দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে, তাই দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ এবং বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় সর্বদা সমানুপাতিক হয়। সেক্ষেত্রে একটি ফার্মের মোট আয় (Total revnue)-রেখা মূলবিন্দুগামী একটি সরলরেখা হবে।

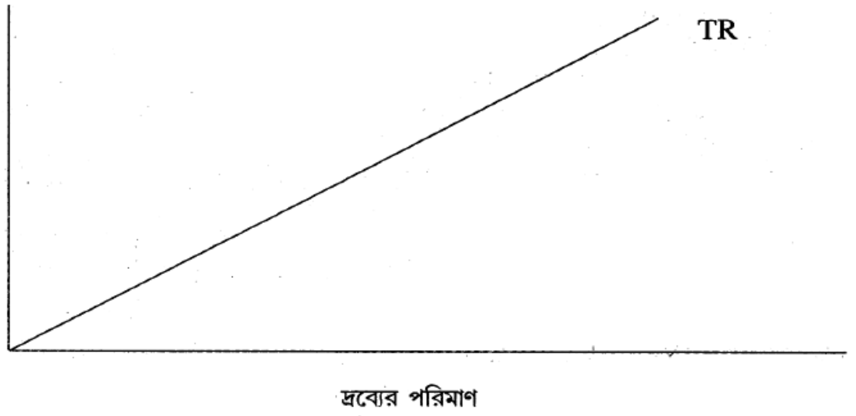

৫৪.২ নং চিত্র

নিচের দৃষ্টান্তে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল—

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট আয় (টাকা)	দাম বা গড় আয় (টাকা)	প্রান্তিক আয় (টাকা)
১	১০	১০	১০
২	২০	১০	১০
৩	৩০	১০	১০
৪	৪০	১০	১০
৫	৫০	১০	১০

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার মোট আয় :

$R = Pq$ P = দ্রব্যের দাম (একটি ধ্রুবক)

q = দ্রব্যের পরিমাণ

R = মোট আয়

$\therefore$ প্রান্তিক আয় $\left(=\frac{dR}{dq}\right) = p$

$\therefore$ দাম = প্রান্তিক আয়

৫৪.২ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য

৫৪.২.১ স্বল্পকালীন ভারসাম্য :

স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময় বোঝায়, যখন নতুন কোন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারে না। এবং পুরনো ফার্মগুলিও শিল্প পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারে না। আবার, শিল্পের অন্তর্গত যে

কোন ফার্ম স্বল্পকালে তার স্থির উপকরণগুলির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপাদানগুলির পরিবর্তন ঘটিয়ে চাহিদার সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি অথবা কম পরিমাণে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বাজার দামের উপর কোন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে না। একটি নির্দিষ্ট দামে ক্রেতা এবং বিক্রেতা দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা হয় ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। তাই প্রত্যেক ফার্ম হ'ল দাম-গ্রহিতা এবং ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা আনুভূমিক হবে।

ফার্মের উদ্দেশ্য হ'ল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। তাই একটি ফার্ম দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের দিক থেকে দাম যেহেতু সর্বদা স্থির থাকে, তাই দাম এবং প্রান্তিক ব্যয় যেখানে পরস্পর সমান হবে, সেখানেই ফার্মের মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে। দাম যদি প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, তবে দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করলে ফার্মের মোট ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মোট আয় তার তুলনায় বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ ফার্মের মোট মুনাফা বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় ফার্ম ক্রমাগত দ্রব্যটির উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ বাড়িয়ে যাবে। অপর পক্ষে দাম যদি প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহলে দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করলে ফার্মের মোট আয় যে পরিমাণ বাড়বে, মোট ব্যয় তার তুলনায় বেশি পরিমাণে বাড়বে। অর্থাৎ ফার্মের মোট মুনাফা কমে যাবে। এ অবস্থায় ফার্ম দ্রব্যটির উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ কমিয়ে দেবে। অতএব দাম এবং প্রান্তিক ব্যয় যেখানে পরস্পর সমান হবে (P = MC), সেখানেই ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক হবে। অর্থাৎ ভারসাম্য ঘটবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য নিচের চিত্রে দেখানো হ'ল।

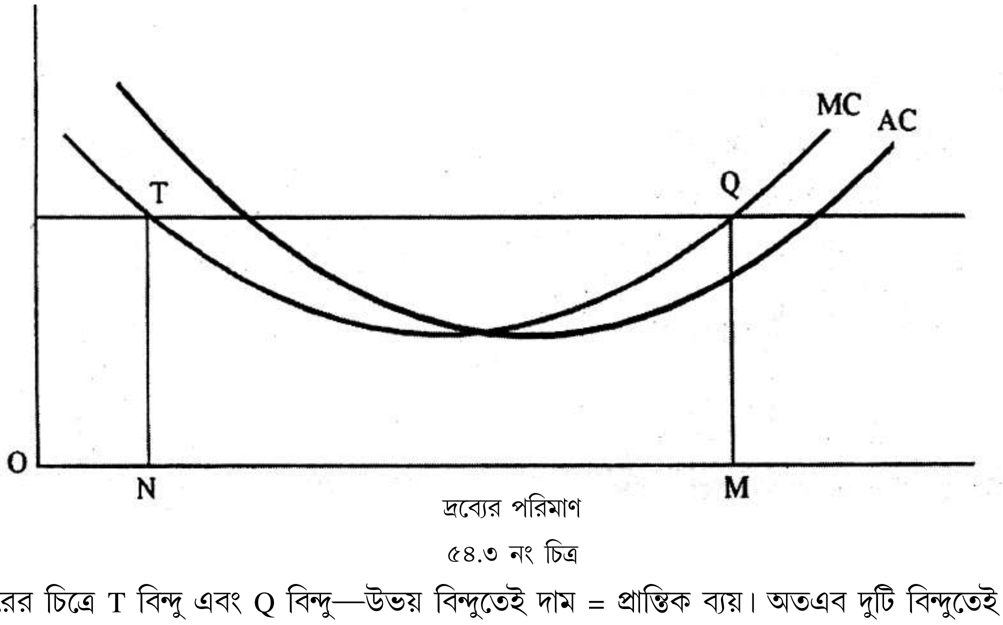

৫৪.৩ নং চিত্র

উপরের চিত্রে T বিন্দু এবং Q বিন্দু—উভয় বিন্দুতেই দাম = প্রান্তিক ব্যয়। অতএব দুটি বিন্দুতেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্তটি খাটছে। কিন্তু একটু

লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, T বিন্দুতে ফার্মের মুনাফা কখনই সর্বাধিক হতে পারে না, বরং T বিন্দুতে মুনাফা সর্বনিম্ন হবে। T বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি ON পরিমাণ উৎপাদন করার পর যদি অতিরিক্ত আরও এক একক উৎপাদন করা হয়, তবে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা দাম বেশি হয়ে পড়ে, অর্থাৎ ফার্মের মোট মুনাফা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় ফার্ম ক্রমশ উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে চলবে। এইভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে যখন ঠিক OM পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তখন আবার দাম ও প্রান্তিক ব্যয় বেশি হয়ে পড়ে অর্থাৎ ফার্মের মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে।

দাম = প্রান্তিক ব্যয় হ'ল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু এই শর্তটি যথেষ্ট নয়। কিন্তু এই শর্তটি যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত আরও একটি শর্ত পূরণ করতে হবে। সেই শর্তটি হ'ল, ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে। T বিন্দুতে দাম = প্রান্তিক ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও ফার্মের মোট মুনাফা সর্বাধিক হ'ল না, কারণ ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নগামী হয়েছে। কিন্তু Q বিন্দুতে (i) দাম = প্রান্তিক ব্যয় এবং (ii) প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী, তাই Q বিন্দুতেই ফার্মের মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে।

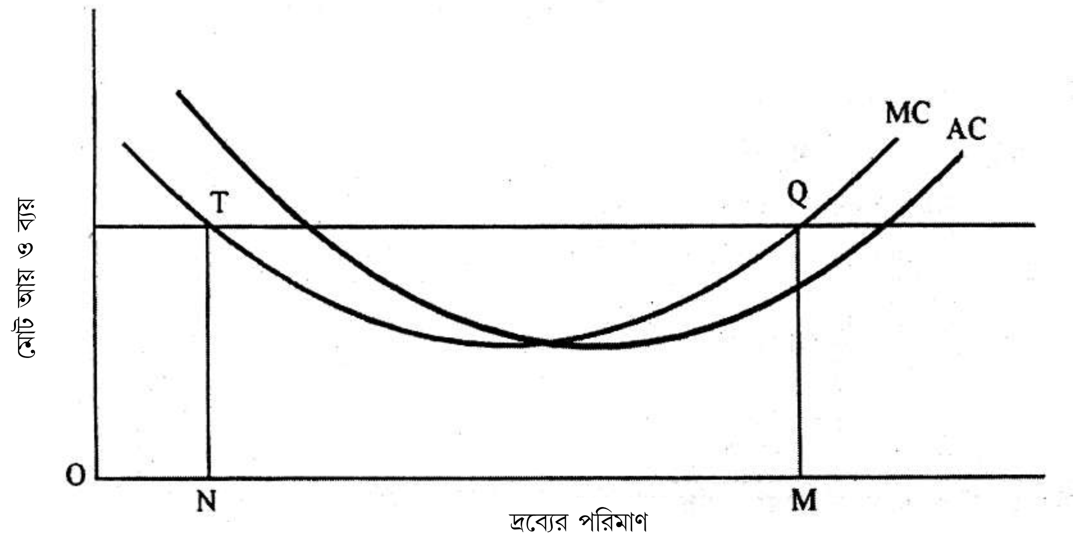

৫৪.৪ নং চিত্র

উপরের চিত্রে Q বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটির OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করে সেক্ষেত্রে ফার্মের মোট আয় হবে OMQP এবং মোট ব্যয় হবে OMST (মোট ব্যয় = গড় ব্যয় × দ্রব্যের পরিমাণ = MS × OM)

(মোট আয় = দাম × দ্রব্যের পরিমাণ

= OP × OM = PTSQ)

সেক্ষেত্রে ফার্মের মোট স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে TSQP

৫৪.২.২ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য :

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে একটি ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা লাভ করতে পারে। আবার কখনও কখনও লোকসান স্বীকার করতেও বাধ্য হয়। কিন্তু দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্মের শিল্পে অবাধ প্রবেশ অথবা পুরনো ফার্মগুলির শিল্প থেকে অবাধ প্রস্থানের ফলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন সকল ফার্মই কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে।

স্বল্পকালে বর্তমান ফার্মগুলি যদি স্বাভাবিক মুনাফার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করে, তবে দীর্ঘকালে নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে। এরফলে বাজারে দ্রব্যটির যোগান বেড়ে যাবে এবং চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে। সেক্ষেত্রে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা নিচের দিকে নেমে আসবে। আবার নতুন নতুন ফার্মের শিল্পে প্রবেশের ফলে দ্রব্যটি উৎপাদন করতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয়, সেগুলির চাহিদা বেড়ে যাবে। উপকরণগুলির যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হলে তাদের দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে প্রত্যেকটি ফার্মের গড় ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। অতএব দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্মের অবাধ প্রবেশের ফলে প্রতিটি ফার্মের একদিকে গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা নিচের দিকে নেমে যাবে এবং অন্যদিকে গড় ব্যয়রেখা ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে।

উভয় শক্তির প্রভাবেই ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার তুলনায় যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছিল তার পরিমাণ কমে যাবে। এই অতিরিক্ত মুনাফার অস্তিত্ব দেখা দিলেই নতুন নতুন ফার্মের শিল্পে প্রবেশ যদি অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে, তাহলে দীর্ঘকালে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হবে যখন সকল ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। তখন আর নতুন কোন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে না।

অপরপক্ষে স্বল্পকালে বর্তমান ফার্মগুলির যদি লোকসান হতে থাকে, তবে দীর্ঘকালে একে একে ফার্মগুলি শিল্প পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবে। এর ফলে বাজারে দ্রব্যের যোগান কমে যাবে। এবং চাহিদার অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। যে সকল ফার্ম তখনও উৎপাদন চালিয়ে যাবে তাদের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে। আবার একে একে ফার্মগুলি শিল্প পরিত্যাগ করায় দ্রব্যটি উৎপাদন করতে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাদের চাহিদা কমে যাবে এবং তাদের দামও কমে যাবে। এর ফলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন হয় তাদের চাহিদা কমে যাবে এবং তাদের দামও কমে যাবে। এর ফলে যে সকল ফার্ম তখনও উৎপাদন চালিয়ে যাবে, তাদের প্রতেকের গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিচের দিকে নেমে যাবে। এভাবে দীর্ঘকালে একে একে ফার্মগুলি যদি শিল্প পরিত্যাগ করে চলে যায় তবে একদিকে প্রত্যেকটি ফার্মের (যারা তখনও উৎপাদন করে যাবে) গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে এবং অন্য দিকে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিচের দিকে নেমে যাবে। ফলে ফার্মের যে লোকসান হচ্ছিল তার পরিমাণ কমে যাবে। স্বল্পকালে লোকসান দেখা দিলেই ফার্মগুলি যদি এভাবে অবাধে শিল্প পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারে তবে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় অবশিষ্ট ফার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে। তখন আর কোন ফার্ম শিল্প পরিত্যাগ করবে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত হ'ল :

(i) দাম (= গড় আয়) = প্রান্তিক আয় = স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় = দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়।

[P (=AR) = MR = SMC = LMC]

(সর্বাধিক মুনাফার শর্ত)

(ii) দাম (= গড় আয়) = স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়।

[P (=AR) = SAC = LAC]

(স্বাভাবিক মুনাফার শর্ত)

দুটি শর্তকে এক যোগে লিখলে আমরা পাই,

দাম (= গড় আয়) = প্রান্তিক আয় = স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয় = দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় = স্বল্পকালীন গড় ব্যয় = দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়।

[P (=AR) = MR = SMC = LMC = SAC = LAC]

নিচের চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখান হ'ল।

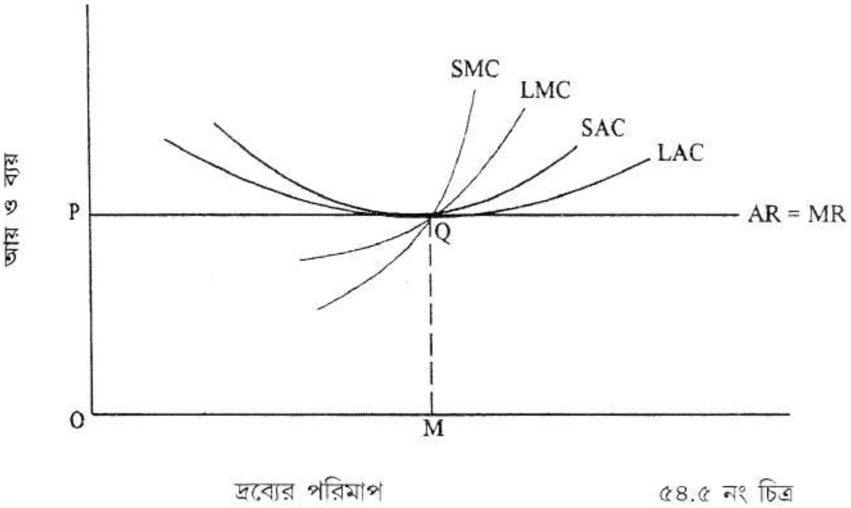

৫৪.৫ নং চিত্র

চিত্রে AR = MR রেখা হ'ল ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা। LAC রেখা, SAC রেখা ও SMC রেখা হ'ল যথাক্রমে ফার্মের দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা, স্বল্পকালীন গড় ব্যয়রেখা, LMC রেখা, দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা এবং স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা। Q বিন্দুতে ভারসাম্যের শর্তটি পালিত হচ্ছে। Q বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করবে। Q বিন্দু হ'ল SAC রেখা এবং LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু। অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় তার গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে। এই উৎপাদনকে সেই কারণেই "কাম্য উৎপাদন" (optimum output) বলে।

৫৪.৩ স্বল্পকালে লোকসানের অবস্থায় ফার্মের ভারসাম্য

স্বল্পকালে কোন একটি ফার্মের মোট ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়। মোট স্থির ব্যয় হ'ল সেই সকল ব্যয় যার সঙ্গে মোট উৎপাদনের পরিমাণের কোন সম্পর্ক নেই। উৎপাদনের পরিমাণ বেশি হোক না কম হোক, ফার্মকে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মোট স্থির ব্যয় বহন করে যেতে হবে। এমনকি উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলেও ফার্মকে এই মোট স্থির ব্যয় চালিয়ে যেতে হয়। অপরপক্ষে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় হ'ল সেই সকল ব্যয় যেগুলি উৎপাদনের

পরিমাণের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। অর্থাৎ মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে এই মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ও বেড়ে যায় এবং মোট উৎপাদনের পরিমাণ কমে গেলে এই মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ও কমে যায়। উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলে ফার্মকে কোনরূপ পরিবর্তনশীল ব্যয় বহন করতে হয় না।

স্বল্পকালে লোকসান হওয়ার ফলে কোন ফার্ম যদি তার উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়, তবে তার মোট আয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়—উভয়ই শূন্য হয় কিন্তু ফার্মকে তার মোট স্থির ব্যয় বহ করে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে ফার্মের মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে মোট স্থির ব্যয় যা ঠিক তাই। উৎপাদন চালিয়ে গেলে ফার্মের যে লোকসান হয় তা যদি ফার্মের মোট স্থির ব্যয় অপেক্ষা কম হয়, তাহলে স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ না করে দিয়ে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়ায় ফার্মের পক্ষে কম লোকসানজনক হবে। কিন্তু বাজারে দ্রব্যের দাম যদি এমন হয় যে, ফার্ম তার মোট আয়ের দ্বারা মোট স্থির ব্যয় তো দূরের কথা মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ও তুলতে পারে না (অর্থাৎ দাম যদি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা কম হয়), তবে ফার্মের পক্ষে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়াই সমীচীন হবে। নিচে চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল।

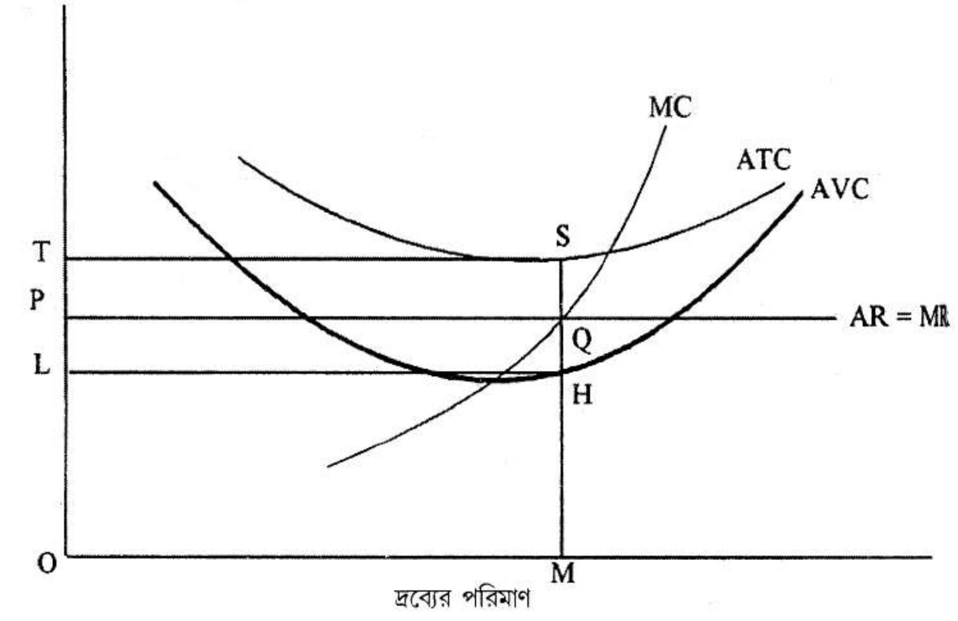

৫৪.৬ নং চিত্র

উপরের দিকে AVC রেখা, ATC রেখা এবং MC রেখা হ'ল যথাক্রমে একটি ফার্মের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা, গড় মোট ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা। AR = MR রেখা হ'ল ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি নির্দিষ্ট দামে ফার্ম যেহেতু দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে, তাই এই রেখাটি আনুভূমিক হয়েছে। Q বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য হবে, কারণ এই বিন্দুতে (i) দাম = প্রান্তিক ব্যয় এবং (ii) প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। Q বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করবে। ফার্মের মোট আয় হবে OMQP, কিন্তু মোট ব্যয় হবে OMST, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ফার্মের মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে PQST। যখন দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন করা হয়, তখন গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় হয় MH এবং গড় স্থির ব্যয় হয় HS। অর্থাৎ ফার্মের মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় হবে OMHL এবং মোট স্থির ব্যয় হবে LHST (= OMST–OMHL)।

উৎপাদনের পরিমাণ যাই হোক না কেন, মোট স্থির ব্যয় সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। তাই যদি দ্রব্যটি আদৌ উৎপাদন করা না হয়, তাহ'লেও ফার্মের মোট স্থির ব্যয় হবে LHST। সেক্ষেত্রে ফার্মের মোট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে LHST। যেহেতু LHST আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল অপেক্ষা PQST আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কম, তাই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার চেয়ে উৎপাদন চালিয়ে গেলে ফার্মের মোট লোকসানের পরিমাণ কম হবে। তাই এ অবস্থায় স্বল্পকালে লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ফার্মের পক্ষে উৎপাদন চালিয়ে যাওয়াই সমীচীন হবে। তবে দাম যদি এমন হয় যে, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষাও কম, ফার্ম তার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ও তুলতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ফার্ম অবশ্যই উৎপাদন বন্ধ করে দেবে।

বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবেও দেখা যেতে পারে :

মনে করি π_0 = মোট মুনাফা, যখন ফার্ম দ্রব্যটির উৎপাদন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়।

π_p মোট মুনাফা যখন ফার্ম দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রির করে স্বল্পকালে লোকসান হতে থাকলেও ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে যতক্ষণ $\pi_p > \pi_0$

বা, $R - V - F \geq - F$

R = মোট আয়, V = মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়, F = মোট স্থির ব্যয়

বা, $R - V \geq O$

বা, $R \geq V$

বা, $\frac{R}{q} \geq \frac{V}{q}$

বা, $P \geq AVC$

q = উৎপাদনের পরিমাণ

p = দ্রব্যের দাম

AVC = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়

৫৪.৪ ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা

যোগানরেখা হ'ল এমন একটি রেখা, যে রেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে দ্রব্যটির বিভিন্ন দামে একজন বিক্রেতা দ্রব্যটি কি পরিমাণ বিক্রি করতে প্রস্তুত আছে তা আমরা জানতে পারি। সাধারণত যোগানের সূত্র অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় বিষয় অপরিবর্তিত থেকে দ্রব্যটির দাম বাড়লে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং দাম কমলে যোগানের পরিমাণও কমে যায়। অর্থাৎ যোগানরেখাটি একটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন রেখা হয়।

পাশের চিত্রে SS^1 রেখা হল কোন একটি দ্রব্যের জন্য একজন বিক্রেতার যোগানরেখা। দাম যখন OP তখন দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণ হ'ল OM। দাম কমে গিয়ে যদি OP_1 হয় তবে যোগানের পরিমাণ কমে গিয়ে OM_1 হবে। আবার দাম বেড়ে গিয়ে যদি OP_2 হয় তবে দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণও বেড়ে গিয়ে OM_2 হবে।

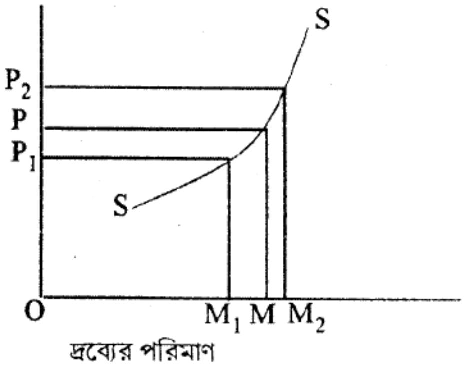

৫৪.৭ নং চিত্র

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি ফার্মের স্বল্পকালে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের শর্ত হল—

(i) দাম = প্রান্তিক ব্যয়

(ii) প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ভারসাম্য বিন্দুতে ঊর্ধ্বগামী হবে।

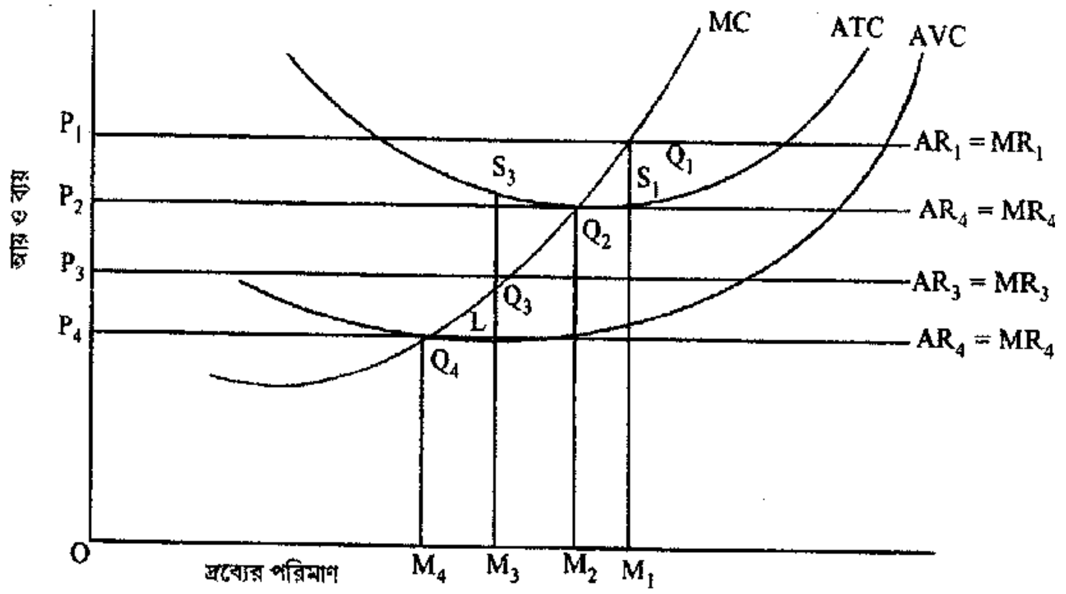

৫৪.৮ নং চিত্র

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি দ্রব্যের সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্যটির ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিক্রেতা ঐ দামটিকেই মেনে নেবে এবং ঐ নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রি করবে যেখানে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। উপরের চিত্রে ধরা যাক প্রথমে এই নির্দিষ্ট দাম হ'ল OP_1 সেক্ষেত্রে ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা হবে $AR_1=MR_1$ রেখা। চিত্রে AVC রেখা, ATC রেখা এবং MC রেখা হ'ল যথাক্রমে ফার্মের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা, গড় মোট ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা যখন $AR_1 = MR_1$ রেখা তখন ভারসাম্য বিন্দু হ'ল Q_1 বিন্দু, কারণ ঐ বিন্দুতে

(i) দাম = প্রান্তিক ব্যয়

(ii) প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী।

Q_1 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি OM_1 পরিমাণ বিক্রি করবে অর্থাৎ যোগান দেবে এবং সেক্ষেত্রে ফার্মের প্রতি এককে S_1Q_1 পরিমাণ স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে।

ধরা যাক, কোন কারণে বাজারে দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদা কমে গেল এবং এর ফলে দ্রব্যটির দাম OP_1 থেকে কমে গিয়ে OP_2 হ'ল। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রতিটি ফার্ম এখন এই OP_2 দামে দ্রব্যটি বিক্রি করবে। দাম যখন OP_2 তখন ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা হবে $AR_2 = MR_2$ রেখা। ঐ রেখার Q_2 বিন্দুতে এখন ফার্মের ভারসাম্য হবে। Q_2 বিন্দু অনুযায়ী এখন ফার্ম দ্রব্যটি OM_2 পরিমাণ যোগান দেবে। Q_2 বিন্দুতে $AR_2 = MR_2$ রেখা ATC রেখাকে তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে স্পর্শ করবে। এক্ষেত্রে দাম এবং গড় মোট ব্যয় পরস্পর সমান হবে। এবং ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। এই

কারণে Q_2 বিন্দুকে ‘‘না-লাভ না-ক্ষতির বিন্দু’’ (Break even point) বলা হয়।

এখন দ্রব্যের দাম যদি আরও কমে গিয়ে OP_3 হয় তবে ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা হবে $AR_3 = MR_3$ রেখা। এই রেখার Q_3 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য হবে। এই Q_3 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি OM_3 পরিমাণ যোগান দেবে। সেক্ষেত্রে দাম (M_3Q_3) গড় মোট ব্যয় (M_3S_3) অপেক্ষা কম হবে এবং ফার্মের প্রতি এককে লোকসান দাঁড়াবে Q_3S_3। লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ফার্ম স্বল্পকালে উৎপাদন চালিয়ে যাবে, কারণ দাম এখানে গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (M_3L) অপেক্ষা বেশি। ফলে ফার্ম তার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সম্পূর্ণ অংশ তুলে নিয়েও তার মোট স্থির ব্যয়ের একাংশ তুলে নিতে পারছে। কিন্তু উৎপাদন বন্ধ করে দিলে তার লোকসানের পরিমাণ আরও বেশি হবে। কারণ সেক্ষেত্রে মোট লোকসানের পরিমাণ হবে মোট স্থির ব্যয়ের সমান।

দাম যদি আরও কমে গিয়ে OP_4 হয় তখন ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখা হবে $AR_4=MR_4$ রেখা। এই রেখার Q_4 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য এবং এই Q_4 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম OM_4 পরিমাণ দ্রব্য যোগান দেবেন, এক্ষেত্রে দাম এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় পরস্পর সমান হবে (উভয়েই M_4Q_4-এর সমান)। এ অবস্থায় উৎপাদন চালিয়ে যাওয়া ও উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়ার মধ্যে ফার্ম নিরপেক্ষ থাকবে। কারণ উৎপাদন বন্ধ করে দিলে অথবা উৎপাদন চালিয়ে গেলে ফার্মের মোট লোকসানের পরিমাণ একই হবে—উভয় ক্ষেত্রে লোকসানের পরিমাণ দাঁড়াবে মোট স্থির ব্যয় যা ঠিক তাই। দাম যদি কোন কারণে OP_4 অপেক্ষাও কম হয়। তবে দাম গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষাও কম হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই কারণেই Q_4 বিন্দুকে ‘‘উৎপাদন বন্ধের বিন্দু’’ (Shut down point) বলে।

উপরের চিত্রে আমরা দেখলাম যে, দাম যতক্ষণ OP_4 অপেক্ষা কম না হয় ততক্ষণ একটি ফার্ম দ্রব্যটি বিভিন্ন দামে কতটা পরিমাণ যোগান দেবে তা MC রেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে (Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 ইত্যাদি বিন্দু) জানা যায়। কিন্তু দাম OP_4 অপেক্ষা কম হলে ফার্ম দ্রব্যটি আদৌ যোগান দেয় না। অতএব পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা হল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখা সেই অংশ যা তার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর (উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর) উপরিভাগে অবস্থিত।

৫৪.৫ স্বল্পকালে ফার্মের যোগানরেখা এবং শিল্পের যোগানরেখা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদনকারী অনেকগুলি ফার্মের সমষ্টি হ’ল শিল্প। তাই ফার্মের যোগানরেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলেই শিল্পের যোগানরেখাটি পাওয়া যায়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা হ’ল তার প্রান্তিক ব্যয়রেখার সেই অংশ যা তার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার উপরিভাগে অবস্থিত। আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য ধরে নিচ্ছি যে, প্রতিটি ফার্ম একই ব্যয়ের অবস্থায় দ্রব্যটি উৎপাদন করে। প্রতিটি ফার্মের গড় মোট ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়, প্রান্তিক ব্যয় এবং ফার্মের উৎপাদন বন্ধের বিন্দু অর্থাৎ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সর্বনিম্ন বিন্দু একই হবে। মনে করি এই রকম ১০০০টি সমজাতীয় ফার্মকে নিয়ে শিল্পটি গঠিত। ফলে কোন একটি নির্দিষ্ট দামে ফার্ম দ্রব্যটি যে পরিমাণ যোগান দেয়, সমগ্র শিল্প তার ১০০০ গুণ পরিমাণ যোগান দেবে। নিচের চিত্রে ফার্মের যোগানরেখা থেকে কিরূপে শিল্পের যোগানরেখা পাওয়া যায় তা দেখান হ’ল—

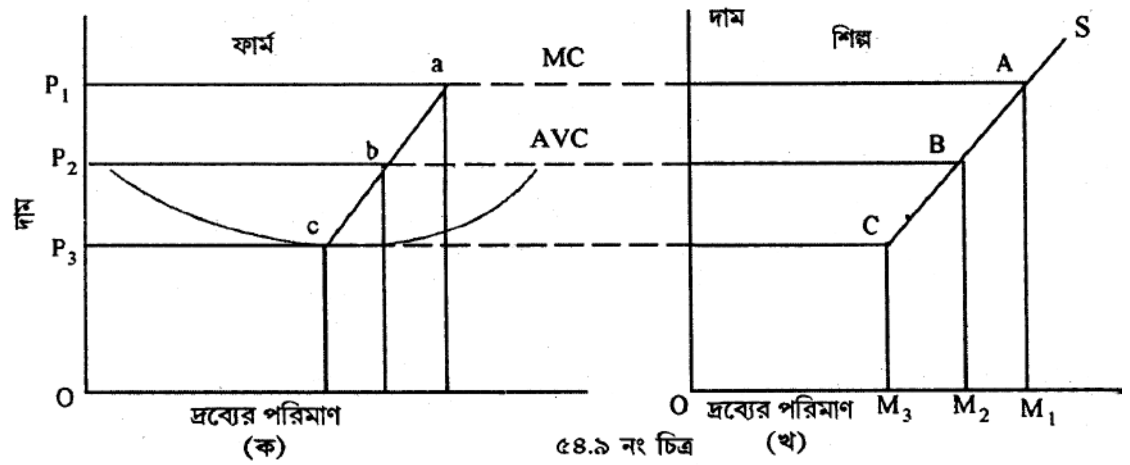

৫৪.৯ নং চিত্র

উপরের 'ক' চিত্রে AVC রেখা এবং MC রেখা হ'ল একটি ফার্মের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা। দাম যখন OP_1 তখন ফার্ম MC রেখার a বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি om_1 পরিমাণ যোগান দেয়। ঐ দামে সমগ্র শিল্পের যোগান হবে OM_1 = ১০০০ (om_1)। 'খ' চিত্রে A বিন্দুর সাহায্যে এটা দেখান হ'ল। আবার দ্রব্যের দাম যখন OP_2 তখন b বিন্দু অনুযায়ী ফার্মের যোগান হবে om_2 এবং সমগ্র শিল্পের যোগান হবে OM_2 = ১০০০(om_2)। 'খ' চিত্রে B বিন্দুর সাহায্যে এটি দেখান হল। আবার দ্রব্যের দাম যখন OP_3 তখন C বিন্দু অনুযায়ী ফার্মের যোগান হবে OM_3 = ১০০০ (om_3)। 'খ' চিত্রে C বিন্দুর সাহায্যে এটি দেখান হ'ল। দাম যদি OP_3 অপেক্ষা কম হয় তবে দাম গড় পরিবর্তনশীল বয় অপেক্ষাও কম হবে। এবং সেক্ষেত্রে ফার্ম দ্রব্যটি আদৌ যোগান দেবে না। এবং সমগ্র শিল্পের যোগানও হবে শূন্য। C বিন্দুর উপরিভাগে অবস্থিত A, B এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিন্দুগুলিকে যোগ করে আমরা 'খ' চিত্রে শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখাটি পাওয়া যায়। ফার্মের যোগানরেখাটি যেহেতু ঊর্ধ্বগামী তাই সমগ্র শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখাটিও ঊর্ধ্বগামী অর্থাৎ ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে।

৫৪.৬ ক্রমহ্রাসমান ব্যয় এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে ভারসাম্য

আমরা আগেই দেখেছি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের তখনই ভারসাম্য হতে পারে যখন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। প্রান্তিক ব্যয় ক্রমহ্রাসমান অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নগামীহলে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের দ্বিতীয় ক্রম (Second order) শর্ত বা পর্যাপ্ত (sufficient) শর্তটি খাটবে না এবং এই অবস্থায় প্রথম-ক্রম (first-order) বা প্রয়োজনীয় (necessary) শর্তটি (অর্থাৎ দাম = প্রান্তিক ব্যয়) যে পরিমাণ উৎপাদনে খাটবে সেখানে ফার্মের মুনাফা সর্বাধিক না হয়ে বরং সর্বনিম্ন হবে। সেক্ষেত্রে ফার্ম ক্রমাগত উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে চলবে।

ক্রমহ্রাসমান গড় ব্যয়ের ক্ষেত্রেও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে না। প্রতিযোগী ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে। এ অবস্থায় গড় ব্যয় যদি ক্রমহ্রাসমান হয় (এবং দাম যদি অপরিবর্তিত থাকে), তবে দ্রব্যটি যত বেশি বেশি পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করা হবে ততই দাম ও গড় ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে থাকবে অর্থাৎ ফার্মের একক পিছু মুনাফা এবং মোট মুনাফা ক্রমবর্ধমান হবে। স্বভাবতই এ অবস্থায় ফার্ম স্থিতিশীল ভারসাম্যে পৌঁছতে পারবে না।

বিষয়টিকে অন্য আর একটি দিক থেকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। উৎপাদনের মাত্রাজনিত প্রতিদান (Returns to scale) ক্রমবর্ধমান হওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়বে, গড় উৎপাদন ব্যয় ততই কমবে। গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু অনুযায়ী যে পরিমাণ উৎপাদন হতে পারে, বাজারে দ্রব্যটির চাহিদার পরিমাণ যদি তার তুলনায় কম হয়, তাহলে একটি মাত্র ফার্মই বাজার-চাহিদার সম্পূর্ণটা যোগান দেবে। সেক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটবে। প্রতিযোগী ফার্মগুলির মধ্যে যে ফার্মটি আয়তনজনিত ব্যয়সংকোচের (economics of scale) সুবিধা সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণে ভোগ করতে সক্ষম হবে, সেই ফার্মটি বাকি ফার্মগুলিকে বাজার পরিত্যাগ করতে বাধ্য করবে এবং নিজে একটি একচেটিয়া ফার্ম হিসাবে বাজারে দ্রব্যটির যোগানের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবে।

৫৪.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা

স্বল্পকালে বর্তমান ফার্মগুলি স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হলে দীর্ঘকালে অনেক নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে এবং শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখা ডানদিকে সরে যাবে। এর ফলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত নতুন বা পুরনো সবকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। তখন আর নতুন কোন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে না।

আমরা নিম্নলিখিত তিনটি পরিস্থিতিতে পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা কি হবে তা আলোচনা করব।

(i) সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প : দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করলেও উপাদানগুলির দামের কোন পরিবর্তন হবে না এবং ফার্মের গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলিরও কোন পরিবর্তন হবে না।

(ii) ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প : নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় উপাদানগুলির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে উপাদানগুলির দামও বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলি উপরের দিকে উঠে যাবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্য (External diseconomies) দেখা দেবে।

(iii) ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প : নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় উৎপাদন ক্ষেত্রে বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ ঘটবে (External economiecs)। যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে কারখানায় যন্ত্রপাতিগুলি তৈরি হয়, সেখানে বৃহদায়তন উৎপাদনের নানাবিধ সুবিধার ফলে যন্ত্রপাতি নির্মাণের ব্যয় কমে যেতে পারে, শিল্পের স্থানিকতা বা একদেশতার দরুন ফার্মের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রতিটি ফার্মের কিছু ব্যয়সংকোচ ঘটতে পারে ইত্যাদি। এর ফলে ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলি নিচের দিকে নেমে যাবে।

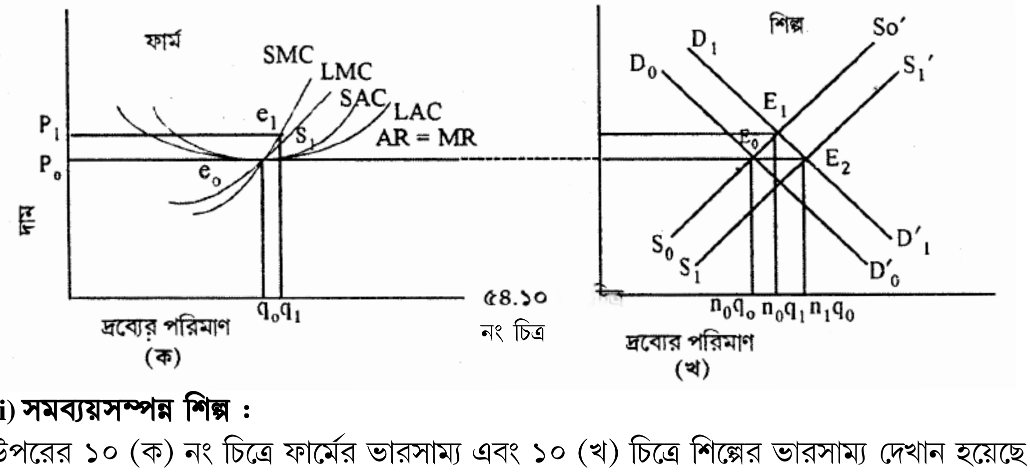

৫৪.১০ নং চিত্র

(i) সমব্যয়সম্পন্ন শিল্প :

উপরের ১০ (ক) নং চিত্রে ফার্মের ভারসাম্য এবং ১০ (খ) চিত্রে শিল্পের ভারসাম্য দেখান হয়েছে। ১০

(খ) চিত্র অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় E_0 বিন্দুতে শিল্পের ভারসাম্য ঘটেছে কারণ E_0 বিন্দুতে $D_0D_0^1$ চাহিদারেখা এবং $S_0S_0^1$ যোগানরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ভারসাম্য দাম হ'ল OP_0 শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম এই দামটিকেই মেনে নেবে এবং ১০ (ক) চিত্রে e_0 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে। এই e_0 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি q_0 পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং সমগ্র শিল্পে যদি n_0 সংখ্যক সমজাতীয় ফার্ম থাকে, তাহলে ১০ (খ) চিত্র অনুযায়ী OP_0 দামে সমগ্র শিল্পের যোগ হবে n_0q_0। e_0 বিন্দুতে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটবে এবং ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে।

এখন ধরা যাক, বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গিয়ে নতুন চাহিদা রেখা হ'ল $D_1D_1^1$ রেখা। স্বল্পকালে শিল্পের যোগানরেখার কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কারণ নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করতে পারবে না এবং পুরনো ফার্মগুলিও তাদের উৎপাদন মাত্রার কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। ফলে $S_0S_0^1$ রেখা অনুযায়ী শিল্পের যোগানের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটবে। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর E_1 বিন্দুতে এখন শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঘটবে। নতুন দামে হবে OP_1। এখন এই নতুন দান অনুযায়ী ১০ (ক) চিত্রে ফার্মের e_1 বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটবে। ফার্ম এখন দ্রব্যটি q_1 পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং সমগ্র শিল্পের উৎপাদন হবে n_0q_1। প্রতিটি ফার্মের e_1S_1 পরিমাণ প্রতি এককে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে।

এই অতিরিক্ত মুনাফা দেখা দেওয়ার দীর্ঘকালে অনেক নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে এবং শিল্পের যোগানরেখাটি ডানদিকে সরে গিয়ে $S_1S_1^1$ রেখা হবে [১০(খ) চিত্র]। সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় কোনরূপ বাহ্যিক ব্যয়সংকোচ বা বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্য ঘটবে না। ফলে প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলিরও কোন পরিবর্তন ঘটবে না। E_2 বিন্দুতে শিল্পের ভারসাম্য ঘটবে এবং নতুন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম আবার দ্রব্যটি q_2 পরিমাণ উৎপাদন করবে। এবং সমগ্র শিল্পের উৎপাদন হবে n_1q_0 (কারণ ফার্মের সংখ্যা দীর্ঘকালে n_0 থেকে বেড়ে n_1 হয়েছে)। ১০ (খ) চিত্রে E_0E_2 বিন্দুকে যোগ করে আমরা যে রেখাটি পাই, তাই হ'ল শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা (LRS) সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে রেখাটি আনুভূমিক হয়েছে।

(ii) ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প : ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পের অতিরিক্ত মুনাফার প্রলোভনে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় বাজারে সামগ্রিকভাবে ঐ শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলির চাহিদা বেড়ে যাবে।

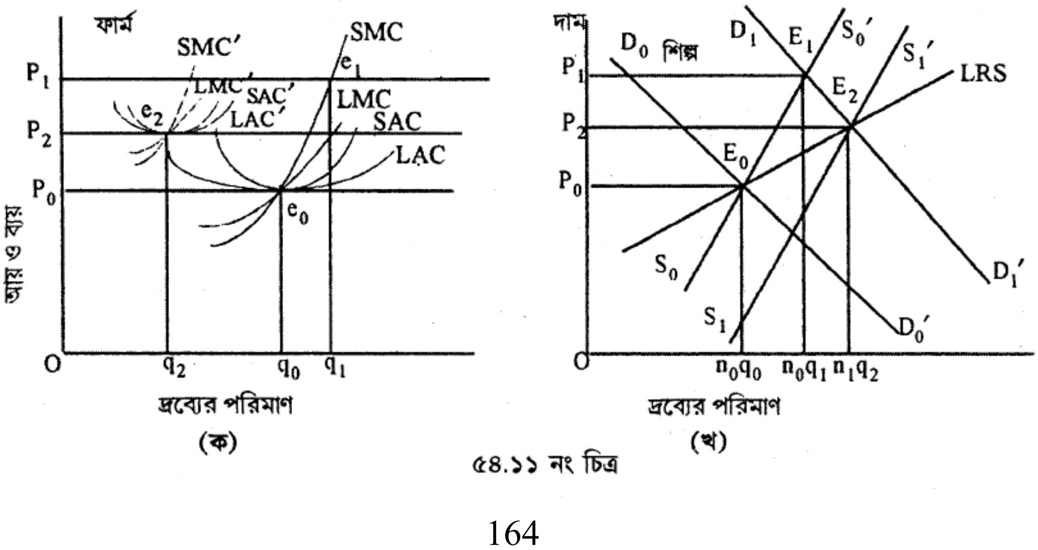

(ক) (খ)

৫৪.১১ নং চিত্র

উপকরণগুলির যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হলে এদের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দাম বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলি উপরের দিকে উঠে যাবে। এবং নতুন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দাম পুরনো দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দামের তুলনায় বেশি হবে। সমগ্র শিল্পের যোগানরেখাটিও ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে।

উপরের ১১ (খ) চিত্রে E_0 বিন্দুতে শিল্পের প্রারম্ভিক ভারসাম্য ঘটেছে। এই বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যের দাম হবে OP_0 এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হবে n_0q_0। শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম এই OP_0 দামে e_0 বিন্দুতে অবস্থান করবে। এই দ্রব্যটি q_0 পরিমাণ উৎপাদন করবে। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে—১১(ক) চিত্রে এটা দেখানো হয়েছে। প্রতিটি সমজাতীয় ফার্ম যদি q_0 পরিমাণ উৎপাদন করে এবং ফার্মের সংখ্যা যদি n_0 হয় তবে সমগ্র শিল্পের মোট যোগান হবে n_0q_0।

এখন ধরা যাক, বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেল এবং নতুন চাহিদারেখা হ'ল D_1D_1' রেখা। এই রেখার এবং শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখার ($S_0S_0S^1$ রেখার) ছেদবিন্দু হ'ল E_1 বিন্দু। এই E_1 বিন্দুতে এখন সমগ্র শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঘটবে। এবং দ্রব্যের দাম হবে OP_1। এই OP_1 দামে e_1 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে এবং প্রতিটি ফার্ম দ্রব্যটি q_1 পরিমাণ উৎপাদন করবে। সমগ্র শিল্পের দিক থেকে দ্রব্যটির যোগান হবে n_0q_1।

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর স্বল্পকালীন ভারসাম্যের অবস্থায় প্রতিটি ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে। এর ফলে দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পরিস্থিতিতে নতুন নতুন ফার্ম শিষল্প প্রবেশ করায় ফার্মের গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে এবং নতুন রেখাগুলি হবে LAC', SAC', LMC' রেখা। শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখা ডানদিকে সরে গিয়ে s_1s_1 রেখা হ'ল। এখন শিল্পের নতুন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দু হবে E_2 বিন্দু এবং দাম হবে OP_2 দামে e_2 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে। ফার্ম দ্রব্যটি q_2 পরিমাণ উৎপাদন করবে। ফার্মের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে এখন দাঁড়িয়েছে n_1। ফলে এখন সমগ্র শিল্পের যোগান হবে n_1q_2 পূর্বের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থার তুলনায় এখন ফার্মের উৎপাদন কম হলেও সমগ্র শিল্পের যোগান কিন্তু বেড়ে গেছে। এর কারণ হ'ল শিল্পের অন্তর্গত ফার্মের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। E_0 এবং E_2 বিন্দুকে যোগ করে যে রেখাটি পাই, তাই হ'ল শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা (L.R.S.)। ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পরিস্থিতিতে এই রেখাটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়েছে।

(iii) ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্প : দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় শিল্পের অন্তর্গত প্রতিটি ফার্ম বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা ভোগ করতে পারে। সাধারণত শিল্পের একদেশতার দরুন এই ধরনের ব্যয়

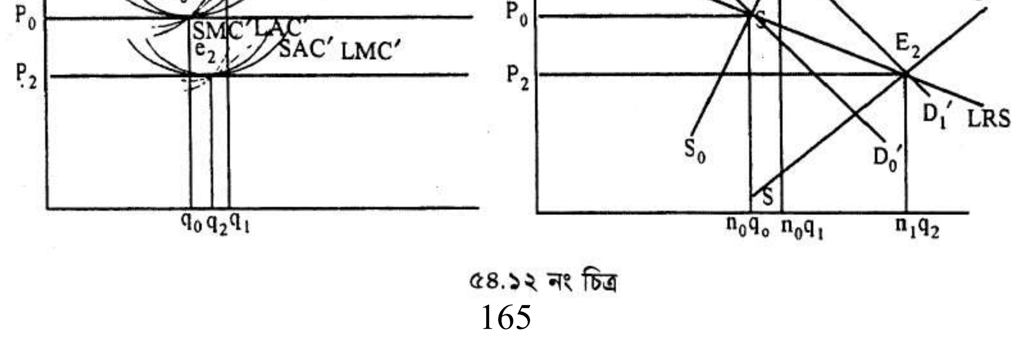

৫৪.১২ নং চিত্র

সঙ্কোচ দেখা দেয়। এর ফলে প্রতিটি ফার্মের গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিচের দিকে নেমে যাবে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের পরিস্থিতিতে শিল্পের যোগানরেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে।

১২(খ) চিত্রে E_0 বিন্দুতে শিল্পের প্রারম্ভিক ভারসাম্য ঘটেছে। দ্রব্যের দাম হবে OP_0। এই দামে প্রতিটি ফার্ম দ্রব্যটি q_0 পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং সমগ্র শিল্পের যোগান হবে n_0q_0। চাহিদা বেড়ে যাবার পর E_1 বিন্দুতে শিল্পের ভারসাম্য ঘটবে। দাম হবে OP_1। এই OP_1 দামে ফার্ম দ্রব্যটি or_1 পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং সমগ্র শিল্পেরযোগান হবে n_0or_1। এ অবস্থায় ফার্মের এবং শিল্পের স্বল্পকালীন ভারসাম্য ঘটবে। প্রতিটি ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করায় নতুন নতুন শিল্পে প্রবেশ করবে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের পরিস্থিতিতে প্রতিটি ফার্মের গড়ন ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখাগুলি নিচের দিকে নেমে যাবে। এবং নতুন রেখাগুলি হবে LAC, SAC, LMC, SMC রেখা। নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করায় শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখা ডানদিকে সরে গিয়ে S_1S_1 রেখা হবে। E_2 বিন্দুতে এখন শিল্পের ভারসাম্য ঘটবে। নতুন ভারসাম্য দাম হবে OP_2। এই দামে e_2 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য ঘটবে। এবং ফার্ম দ্রব্যটি q_2 পরিমাণ উৎপাদন করবে। নতুন দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় ফার্ম আবার কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। E_0 এবং E_2 বিন্দুকে যোগ করে যে রেখাটি পাই, তাই হ'ল দীর্ঘকালীন যোগানরেখা। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের পরিস্থিতিতে এই রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়েছে।

৫৪.৮ চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন এবং দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের উপর প্রভাব

(ক) চাহিদার পরিবর্তন :

চাহিদার পরিবর্তন বলতে একই দামে দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে অথবা কম পরিমাণে ক্রয় করা বোঝায়। যদি একই দামে ক্রেতারা দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ক্রয় করে, তবে তাকে চাহিদার বৃদ্ধি বলে। অপরপক্ষে একই দামে ক্রেতারা যদি দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণে ক্রয় করে, তবে তাকে চাহিদার হ্রাস বলে। প্রথম ক্ষেত্রে চাহিদারেখাটি ডান দিকে সরে যায় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাহিদারেখাটি বাঁ দিকে সরে যায়।

(i) চাহিদার বৃদ্ধি, যোগান অপরিবর্তিত : যোগানরেখা অপরিবর্তিত থেকে যদি চাহিদারেখা ডান দিকে সরে যায় তবে সাধারণত দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়েই বৃদ্ধি পাবে। তবে যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে (অর্থাৎ যোগানরেখা যত বেশি বিস্তৃত হবে), চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম তত বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

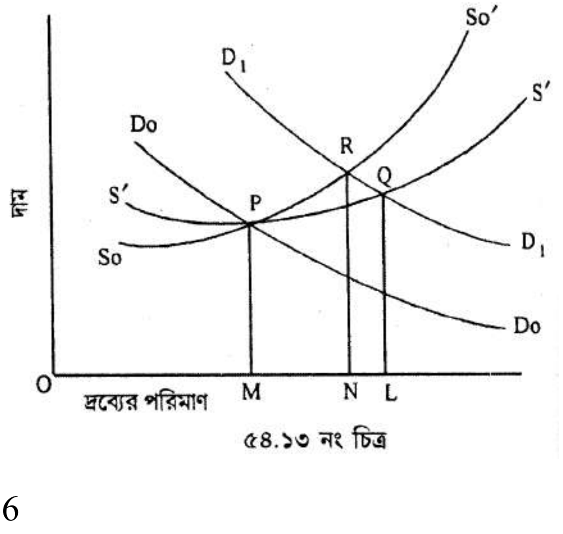

৫৪.১৩ নং চিত্র

পাশের চিত্রে D_0D_0 রেখা S_0S_0 রেখা হ'ল যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। রেখা দুটি পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই P বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যের ভারসাম্য দাম হ'ল PM এবং

দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হলো OM। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর নতুন চাহিদারেখা হ'ল D_1D_1 রেখা। নতুন ভারসাম্য দাম হবে RN এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হবে ON। PM অপেক্ষা RN বড় এবং OM অপেক্ষা ON বড়। অতএব যোগান অপরিবর্তিত থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

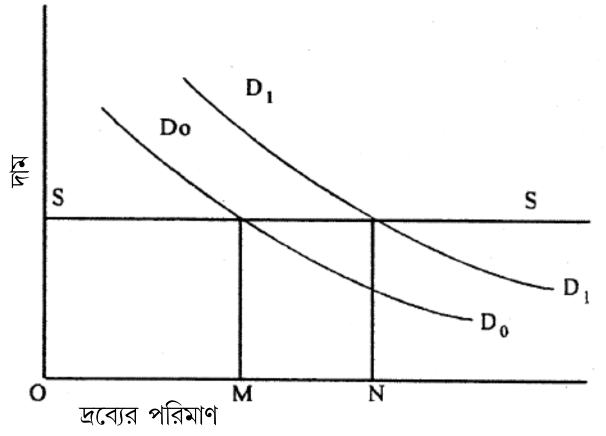

৫৪.১৪ নং চিত্র

তবে যোগানরেখা যদি অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয় এবং S_0S_0 রেখা না হয়ে SS রেখা হয় তবে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর নতুন ভারসাম্য দাম হবে QL এবং দ্রব্যের পরিমাণ হবে OL। RN অপেক্ষা QL ছোট এবং ON অপেক্ষা OL বড়। অতএব যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে (অর্থাৎ যোগানরেখা যত বেশি বিস্তৃত হবে) চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যের দাম তত কম বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ যোগানরেখা যদি আনুভূমিক হয়), তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে, দামের কোন পরিবর্তন হবে না।

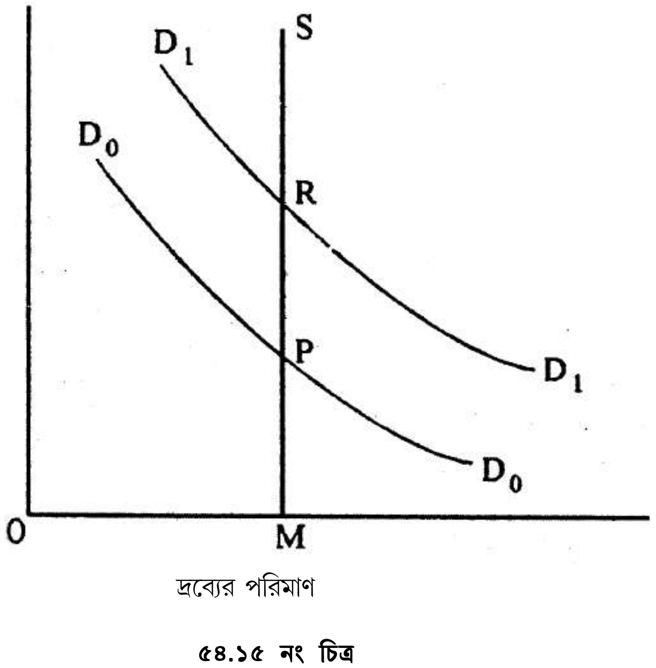

৫৪.১৫ নং চিত্র

চাহিদারেখা ডান দিকে সরে যাওয়ার পর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM বেড়ে ON হ'ল, কিন্তু দ্রব্যের কোন পরিবর্তন হ'ল না (PM = RN)।

যোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ যোগানরেখা যদি উলম্ব হয়), তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

চাহিদারেখা ডান দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হলো না। কেবলমাত্র দ্রব্যের দাম PM থেকে বেড়ে RM হ'ল।

যোগান যদি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয় (ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পে এরূপ ঘটতে পারে), তবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে, কিন্তু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

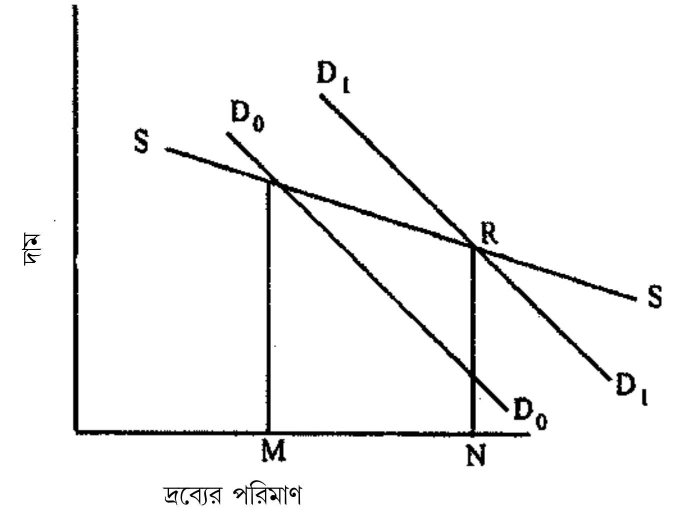

৫৪.১৬ নং চিত্র

চাহিদারেখা ডানদিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের দাম PM থেকে কমে RN হলো এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM থেকে বেড়ে ON হ'ল।

(ii) চাহিদার হ্রাস, যোগান অপরিবর্তিত : যোগানরেখা অপরিবর্তিত থেকে যদি চাহিদারেখা বাঁ দিকে সরে যায় তবে সাধারণত দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ই কমে যাবে। তবে যোগান যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে (অর্থাৎ যোগানরেখা যত বেশি বিস্তৃত হবে), চাহিদা হ্রাস পেলে দ্রব্যের দাম তত কম হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ তত বেশি হ্রাস পাবে।

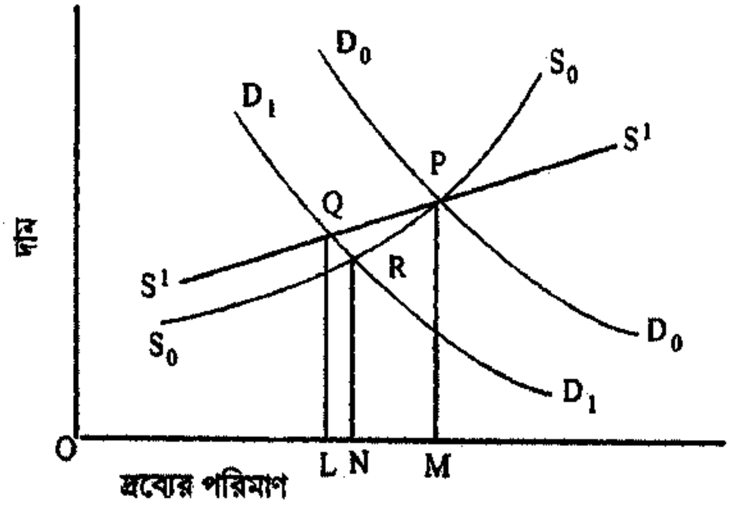

৫৪.১৭ নং চিত্র

উপরের চিত্রে D_0D_0 রেখা এবং S_0S_0 রেখা হ'ল যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। পূর্বের ভারসাম্য দাম হ'ল PM এবং দ্রব্যের পরিমাণ হল OM। এখন চাহিদা হ্রাস পাওয়ার পর নতুন চাহিদারেখা হ'ল D_1D_1 রেখা। যোগানরেখা অপরিবর্তিত থাকলে নতুন ভারসাম্য দাম হবে RN এবং দ্রব্যের পরিমাণ হবে ON। PM অপেক্ষা RN ছোট এবং OM অপেক্ষা ON ছোট। অর্থাৎ চাহিদা কমে যাওয়ার ফলে দ্রব্যের দাম

এবং দ্রব্যের পরিমাণ উভয়ই কমে গেল। তবে যোগানরেখা যদি S_0S_0 রেখা না হয়ে SS রেখা হয় (অর্থাৎ যোগান যদি অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়), তবে এই একইরকমভাবে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে দাম PM থেকে কমে গিয়ে QL হবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে কমে গিয়ে OL হবে। RN অপেক্ষা QL বড় যদিও PM অপেক্ষা QL ছোট এবং ON অপেক্ষা OL ছোট। অর্থাৎ যোগান যত স্থিতিস্থাপক হবে চাহিদা কমে গেলে দ্রব্যের দাম তত কম হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ তত বেশি হ্রাস পাবে।

যোগান যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ যোগানরেখা যদি সম্পূর্ণ আনুভূমিক হয়), তবে চাহিদা কমে গেলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যাবে, কিন্তু দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হবে না।

উপরের চিত্রে চাহিদারেখা বাঁ দিকে সরে যাওয়ার পর দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে কমে ON হ'ল কিন্তু দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হ'ল না।

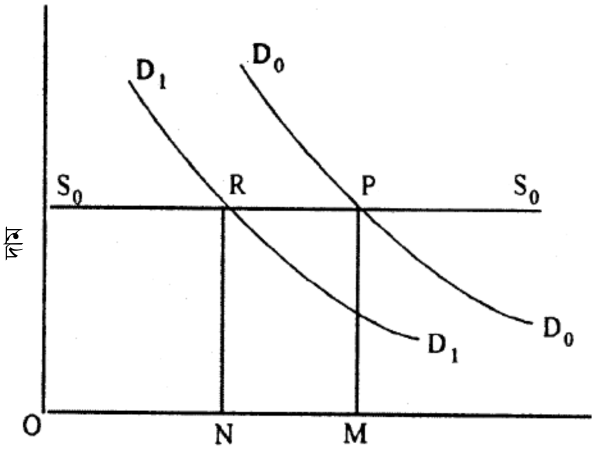

দ্রব্যের পরিমাণ

৫৪.১৮ নং চিত্র

যোগান যখন সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (অর্থাৎ যোগানরেখা যখন উল্লম্ব হয়), চাহিদা হ্রাস পেলে কেবলমাত্র দ্রব্যের দাম কমে যাবে। দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

চাহিদারেখা বাঁ দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের দাম PM থেকে কমে RM হ'ল, কিন্তু দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটল না।

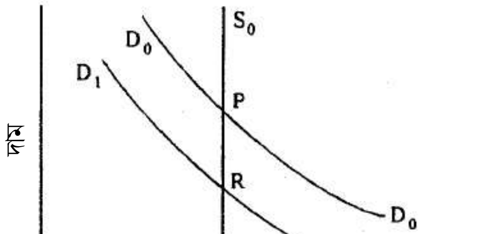

দ্রব্যের পরিমাণ

৫৪.১৯ নং চিত্র

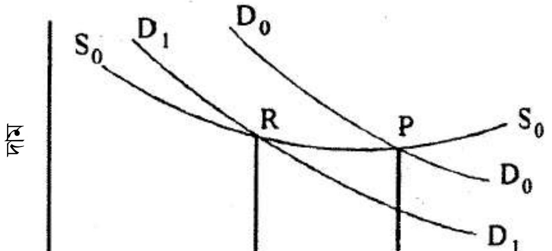

দ্রব্যের পরিমাণ

৫৪.২০ নং চিত্র

যোগানরেখা যদি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়, তবে চাহিদা কমে গেলে দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে কিন্তু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যাবে।

চাহিদারেখা বাঁ দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের দাম PM থেকে বেড়ে RN হ'ল, কিন্তু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM থেকে কমে ON হ'ল।

(খ) যোগানের পরিবর্তন :

যোগানের পরিবর্তন বলতে একই দামে দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বা কম পরিমাণে যোগান দেওয়া বোঝায়। একই দামে বিক্রেতারা যখন দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে চায়, তখন যোগানের বৃদ্ধি ঘটে এবং যোগানরেখাটি ডান দিকে সরে যায়, আবার একই দামে বিক্রেতারা যখন দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণে বিক্রি করতে চায়, তখন যোগানের হ্রাস ঘটে এবং যোগান রেখাটি বাঁ দিকে সরে যায়।

(i) যোগানের বৃদ্ধি, চাহিদা অপরিবর্তিত : চাহিদারেখাটি নির্দিষ্ট থাকলে যোগানরেখা বাঁ দিকে সরে গেলে দ্রব্যের দাম হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তবে চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে (অর্থাৎ চাহিদা রেখাটি যত বেশি বিস্তৃত হবে) দ্রব্যের দাম তত কম হ্রাস পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

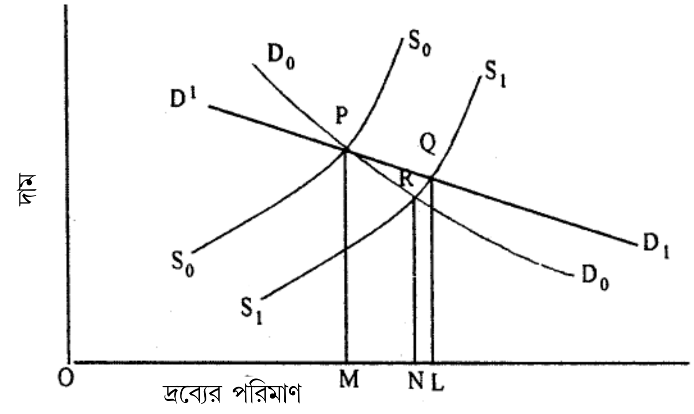

D_0D_0 রেখা এবং S_0S_0 রেখা হলো যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। পূর্বের ভারসাম্য দাম হল PM এবং দ্রব্যের পরিমাণ হ'ল OM। যোগান বৃদ্ধি পাওয়ার পর নতুন যোগানরেখা হ'ল S_1S_1 রেখা, নতুন ভারসাম্য দাম হ'ল RN এবং দ্রব্যের পরিমাণ হ'ল ON PM থেকে RN ছোট এবং OM থেকে ON বড়। অতএব চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান বেড়ে গেলে দ্রব্যের দাম কমে যাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে। তবে চাহিদা রেখাটি যদি D_0D_0 রেখা না হয় D'D' হয়, তবে যোগানের একই রকম পরিবর্তন ঘটলে দ্রব্যের দাম PM থেকে কমে QL হবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে কমে QL হবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে বেড়ে OL হবে। RN থেকে QL বড় যদি PM থেকে QL ছোট এবং ON থেকে OL বড়। অতএব চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে, যোগান বেড়ে গেলে দ্রব্যের দাম তত কম হ্রাস পাবে এবং রব্যের পরিমাণ তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

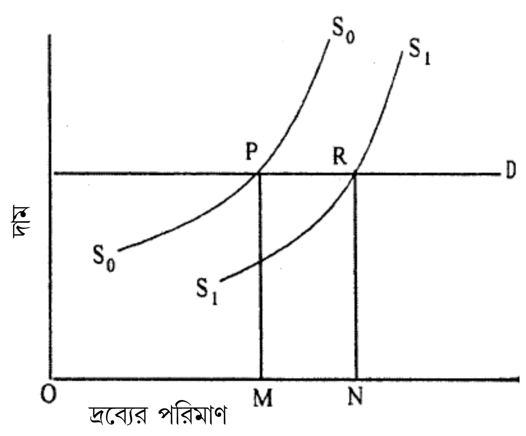

চাহিদা যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ চাহিদারেখা যদি আনুভূমিক হয়), তবে যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হবে না কেবলমাত্র দ্রব্যের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

যোগানরেখা ডান দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে বেড়ে ON হল, কিন্তু দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থেকে গেল।

অপরপক্ষে দ্রব্যের চাহিদা যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় (অর্থাৎ চাহিদারেখা যদি উল্লম্ব হয়), তবে যোগান বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হবে না, কেবলমাত্র দাম কমে যাবে।

যোগানরেখা ডান দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের দাম PM থেকে কমে RM হল এবং দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

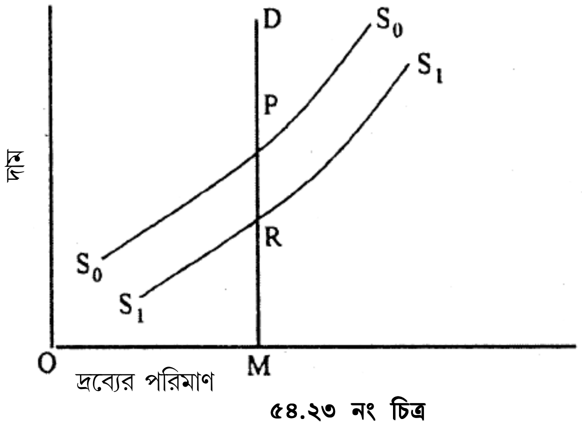

৫৪.২৩ নং চিত্র

(ii) যোগানের হ্রাস চাহিদা অপরিবর্তিত : চাহিদারেখা যদি অপরিবর্তিত থাকে তবে যোগান হ্রাস পেলে (অর্থাৎ যোগানরেখা বাঁ দিকে সরে গেলে) দ্রব্যের দাম সাধারণত বেড়ে যায় এবং দ্রব্যের পরিমাণ সাধারণত কমে যায়। তবে চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে (অর্থাৎ চাহিদারেখা যদি বেশি বিস্তৃত হবে), যোগান হ্রাস পেলে দ্রব্যের দাম তত কম বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ তত বেশি হ্রাস পাবে।

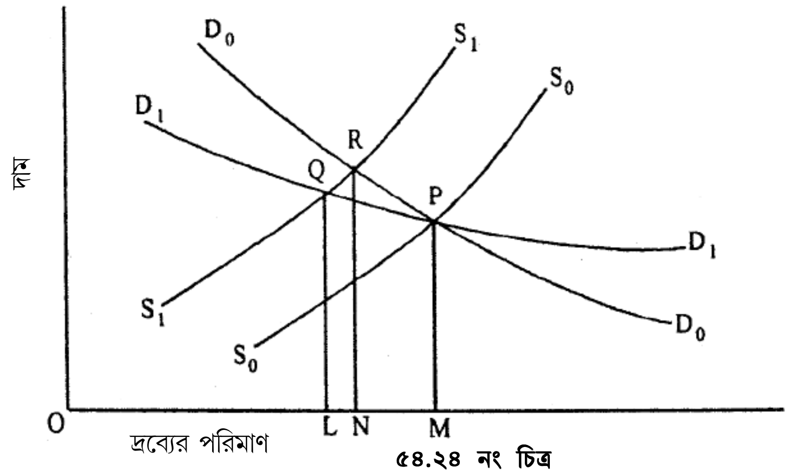

৫৪.২৪ নং চিত্র

উপরের চিত্রে D_0D_0 রেখা এবং S_0S_0 রেখা হ'ল যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা ও যোগানরেখা। পূর্বের ভারসাম্য দাম হ'ল PM এবং দ্রব্যের পরিমাণ হ'ল OM। এখন যোগান হ্রাস পাওয়ার পর নতুন যোগানরেখা হ'ল S_1S_1 রেখা। চাহিদারেখা যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে নতুন ভারসাম্য দাম হবে RN এবং দ্রব্যের পরিমাণ হবে ON। অতএব চাহিদা অপরিবর্তিত থেকে যোগান হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল (PM অপেক্ষা RN বড়) এবং দ্রব্যের পরিমাণ কমে গেল (OM অপেক্ষা ON ছোট)। তবে চাহিদারেখা যদি D'D' রেখা হয়, সেক্ষেত্রে যোগানরেখা একইরকমভাবে বাঁ দিকে সরে গেলে দ্রব্যের দাম PM থেকে বেড়ে QL হবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে কমে OL হবে। RN অপেক্ষা QL ছোট এবং ON অপেক্ষা OL ছোট। অতএব চাহিদা যত বেশি স্থিতিস্থাপক হবে, যোগান হ্রাস পেলে দ্রব্যের দাম তত কম বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ তত বেশি হ্রাস পাবে।

চাহিদা যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়, তবে যোগান হ্রাস পেলে দামের কোন পরিবর্তন হবে না, কেবলমাত্র দ্রব্যের পরিমাণ কমে যাবে।

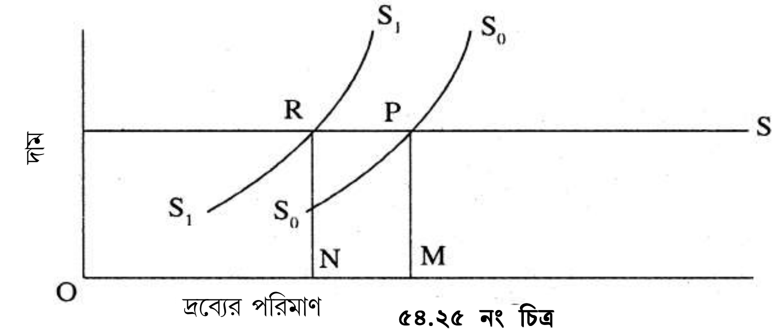

৫৪.২৫ নং চিত্র

যোগানরেখা বাঁ দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের পরিমাণ OM থেকে কমে ON হ'ল, কিন্তু দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হ'ল না (RN = PM)।

চাহিদা যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় তবে যোগান হ্রাস পেলে দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হবে না, কেবলমাত্র দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে।

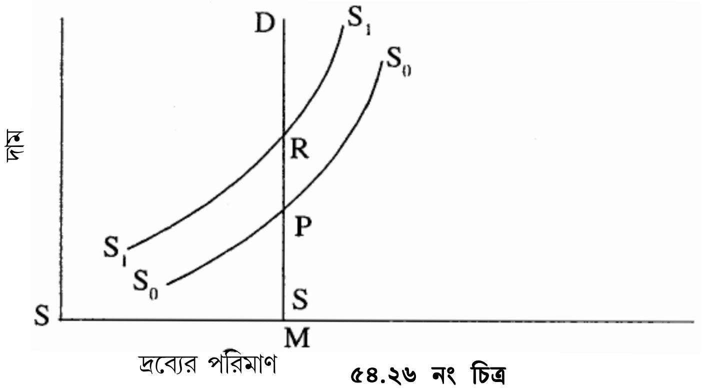

৫৪.২৬ নং চিত্র

যোগানরেখা বাঁ দিকে সরে যাবার পর দ্রব্যের দাম PM থেকে বেড়ে RM হ'ল, কিন্তু দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়ে গেল।

(গ) চাহিদা এবং যোগান উভয়ের পরিবর্তন :

(i) চাহিদা এবং যোগান উভয়ের বৃদ্ধি : চাহিদা এবং যোগান উভয়ের বৃদ্ধি ঘটলে চাহিদারেখা এবং যোগান রেখা উভয় রেখাই ডান দিকে সরে যাবে। এর ফলে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু দ্রব্যের দাম বাড়তে পারে, অপরিবর্তিত থাকতে পারে, অথবা কমতে পারে।

যদি পূর্বের ভারসাম্য দামে—

(a) নতুন চাহিদা নতুন যোগান অপেক্ষা বেশি হয়, তবে দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে।

(b) নতুন চাহিদা এবং নতুন যোগান পরস্পর সমান হয়, তবে দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত থাকবে।

(c) নতুন চাহিদা নতুন যোগান অপেক্ষা কম হয়, তবে দ্রব্যের দাম কমে যাবে।

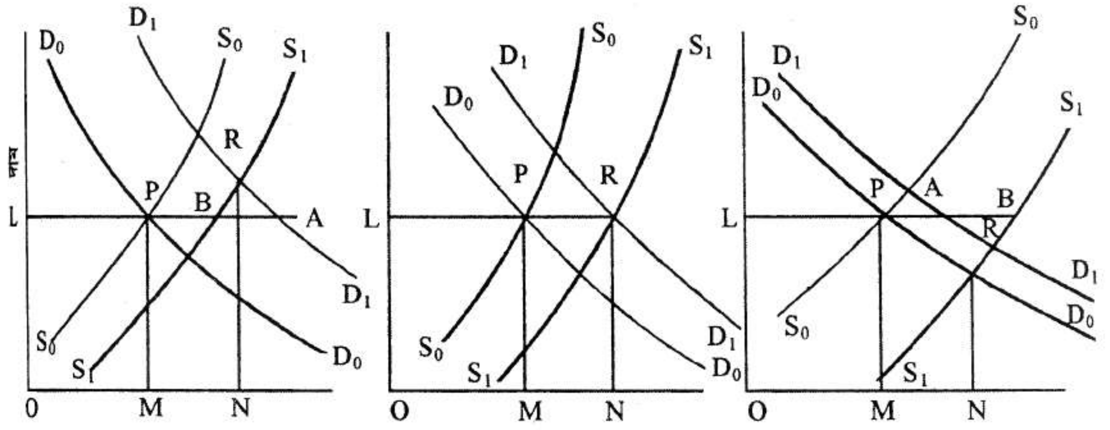

(ক) (খ) (গ)

৫৪.২৭ নং চিত্র

উপরের চিত্রে D_0D_0 রেখা এবং S_0S_0 রেখা হল যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। রেখা দুটি পরস্পরকে P বিন্দুতে ছেদ করেছে। অতএব দ্রব্যের পূর্বের ভারসাম্য দাম হ'ল PM এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ'ল OM। চাহিদা ও যোগান উভয়েই বৃদ্ধি পাওয়ার পর নতুন চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা হ'ল যথাক্রমে D_1D_1 রেখা এবং S_1S_1 রেখা। নতুন ভারসাম্য দাম হল RN এবং ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ'ল ON।

'ক' চিত্রে পুরনো ভারসাম্য দামে (OK=PM দামে) নতুন চাহিদা (LA) নতুন যোগান (LB) অপেক্ষা বেশি। সেই কারণে PM অপেক্ষা RN বড়।

'খ' চিত্রে পুরনো ভারসাম্য দামে (OL দামে) চাহিদা এবং নতুন যোগান পরস্পর সমান (উভয়েই LR-এর সমান)। তাই RN=PM।

'গ' চিত্রে পুরনো ভারসাম্য দামে (OL দামে) নতুন চাহিদা (LA) নতুন যোগান (LB) অপেক্ষা কম। তাই দ্রব্যের দাম PM থেকে কমে RN হয়েছে।

তিনটি ক্ষেত্রেই অবশ্য OM অপেক্ষা ON বড়।

(ii) চাহিদা বৃদ্ধি যোগান হ্রাস : চাহিদা বৃদ্ধি পেলে একই দামে ক্রেতারা দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে আগ্রহী হয়। অতএব চাহিদারেখা ডান দিকে সরে যায়। যোগান হ্রাস পেলে একই দামে বিক্রেতারা দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণে বিক্রি করতে চায় ফলে যোগানরেখা বাঁ দিকে সরে যায়। চাহিদা রেখা যদি ডান দিকে এবং যোগানরেখা যদি বাঁ দিকে সরে যায়, তবে দ্রব্যের দাম অবশ্যই বাড়বে। কিন্তু দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়তে পারে, অপরিবর্তিত থাকতে পারে, অথবা কমতে পারে।

যদি পুরনো ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে—

(a) নতুন চাহিদা দাম নতুন যোগান দাম অপেক্ষা বেশি হয়, তবে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়বে।

(b) নতুন চাহিদা দাম এবং নতুন যোগান দাম পরস্পর সমান হয়, তবে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

(c) নতুন চাহিদা-দাম নতুন যোগান-দাম অপেক্ষা কম হয়, তবে দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ কমে যাবে।

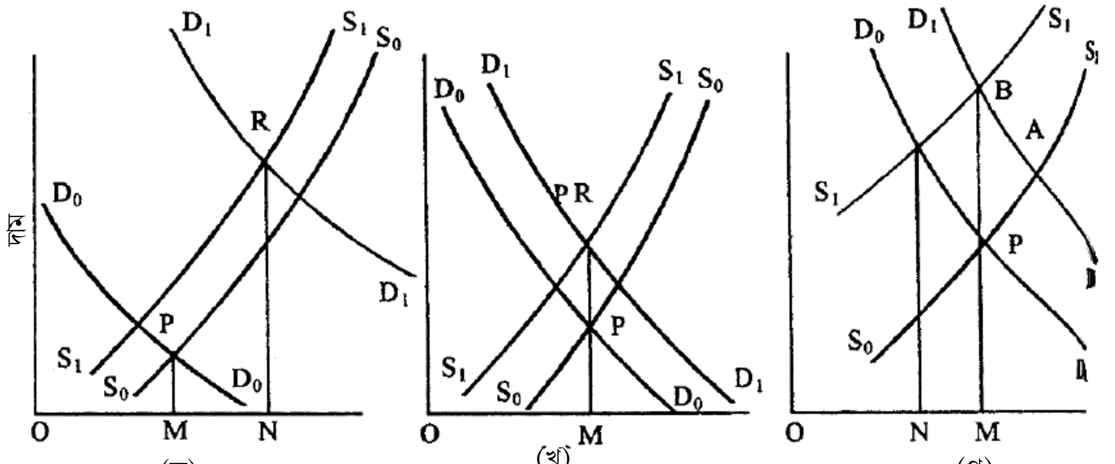

(ক) (খ) (গ)

দ্রব্যের পরিমাণ

৫৪.২৮ নং চিত্র

উপরের চিত্র D_0D_0 রেখা এবং S_0S_0 রেখা হ'ল যথাক্রমে পূর্বের চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। পূর্বের ভারসাম্য দাম হ'ল PM এবং দ্রব্যের পরিমাণ হ'ল OM। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার পর নতুন চাহিদারেখা হ'ল D_1D_1 রেখা এবং যোগান হ্রাস পাওয়ার পর নতুন যোগানরেখা হ'ল S_1S_1 রেখা। নতুন ভারসাম্য দাম হ'ল RN এবং দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হ'ল ON। তিনটি ক্ষেত্রেই PM অপেক্ষা RN বড়।

'ক' চিত্রে পুরনো ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে (OM পরিমাণে) নতুন দাহিদা-দাম (MA) নতুন যোগান-দাম (MB) অপেক্ষা বড়। তাই দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM থেকে বেড়ে ON হয়েছে।

'খ' চিত্রে পুরনো ভারসাম্য ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে (OM পরিমাণে) নতুন চাহিদা দাম এবং নতুন যোগান দাম পরস্পর সমান (উভয়েই MR-এর সমান) তাই দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হ'ল না (OM=ON)।

'গ' চিত্রে পুরনো ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণে OM পরিমাণে নতুন চাহিদা-দাম (MA) এবং নতুন যোগান-দাম (MB) অপেক্ষা কম। তাই দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ OM থেকে কমে ON হ'ল।

৫৪.৯ সারাংশ

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকে ঃ (i) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা (ii) সমজাতীয় দ্রব্য; (iii) লাভের সম্ভাবনা দেখা দিলে নতুন নতুন ফার্মের দীর্ঘকালে শিল্পে অবাধ প্রবেশ এবং লোকসান দেখা দিলে পুরনো ফার্মগুলির শিল্প থেকে অবাধ প্রস্থান; (iv) বাজার সম্পর্কে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা পরিপূর্ণ জ্ঞান; (v) প্রত্যেকটি উপাদানের পূর্ণ সচলতা ও (vi) পরিবহন ব্যয়ের অনস্তিত্ব।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্ত হ'ল দুটি; (i) দাম = প্রান্তিক ব্যয় এবং (ii) ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে। স্বল্পকালে ফার্ম তার ভারসাম্য অবস্থা স্বাভাবিক অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে, কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা পেতে পারে এবং

লোকসান স্বীকার করতেও বাধ্য হতে পারে। তবে স্বল্পকালে লোকসানের অবস্থায় ফার্ম যদি তার মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় তুলে নিতে পারে (অর্থাৎ দাম যদি গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় অপেক্ষা কম না হয়), তবে লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ফার্ম উৎপাদন চালিয়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্মের শিল্পে অবাধ প্রবেশ এবং পুরনো ফার্মগুলির শিল্প থেকে অবাধ প্রস্থান অব্যাহত থাকলে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় সকল ফার্মই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় প্রত্যেকটি ফার্মের ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত শর্তটি বজায় থাকবে।

দাম (= গড় আয়) = প্রান্তিক ব্যয় = গড় ব্যয়। ফার্ম তখন তার গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে। এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থার উৎপাদনকে "কাম্য উৎপাদন" বলে। ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অবস্থায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্থিতিশীল ভারসাম্য হতে পারে না। ফার্মের ভারসাম্যের দ্বিতীয় ক্রম (Second order) বা পর্যাপ্ত (Sufficient) শর্তটি হলো যে, ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে। তাই প্রান্তিক ব্যয়রেখা যখন নিম্নগামী অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় যখন ক্রমহ্রাসমান, তখন যে স্থিতিশীল ভারসাম্য সম্ভব নয় তা সহজেই অনুমেয়। ক্রমহ্রাসমান গড় ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য সম্ভব হয় না, কারণ দাম (= গড় আয়) = প্রান্তিক আয়রেখা যেহেতু আনুভূমিক, গড় ব্যয়ের ক্রমহ্রাসমান হলে ফার্ম যত বেশি উৎপাদন করবে, ততই দাম এবং গড়ন ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাবে। ফলে ফার্মের মোট মুনাফাও বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় ফার্ম ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে চলবে এবং ফার্মের কোন ভারসাম্য হতে পারে না। তাই গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় যখন ঊর্ধ্বগামী, কেবলমাত্র তখনই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য হতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা হ'ল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখার সেই অংশ যা তার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর (উৎপাদন বন্ধের বিন্দু বা Shut-down point) উপরিভাগে অবস্থিত। শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখার এই অংশটিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে সাধারণত শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখা পাওয়া যায়। ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা যেহেতু ঊর্ধ্বগামী (প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঊর্ধ্বগামী অংশেই ফার্মের ভারসাম্য হতে পারে) তাই শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখাও ঊর্ধ্বগামী হবে। তবে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা আনুভূমিক, ঊর্ধ্বগামী বা নিম্নগামী—এই তিনটি রূপই নিতে পারে। সমব্যয়সম্পন্ন শিল্পে (যেখানে বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ বা বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্য কোনটাই ঘটে না) যোগানরেখা আনুভূমিক হবে, ক্রমবর্ধমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পে (যেখানে বাহ্যিক ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয়) যোগানরেখা ঊর্ধ্বগামী হবে এবং ক্রমহ্রাসমান ব্যয়সম্পন্ন শিল্পে (যেখানে বাহ্যিক ব্যয়সঙ্কোচ দেখা দেয়) যোগানরেখা নিম্নগামী হবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয় দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন হ'লে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণেও পরিবর্তন ঘটবে, তবে এই পরিবর্তন কতটা হবে তা চাহিদা ও যোগানের স্থিতিস্থাপকতার উপর অনেকাংশে নির্ভর করবে।

৫৪.১০ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। এই বাজারে একটি ফার্মের মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়রেখাগুলির আকৃতি কিরূপ হবে?

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজেরে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি ব্যাখ্যা

করুন।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে সর্বোচ্চ লাভ সংগ্রহকারী একটি উৎপাদক সংস্থার ভারসাম্যের অবস্থা বর্ণনা করুন।

৪। কোন ফার্মের যোগানরেখা বলতে কি বোঝায়? পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালীন সময়ে ফার্মের ও শিল্পের যোগানরেখা কিরূপ নির্ধারণ করা যায়?

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

৬। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে, কিন্তু শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা ঊর্ধ্বগামী, অনুভূমিক, এমন কি নিম্নগামীও হতে পারে। ব্যাখ্যা করুন।

৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালে (i) স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফার অবস্থায় ভারসাম্য, (ii) স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থায় ভারসাম্য এবং (iii) লোকসানের অবস্থায় ভারসাম্য চিত্র সহযোগে ব্যাখ্যা করুন। স্বল্পকালে লোকসান হতে থাকলে ফার্ম কি উৎপাদন চালিয়ে যাবে, না উৎপাদন বন্ধ করবে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৮। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে ভারসাম্য দাম কিভাবে পরিবর্তিত হয় যখন—(i) শুধুমাত্র চাহিদা বা (ii) শুধুমাত্র যোগান বা (iii) উভয়েরই পরিবর্তন ঘটে।

৯। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থায় দাম, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয়ের মধ্যে কি সম্পর্ক তা দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। পণ্যের বাজারে প্রতিযোগিতা কখন পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় রূপান্তরিত হয়?

২। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনকারী একটি ফার্ম কেন যেখানে দাম = প্রান্তিক ব্যয় হয় সেখানে ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছয়?

৩। স্বল্পকালে লোকসান হতে থাকলেও ফার্ম অনেক সময়ই উৎপাদন চালিয়ে যায় কেন?

৪। না-লাভ-না-ক্ষতির বিন্দু (Break-even point) এবং উৎপাদন বন্ধের বিন্দুর (Shut-down point)-এর মধ্যে পার্থক্য করুন।

৫। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঊর্ধ্বগামী অংশের সম্পূর্ণটাই হ'ল ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা—মন্তব্যটি সঠিক না ভুল ব্যাখ্যা করুন।

৬। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা এবং শিল্পের স্বল্পকালীন যোগানরেখার মধ্যে সম্পর্ক কি?

৭। কোন ফার্মের ক্রমহ্রাসমান ব্যয়ের অবস্থাটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মের ভারসাম্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কেন?

৮। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা কোন্ পরিস্থিতিতে আনুভূমিক হতে পারে?

৯। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা কোন্ পরিস্থিতিতে ঊর্ধ্বগামী (বা ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন) হয়?

১০। প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের দীর্ঘকালীন যোগানরেখা কখন নিম্নগামী (বা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন) হয়?

১১। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের শর্তটি হ'ল ঃ দাম = প্রান্তিক ব্যয়। এই শর্তটি কি যথেষ্ট? অতিরিক্ত আরও কোন শর্তের কি প্রয়োজন আছে? ব্যাখ্যা করুন।

১২। যদি যোগান অপরিবর্তিত থাকে এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তবে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কি প্রভাব পড়বে?

১৩। যদি যোগান অপরিবর্তিত থেকে চাহিদা হ্রাস পায়, তবে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর কি প্রভাব পড়বে?

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় দাম ও প্রান্তিক আয় সমান হয় কেন?

২। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের সর্বোচ্চ মুনাফার শর্ত কি?

৩। নিম্নমুখী প্রান্তিক ব্যয়ের অবস্থায় প্রতিযোগী ফার্মের ভারসাম্য কি সম্ভব?

৪। স্বল্পকালীন দামের সর্বনিম্ন সীমা কি?

৫। স্বল্পকালীন দাম নির্ধারণে গড় ব্যয় না প্রান্তিক ব্যয়—কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক?

৬। ফার্মের না-লাভ-না-ক্ষতির বিন্দু বা আয়-ব্যয় সমতার বিন্দুটি (Break-even point) কোথায় অবস্থিত?

৭। ফার্মের উৎপাদন বন্ধকরণ বিন্দুটি (Shut-down point) কোথায় অবস্থিত?

৮। প্রতিযোগী ফার্ম কি দীর্ঘকালে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে?

৯। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম বিজ্ঞাপনের উপর অর্থ ব্যয় করে না কেন?

১০। প্রতিযোগী ফার্মের স্বল্পকালীন যোগানরেখা কোন্‌টি?

১১। চাহিদার বৃদ্ধি কিন্তু যোগান স্থির আছে—এ রকম অবস্থায় দাম বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে?

১২। যোগানের বৃদ্ধি কিন্তু চাহিদা স্থির আছে—এ রকম অবস্থায় দাম বৃদ্ধি পাবে না হ্রাস পাবে?

১৩। দেখান যে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও যোগান যদি সম্পূর্ণ সম্প্রসারণশীল (বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক) হয়, তবে দাম বৃদ্ধি পাবে না।

১৪। দেখান যে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও যোগান যদি সম্পূর্ণ সম্প্রসারণশীল (বা সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক) হয়, তবে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হবে না।

১৪। দেখান যে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও যোগান সম্পূর্ণ অসম্প্রসারণশীল (বা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক) হয়, তবে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন হবে না।

১৫। কোন পণ্যের যোগানরেখা ডান দিকে সরে গেলে, ভারসাম্য দামের কি পরিবর্তন হবে যদি চাহিদারেখা (ক) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় এবং (খ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়?

১৬। যোগান অপরিবর্তিত থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ভারসাম্য দামের কি পরিবর্তন হবে যদি যোগানরেখা (ক) সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় এবং (খ) সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয়?

১৭। চাহিদা ও যোগান উভয়ই বৃদ্ধি পেলে বিক্রীত দ্রবের পরিমাণ বাড়বে না কমবে?

১৮। চাহিদা ও যোগান উভয়ই বৃদ্ধি পেলে দ্রব্যের দাম বাড়বে না কমবে?

১৯। চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস পেলে দ্রব্যের দামের উপর কি প্রভাব পড়বে?

২০। চাহিদা বৃদ্দি ও যোগান হ্রাস পেলে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বাড়বে না কমবে?

একক ৫৫ ◆ একচেটিয়া বাজার

গঠন

৫৫.০ উদ্দেশ্য
৫৫.১ একচেটিয়া বাজার ও তার উদ্ভবের কারণ
৫৫.২ একচেটিয়া কারবারীর মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়
৫৫.৩ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ঃ স্বল্পকালীন ভারসাম্য ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য
৫৫.৪ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
৫৫.৫ একচেটিয়া কারবারী ও যোগানরেখা
৫৫.৬ একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণ
৫৫.৬.১ বিভিন্ন ধরনের দাম পৃথকীকরণ
৫৫.৬.২ দাম পৃথকীকরণ কখন সম্ভব হয়
৫৫.৬.৩ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য
৫৫.৬.৪ দাম পৃথকীকরণ কখন লাভজনক হয়
৫৫.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য ও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের মধ্যে তুলনা
৫৫.৮ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের পরিমাণ এবং একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের মধ্যে তুলনা
৫৫.৯ সারাংশ
৫৫.১০ অনুশীলনী

৫৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- একচেটিয়া কারবার কাকে বলে ও তার উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল
- একচেটিয়া কারবারীর মোট, গড় ও প্রান্তিক আয়
- একচেটিয়া কারবারীর স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য
- একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা
- একচেটিয়া কারবারী, যোগানরেখা ও দাম পৃথকীকরণ
- পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের ভারসাম্য ও একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য এবং দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের পরিমাণ

৫৫.১ একচেটিয়া বাজার ও তার উদ্ভবের কারণ

যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা কোন একটি দ্রব্য অসংখ্য ক্রেতার নিকট বিক্রি করে এবং যেখানে ঐ দ্রব্যটির কোন ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য থাকে না, সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। একচেটিয়া বাজারে একটি ফার্ম মাত্র দ্রব্যটি উৎপাদন ও বিক্রি করায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে। একটি ফার্ম নিয়েই শিল্প গঠিত হয়।

এই বাজারে নতুন ফার্মের প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। যদি নতুন ফার্ম বাজারে প্রবেশ করে তাহলে আর বাজারে একচেটিয়া অবস্থা থাকবে না।

একচেটিয়া কারবারের ভিত্তি কি অর্থাৎ কিভাবে এর উদ্ভব হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমত, প্রকৃতিগত কারণে কোন কাঁচামালের জোগান সীমাবদ্ধ হ'লে এবং একটিমাত্র ফার্মের ঐ কাঁচামালের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকলে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয়। যেমন অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করতে বক্সাইট নামক একটি খনিজ পদার্থের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির এই বক্সাইটের উপর একমাত্র অধিকার থাকায় এই কোম্পানি একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে। দ্বিতীয়, সমাজের দিক থেকে গ্যাস, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল পরিবহন প্রভৃতি জনস্বার্থ সম্পর্কিত সেবা প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া মালিকানাধীনে পরিচালনা করাই অপরিহার্য বা ব্যয়সংক্ষেপের দিক দিয়ে যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়। এরূপ একচেটিয়া কারবারকে সামাজিক একচেটিয়া কারবার বলা হয়। তৃতীয়ত, অনেক সময় সরকার নিজে কোন বিশেষ দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করে এবং অন্য কোন বেসরকারী সংস্থাকে ঐ বাজারে প্রবেশ করতে দেয় না। যেমন টেলিফোন, রেল পরিবহন, বিমান পরিবহন, প্রতিরক্ষার সাজসরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন। আবার অনেক সময় সরকার নিজে একচেটিয়া অধিকার না দিয়ে কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে দিতে পারে এবং আইন বলে অন্য ফার্মের নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। যেমন কলকাতা এবং তার শহরতলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হ'ল CESC। চতুর্থত, নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমেও একচেটিয়া বাজারের উদ্ভব হতে পারে। কোন ফার্ম নতুন দ্রব্য বা নতুন উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করে এর পেটেন্ট নিতে পারে। এর অর্থ হ'ল ঐ দ্রব্যের উৎপাদন বা ঐ উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ অন্য কেউ করতে পারবে না। পঞ্চমত, অনেক সময় কয়েকটি ফার্ম একত্রিক হয়েও একচেটিয়া বাজার সৃষ্ট করতে পারে। একে বলে জোটবদ্ধতার মাধ্যমে সৃষ্টি একচেটিয়া কারবার।

৫৫.২ একচেটিয়া কারবারীর মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয়

একচেটিয়া কারবারী যেহেতু বাজারে দ্রব্যটির একমাত্র বিক্রেতা, তাই সে যদি দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে চায়, তবে নতুন ক্রেতাদের আকর্ষণ করার উদ্দ্যেশ্য এবং পুরনো ক্রেতারা যাতে দ্রব্যটি আরও বেশি পরিমাণে ক্রয় করে সেই উদ্দেশ্যে তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হবে। এই কারণে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদারেখা বা গড় আয়রেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী বা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়। প্রান্তিক আয়রেখাও নিম্নগামী হয় এবং প্রান্তিক আয়রেখা গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করে। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটির একমাত্র বিক্রেতা হওয়ায় সে দ্রব্যের যোগানের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজার দামের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। অর্থাৎ সে যদি দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে চায়, তাহলে যেমন তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়, তেমনি সে দ্রব্যটির যোগান কমিয়ে দিয়ে বাজারের দ্রব্যের নাম বাড়াতে পারে। এই কারণে একচেটিয়া কারবারী হ'ল দাম নিয়ন্ত্রক (Price-maker)।

একচেটিয়া কারবারীর মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয় কিরূপ হবে তা নিচের দৃষ্টান্তে দেখাল হ'ল—

দ্রব্যের পরিমাণ	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR) বা দাম (P)	প্রান্তিক আয় (MR)
১	১০.০০	১০.০০	১০.০০
২	১৯.০০	৯.৫০	৯.০০
৩	২৭.০০	৯.০০	৮.০০
৪	৩৪.০০	৮.৫০	৭.০০
৫	৪০.০০	৮.০০	৬.০০

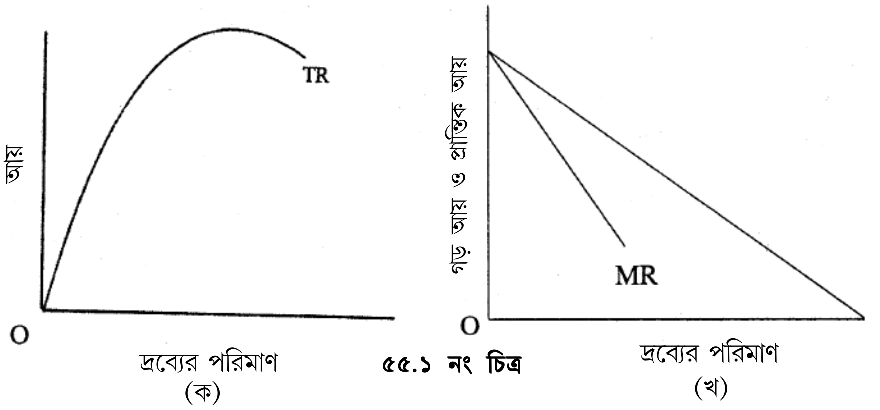

৫৫.১ নং চিত্র

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে যেহেতু তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়, তাই যে অনুপাতে দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে তার তুলনায় কম অনুপাতে বিক্রেতার মোট আয় বাড়ে। এই কারণে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় (TR) রেখা আনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল হয়। এমনকি দ্রব্যটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিক্রি করার পর যদি আরও বেশি পরিমাণে বিক্রি করা হয় তবে দ্রব্যের দাম এতটা কমাতে হয়, যাতে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় কমে যায় বিক্রেতার। এই কারণে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুর পর TR রেখাটি নিম্নগামী হয়ে পড়ে।

দ্রব্যটি বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে হলেই একচেটিয়া কারবারীকে যেহেতু দ্রব্যের দাম কমাতে হয়, তাই তার দাম = গড় আয় (P = AR) রেখা এবং প্রান্তিক আয় (MR) রেখা—উভয় রেখাই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় এবং MR রেখা P = AR রেখার নিচে অবস্থান করে।

৫৫.৩ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য হ'ল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। একচেটিয়া কারবারী কিভাবে তার এই লক্ষ্যে উপনীত হয়, তা আমরা দুটি দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে পারি।

(ক) মোট আয় ও মোট ব্যয় পদ্ধতি ঃ একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় এবং মোট ব্যয়ের পার্থক্য যেখানে সর্বাধিক হবে সেখানেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হবে। কারণ এই পার্থক্যই হ'ল তার মুনাফা।

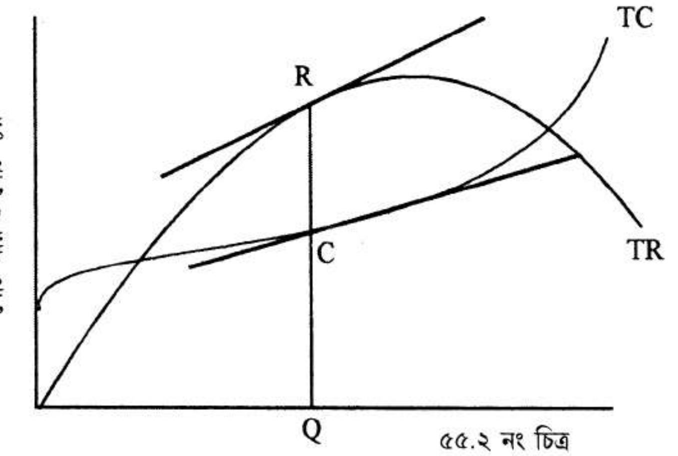

৫৫.২ নং চিত্র

উপরের চিত্রে T, R রেখা এবং T, C রেখা হ'ল যথাক্রমে একচেটিয়া কারবারীর মোট আয় ও মোট ব্যয়রেখা। এই রেখা দুটির মধ্যে উল্লম্ব পার্থক্য দ্রব্যটি বিভিন্ন পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করে একচেটিয়া কারবারী কি পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে পারে তা নির্দেশ করে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একচেটিয়া কারবারী যখন দ্রব্যটি OQ পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করে, তখনই এই রেখা দুটির মধ্যে উল্লম্ব পার্থক্য সর্বাধিক হয় অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হয়। দ্রব্যটি OQ পরিমাণ বিক্রি করা হ'লে তার মোট আয় হয়, QR এবং ব্যয় হয় QC। অতএব সর্বাধিক মুনাফার পরিমাণ হ'ল RC। দুটি রেখার মধ্যে উল্লম্ব পার্থক্য সেখানেই সর্বাধিক হয়, যেখানে রেখা দুটির স্পর্শক পরস্পর সমান্তরাল হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, TR রেখার R বিন্দুতে আঁকা স্পর্শকটি এবং TC রেখার C বিন্দুতে আঁকা স্পর্শকটি পরস্পর সমান্তরাল। অর্থাৎ দুটি স্পর্শকের ঢাল পরস্পর সমান। TR রেখার কোন বিন্দুতে কোন স্পর্শক আঁকা হ'লে ঐ স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক আয় নির্দেশ করে। অপরপক্ষে TC রেখার কোন বিন্দুতে কোন স্পর্শক আঁকা হলে ঐ স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক আয় নির্দেশ করে। অপরপক্ষে TC রেখার কোন বিন্দুতে কোন স্পর্শক আঁকা হলে ঐ স্পর্শকের ঢাল ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করে। অতএব দ্রব্যটি যখন OQ পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়, তখন একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়।

আরও লক্ষণীয় যে, R বিন্দুর ডান দিকে TR রেখার আর একটি বিন্দুতে যদি একটি স্পর্শক আঁকা যায়, তবে ঐ স্পর্শকের ঢাল R বিন্দুতে আঁকা স্পর্শকের ঢাল অপেক্ষা কম হবে। অর্থাৎ প্রান্তিক আয় ক্রমশ কমে যাবে বা প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল ঋণাত্মক হবে। কিন্তু C বিন্দুর ডানদিকে TC রেখার অন্য একটি বিন্দুতে যদি একটি স্পর্শক আঁকা যায় তবে সেই স্পর্শকের ঢাল C বিন্দুতে আঁকা স্পর্শকের ঢাল অপেক্ষা বেশি হবে। অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে বা প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল ধনাত্মক হবে। অতএব একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের পর্যাপ্ত শর্তটি হ'ল যে প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হবে।

(খ) প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পদ্ধতি ঃ একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সেখানেই সর্বাধিক হবে যেখানে প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হবে। কোন দ্রব্য পূর্বের তুলনায় অতিরিক্ত এক একক বিক্রি করা হলে বিক্রেতার মোট আয় যে পরিমাণ বেড়ে যায় তাকেই প্রান্তিক আয় বলে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন করা হ'লে মোট ব্যয় যে পরিমাণ বাড়ে তাকেই প্রান্তিক ব্যয় বলে। প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় যদি বেশি হয়, তবে দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করা হ'লে বিক্রেতার মোট ব্যয় যতটা বাড়ে মোট আয় তার তুলনায় বেশি বাড়ে। অর্থাৎ তার মোট মুনাফা বেড়ে যায়। এই অবস্থায় সে দ্রব্যটি ক্রমাগত বেশি বেশি পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রি করা যাবে।

অপরপক্ষে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় যদি বেশি হয়, তবে দ্রব্যটি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করা হ'লে তার মোট আয় যতটা বাড়ে মোট ব্যয় তার তুলনায় বেশি বাড়ে অর্থাৎ তার মোট মুনাফা কমে যায়। এ অবস্থায় সে দ্রব্যটির উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ কমিয়ে দেবে। অতএব প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় যেখানে পরস্পর সমান সেখানেই একচেটিয়া কারবারীর মোট মুনাফা সর্বাধিক হয়। নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল—

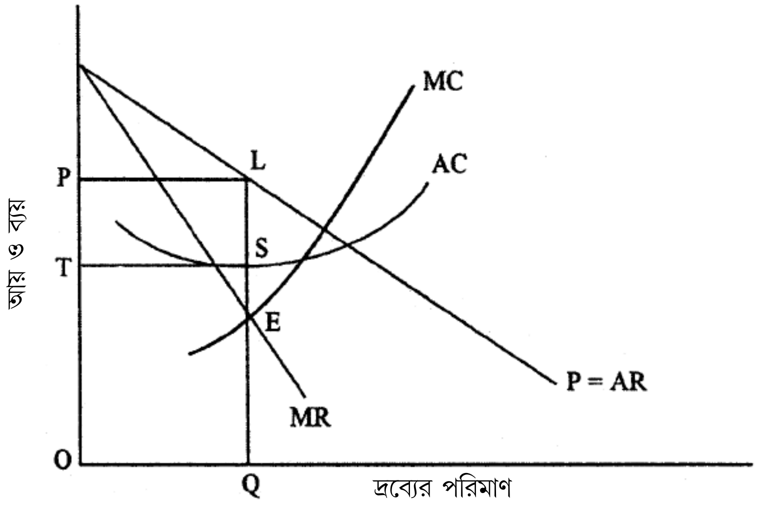

৫৫.৩ নং চিত্র

উপরের চিত্রে P = AR রেখা এবং MR রেখা হ'ল একচেটিয়া কারবারীর যথাক্রমে দাম = গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা। AC এবং MC রেখা হ'ল যথাক্রমে গড় ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা E বিন্দুতে MR রেখা এবং MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। একচেটিয়া এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা E বিন্দুতে MR রেখা এবং MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করছে। এখানেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের শর্তটি খাটছে। E বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি OQ পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করার পর যদি অতিরিক্ত আরও এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করা হয়, তবে প্রান্তিক আয় অপেক্ষা প্রান্তিক ব্যয় বেশি হয়ে পড়ে। অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারীর মোট মুনাফা কমে যায়। অতএব E বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি OQ পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করলেই একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হবে। OQ পরিমাণ দ্রব্য সে QL = OP দামে বিক্রি করতে পারবে। তার মোট আয় হবে OQLP এবং মোট ব্যয় হবে OQST (গড় ব্যয়) = QS। অতএব একচেটিয়া কারবারীর মোট স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে TSLP।

একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঃ

একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়াটিকে দুটি দিক থেকে বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, স্বল্পকালে একচেটিয়া কারবারীর যদি লোকসান হয় এবং যে উৎপাদন মাত্রা (Plant size) ব্যবহার করা হোক না কেন, এই লোকসান যদি এড়ান সম্ভব না হয়, তবে সে ব্যবসা ছেড়ে চলে যাবে, দ্বিতীয়ত, বর্তমানে সে যে উৎপাদনমাত্রা ব্যবহার করছে তাতে সে স্বল্পকালীন মুনাফা অর্জন করছে। তৎসত্বেও দীর্ঘকালে অন্য কোন উৎপাদন মাত্রা ব্যবহার করে আরও বেশি মুনাফা পাওয়া যায় কিনা, তা সে অনুসন্ধান করে দেখবে। চিত্রে দ্বিতীয় অবস্থাটিকে দেখান হ'ল। DD^1 রেখা এবং M রেখা হ'ল একচেটিয়া কারবারীর যথাক্রমে চাহিদা রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা। LAC রেখা হ'ল

দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা। LMC রেখা হ'ল সংশ্লিষ্ট দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা। ধরা যাক, প্রাথমিক অবস্থায় ফার্ম SAC_1 এবং SMC_1 দ্বারা নির্দেশিত উৎপাদন মাত্রাটি নির্মাণ করেছে। সেক্ষেত্রে স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখার ছেদবিন্দু অনুযায়ী ফার্ম OQ_{SR} পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং OA দামে তা বাজারে বিক্রি করবে। ফার্মের গড় ব্যয় হবে $OD = Q_{SR}$ পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং OA দামে তা বাজারে বিক্রি করবে। ফার্মের গড় ব্যয় হবে $OD = Q_{SR}C$ স্বল্পকালীন মোট মুনাফা হবে ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল।

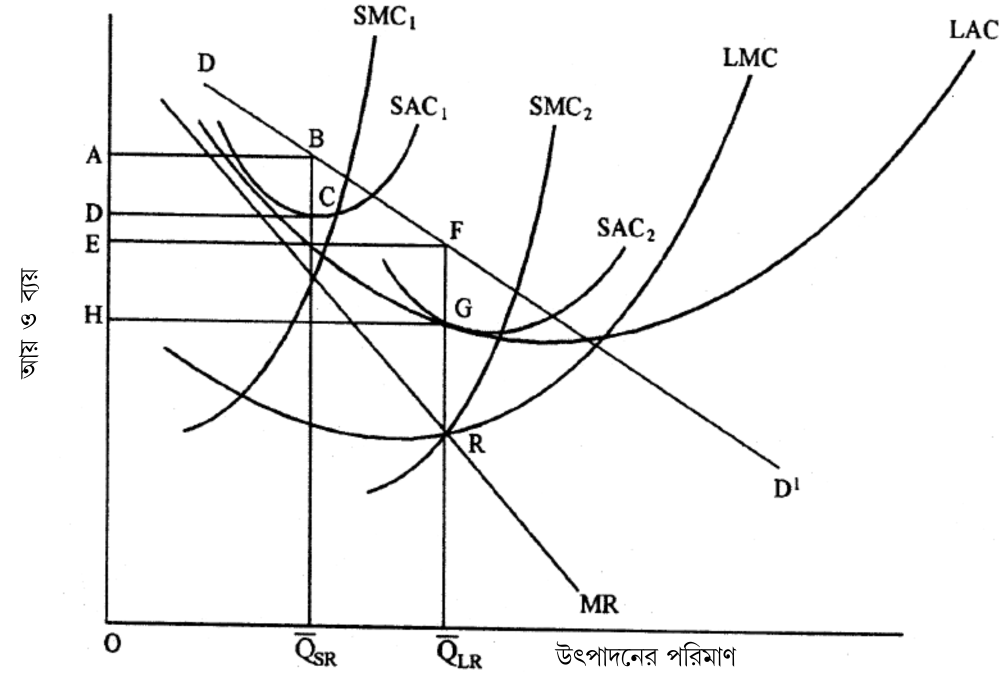

৫৫.৪ নং চিত্র

দীর্ঘকালে অন্য কোন উৎপাদন মাত্রায় উৎপাদন করলে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যাবে কিনা, ফার্ম তা অনুসন্ধান করে দেখবে। ফার্ম তখন অবশ্যই দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় (LMC) রেখাটিকে মূল বিবেচ্য বিষয় হিসাবে গণ্য করবে। যেখানে একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা তার প্রান্তিক আয়রেখাকে ভিতর দিক থেকে ছেদ করবে, সেখানেই তার দীর্ঘকালীন ভারসাম্য ঘটবে। চিত্র অনুযায়ী দীর্ঘকালীন সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে সে দ্রবটি OQ_{LR} পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং OE দামে তা বাজারে বিক্রি করবে।

LAC রেখার G বিন্দুতে দেখা গেল যে, OQ_{LR} পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে একচেটিয়া কারবারী SAC_2 রেখা এবং SMC_2 রেখা দ্বারা নির্দেশিত উৎপাদন মাত্রাটি ব্যবহার করবে। গড় উৎপাদন ব্যয় হবে OH এবং দীর্ঘকালীন সর্বাধিক একচেটিয়া মুনাফা হবে EFGH আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল। এই মুনাফার পরিমাণ অবশ্য প্রাথমিক অবস্থায় স্বল্পকালে যে মুনাফা অর্জিত হয়েছিল (ABCD আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল) তার তুলনায় বেশি হবে।

অতএব আমরা দেখলাম যে, একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে গিয়ে দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদন বিক্রি করবে যেখানে তার প্রান্তিক আয় ও দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর

সমান হবে। এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপাদনে সে স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়রেখা দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাকে স্পর্শ করে সেই রেখাটির দ্বারাই উৎপাদনের কাম্য মাত্রা নির্দেশিত হয়। এই স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দুতে (R বিন্দুতে) দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখাকে ছেদ করবে।

৫৫.৪ একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ও চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা

আমরা দেখেছি যে, চাহিদার দাম—স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রান্তিক আয় ও গড় আয়ের মধ্যে সম্পর্ক হ'ল— $MR = AR\left(1 - \frac{1}{e}\right)$

এই সম্পর্কটি সহজেই দেখা যায় যখন $e > 1$ (অর্থাৎ চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক), তখন $MR > 0$

যখন $e = 1$ (অর্থাৎ চাহিদা যখন একক স্থিতিস্থাপক) তখন $MR = 0$

যখন $e > 1$ (চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক), তখন

$MR < 0$

একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল ঃ

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়

সাধারণত প্রান্তিক ব্যয় ধনাত্মক হয়, (অর্থাৎ কোন দ্রব্য আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে হলে মোট উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায়।) অতএব একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক আয়কেও ধনাত্মক হতে হবে কারণ ধনাত্মক প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে ঋণাত্মক বা শূন্য প্রান্তিক আয়ের সমতা বিধান করা সম্ভব হয় না। এখন প্রান্তিক আয়কে ধনাত্মক হতে হলে একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদাকে অবশ্যই স্থিতিস্থাপক হতে হবে। তাই আমরা বলতে পারি যে, কেবলমাত্র স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হতে পারে।

একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয়, তবে একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলে একদিকে দ্রব্যের দাম বেড়ে যাওয়ার দরুন বিক্রেতার মোট আয় বেড়ে যাবে, অন্যদিকে দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণ উৎপাদন করার দরুন মোট ব্যয় কমে যাবে। ফলে দু'দিক থেকেই একচেটিয়া কারবারীর মোট মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় সে কখনই ভারসাম্যের উপনীত হতে পারে না। ক্রমাগত সে দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে যাবে।

একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদা যদি একক স্থিতিস্থাপক হয় তবে সে দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণে বিক্রি করলে দ্রব্যের দাম বাড়লেও তার মোট আয়ের কোন পরিবর্তন হবে না, কিন্তু দ্রব্যটি কম পরিমাণ উৎপাদন করার ফলে তার মোট ব্যয় কমে যাবে। এক্ষেত্রেও তার মোট মুনাফা বেড়ে যাবে এবং সে ক্রমাগত দ্রব্যটির উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ কমাতে থাকবে। ফলে এ অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্যে উপনীত হবে না।

একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে সে দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়ে দিলে দাম বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন তার মোট আয় কমে যাবে। অপরপক্ষে দ্রব্যটি আগের চেয়ে কম পরিমাণ উৎপাদন

করার ফলে মোট ব্যয়ও কমে যাবে। মোট আয় এবং মোট ব্যয় উভয়ই কমে যাওয়ায় মোট মুনাফার কি পরিবর্তন হবে তা সঠিক বলা যায় না, যদি দেখা যায় উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ কমানোর ফলে মোট ব্যয় যতটা কমছে মোট আয় তার তুলনায় বেশি পরিমাণ কমছে, তাহলে মোট মুনাফা কমে যাবে এবং বর্তমান অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করলেও করতে পারে। অতএব কেবলমাত্র স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ঘটলেও ঘটতে পারে।

নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল—

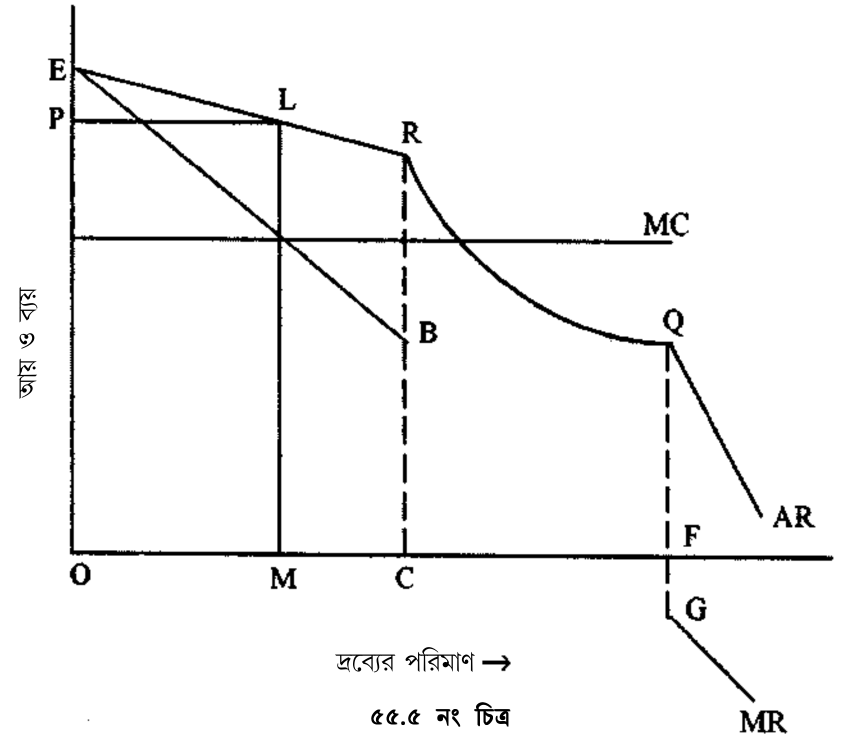

৫৫.৫ নং চিত্র

উপরের চিত্রে একচেটিয়া কারবারীর চাহিদারেখা বা গড় আয়রেখার তিনটি অংশ রয়েছে। ER অংশ হ'ল স্থিতিস্থাপক, PQ, অংশ হল একক স্থিতিস্থাপক এবং QAR অংশ হ'ল অস্থিতিস্থাপক। চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক প্রান্তিক আয় তখন ধনাত্মক। আমরা তখন প্রান্তিক আয়রেখার EB অংশ পাই। চাহিদা যখন একক স্থিতিস্থাপক তখন প্রান্তিক আয় হবে শূন্য। তাই প্রান্তিক আয়রেখার এই অংশ আনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে মিশে যাবে (CF অংশ)। আবার চাহিদা যখন অস্থিতিস্থাপক প্রান্তিক আয় তখন ঋণাত্মক এবং তখন আমরা প্রান্তিক আয়রেখার GMR অংশ পাই। আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি যে, প্রান্তিক ব্যয়রেখা (MC) হ'ল আনুভূমিক। MR রেখার ধনাত্মক অংশের কোন বিন্দুতে MC রেখা ও MR রেখা পরস্পরকে ছেদ করে। এই ছেদ বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যের পরিমাণ হবে OM এবং দ্রব্যের দাম হবে ML (=OP)। চাহিদারেখার L বিন্দুতে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা একক অপেক্ষা বেশি। অতএব একচেটিয়া কারবারীর দ্রব্যের চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক কেবলমাত্র তখনই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হবে।

তবে ব্যয়হীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে (উদাহরণস্বরূপ, একচেটিয়া কারবারী যদি এমন একটি প্রস্রবণের মালিক হয় [Mineral spring] যেখানে ঐ খনিজ জল উৎপাদন করতে কোন ব্যয় হয় না) একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হবে। সেক্ষেত্রে ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক আয়কেও অবশ্যই শূন্য হতে হবে। প্রান্তিক আয় তখনই শূন্য হবে যখন একচেটিয়া কারবারীর দ্রবের একক স্থিতিস্থাপক হবে। অতএব ব্যয়হীন একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে চাহিদা একক স্থিতিস্থাপক হলে ভারসাম্য হতে পারে। নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল—

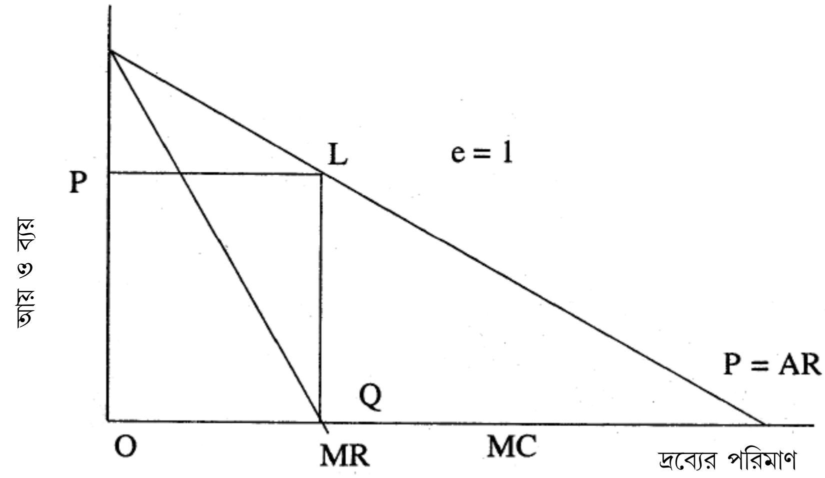

৫৫.৬ নং চিত্র

MC যেহেতু সর্বদাই শূন্য সেই কারণে MC রেখা আনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে মিশে যাবে। Q বিন্দুতে MC রেখা ও MR রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। অতএব Q বিন্দুই হবে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য বিন্দু। এই Q বিন্দু অনুযায়ী একচেটিয়া কারবারী দ্রবটি OQ পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং QL = OP দামে তা বাজারে বিক্রি করবে। বিক্রেতার মোট আয় এবং মোট মুনাফা উভয়ই OQLP-এর সমান হবে। চাহিদারেখার L বিন্দুতে চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান হবে।

৫৫.৫ একচেটিয়া কারবারী ও যোগানরেখা

যোগানরেখা অনুযায়ী দাম এবং যোগানের পরিমাণের মধ্যে সর্বদা একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক (unique relationship) থাকবে। একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে যোগান দেওয়া হয়। যদি এমন হয় যে, বিভিন্ন চাহিদার অবস্থায় একই দামে দ্রব্যটি বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেওয়া হয় অথবা বিভিন্ন দামে দ্রব্যটি একই পরিমাণ যোগান দেওয়া হয়, তবে দাম ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে এই নির্দিষ্ট সম্পর্কটি আর বজায় থাকবে না এবং কোন যোগানরেখাও পাওয়া যাবে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারে প্রতিটি ফার্ম হ'ল দামগ্রহীতা। এই বাজারে প্রতিটি ফার্ম একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি সর্বদা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণেই যোগান দেয়। আমরা দেখেছি যে, ফার্মের গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর উপরিভাগে অবস্থিত প্রান্তিক ব্যয়রেখার অংশটিই হ'ল এই বাজারে একটি ফার্মের যোগানরেখা। একচেটিয়া বাজারে কিন্তু বিক্রেতা তার দ্রব্যটির যোগানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ফলে দ্রব্যটির দাম এবং দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে না। নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হ'ল।

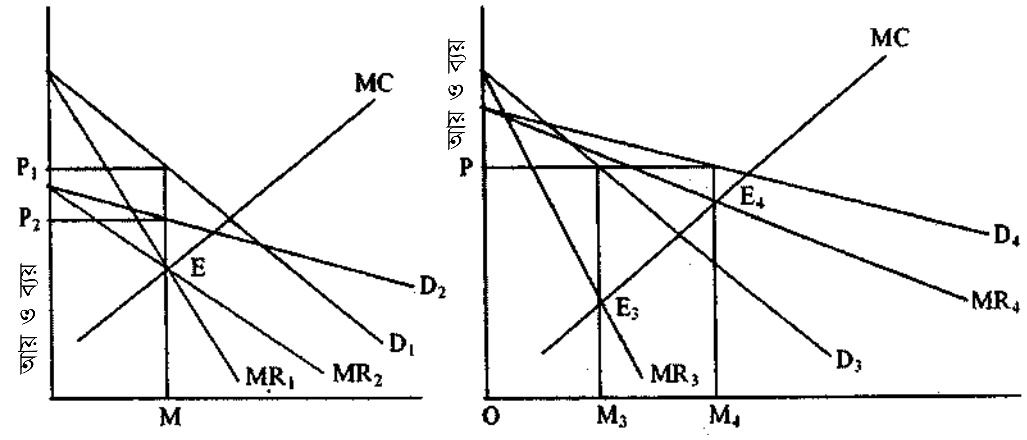

দ্রব্যের পরিমাণ
(ক)

দ্রব্যের পরিমাণ
(খ)

৫৫.৭ নং চিত্র

উপরের দুটি চিত্রেই চাহিদা (D)-রেখা, প্রান্তিক আয় (MR)-রেখা এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC)-রেখাকে সরলরেখা রূপে ধরা হয়েছে।

'ক' চিত্রে চাহিদা রেখা যখন D_1 রেখা এবং সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক আয় রেখা MR_1 রেখা, তখন E বিন্দুতে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হবে, কারণ ঐ বিন্দুতে (i) প্রান্তিক আয় (MR) = প্রান্তিক ব্যয় (MC) এবং (ii) MC রেখা (MR) রেখাকে ভিতর দিক থেকে ছেদ করে। এই E বিন্দু অনুযায়ী বিক্রেতা দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং OP_1 দামে তা বাজারে বিক্রি করবে। আবার চাহিদারেখা যখন D_2 রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা MR_2 রেখা তখনও E বিন্দুতেই ভারসাম্য ঘটবে এবং দ্রব্য ঐ OM পরিমাণই উৎপাদন ও বিক্রি করা হবে। কিন্তু এখন দ্রব্যেরদাম হবে OP_2। এখানে বিভিন্ন চাহিদার অবস্থায় একই পরিমাণ দ্রব্য বিভিন্ন দামে যোগান দেওয়া হচ্ছে।

'খ' চিত্রে D_3 রেখা যখন চাহিদারেখা এবং MR_3 প্রান্তিক আয়রেখা, তখন E_3 বিন্দুতে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য ঘটবে। এখন E_3 বিন্দু অনুযায়ী সে দ্রব্যটি OM_3 পরিমাণ যোগান দেবে এবং দ্রব্যের দাম হবে OP_1 আবার চাহিদারেখা যখন D_4 রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা MR_4 রেখা, তখন E_4 বিন্দুতে ভারসাম্য হবে। E_4 বিন্দু অনুযায়ী সে দ্রব্যটি OM_4 পরিমাণ যোগান দেবে কিন্তু এক্ষেত্রেও দ্রব্যের দাম হবে OP। এখানে বিভিন্ন চাহিদার অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী একই দামে দ্রব্যটি বিভিন্ন পরিমাণ যোগান দেয়।

৫৫.৬ একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণ

৫৫.৬.১ বিভিন্ন ধরনের দাম পৃথকীকরণ

একচেটিয়া কারবারী যখন একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট পৃথক পৃথক দামে বিক্রি করে তখন তাকে দাম স্বতন্ত্রতা বা দাম পৃথকীকরণ বলে। একচেটিয়া কারবারীর এই দাম পৃথকীকরণ মোটামুটিভাবে তিন ধরনের হতে পারে—

(ক) ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণ ঃ এরূপ ক্ষেত্রে একচেটিয়া একই দ্রব্য বা একই সেবামূলক কার্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ক্রেতার নিকট ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করে থাকে। কোন একজন চিকিৎসক ধনী রোগীদের নিকট থেকে বেশি ফি এবং গরিব রোগীদের নিকট থেকে কম ফি আদায় করতে পারেন, একই রকমভাবে রেলগাড়ির দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের তুলনায় প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের কিছু বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলেও ভাড়ার তারতম্য অনেক বেশী হয়।

(খ) স্থানগত দাম পৃথকীকরণ ঃ একচেটিয়া কারবারী কোন একটি বাজারে বেশি দাম এবং অন্য একটি বাজারে একই দ্রব্যের জন্য কম দাম আদায় করতে পারে। যেমন শ্রীনগরে কোন একটি কাশ্মীরী শাল যে দামে বিক্রি হয়, কলকাতায় সেই একই শাল তার তুলনায় অনেক বেশি দামে বিক্রি হবে। অনেক সময় একচেটিয়া বিক্রেতা বিদেশের বাজার অধিকার করার জন্য বিদেশে দ্রব্যটি অপেক্ষাকৃত কম দামে বিক্রি করে, কিন্তু দেশের বাজারে একই দ্রব্যের জন্য বেশি দাম আদায় করে। একে অর্থবিদ্যায় ডাম্পিং (Dumping) বলে।

(গ) ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ ঃ একই দ্রবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম আদায় করাকে ব্যবহারগত দাম পৃথকীকরণ বলে। যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি বিদ্যুতের জন্য কারখানাগুলির নিকট থেকে এক দাম কিন্তু গৃহস্থের নিকট থেকে অন্য দাম আদায় করে।

৫৫.৬.২ দাম পৃথকীকরণ কখন সম্ভব হয় ঃ

কেবল একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে দাম পৃথকীকরণ করা সম্ভব হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বহু সংখ্যক বিক্রেতা সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে এবং প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতা বাজার সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হয়। ফলে কোন একজন বিক্রেতা যদি কোন ক্রেতার নিকট থেকে প্রচলিত বাজার দাম অপেক্ষা বেশি দাম দাবি করে, তবে ঐ ক্রেতা অন্য বিক্রেতার নিকট থেকে কম দামে ঐ দ্রব্যটি সংগ্রহ করবে। এবং বিক্রেতার পক্ষে দ্রব্যটি বেশি দামে বিক্রি করা সম্ভব হবে না। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হবে এমন মনে করা ভুল। একচেটিয়া বাজারে দাম পৃথকীকরণের প্রধান শর্ত হ'ল, দ্রব্যটিকে পুনর্বিক্রয় করার কোন সুযোগ থাকবে না। যদি দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয় করার সুযোগ থাকে, তবে কোন একজন ব্যক্তি যে বাজারে দ্রব্যটির দাম কম সেই বাজার থেকে দ্রব্যটি ক্রয় করে যে বাজারে দ্রব্যটির দাম বেশি সেই বাজারে দ্রব্যটি বিক্রি করবে। অথবা যে ক্রেতার নিকট থেকে বিক্রেতা দ্রব্যটির জন্য বেশি দাম আদায় করে, সেই ক্রেতা যে ক্রেতা দ্রব্যটি অপেক্ষাকৃত কম দামে সংগ্রহ করতে পারে, তার মাধ্যমে দ্রব্যটি ক্রয় করে। এ সকল ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণ নীতি ব্যর্থ হবে। অধ্যাপক পিগুর (Pigou) মতে, নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পূর্ণ হ'লে দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হবে—

(i) চাহিদা যেন অধিক দামের বাজার থেকে কম দামের বাজারে স্থানান্তরিত হতে না পারে। যদি ধনী ব্যক্তি ডি-লাক্স, (De lux) সংস্করণের বই না কিনে পেপার ব্যাক (Paper bag) সংস্করণের বই কেনে তা হলে ব্যক্তিগত দাম পৃথকীকরণ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

(ii) দ্রব্যটি যেন কম দামের বাজার থেকে বেশি দামের বাজারে স্থানান্তরিত করার সুযোগ না থাকে। যদি দ্রব্যটি এভাবে স্থানান্তরের সুযোগ থাকে, তাহলে কিছু ব্যক্তি কম দামের বাজার থেকে দ্রব্যটি কিনে বেশি দামের বাজারে তা বিক্রি করে লাভবান হবে এবং একচেটিয়া কারবারী তখন তার দাম পৃথকীকরণ নীতি সফলতার সঙ্গে অনুসরণ করতে পারত না।

নিম্নলিখিত অবস্থায় দাম পৃথকীকরণ সহজেই সম্ভব হয়—

(ক) ভোগকারীর বিচিত্র মনোভাব ঃ

এ বিষয়ে তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

(i) একদল ক্রেতার কাছ থেকে কি দাম আদায় করা হচ্ছে অন্য আর একদল ক্রেতা যদি সে ব্যাপারে অজ্ঞ হয়, তাহলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে একই জিনিসের জন্য একদল ক্রেতার কাছ থেকে কম দাম এবং অন্য আর এক দল ক্রেতার কাছ থেকে বেশি দাম আদায় করা সম্ভব হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে দামের পার্থক্য এত সামান্য হয় যার ফলে যাদের কাছ থেকে বেশি দাম আদায় করা হচ্ছে, তারা এই দামের পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতে পারে।

(iii) ক্রেতাদের অযৌক্তিক (irrational) মনোভাবের দরুনও দাম পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটে। কিছু ক্রেতা সব সময়ই মনে করতে পারে, যে দ্রব্যটি জন্য তাকে অপেক্ষাকৃত বেশি দাম দিতে বলা হচ্ছে, সেই দ্রব্যটি কম দামে অন্যান্য ক্রেতার নিকট যে দ্রব্যটি বিক্রি করা হচ্ছে তাদের তুলনায় অনেক উন্নতমানের। অনেক সময় একই দ্রব্যকে বিভিন্ন প্রতিপন্ন করে (যেমন, বিভিন্ন ধরনের মোড়ক ব্যবহার করে) কিছু ক্রেতার নিকট থেকে বেশি দাম আদায় করা যায়।

(খ) সেবামূলক কাজ ঃ

ব্যক্তিগত সেবাকর্মের ক্ষেত্রে দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়। একজন ক্রেতা অল্প দামে সেবাকার্যটি সংগ্রহ করে, অন্য একজন ক্রেতার নিকট তা বেশি দামে বিক্রি করতে পারে না। ফলে এখানে একচেটিয়া কারবারী সহজেই সফলতার সঙ্গে দাম পৃথককীকরণ নীতির প্রয়োগ ঘটাতে পারে। যেমন, কোন বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক একই ধরনের অস্ত্রোপচারের জন্য গরিব রোগীদের নিকট থেকে কম ফি এবং ধনীদের নিকট থেকে বেশি ফি আদায় করতে পারেন। কারণ চিকিৎসকের সেবাকার্য পুনরায় বিক্রি করা যায় না।

(গ) ভৌগোলিক ব্যবধান বা রাজনৈতিক সীমারেখার জন্য দাম পৃথকীকরণ ঃ

দুটি বাজারের মধ্যে ভৌগোলিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবধান বা বাধানিষেধ থাকলে একচেটিয়া বিক্রেতা এই দুই বাজারে একই দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দাম ধার্য করতে পারে। কারণ এরূপ ক্ষেত্রে এক বাজারের ক্রেতারা অন্য বাজারের ক্রেতাদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারে না বা দ্রব্যটি এক বাজার থেকে অন্য বাজারে চালান দেওয়া সম্ভব হয় না।

৫৫.৬.৩ দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য

দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্য হ'ল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। এই মুনাফা সর্বাধিক করার অন্যতম শর্ত হ'ল, বিভিন্ন বাজারে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে। বর্তমানে দ্রব্যটি দুটি বাজারের মধ্যে যেভাবে ভাগ করা হয়েছে তাতে ১নং বাজারের প্রান্তিক আয় ২ নং বাজারের প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি। সেক্ষেত্রে বিক্রেতা ২নং বাজারে দ্রব্যটির বিক্রয় এক একক কমিয়ে দিয়ে যদি সেই এককটি ১নং বাজারে বিক্রি করে, তবে ২নং বাজারে তার মোট আয় যে পরিমাণ কমে যাবে, ১নং বাজারে তার মোট আয় তার তুলনায় বেশি পরিমাণে বাড়বে। অর্থাৎ তার মোট মুনাফা বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রমাগত ২নং বাজার থেকে দ্রব্যটিকে সরিয়ে এনে ১নং বাজারে বিক্রি করবে। একচেটিয়া বিক্রেতার প্রান্তিক

আয়রেখা যেহেতু বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়, সেই কারণে ১নং বাজারে দ্রব্যটি যত বেশি পরিমাণে বিক্রি করা হবে, তত ঐ বাজারে প্রান্তিক আয় কমে যাবে এবং ২নং বাজারে দ্রব্যটি যত কম কম পরিমাণ বিক্রি করা হবে, ততই ঐ বাজারে প্রান্তিক আয় বেড়ে যাবে। ফলে দুটি বাজারে প্রান্তিক আয়ের ব্যবধান ক্রমশ কমে যাবে। শেষপর্যন্ত যেখন দুটি বাজারে প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হবে তখনই একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হবে। তখন আর এক বাজার থেকে অন্য বাজারে দ্রব্যটি সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রেতার মুনাফা বাড়বে না।

অতএব আমরা বলতে পারি, দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের অন্যতম শর্ত হ'ল ঃ (i) ১নং বাজারে প্রান্তিক আয় = ২নং বাজারের প্রান্তিক আয়

($MR_1 = MR_2$)

(ii) প্রত্যেক বাজারে প্রান্তিক আয় আবার প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হবে (পৃথক পৃথক বাজারে দ্রব্যটি বিক্রি হ'লেও উৎপাদন কিন্তু একটি কারখানাতেই হচ্ছে)।

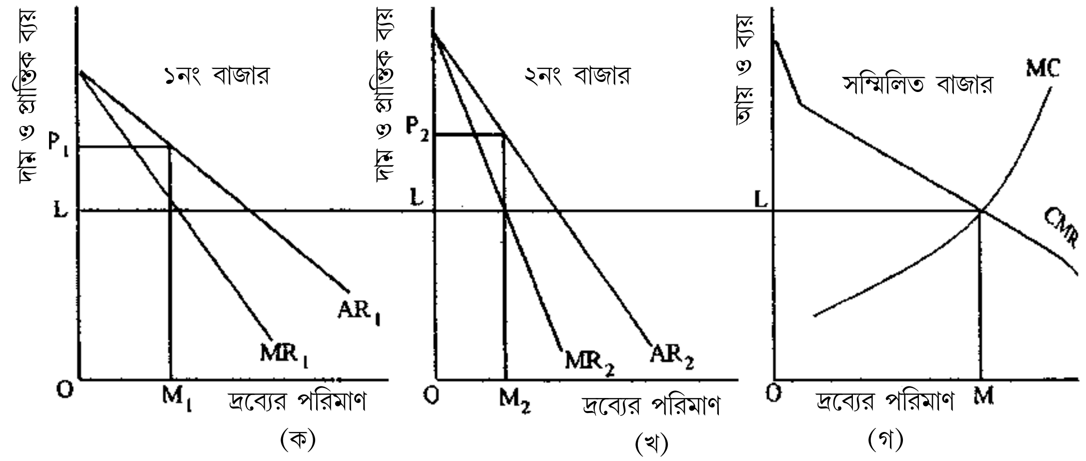

৫৫.৮ নং চিত্র

উপরের চিত্রে দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য দেখান হ'ল 'ক' চিত্রে AR_1 এবং MR_1 রেখা হ'ল ১নং বাজারের যথাক্রমে গড় আয়রেখা ও প্রান্তিক আয়রেখা; ৮ 'খ' চিত্রে AR_2 এবং MR_2 রেখা হ'ল যথাক্রমে ৮নং বাজারের গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা; ৮ 'খ' চিত্রে AR_2 এবং MR_2 রেখা হ'ল যথাক্রমে ৮ নং বাজারের গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা। এই MR_1 এবং MR_2 রেখাকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা ৮ 'গ' চিত্রে সম্মিলিত প্রান্তিক আয় (CMR) রেখা পাই। MC রেখা হ'ল একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয়রেখা। Q বিন্দুতে MC রেখা CMR রেখাকে নিচেরদিক থেকে ছেদ করেছে। অতএব Q বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করলে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হবে। এখন এই OM পরিমাণ দ্রব্য একচেটিয়া কারবারী দুটি বাজারের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেবে যাতে $MR_1 = MR_2 = MC$ হয়। সেক্ষেত্রে সে ১নং বাজারে দ্রব্যটি OM_1 পরিমাণ বিক্রি করবে এবং ২নং বাজারে দ্রব্যটি OM_2 পরিমাণ বিক্রি করবে। ১নং বাজারে ঐ OM_1 পরিমাণ দ্রব্য OP_1 দামে এবং ২নং বাজারে এই OM_2 পরিমাণ দ্রব্য OP_2 দামে বিক্রি করবে। OP_2 অপেক্ষা OP_1 ছোট। অতএব আমরা দেখলাম যে, বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত বেশি সেই বাজারে দ্রব্যের দাম অপেক্ষাকৃত কম হয় (AR_2 রেখা থেকে AR_1 রেখা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত) অর্থাৎ ২নং বাজার থেকে ১নং বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বেশি।

৫৫.৬.৪ দাম পৃথকীকরণ কখন লাভজনক হয় ঃ

দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল যে, বিভিন্ন বাজারের প্রান্তিক আয় অবশ্যই পরস্পর সমান হবে। ধরা যাক, একচেটিয়া কারবারী দুটি পৃথক বাজারে তার দ্রব্যটি বিক্রি করে সেক্ষেত্রে তার ভারসাম্যের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত হবে—

$MR_1 = MR_2$ MR_1 = ১নং বাজারের প্রান্তিক আয়

MR_2 = ২নং বাজারের প্রান্তিক আয়

আমরা চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতার মাধ্যমে প্রান্তিক আয় এবং দামের মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পর্কটি পাই—

$$MR = P\left(1 - \frac{1}{e}\right)$$

P = দ্রব্যের দাম

e = চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

সেক্ষেত্রে দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের অন্যতম শর্তটি দাঁড়াবে—

$$P_1\left(1 - \frac{1}{e}\right) = P_2\left(1 - \frac{1}{e_2}\right)$$

P_1 = ১নং বাজারে দ্রব্যের দাম

P_2 = ২নং বাজারে দ্রব্যের দাম

e_1 = ১নং বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

e_2 = ২নং বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা

১নং দৃষ্টান্ত ঃ মনে করি $e_1 = e_2$

সেক্ষেত্রে ১নং সমীকরণ থেকে পাই,

$$\left(P_1 \frac{1}{e^2}\right) = P_2\left(1 - \frac{1}{e_1}\right)$$

or, $P_1 = P_2$

অর্থাৎ এক্ষেত্রে দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হবে না।

২নং দৃষ্টান্ত ঃ মনে করি $e_1 > e_2$

সেক্ষেত্রে $\frac{1}{e_1} < \frac{1}{e_2}$

or, $\left(1 - \frac{1}{e_1}\right) > \left(1 - \frac{1}{e_2}\right)$

∴ ১নং সমীকরণ থেকে পাই,

$P_1 < P_2$

অর্থাৎ যে বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বেশি সেই বাজারে দ্রব্যের দাম কম হবে।

অতএব দাম পৃথকীকরণ তখনই লাভজনক হবে যখন বিভিন্ন বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা পৃথক হবে।

অধ্যাপক স্টিগ্লার (Stigler) বলেন যে, নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ হ'লেই দাম পৃথকীকরণ লাভজনক হবে—

(i) দ্রব্যটির চাহিদা বিভিন্ন বাজারের মধ্যে বিভক্ত করা যাবে; (ii) বিভিন্ন বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হবে; (iii) বিভিন্ন বাজারকে পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার ব্যয় চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্যের চেয়ে অধিক নয়। এর মধ্যেই দ্বিতীয় শর্তটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৫৫.৬.৫ দাম পৃথকীকরণ ও সামাজিক কল্যাণ

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দাম পৃথকীকরণ কাম্য বলে বিবেচিত হয়—

(i) অনেক ক্ষেত্রে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে দাম পৃথকীকরণ করা সম্ভব না হ'লে হয়ত দ্রব্যটির উৎপাদন আদৌ সম্ভব হবে না। দাম পৃথকীকরণ করা হলে একশ্রেণীর ক্রেতার নিকট থেকে বেশি দাম ও অন্য আরেক শ্রেণীর নিকট থেকে একই দ্রব্যের জন্য কম দাম আদায় করা হয়। কেবলমাত্র কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হ'লে উৎপাদন ব্যয় মেটান যায় না। আবার শুধুমাত্র বেশি দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হ'লে বাজারে দ্রব্যটির খুব চাহিদা থাকবে না এবং উৎপাদন লাভজনক হবে না। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দাম আদায় করা হ'লে কোন কোন ক্ষেত্রে লোকসান হ'লে অন্য ক্ষেত্রগুলি থেকে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে যাতে সামগ্রিকভাবে ব্যয় সংকুলান হয়ে যায়। যেমন, রেলপথ বিভিন্ন শ্রেণীর যাত্রী ও বিভিন্ন প্রকারে দ্রব্যের মধ্যে ভাড়ার তারতম্য ঘটিয়ে সেবাকার্যটিকে লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত করতে পারে। এই তারতম্যের ব্যবস্থা না থাকলে রেলপথ পরিচালনায় লোকসান দেখা দিত।

(ii) যদি কোন চিকিৎসক দরিদ্র রোগীদের নিকট থেকে অল্প ফি এবং ধনী রোগীদের নিকট থেকে বেশি ফি আদায় করেন, তা হলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা উপকৃত হবে। এটা সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য, কারণ ধনী ব্যক্তিদের অধিক ফি দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে, কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদের এই ক্ষমতা নেই।

(iii) দাম পৃথকীকরণের ফলে দরিদ্রশ্রেণীর লোকেরা কিভাবে লাভবান হয় তার আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রেলের ভাড়া যদি সকল যাত্রীর ক্ষেত্রে কই হতো বর্তমান দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া থেকে তা অনেক বেশি হতো এবং প্রথম শ্রেণী ও বাতানুকুল শ্রেণীর ভাড়া থেকে তা অনেক কম হতো; কারণ প্রদত্ত সেবার মোট ব্যয়ভার সকল যাত্রীকে সমানভাবে বহন করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীরা অনেক বেশি ভাড়া দেয় বলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা কম ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারে।

(iv) অনেক সময় একটিমাত্র দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হ'লে দ্রব্যটির যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তার চেয়ে দাম পৃথকীকরণের আওতায় দ্রব্যের উৎপাদন বেশি হয়। এখন দ্রব্যটির উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন ব্যয়ের প্রয়োগ ঘটে তা হ'লে একচেটিয়া কারবারী দাম পৃথকীকরণের আশ্রয় নিয়ে সমাজের কল্যাণসাধন করতে পারে। দাম পৃথকীকরণের কয়েকটি কুফলের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—

(i) পৃথকীকরণ করা হ'লে একচেটিয়া কারবারী ভোগকারীদের নিকট থেকে যতদূর সম্ভব আদায় করে নেয় এবং ভোগকারীদের প্রকারান্তরে শোধন করে।

(ii) একচেটিয়া কারবারে উৎপাদনের উপাদানগুলির অকাম্য বণ্টন ঘটে এবং দাম পৃথকীকরণ করা হ'লে এই অকাম্য বণ্টনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়।

(iii) দেশীয় বাজারে দ্রব্যটি বেশি দামে বিক্রি করে বিদেশের বাজারে যদি দ্রব্যটি কম দামে বিক্রি করা হয় তবে দেশীয় বাজারের ক্রেতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫৫.৭ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য এবং একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের মধ্যে তুলনা

(i) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের এবং একচেটিয়া কারবারীর—উভয়েরই উদ্দেশ্য হ'ল সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করা। উভয় ক্ষেত্রেই সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম যেহেতু একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্যটি যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে; তাই তারা প্রান্তিক আয় এবং দাম (= গড় আয়) সর্বদা পরস্পর সমান হয়, তাই ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় যখন পরস্পর সমান হয়। তখন দাম এবং প্রান্তিক ব্যয়ও পরস্পর সমান হবে।

[ভারসাম্যের শর্ত : $MR = MC$
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে $P\ (AR) = MR$
$\therefore$ ভারসাম্য অবস্থায়, $P = MC$]

একচেটিয়া কারবারীর দাম = গড় আয় [$P = AR$] এবং প্রান্তিক আয় (MR)—উভয় রেখাই ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয় এবং প্রান্তিক আয় সর্বদাই দাম অপেক্ষা কম হয়। তাই ভারসাম্য অবস্থায় যখন প্রান্তিক আয় এবং প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়, তখন দাম অবশ্যই প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে।

[ভারসাম্যের শর্ত : $MR = MC$
পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক ফার্মের ক্ষেত্রে $P\ (AR) > MR$
$\therefore$ ভারসাম্য অবস্থায়, $P > MC$]

(ii) প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয় হ'ল একটি ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত। কিন্তু এই শর্তটি যথেষ্ট নয়। অতিরিক্ত আর একটি শর্তের প্রয়োজন। সেই শর্তটি হ'ল; ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা অবশ্যই কম হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা অবশ্যই কম হবে। অন্যভাবে বলা যায়, ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা প্রান্তিক আয়রেখাকে অবশ্যই ভেতর থেকে বা নিচের দিক থেকে ছেদ করবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয়রেখা হ'ল আনুভূমিক অর্থাৎ প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল হ'ল শূন্য। সেক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা তখনই কম হবে যখন প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল ধনাত্মক হবে। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে।

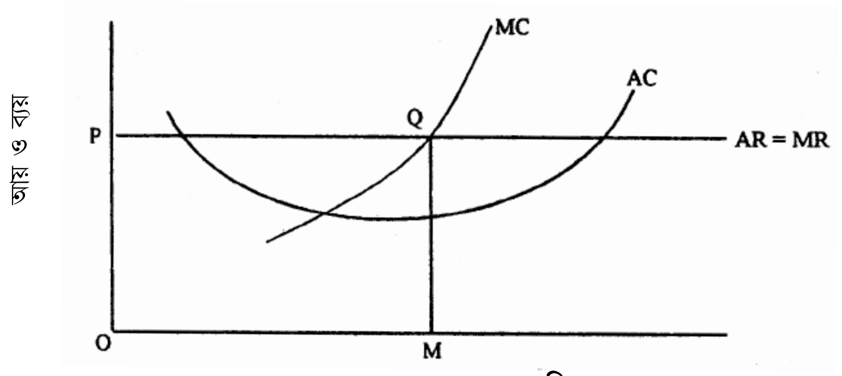

৫৫.৯ নং চিত্র

উপরের চিত্রে Q বিন্দুতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফর্মের ভারসাম্য হবে। কারণ ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয়রেখা প্রান্তিক আয়রেখাকে ভেতর থেকে ছেদ করেছে।

একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে প্রান্তিক আয়রেখা হল ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন। এক্ষেত্রে ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী, আনুভূমিক, এমনকি নিম্নগামী হলেও প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হতে পারে।

১নং দৃষ্টান্ত ঃ ঊর্ধ্বগামী প্রান্তিক ব্যয়রেখা (ক্রমবর্ধমান ব্যয়)—

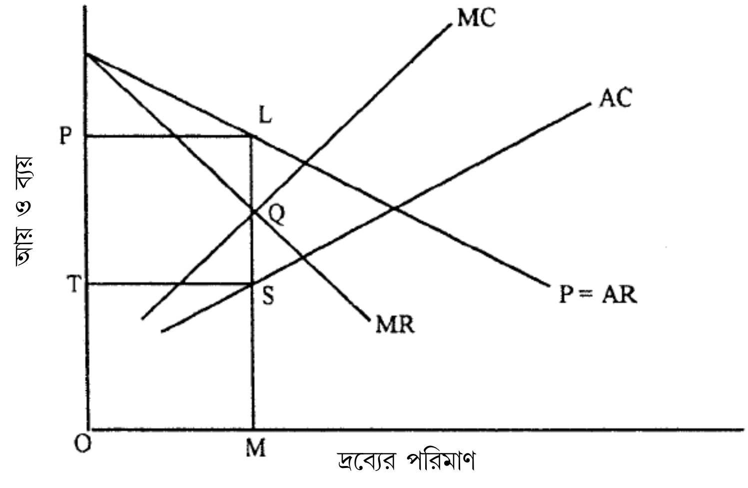

উপরের চিত্রে আমরা ধরে নিয়েছি যে, গড় এবং প্রান্তিক আয় এবং ব্যয়রেখাগুলি সব সরলরেখা। Q বিন্দুতে MR রেখা এবং MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে, ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল ঋণাত্মক। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল ধনাত্মক। অতএব প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল কম। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর Q বিন্দুতে ভারসাম্য হবে। দ্রব্যের পরিমাণ হবে OM, দাম হবে OP; মোট আয় হবে OMLP, মোট ব্যয় OMST এবং মোট স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে TSLP।

২নং দৃষ্টান্ত ঃ প্রান্তিক ব্যয়রেখা আনুভূমিক (সমব্যয়)

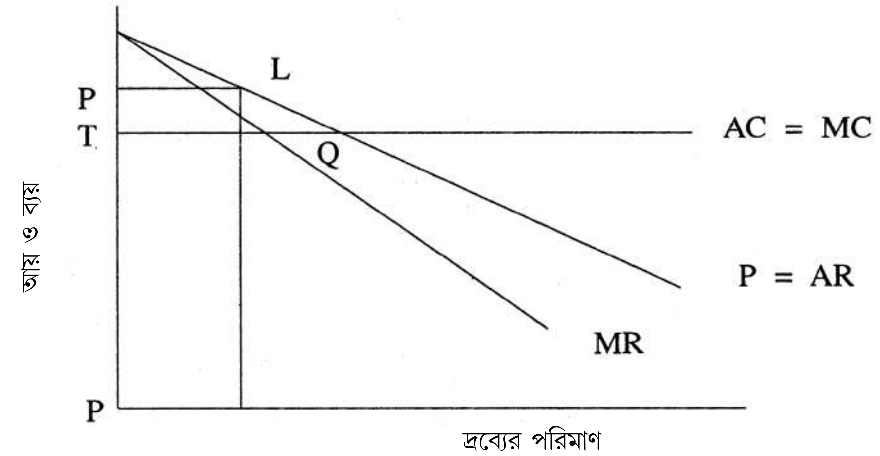

৫৫.১১ নং চিত্র

উপরের চিত্রে Q বিন্দুতে MR রেখা এবং MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। Q বিন্দুতে MR রেখার ঢাল ঋণাত্মক কিন্তু MC রেখার ঢাল শূন্য। অতএব MC রেখার ঢাল অপেক্ষা MC রেখার ঢাল কম। এবং ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি এখানে খাটছে। Q বিন্দু অনুযায়ী একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন করবে। এবং ML = OP দামে তা বাজারে বিক্রি করবে। মোট আয় হবে OMLP এবং মোট ব্যয় হবে OMQT। অতএব মোট স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে TQLP।

৩নং দৃষ্টান্ত ঃ ক্রমহ্রাসমান ব্যয় (প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নগামী, কিন্তু প্রান্তিক ব্যয়রেখা প্রান্তিক আয়রেখাকে ভেতর দিক থেকে ছেদ করে)—

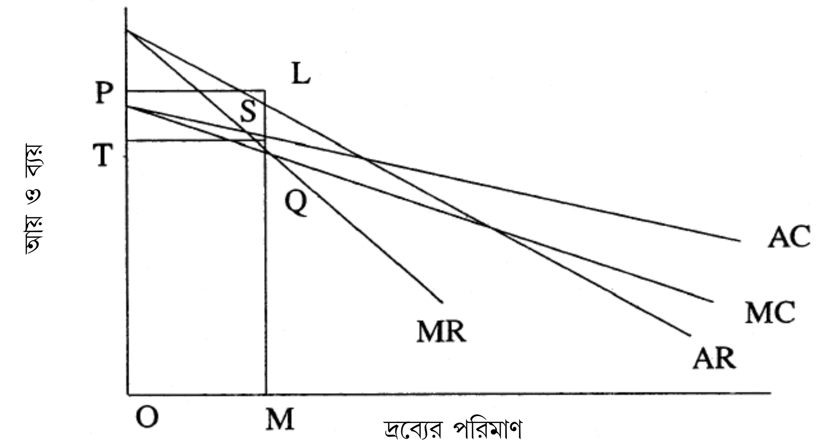

৫৫.১২ নং চিত্র

উপরের চিত্রে Q বিন্দুতে MC রেখা এবং ME রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দুতে উভয় রেখার ঢাল ঋণাত্মক। কিন্তু MC রেখার তুলনায় MR রেখা অধিকতর খাড়া। অর্থাৎ MC রেখার ঢাল অপেক্ষা MR রেখার ঢাল কম (অধিকতর ঋণাত্মক) ফলে Q বিন্দুতে ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি খাটছে। Q বিন্দু অনুযায়ী একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন করবে। মোট আয় হবে OMLP এবং মোট ব্যয় হবে OMST। অতএব মোট স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হবে TSLP।

৪নং দৃষ্টান্ত ঃ ক্রমহ্রাসমান ব্যয় (নিম্নগামী MC রেখা কিন্তু MC রেখা MR রেখাকে উপর থেকে বা বাইরের দিক থেকে ছেদ করে)—

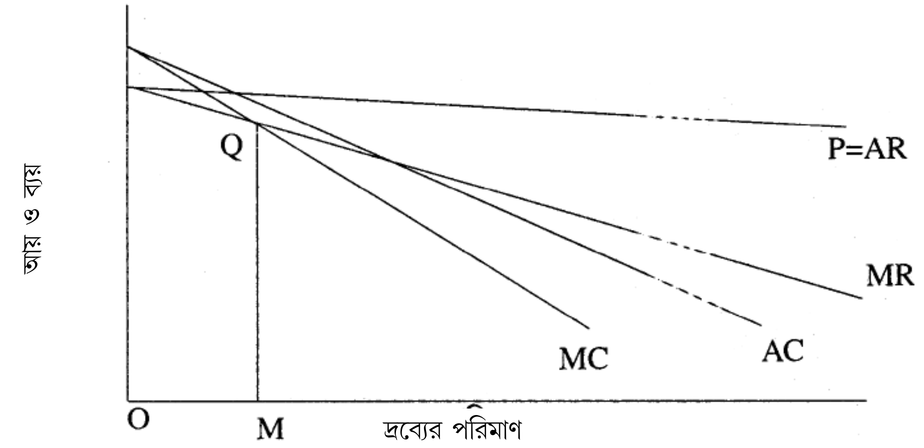

৫৫.১৩ নং চিত্র

উপরের চিত্রে Q বিন্দুতে MR রেখা ও MC রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। এই বিন্দুতে উভয় রেখার ঢাল ঋণাত্মক কিন্তু MR রেখা অপেক্ষা MC রেখা অধিকতর খাড়া অতএব MC রেখার ঢাল অপেক্ষা MR রেখার ঢাল বেশি। এক্ষেত্রে ভারসাম্যের দ্বিতীয় শর্তটি খাটছে না। দ্রব্যটি OM পরিমাণ উৎপাদন করার পর একচেটিয়া কারবারী যদি অতিরিক্ত এক একক উৎপাদন ও বিক্রি করে তবে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় বেশি হয় অর্থাৎ একচেটিয়া কারবারীর মোট মুনাফা বেড়ে যায়। এ অবস্থায় সে ক্রমাগত উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে চলবে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর কোন ভারসাম্য হবে না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম কেবলমাত্র তখনই ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছতে পারে যখন প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। একচেটিয়া কারবারী ক্ষেত্র প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী, আনুভূমিক এমনকি নিম্নগামী হলেও ভারসাম্য হতে কোন বাধা নেই। কেবলমাত্র একটি ক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য হবে না, সেই ক্ষেত্রটি হল ঃ প্রান্তিক ব্যয়রেখা নিম্নগামী এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা প্রান্তিক আয়রেখাকে বাইরে দিক থেকে ছেদ করে।

(iii) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। দীর্ঘকালে ফার্মগুলির অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের ফলে এইরূপ ঘটে থাকে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয় পরিস্থিতিতেই স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা বজায় থাকতে পারে, কারণ একচেটিয়া বাজারে নতুন কোন ফার্ম স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল কোন অবস্থাতেই বাজারে প্রবেশ করতে পারে না।

তবে একথা বলার অর্থ এই নয় যে, একচেটিয়া কারবারী সর্বদাই স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফ অর্জন করবে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। নিচের চিত্রে স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য এবং একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য দেখানো হল—

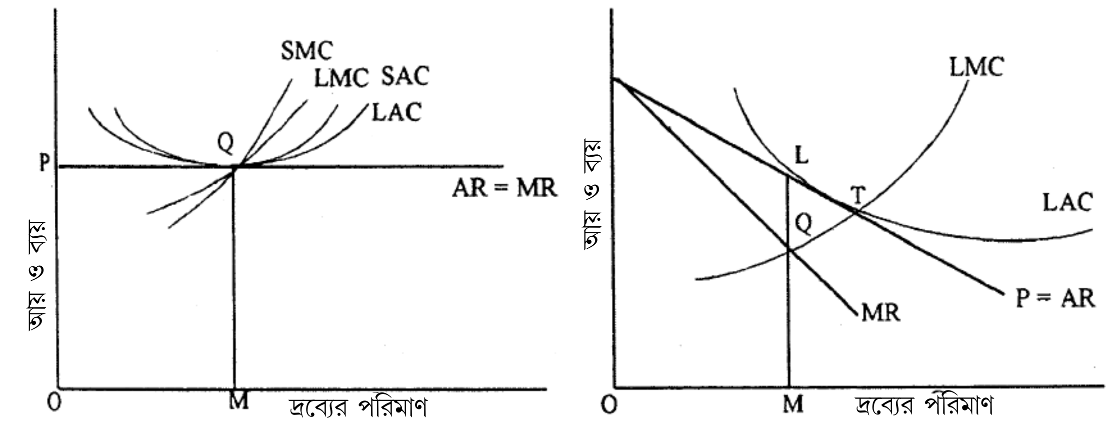

(ক) (খ)

৫৫.১৪ নং চিত্র

'ক' চিত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য দেখান হয়েছে। 'খ' চিত্রে একচেটিয়া কারবারীর স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থায় কি রূপে ভারসাম্য হয় তা দেখান হয়েছে। (খ) চিত্রে Q বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে ভেতর দিক থেকে ছেদ করেছে। তাই Q বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি যদি OM পরিমাণ উৎপাদন করা যায় এবং MC দামে তা বিক্রি করা হয় তবে একচেটিয়া কারবারীর মুনাফা সর্বাধিক হবে কিন্তু এখানে OM পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করা হ'লে দাম এবং গড় ব্যয় পরস্পর সমান হয়। L বিন্দুতে AR রেখা এবং LAC রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করে। এক্ষেত্রে একচেটিয়া কারবারীর কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা দেখা দেবে। তবে স্বাভাবিক মুনাফা হলেও পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থায় যেমন গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু উৎপাদন করে, একচেটিয়া কারবারীর ক্ষেত্রে তা হবে না। L বিন্দু গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর (T বিন্দুর) বাঁ দিকে অবস্থিত।

৫৫.৮ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম ও দ্রব্যের পরিমাণ এবং একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম ও পরিমাণ

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি দ্রব্যের বাজার চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যটির ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ এক যোগে নির্ধারিত হয়। যে বিন্দুতে দ্রব্যটির সামগ্রিক চাহিদা রেখা এবং সামগ্রিক যোগানরেখা পরস্পরকে ছেদ করে সেই বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটির বাজার দাম নির্ধারিত হয় এবং ঐ শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক বিক্রেতা ঐ নির্দিষ্ট দাম মেনে নিয়ে দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করে, যাতে তার মুনাফা সর্বাধিক হয়।

চিত্র D রেখা এবং S রেখা হ'ল পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সমগ্র শিল্পের যথাক্রমে চাহিদারেখা এবং যোগানরেখা। এই রেখা দুটি P বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করেছে। অতএব দ্রব্যের ভারসাম্য দাম হবে PM এবং দ্রব্যটি ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ হবে OM.

এখন ধরা যাক, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠান জোট গঠন করল। কিন্তু আমরা ধরে নিচ্ছি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পটি এভাবে একচেটিয়া কারবারে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও দ্রব্যটির চাহিদার অবস্থা এবং উৎপাদন ব্যয়ের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না।

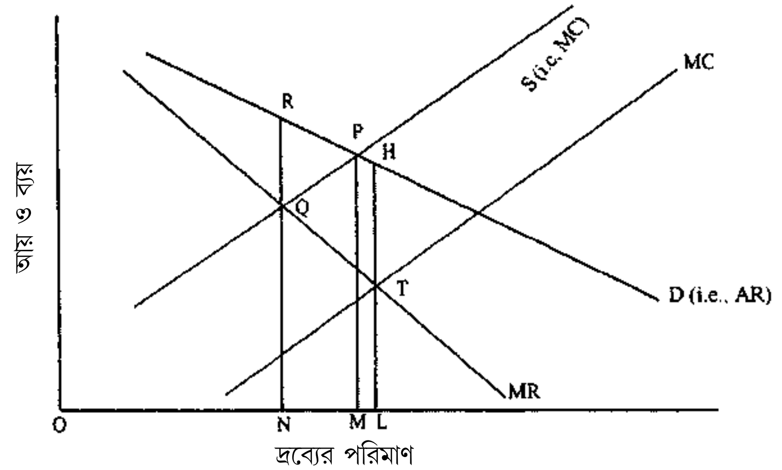

৫৫.১৫ নং চিত্র

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পটি যখন একচেটিয়া কারবারে রূপান্তরিত হ'ল তখন পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের চাহিদারেখাই হবে একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় (AR)-রেখা। এই AR রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রান্তিক আয় (MR) রেখা পাওয়া যাবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে রেখাটি শিল্পের সামগ্রিক যোগানরেখা ছিল তাই এখন একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয়রেখা (MC) হয়ে পড়বে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোন একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের যোগানরেখা হ'ল প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়রেখার সে অংশ যা তার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর উপরিভাগে অবস্থিত। শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক ব্যয়রেখার এই অংশকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলেই শিল্পের যোগানরেখা পাওয়া যায়। একচেটিয়া বাজারে প্রান্তিক ব্যয়রেখা যে বিন্দুতে প্রান্তিক আয়রেখাকে নিচের দিক থেকে বা ভিতর থেকে ছেদ করে সেই বিন্দুতেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্য হয়। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী দ্রব্যটি কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে তা স্থির করা হয় এবং বাজারে দ্রব্যটি কি দামে বিক্রয় করা হবে তা একচেটিয়া কারবারীর গড় আয়রেখা থেকে জানা যায়। চিত্রে Q বিন্দুতে MC রেখা MR রেখাকে ভেতর থেকে ছেদ করেছে। অতএব Q বিন্দু অনুযায়ী একচেটিয়া বাজারে এখন দ্রব্যটি ON পরিমাণ বিক্রয় করা হয় এবং দ্রব্যের দাম হয় RN। যেহেতু OM বড়, তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম যা হবে তার তুলনায় একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম বেশি হবে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যটি যে পরিমাণ বিক্রয় করা হয় একচেটিয়া বাজারে তার তুলনায় দ্রব্যটি কম পরিমাণে বিক্রয় করা হবে।

উপরের আলোচনায় আমরা ধরে নিয়েছি যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক শিল্পের অন্তর্গত প্রতিষ্ঠানগুলি যখন একটি একচেটিয়া, জোটে সংঘবদ্ধ হয় তখন উৎপাদন ব্যয়ের অবস্থার কোন রকম পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু অনেক সময়েই একচেটিয়া জোট সৃষ্টি হওয়ায় উৎপাদন ও অন্যান্য দিক থেকে নানারকম সুবিধা পাওয়া যায়। এর ফলে নানারকম ব্যয়সংকোচ ঘটে অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যা উৎপাদন ব্যয় তার তুলনায় এখন উৎপাদন ব্যয় কম হবে ধরা যাক, উৎপাদন ব্যয় কমে যাওয়ার ফলে প্রান্তিক ব্যয়রেখা, MC রেখা থেকে সরে গিয়ে MC' রেখা হ'ল। সেক্ষেত্রে নতুন ভারসাম্য বিন্দু হবে T বিন্দু। একচেটিয়া কারবারী এখন, দ্রব্যটি এই T বিন্দু অনুযায়ী OL পরিমাণ উৎপাদন করবে এবং দ্রব্যের দাম হবে HL। PM অপেক্ষা HL ছোট এবং OM অপেক্ষা OL বড়। এক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনায় একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম কম হবে এবং দ্রব্যের পরিমাণ বেশি হবে।

৫৫.৯ সারাংশ

যে বাজারে একটি দ্রব্যের একজনমাত্র বিক্রেতা থাকে এবং দ্রব্যটির কোন পরিবর্ত দ্রব্য থাকে সেই বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে। এই বাজারে নতুন কোন ফার্মের প্রবেশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ। একচেটিয়া বাজারের উদ্ভবের পিছনে প্রধানত চারটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। (i) একটি মাত্র ফার্মের যখন কাঁচামালের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে; (ii) বিদ্যুৎ ও গ্যাসে উৎপাদন, রেল পরিবহন প্রভৃতি জনস্বার্থ সম্পর্কিত শিল্পের ক্ষেত্রে যখন কোন প্রতিষ্ঠান ব্যয়সংকোচের সুযোগ গ্রহণ করে; (iii) সরকার নিজে যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন ও বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে অথবা বেসরকারী কোন প্রতিষ্ঠানকে এই দায়িত্ব নিতে বলে এবং (iv) নতুন কোন দ্রব্য বা উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কার করে কোন প্রতিষ্ঠান তার পেটেন্ট নিয়ে নেয়।

একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে অবশ্যই তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়। এই কারণে যে অনুপাতে দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে বিক্রেতার মোট আয় তার তুলনায় কম অনুপাতে বাড়ে। মোট আয়রেখা আনুভূমিক অক্ষের দিকে অবতল হয়। গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা—উভয় রেখাই বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী অর্থাৎ ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয় এবং প্রান্তিক আয়রেখা গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করে।

সর্বাধিক মুনাফা অর্জনকারী একচেটিয়া দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণে উৎপাদন ও বিক্রি করবে যেখানে (i) প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হবে এবং (ii) প্রান্তিক ব্যয়রেখা প্রান্তিক আয়রেখাকে নিচ দিক থেকে বা ভিতর থেকে ছেদ করবে। দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হওয়ার পর ঐ পরিমাণ দ্রব্য কি দামে বিক্রি করা যাবে তা বিক্রেতার গড় আয়রেখা থেকে জানা যাবে।

একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক ব্যয় যদি ধনাত্মক হয় (সাধারণত এরূপই ঘটে, কারণ কোন দ্রব্য আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে উৎপাদন করতে গেলে উৎপাদকের মোট ব্যয় বেড়ে যায়), তবে কেবলমাত্র স্থিতিস্থাপক চাহিদার ক্ষেত্রেই একচেটিয়া কারবারী ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছতে পারে। স্থিতিস্থাপক চাহিদা হ'লে (অর্থাৎ চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার সংখ্যাগত মান ১-এর চেয়ে বেশি হলে) একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয় ধনাত্মক হবে এবং তখনই ধনাত্মক প্রান্তিক ব্যয়ের সঙ্গে ধনাত্মক প্রান্তিক আয়ের সমতা বিধান করা সম্ভব হবে (একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল ঃ প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়) চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি ১-এর সমান হয় তাহলে প্রান্তিক আয় শূন্য হবে এবং চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা যদি ১-এর চেয়ে কম হয়, তবে প্রান্তিক আয় ঋণাত্মক হবে। কিন্তু প্রান্তিক আয় শূন্য বা ঋণাত্মক হলে এই প্রান্তিক আয়ের সঙ্গে ধনাত্মক প্রান্তিক ব্যয়ের সমতা আনা যায় না। ফলে এরূপ পরিস্থিতিতে একচেটিয়া কারবারীর কোন ভারসাম্য হতে পারে না, তবে ব্যয়হীন একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে (যেখানে প্রান্তিক ব্যয় শূন্য হয়), দ্রব্যটি ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদন করা হবে যেখানে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা ১-এর সমান হবে এবং প্রান্তিক আয় শূন্য হবে।

একচেটিয়া কারবারীর কোন যোগানরেখা থাকে না, কারণ বিভিন্ন চাহিদার অবস্থায় বিভিন্ন দামে দ্রব্যটি একই পরিমাণ অথবা একই দামে বিভিন্ন পরিমাণ বিক্রি করা হয় অর্থাৎ দাম ও দ্রব্যটির যোগানের পরিমাণের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট সম্পর্ক থাকে না।

একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঠিক সেই পরিমাণ উৎপাদনে যে স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়রেখাটি দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাটিকে স্পর্শ করে সেই স্বল্পকালীন গড় মোট

ব্যয়রেখা উৎপাদনের কাম্য মাত্রা নির্দেশ করে। এই দীর্ঘকালীন ভারসাম্য বিন্দুতে এই স্বল্পকালীন গড় মোট ব্যয়রেখাটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বল্পকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখাকে ছেদ করবে।

একচেটিয়া কারবারী যখন একই দ্রব্য বিভিন্ন ক্রেতার নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রি করতে পারে, তখন তাকে দাম পৃথকীকরণ বলে। দাম পৃথকীকরণ সাধারণত তিন প্রকারের হয় ঃ ব্যক্তিগত, স্থানগত ও ব্যবহারগত। একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে এই দাম পৃথকীকরণ করা তখনই সম্ভব হবে যখন দ্রব্যটি পুনর্বিক্রয় (resale) করা সম্ভব হয় না। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে এই দাম পৃথকীকরণ সম্ভব হয় ঃ (i) ভোগকারীর বিচিত্র মনোভাব; (ii) সেবামূলক কার্য যা পুনরায় বিক্রি করা যায় না এবং (iii) ভৌগোলিক ব্যবধান বা রাজনৈতিক সীমারেখার অস্তিত্ব।

দাম পৃথকীকরণ তখনই লাভজনক হয় যখন বিভিন্ন বাজারে দ্রব্যটির চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা বিভিন্ন হয়। যে বাজারে চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা অপেক্ষাকৃত বেশি সেই বাজারে দ্রব্যের দাম অপেক্ষাকৃত কম হবে। দাম স্বতন্ত্রকারী একচেটিয়া কারবারী যখন দুটি পৃথক বাজারে তার দ্রব্যটি বিক্রি করে তখন তারা ভারসাম্যের প্রয়োজনীয় শর্তটি হবে ঃ ১নং বাজারের প্রান্তিক আয় = ২নং বাজারের প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক ব্যয়। ভারসাম্যের দ্বিতীয় ক্রম বা পর্যাপ্ত শর্তটি হ'ল ঃ প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয়রেখার ঢাল প্রান্তিক ব্যয়রেখার ঢাল অপেক্ষা কম হবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য এবং একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের মধ্যে তুলনা করলে আমরা তিনটি পার্থক্য লক্ষ্য করি (i) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য অবস্থায় দাম ও প্রান্তিক ব্যয় পরস্পর সমান হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থায় দাম প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়। (ii) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য বিন্দুতে প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী, আনুভূমিক, এমন কি নিম্নগামীও হতে পারে। (iii) পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালেও স্বাভাবিক মুনাফা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের পরিমার অপেক্ষা একচেটিয়া বাজারে সাধারণত দ্রব্যের পরিমাণ কম হয় এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলকে বাজারে দ্রব্যের দাম অপেক্ষা একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম বেশি হয়। তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতার অন্তর্গত ফার্মগুলি জোটবন্ধ হয়ে যদি একচেটিয়া কারবার গড়ে তোলে তবে কখনও কখনও বৃহদায়তন উৎপাদনের ব্যয়সঙ্কোচের দরুন এমন হতে পারে যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার তুলনায় একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের পরিমাণ বেশি এবং দ্রব্যের দাম কম হয়।

৫৫.১০ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হয় কিরূপে? একচেটিয়া কারবারী কিভাবে তার দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যের পরিমাণ স্থির করবে?

২। (ক) মোট আয় ও মোট ব্যয়রেখার সাহায্যে এবং (খ) প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয়রেখার সাহায্যে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য বিশ্লেষণ করুন।

৩। একচেটিয়া কারবারী কিরূপে তার দ্রব্যের চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা বিচার করে দ্রব্যের দাম ধার্য করবে? চাহিদার দাম-স্থিতিস্থাপকতা এককের সমান—এ অবস্থায় সে কি কখনও ভারসাম্যে পৌঁছতে পারবে?

৪। একচেটিয়া উৎপাদকের লাভের অঙ্ক সর্বোচ্চ করার অবস্থাটি বর্ণনা করুন। এই প্রকার উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন সময়ে কেন লাভ সংগৃহীত হতে পারে আলোচনা করুন।

৫। দাম পৃথকীকরণ বলতে কি বোঝায়? কখন এটা সম্ভব হয়? দাম-পৃথকীকরণে লিপ্ত রয়েছে এমন একটি ফার্মের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করুন।

৬। কখন একচেটিয়া কারবারী তার দ্রব্যের জন্য পৃথক দাম ধার্য করতে পারে? এই পৃথক পৃথক দাম ধার্য করা কখন তার পক্ষে লাভজনক হবে? এটা কি সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য বলে বিবেচিত হতে পারে?

৭। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্যের সঙ্গে একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্যের তুলনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়া কারবারীর মোট আয়, গড় আয় এবং প্রান্তিক আয়রেখার আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

২। একচেটিয়া কারবারীর কোন যোগানরেখা থাকে না কেন? ব্যাখ্যা করুন।

৩। একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের অবস্থাটি বর্ণনা করুন।

৪। একচেটিয়া অবস্থায় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোন ফার্ম যে স্তরে উৎপাদনের অস্থিতিস্থাপক চাহিদা, সেই স্তরে কি উৎপাদন করতে ইচ্ছুক হবে উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৫। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা অভিন্ন হয় এবং ঐ রেখাটি আনুভূমিক হয়, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা পৃথক এবং রেখা দুটি নিম্নগামী হয় কেন? দৃষ্টান্ত সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

৬। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়রেখা অবশ্যই ঊর্ধ্বগামী হবে, কিন্তু একচেটিয়া কারবারীর ভারসাম্য অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয়রেখা ঊর্ধ্বগামী, আনুভূমিক, এমন কি নিম্নগামীও হতে পারে। ব্যাখ্যা করুন।

৭। এটা কি স্বভাবতই সত্য যে, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের তুলনায় একচেটিয়া বাজারে দ্রব্যের দাম বেশি এবং দ্রব্যের পরিমাণ কম হয়? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের সঙ্গে একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের তুলনা করুন।

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়া কারবারীর গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখার আকৃতি কিরূপ হবে?

২। একচেটিয়া কারবারী কি স্বাভাবিক মুনাফার অবস্থায় গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে?

৩। অস্থিতিস্থাপক চাহিদার অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর কি ভারসাম্য হতে পারে?

৪। একক স্থিতিস্থাপক চাহিদার অবস্থায় একচেটিয়া কারবারী কি ভারসাম্যে উপনীত হতে পারে?

৫। দীর্ঘকালীন অবস্থায় কি একচেটিয়া কারবারীর স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করা সম্ভব?

৬। নিম্নমুখী প্রান্তিক ব্যয়ের অবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর কি ভারসাম্য সম্ভব?

৭। প্রান্তিক ব্যয়রেখা আনুভূমিক হলে একচেটিয়া উৎপাদকের কি ভারসাম্য সম্ভব?

৮। একচেটিয়া কারবারী স্বল্পকালে কোন মুনাফা অর্জন করতে পারল না, এটা কি সম্ভব?

৯। একচেটিয়া কারবারে দাম প্রান্তিক আয় অপেক্ষা বেশি হয় কেন?

১০। একচেটিয়া কারবারীর দাম পৃথকীকরণ কাকে বলে?

১১। একচেটিয়া দাম সাধারণত প্রতিযোগিতার দামের তুলনায় কি বেশি হয়?

১২। একচেটিয়া উৎপাদন কি প্রতিযোগিতার উৎপাদনের তুলনায় কম হয়?

১৩। একচেটিয়া কারবারীর দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের শর্ত কি?

১৪। দাম পৃথকীকরণ নীতির সাফল্যের মূল শর্ত কি?

১৫। দাম পৃথকীকরণ কখন লাভজনক হয়?

১৬। এমন একটি দৃষ্টান্ত দিন যেখানে দাম পৃথকীকরণ সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে কাম্য বলে বিবেচিত হয়।

১৭। দুটি বাজারে একই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন দামে বিক্রি করা সম্ভব বলে বিক্রেতার ভারসাম্যের শর্ত কি?

একক ৫৬ ◆ একচেটিয়া প্রতিযোগিতা

গঠন

৫৬.০ উদ্দেশ্য

৫৬.১ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্য

৫৬.২ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্যপৃথকীকরণের গুরুত্ব

৫৬.৩ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৫৬.৪ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা

৫৬.৫ সারাংশ

৫৬.৬ অনুশীলনী

৫৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের বৈশিষ্ট্য কি কি
- একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্য পৃথকীকরণের গুরুত্ব কি রকম
- একচেটিয়ামূলক বাজারে ফার্মের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা
- একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৫৬.১ একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্য

বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। যা দেখা যায়, তা হ'ল প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবার—এই দুই-এর সংমিশ্রণ। একেই একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বলা হয়। অধ্যাপক চেম্বারলিন (Chamberlin) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এ ধরনের বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'ল ঃ

(১) এ ধরনের বাজারে বহু সংখ্যক উৎপাদক বা বিক্রেতা থাকে। তবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যত বেশি হয়, এ ধরনের বাজারে ততটা হয় না।

(২) বহু সংখ্যক বিক্রেতা থাকলেও, বিক্রেতারা কিন্তু সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে না। পৃথকীকৃত কিন্তু ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য নিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। ট্রেড মার্ক, প্যাকিং, রং, গন্ধ, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদির পার্থক্যর দরুন বিভিন্ন বিক্রেতা যে দ্রব্যগুলি বিক্রি করে, তা একটি থেকে অপরটি সামান্য পৃথক হতে বাধ্য। তবে এই দ্রব্যগুলি পৃথক এবং স্বতন্ত্র হলেও এরা কিন্তু পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বিকল্প হিসাবে গণ্য হয়।

(৩) প্রত্যেক বিক্রেতা যেহেতু সামান্য পৃথকীকরণ দ্রব্য বিক্রি করে, সেইজন্য প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্রেতা নিয়ে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে একচেটিয়া কারবারীর মতো সুবিধা ভোগ করে। প্রত্যেক বিক্রেতার

দ্রব্যই কিছু সংখ্যক ক্রেতা কোন না কোন কারণে পছন্দ করে এবং ঐ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় তার দাম একটু বাড়লেও দ্রব্যটি ক্রয় করা একেবারে বন্ধ করে না। সুতরাং অল্প পরিমাণ ক্রেতা নিয়ে প্রত্যেকেরই ছোটখাট এক একটি একচেটিয়া বাজার গড়ে ওঠে। কিন্তু এটি পূর্ণ একচেটিয়া বাজার নয়, কারণ প্রত্যেকটি দ্রব্যই ঐ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যের অতি ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য। এবং দীর্ঘকালে যে কোন নতুন প্রতিষ্ঠান ঐ জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন শুরু করতে পারে। বাস্তবে বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের তুলনায় এই বাজারে প্রতিযোগিতার তীব্রতা মোটেই কম নয়। বাজারে কিছুটা একচেটিয়া অবস্থা আছে আবার তীব্র প্রতিযোগিতাও চলছে—এ কারণে এরূপ বাজারের নাম হয়েছে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার।

(৪) পণ্য ভেদের দরুন এ ক্ষেত্রে শিল্পের ধারণাটি প্রয়োগ করা যায় না। বরং পরস্পরের নিকটবর্তী বা কাছাকাছি বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদকদের নিয়ে উৎপাদক গোষ্ঠীর (Group) ধারণা এখানে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। সেজন্য এই বাজারে দীর্ঘকালীন অবস্থার যে ভারসাম্য ঘটে তা হ'ল প্রকৃতপক্ষে গোষ্ঠী ভারসাম্য (Group equilibrium), শিল্পে ভারসাম্য নয়। এক গোষ্ঠীভুক্ত ফার্মগুলির পণ্য অন্য গোষ্ঠীভুক্ত ফার্মগুলির পণ্যের তুলনায় অধিকতর সমজাতীয়। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দ্রব্যগুলির চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশি। বিভিন্ন গোষ্ঠীভুক্ত পণ্যগুলির চাহিদার পারস্পরিক স্থিতিস্থাপকতা খুব কম।

(৫) বাজার দখলের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতাকে বিপুল পরিমাণে প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় করতে হয়। একে এক কথায় বিক্রয় খরচ (Selling cost) বলে। এই বিক্রয় খরচ অনেক সময় উৎপাদন খরচের বেশি হয়। প্রচার অভিযান, ছাড় দেওয়া, উপহার দেওয়া বা উপহার কুপন বিলি করা ইত্যাদি বাবদ সকল খরচ বিক্রয় খরচের অন্তর্গত।

(৬) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে বিক্রেতারা কেবলমাত্র দাম নিয়েই প্রতিযোগিতা করে না, কারণ প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু একচেটিয়া অধিকার থাকায় দ্রব্যের দাম কমিয়ে অন্যান্য বিক্রেতাদের নিকট থেকে ক্রেতাদের সম্পূর্ণ রূপে টেনে আনা যায় না। এরূপ অবস্থায় দামহীন প্রতিযোগিতা চলতে পারে। বিজ্ঞাপনের উপর ব্যয়, ক্রেতাদের উপহার বিতরণ, দ্রব্যের সামান্য গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে এরূপ দামহীন প্রতিযোগিতা চলতে পারে।

(৭) এ ধরনের বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা একচেটিয়া অধিকার ভোগ করায় কোন বিক্রেতা যদি দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে বিক্রি করতে চায়, তবে তাকে দাম কমাতে হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক বিক্রেতার দাম = গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন হয় এবং প্রান্তিক আয়রেখা গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করে।

৫৬.২ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে দ্রব্য পৃথকীকরণের গুরুত্ব ঃ

যখন বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা সামান্য পৃথকীকৃত কিন্তু পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রি করে, তখনই "দ্রব্য পৃথকীকরণ" দেখা দেয়। একই গোষ্ঠীভুক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে যখন পার্থক্য করার মতো কোন না কোন কারণ ঘটে, তখন ঐ দ্রব্যগুলি আর সমজাতীয় থাকে না, বিভিন্ন জাতীয় হয়ে পড়ে। কখনও এই পার্থক্য প্রকৃত পার্থক্য হিসাবে দেখা দেয়। আবার কখনও এই পার্থক্য কাল্পনিক পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায়। যখন বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে, অর্থাৎ ক্রেতাদের একটি বিশেষ প্রয়োজন একজন বিক্রেতার দ্রব্যটি যত ভালোভাবে মেটাতে পারে অপর বিক্রেতাদের ঐ জাতীয় দ্রব্যগুলি যদি ততটা ভালোভাবে মেটাতে

না পারে, তা হলেও দ্রব্যের প্রকৃত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন হতে পারে যে, আসলে বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রকৃত কোন পার্থক্য নেই, কিন্তু দ্রব্যের রং, গন্ধ, প্যাকিং, ট্রেড মার্ক ইত্যাদির পার্থক্য ঘটিয়ে এবং বিজ্ঞাপন ও প্রচার অভিযানের তারতম্যের দ্বারা বিভিন্ন বিক্রেতার দ্রব্যগুলির মধ্যে একটি কাল্পনিক পার্থক্যের সৃষ্টি করা হয়।

এই জাতীয় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে প্রত্যেক বিক্রেতা ঐ জাতীয় অন্যান্য দ্রব্যগুলির তুলনায় তার দ্রব্যটিকে ক্রেতাদের নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় করে তুলতে সচেষ্ট হয়। একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিক্রেতা যে দ্রব্যগুলি বিক্রি করে, তার একটি অপরটির সম্পূর্ণ পরিবর্ত দ্রব্য না হলেও এরা পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য।

এই দ্রব্য পৃথকীকরণের দরুণই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থেকে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার পৃথক হয়ে পড়ে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ন্যায় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারেও বহু সংখ্যক ক্রেতা এবং বিক্রেতা থাকে। এবং দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্ম অবাধে ঐ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করা শুরু করতে পারে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা যেখানে সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে (অর্থাৎ বিভিন্ন বিক্রেতা যে দ্রব্যগুলি বিক্রি করে তাদের মধ্যে কাল্পনিক বা প্রকৃত পার্থক্য থাকে না।) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে সেখানে বিভিন্ন বিক্রেতা পৃথকীকৃত কিন্তু পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রি করে। প্রত্যেক বিক্রেতা যেহেতু একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে, তাই প্রত্যেক বিক্রেতারই দাম = গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়— নতুন ক্রেতাকে আকর্ষণ করতে হ'লে প্রত্যেক বিক্রেতাকে তার দ্রব্যের দাম কমাতে হয়।

৫৬.৩ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে, বহুসংখ্যক ফার্ম পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। আবার, প্রত্যেক ফার্ম এমন একটি দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রি করে, যা অন্য কোন ফার্ম উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারে না। অর্থাৎ বিভিন্ন ফার্মগুলি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ফার্মগুলির ন্যায় সমজাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে না, বিভিন্ন জাতীয় দ্রব্য বিক্রি করে। ফলে প্রতিটি ফার্মই একটি ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে কিছুটা একচেটিয়া ক্ষমতা ভোগ করে। এই কারণে, প্রতিটি ফার্মের দাম = গড় আয়রেখা, একচেটিয়া কারবারীর দাম = গড় আয়রেখার মতো ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন (অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী) হয়। এবং প্রান্তিক আয় রেখা দাম = গড় আয়রেখার নিচে অবস্থান করে।

অধ্যাপক চেম্বারলিন (Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের দিক থেকে, দু-প্রকারের চাহিদারেখার উল্লেখ করেছেন ঃ

(i) সন্দর্শিত চাহিদা রেখা (Perceived demand curve) এবং

(ii) বাজারে একটি ফার্মের অংশ নির্দেশক (Share of the market) চাহিদারেখা বা আনুপাতিক চাহিদা রেখা (Proportional demand curve)

সন্দর্শিত চাহিদারেখা হ'ল এমন একটি চাহিদারেখা, যে চাহিদা রেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে বিভিন্ন দামে

ফার্ম বাজারে দ্রব্যটি কি পরিমাণ বিক্রি করতে পারবে তা দেখানো হয়। এই চাহিদারেখা নির্ণয় করার সময় এটা ধরে নেওয়া হয়, যে আমাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় (Representative) ফার্ম কেবল মাত্র দ্রব্যের দাম পরিবর্তন করে, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ফার্ম তাদের দামের কোন পরিবর্তন ঘটায় না। আনুপাতিক চাহিদারেখা হল এমন একটি চাহিদারেখা, যে চাহিদারেখার বিভিন্ন বিন্দু থেকে বিভিন্ন দামে ফার্ম দ্রব্যটি কি পরিমাণ বিক্রি করতে পারে, তা জানা যায়, যখন গোষ্ঠীর অন্তর্গত সবকটি ফার্ম একযোগে একই দিকে সমপরিমাণে দামের পরিবর্তন ঘটায়। স্বভাবতই আনুপাতিক চাহিদারেখা (D রেখা) অপেক্ষা সন্দর্শিত চাহিদা রেখা (d রেখা) অধিকতর স্থিতিস্থাপক হয়, কারণ কোন একটি ফার্ম যদি তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয় এবং অন্যান্য ফার্মগুলি তাদের দ্রব্যের দাম অপরিবর্তিত রাখে, তবে যে ফার্ম তার দ্রব্যের দাম কমাল বাজারে তার দ্রব্যের চাহিদা দু'ভাবে বৃদ্ধি পায়।

(ক) দাম কমে যাওয়ায় নতুন কিছু ক্রেতা ঐ জাতীয় দ্রব্য ক্রয় করতে শুরু করে বা পুরনো ক্রেতারা বেশি বেশি পরিমাণে দ্রব্যটি ক্রয় করবে। এবং

(খ) অন্যান বিক্রেতাদের (যারা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রি করছিল) নিকট থেকে ক্রেতারা সরে এসে যে বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কমাল, তার দ্রব্যটি ক্রয় করা শুরু করবে। কিন্তু আনুপাতিক চাহিদারেখার ক্ষেত্রে সকল বিক্রেতা একযোগে তাদের দ্রব্যের দাম কমালে চাহিদার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় কেবলমাত্র

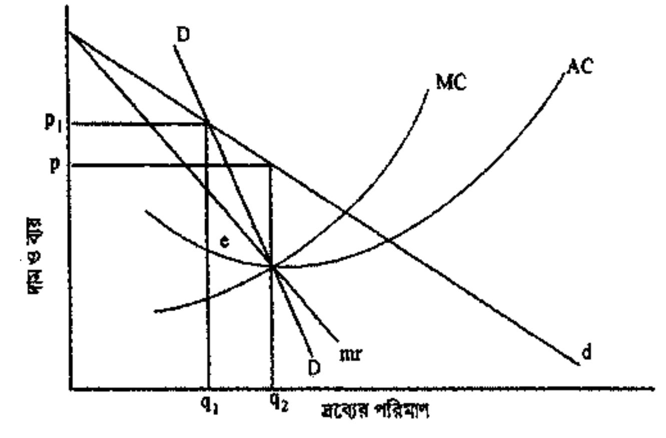

৫৬.১ নং চিত্র

প্রথম কারণটি ঘটবে। ফলে চাহিদা বাড়লেও সন্দর্শিত চাহিদারেখার ক্ষেত্রে যতটা বাড়বে, আনুপাতিক চাহিদারেখার ক্ষেত্রে ততটা বাড়বে না। এই কারণে d রেখার তুলনায় D রেখাটি অধিকতর খাড়া হবে।

উপরের চিত্রে ধরা যাক, যে আমাদের প্রতিনিধি-স্থানীয় ফার্ম p দামে দ্রব্যটি q_1 পরিমাণ বিক্রি করে এবং প্রাথমিক অবস্থায় d রেখা ও D রেখা উভয় রেখার উপরেই অবস্থান করে। কিন্তু p দামে q_1 পরিমাণ বিক্রি করলে ফার্মের সর্বাধিক মুনাফা হবে না। সর্বাধিক মুনাফা হবে যখন p^1 দামে q_2 পরিমাণ বিক্রি করতে পারবে, কারণ দ্রব্যটি q_2 পরিমাণ বিক্রি করলে, d রেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট mr রেখাকে mc রেখা e বিন্দুতে নিচের দিক থেকে ছেদ করে। আমাদের প্রতিনিধি স্থানীয় ফার্ম যদি কেবলমাত্র দাম কমায়, এবং অন্য ফার্মগুলি যদি তাদের দাম অপরিবর্তিত রাখে, তা হলেই এরূপ ঘটবে। একটি ফার্মের পক্ষে যেটা লাভজনক, গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সবকটি ফার্মের পক্ষেই সেটা লাভজনক হবে। ফলে প্রতিটি ফার্মই তার দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেবে এবং ফার্মের d রেখাটি বাঁ দিকে সরে আসবে। অর্থাৎ প্রতিটি ফার্ম D

রেখা ধরে নিচের দিকে নেমে আসবে। স্বল্পকালীন ভারসাম্য অবস্থা হল এমন একটি অবস্থা, যে অবস্থায় কোন ফার্মই একবার উপনীত হলে আর পরিবর্তন করতে চাইবে না। এই ভারসাম্য অবস্থা তখনই দেখা দেবে, যখন MC রেখা mr রেখাকে নিচ থেকে ছেদ করবে এবং দ্রব্যটি যে পরিমাণ উৎপাদন করা হবে সেই পরিমাণ উৎপাদনে, d রেখা এবং D রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে।

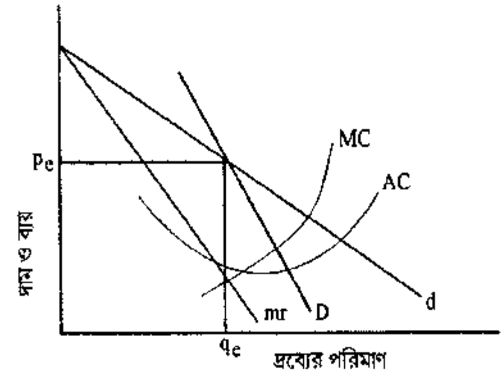

৫৬.২ নং চিত্র

উপরের চিত্রে যে স্বল্পকালীন ভারসাম্য দেখানো হয়েছে তাতে ফার্ম স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করছে। কারণ দাম এখানে গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে যেহেতু ফার্মগুলির প্রবেশ অবাধ ফলে স্বল্পকালে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হওয়ায় দীর্ঘকালে নতুন নতুন ফার্ম "উৎপাদক গোষ্ঠীতে" প্রবেশ করবে। এর ফলে আনুপাতিক চাহিদারেখাটি (D রেখাটি) ক্রমাগত বাঁ দিকে সরে যাবে, কারণ নতুন ফার্ম প্রবেশ করায়, প্রতিটি ফার্মের আগে বাজারের যে অংশ ভোগ করতে তা কমে যাবে। এইভাবে D রেখাটি ক্রমাগত বাঁ দিকে সরতে থাকলে শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থা দেখা দেবে যখন কোন ফার্মই আর স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করবে না। নিচের চিত্রে প্রতিটি ফার্ম যখন কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে, এই অবস্থায় দীর্ঘকালীন ভারসাম্য কিরূপ হবে তা দেখানো হ'ল—

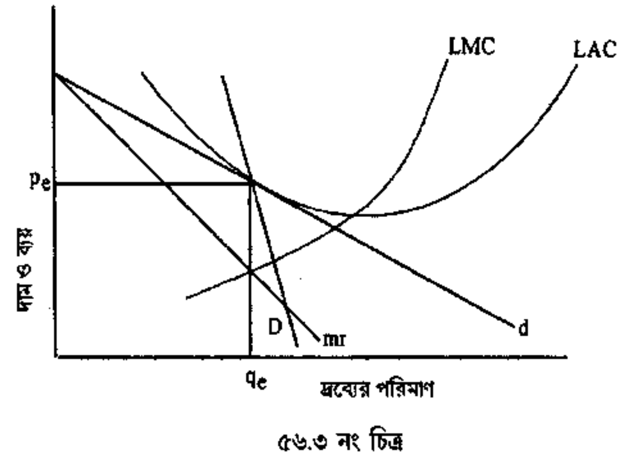

৫৬.৩ নং চিত্র

স্বল্পকালীন ভারসাম্যে যেরূপ ঘটে, দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থাতেও তেমনি কোন ফার্মেরই দাম এবং দ্রব্যের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটানোর ইচ্ছে হবে না, কারণ q_e পরিমাণ উৎপাদন প্রান্তিক আয়রেখা এবং

প্রান্তিক ব্যয়রেখা পরস্পরকে ছেদ করছে। এছাড়া q_e বাজার দামে আনুপাতিক চাহিদারেখাটি (D) LAC রেখাকে ছেদ করেছে।ফলে ফার্ম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন মুনাফা অর্জন করে না এবং কোন নতুন ফার্মের গোষ্ঠীতে প্রবেশের কোন ইচ্ছা দেখা দেবে না অথবা পুরনো কোন ফার্ম গোষ্ঠী ত্যাগ করতেও আগ্রহী হবে না। দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের দুটি শর্ত উপরে পাওয়া গেল ঃ (i) d রেখাটি LAC রেখাকে স্পর্শ করবে (ii) D রেখাটি d রেখাকে এবং LAC রেখাকে এই স্পর্শ বিন্দুতে ছেদ করবে। স্বল্পকালে ভারসাম্যের যে শর্তটি কার্যকর হয়, দীর্ঘকালেও সেটি খাটছে। উপরন্তু রেখাটি LAC রেখাকে ভারসাম্য উৎপাদনের পরিমাণে স্পর্শ করছে।

৫৬.৪ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একটি ফার্ম তার গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করে। গড় ব্যয়রেখাটি 'U' আকৃতি সম্পন্ন এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয়রেখাটি আনুভূমিক। দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় প্রতিটি ফার্ম যেহেতু কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে, তাই এ অবস্থায় দামরেখা এবং গড় ব্যয়রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করবে। একটি 'U' আকৃতিসম্পন্ন রেখাকে একটি আনুভূমিক সরলরেখা কেবলমাত্র প্রথম রেখাটির সর্বনিম্ন বিন্দুতেই স্পর্শ করতে পারে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একটি ফার্ম যেহেতু তার সর্বনিম্ন গড় ব্যয়ের অবস্থায় উৎপাদন করে, সেই কারণে এই উৎপাদনকে "কাম্য উৎপাদন" বলে।

একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় গড় আয় বা চাহিদারেখা এবং গড় ব্যয়রেখা

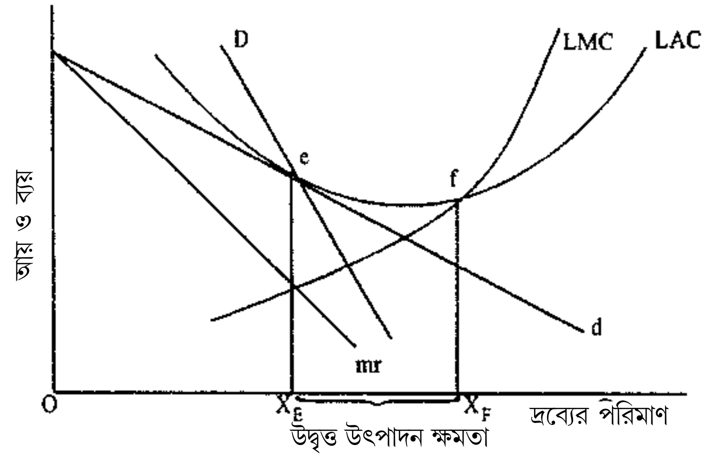

৫৬.৪ নং চিত্র

পরস্পরকে স্পর্শ করে। কিন্তু একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে দাম = গড় আয়রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন। অর্থাৎ বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। ফলে এই রেখাটি যদি 'U' আকৃতিসম্পন্ন গড়

ব্যয়রেখা স্পর্শ করে, তবে স্পর্শ বিন্দুটি অবশ্যই গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুর বাঁ দিকের একটি বিন্দু হবে। এই কারণে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা বজায় থাকে। কারণ ফার্ম কখনই তার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করবে না। ঐ বিন্দুতে উৎপাদন করতে গেলে ফার্মের লোকসান হবে। এই কারণে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপাদন কাম্য উৎপাদন অপেক্ষা কম হবে।

৫৬.৪ নং চিত্রে d রেখা হল ফার্মের সন্দর্শিত (Perceived) চাহিদারেখা। mr রেখা হ'ল সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক আয়রেখা। D রেখা হলে আনুপাতিক (Proportional) চাহিদারেখা। LMC এবং LAC রেখা হল যথাক্রমে দীর্ঘকালীন প্রান্তিক ব্যয়রেখা এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে e বিন্দুতে d রেখা এবং LAC রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করে। এবং D রেখা d রেখা এবং LAC রেখাকে ঐ বিন্দুতে ছেদ করে। ফলে ফার্মের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য উৎপাদন হবে OXE। ফার্মটি যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্ম হতো, তবে LAC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে অর্থাৎ f বিন্দুতে ফার্ম অবস্থান করত। এবং ঐ বিন্দু অনুযায়ী OXF পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করত। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা হ'ল X_EX_F। এখানে কাম্য উৎপাদন অপেক্ষা ভারসাম্য উৎপাদন কম হয়েছে। অনেকে এই কারণে একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অপচয় (wastage) সৃষ্টি হয় বলে মন্তব্য করেছেন। এর উত্তরে অবশ্য অধ্যাপক চেম্বারলিন (Chamberlin) এর অভিমত এই যে, "অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা" এবং 'সম্পদের অকাম্য বন্টনের" (Misallocation of resources) প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন ফার্মের চাহিদারেখাটি আনুভূমিক হয় (যেমন, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক একটি ফার্মের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে)। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের চাহিদারেখা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। এর প্রধান কারণ হলো দ্রব্য পৃথকীকরণের অস্তিত্ব—বিভিন্ন ফার্ম পরস্পর ঘনিষ্ঠ কিন্তু সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্য নিয়ে প্রতিযোগিতা করে। ক্রেতারা দ্রব্য কেনার সময় বৈচিত্র্য পছন্দ করে। ফলে দ্রব্য পৃথকীকরণ ক্রেতাদের নিকট কাম্য বলে পরিগণিত হয় এবং ভারসাম্য অবস্থায় গড় উৎপাদন ব্যয় যে সর্বনিম্ন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয় তা এই দ্রব্য পৃথকীকরণ বা ক্রেতাদের বৈচিত্র্যের জন্য আকাঙ্খা মেটানোর মূল্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাই চেম্বারলিনের মতে এটাকে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা বলা সমীচীন নয়।

৫৬.৫ সারাংশ

বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং বিশুদ্ধ একচেটিয়া কারবার কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। যা দেখা যায় তা হল প্রতিযোগিতা এবং একচেটিয়া কারবার এই দুই-এর সংমিশ্রণ, একেই একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বলা হয়। অধ্যাপক চেম্বারলিন একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছেন। এ বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (i) বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা; (ii) পৃথকীকৃত কিন্তু পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য নিয়ে বিক্রেতাদের মধ্যে বাজার দখলের তীব্র প্রতিযোগিতা; (iii) প্রত্যেক বিক্রেতারই একটি সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে দ্রব্যটির কিছু নিজস্ব ক্রেতা নিয়ে একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী হওয়া; (iv) দ্রব্য পৃথকীকরণের দরুন শিল্পের ধারণাটির পরিবর্তে পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বিকল্প দ্রব্যের উৎপাদকের নিয়ে "উৎপাদক গোষ্ঠীর" (Group) ধারণাটির প্রয়োগ; (v) বাজার দখলের প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা প্রত্যেক বিক্রেতার তার দ্রব্যের প্রচারের জন্য বিপুল পরিমাণ বিজ্ঞাপন ব্যয় (Selling cost) বহন। (vi)

বিজ্ঞাপনের উপর ব্যয়, ক্রেতাদের উপহার বিতরণ, দ্রব্যের সামান্য গুণগত উৎকর্ষ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন উপায়ে দামহীন প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন ফার্মের অংশগ্রহণ এবং (vii) একচেটিয়া কারবারীর মতো প্রত্যেক ফার্মের নিম্নগামী গড় আয় ও প্রান্তিক আয়রেখা।

অধ্যাপক চেম্বারলিন এই বাজারে দু'প্রকারের চাহিদারেখার উল্লেখ করেছেন ঃ সন্দর্শিত চাহিদা রেখা (Perceived demand courve) এবং আনুপাতিক বা বাজারে একটি ফার্মের অংশ নির্দেশক চাহিদারেখা (Proportional or share of the market demand curve)। একটি ফার্মের স্বল্পকালীন ভারসাম্য তখনই ঘটবে যখন ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখা সন্দর্শিত চাহিদারেখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রান্তিক আয়রেখাকে নিচের দিক থেকে ছেদ করবে এবং দ্রব্যটি যে পরিমাণ উৎপাদন করা হবে সেই পরিমাণ উৎপাদনে সন্দর্শিত চাহিদারেখা ও আনুপাতিক চাহিদারেখা পরস্পরকে ছেদ করবে। স্বল্পকালে ভারসাম্যের যে শর্তটি কার্যকর হয় দীর্ঘকালেও সেই শর্তটি খাটবে। উপরন্তু সন্দর্শিত চাহিদা রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখাকে স্পর্শ করবে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের একটি ফার্মের ন্যায় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারেও একটি ফার্ম দীর্ঘকালে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। অর্থাৎ দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় উভয় বাজারের ফার্মেরই গড় আয় এবং দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখা পরস্পরকে স্পর্শ করবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের গড় আয়রেখা যেহেতু আনুভূমিক, তাই স্পর্শবিন্দুটি অবশ্যই গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দু হবে। কিন্তু একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের গড় আয়রেখা ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন। তাই যে বিন্দুতে এই রেখাটি দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম তার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়রেখার বাঁ দিকে অবস্থিত একটি বিন্দুতে উৎপাদন করবে। এই কারণে এই বাজারে একটি ফার্মের উৎপাদন কাম্য উৎপাদন অপেক্ষা কম হয় এবং ফার্মের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) বজায় থাকে। তবে অধ্যাপক চেম্বারলিনের মতে, এই বাজারে ফার্মের গড় উৎপাদন ব্যয় যে সর্বনিম্ন গড় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হয়, তা দ্রব্য পৃথকীকরণ বা বৈচিত্র্যের জন্য ক্রেতাদের আকাঙ্খা মেটানোর মূল্য হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫৬.৬ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। এই বাজারে দ্রব্যপৃথকীকরণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

২। (ক) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে কোন একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সন্দর্শিত (perceived) চাহিদারেখা কেন আনুপাতিক (সামগ্রিক বাজারের) চাহিদারেখা অপেক্ষা কম ঢালবিশিষ্ট হয়? আলোচনা করুন।

(খ) একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্যের জন্য স্বল্পকালীন ভারসাম্যের শর্তগুলি ছাড়াও উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে আরও কি কি শর্ত পূরণ করতে হয়, তা আলোচনা করুন।

৩। (ক) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারের প্রতিযোগিতামূলক এবং একচেটিয়ামূলক দিকগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

(খ) দেখান যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের বাজারে সক্রিয় মূল্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা বজায় থাকে, ততক্ষণ দীর্ঘকালীন ভারসাম্যে অস্বাভাবিক মুনাফা হতে পারে না।

৪। (ক) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

(খ) পরিপূর্ণ একচেটিয়া কারবার থেকে সমাজের যত না ক্ষতি হয়, একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা থেকে ক্ষতি আরও অনেকগুণ বেশি—আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দ্রব্য পৃথকীকরণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন।

২। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে ফার্মের কি অতিরিক্ত উৎপাদনক্ষমতা বজায় থাকে? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩। ‘‘একচেটিয়া কারবারের ফলে অতিরিক্ত মুনাফার উদ্ভব হয় না। বরং উচ্চ দামের ফলে যে লাভ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তা স্বল্প পরিমাণ উৎপাদন ও অদক্ষ উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।’’—উক্তিটির ব্যাখ্যা করুন।

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় গড় ব্যয়রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে উৎপাদন করে না কেন?

২। বিক্রয় খরচ বা বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্ম কিভাবে দ্রব্য পৃথকীকরণ করতে পারে?

৪। সন্দর্শিত (perceived) চাহিদারেখা কাকে বলে?

৫। আনুপাতিক (proportional) চাহিদারেখা কাকে বলে?

৬। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে একটি ফার্মের গড় আয়রেখা ও প্রান্তিক আয়রেখা নিম্নগামী হয় কেন?

৭। একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে ‘‘অপচয়’’ বলতে কি বোঝায়?

একক ৫৭ ◆ অলিগোপলি

গঠন

৫৭.০ উদ্দেশ্য

৫৭.১ অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৫৭.২ অলিগোপলি বাজারে কোণ-যুক্ত চাহিদারেখা [দাম নির্ধারণ]

৫৭.৩ সারাংশ

৫৭.৪ অনুশীলনী

৫৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট কি কি এবং
- ঐ বাজারের কোণ চাহিদারেখা দাম নির্ধারণ করে

৫৭.১ অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

যে বাজারে কয়েকটিমাত্র ফার্ম কোনও দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাকে অলিগোপলি বলে। অলিগোপলি শব্দের অর্থ ''অল্পসংখক বিক্রেতা''। যখন সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকৃত কোন দ্রব্যের বিক্রেতার সংখ্যা অল্প হয় তখন অলিগোপলির উদ্ভব হয়। যেক্ষেত্রে প্রত্যেক উৎপাদক সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে তাকে বিশুদ্ধ অলিগোপলি বলা যায়। অপর পক্ষে যদি এরূপ বাজারের দ্রব্য পৃথকীকরণ থাকে তবে তাকে পৃথকীকৃত অলিগোপলি বলে।

অলিগোপলিতে বিক্রেতার সংখ্যা কম বলতে ঠিক কতজন তা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। মোট কথা বিক্রেতার সংখ্যা এমন হবে যাতে প্রত্যেকের মনেই এরূপ ধারণা জন্মায় যে, সে যদি তার দ্রব্যের দাম, বিক্রয়ের পরিমাণ, দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ, বিক্রয় ব্যয় ইত্যাদির পরিবর্তন করে তবে ঐ জাতীয় দ্রব্যের অন্যান্য বিক্রেতার উপরও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এবং তারাও তাদের দ্রব্যের দাম, দ্রব্যের গুণাগুণ, বিক্রয় ব্যয় ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক বিক্রেতাই জানে দাম ও উৎপাদন সম্পর্কে তার কোনও সিদ্ধান্ত অন্যান্য বিক্রেতার দাম, উৎপাদন ও মুনাফাকে প্রভাবিত করে এবং এই সকল বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য বিক্রেতার কার্যকলাপও আবার প্রথমোক্ত বিক্রেতাকে প্রভাবিত করবে। সকল বিক্রেতার মনেই অন্যান্য বিক্রেতা সম্বন্ধে এই সচেতনতা বজায় থাকে যে, নিজের কার্যকলাপের কোনও প্রভাব অন্যের উপর কতটা পড়বে। ফলে তাদের কাজকর্মে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তা আবার তার নিজের উপর কতটা প্রভাব ফেলবে—এসব বিষয় হিসাব করেই প্রত্যেক বিক্রেতা দাম, বিক্রয়ের পরিমাণ, দ্রব্যের মান, বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ইত্যাদি স্থির করে।

বিক্রেতার সংখ্যা অল্প হওয়ায় অন্যান্য বাজার থেকে অলিগোপলি বাজারের দাম নির্ধারণের সমস্যাটিকে পৃথকভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। যখন কোনও সমজাতীয় বা সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্যের বিক্রেতা বা উৎপাদক স্বল্পসংখ্যক হয়, তখন কোনও বিক্রেতা অপর বিক্রেতার উপর তার নিজের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া কি দাঁড়াবে অথবা অপরের নানা কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া তার নিজের উপর কি প্রভাব ফেলবে তা বিবেচনা না করে পারে না। কারণ প্রত্যেক বিক্রেতাই সমগ্র যোগানের একটা বড় অংশ যোগান দেয় এবং নিজের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যের দাম এবং দ্রব্যের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অলিগোপলির বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা এক অপরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে বাধ্য।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া বাজার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যেও ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে না, ফলে প্রত্যেক বিক্রেতাই পরস্পরের উপর কোনও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই স্বাধীনভাবে তার দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে সক্ষম। এই কারণে ঐ সকল বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখা বা বিক্রেতার গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা সঠিকভাবে পাওয়া যায়। বিক্রেতার গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয়রেখা দেওয়া থাকলে সুনির্দিষ্টভাবে দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ এবং দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু অলিগোপলিতে যে কোন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখা বা গড় আয়রেখা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। কারণ এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা কি হবে তা নির্ভর করে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের দাম, গুণাগুণ, বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে কি নীতি বা কৌশল অবলম্বন করবে তার উপর।

অলিগোপলি বাজারে অল্প সংখ্যক বিক্রেতা থাকায় কোনও একজন বিক্রেতার প্রত্যেকটি কাজ তার প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর গভীরভাবে প্রভাব সৃষ্টি করে। এ বিষয়ে প্রত্যেক বিক্রেতাই সম্পূর্ণরূপে সচেতন থাকে। তবে কোনও একজন বিক্রেতা দাম বা অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কোন পরিবর্তন ঘটালে অন্যান্য বিক্রেতার উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। যেমন, কোনও একজন বিক্রেতা দাম কমালে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দাম অপরিবর্তিত রাখতে পারে অথবা তারাও দাম সামান্য কমাতে পারে বা সমপরিমাণে কমাতে পারে দাম কমালে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দাম অপরিবর্তিত রাখতে পারে অথবা দাম অপরিবর্তিত রেখে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের উৎকর্ষতা বাড়াতে পারে অথবা আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ক্রেতাদের নিজেদের দ্রব্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারে। অন্যান্য বিক্রেতার প্রতিক্রিয়ার এ ধরনের একাধিক সম্ভাবনা থাকায় কোনও একজন বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে যায়। এ অবস্থায় অলিগোপলি দাম ও উৎপাদন কি হবে তা ঠিক করতে হলে বিভিন্ন বিক্রেতার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে নানারূপ অনুমান ধরে নিয়ে আলোচনা করতে হয়। এই এক এক ধরনের অনুমারে উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবিদরা অলিগোপলিতে ভারসাম্য অবস্থা নিরূপণ করতে গিয়ে এক একটি মডেলের অবতারণা করেছেন। এক একজন অর্থনীতিবিদের নাম এরূপ এক-একটি মডেল যুক্ত হয়ে রয়েছে। যেমন কুর্নো (Cournot) মডেল, এজওয়ার্থ (Edgeworth) মডেল, বারট্রাণ্ড (Bertrand) মডেল, সুইজি (Sweezy) মডেল ইত্যাদি।

৫৭.২ অলিগোপলি বাজারে কোণ-যুক্ত চাহিদারেখা [দাম নির্ধারণ]

১৯৩৯ সালে আমেরিকার অর্থনীতিবিদ পল সুইজি (Sweezy) অলিগোপলি বাজারে ভারসাম্য বিশ্লেষণে এই কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার ধারণাটি প্রবর্তন করেন। সুইজির মতে, অলিগোপলি বাজারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল দামের অনমনীয়তা বা অপরিবর্তনশীলতা। এই অপরিবর্তনশীলতার ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই কোণ-যুক্ত

চাহিদারেখার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই কোণ (kink) বাজারে প্রচলিত দামের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। অলিগোপলি বাজারে কোন ফার্মই এই প্রচলিত দাম পরিবর্তন করতে চায় না। কোন ফার্ম যদি প্রচলিত দাম অপেক্ষা কম দাম ধার্য করে, তাহলে অন্যান্য ফার্মগুলিও (যারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত দ্রব্য বিক্রয় করে) তাদের দ্রব্যের দাম কমাতে বাধ্য হয়, কারণ তারা দাম না কমালে ভোগকারীরা তাদের পরিত্যাগ করে যে ফার্ম দ্রব্যের দাম কমিয়েছে তার কাছে গিয়ে ভিড় করে। তাই দ্রব্যের দাম কমিয়ে কোন ফার্মই তার বিক্রয়ের পরিমাণ খুব একটা বাড়াতে পারে না। তবে, সকল ফার্মই তাদের দ্রব্যের কমিয়ে দেওয়ার বাজারে নতুন ক্রেতার আবির্ভাব ঘটবে এবং প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা সামান্য কিছু বাড়বে। তাই প্রচলিত দামের নিচে চাহিদারেখার যে অংশটি আছে, সেটি অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক হবে। অপরপক্ষে, কোন ফার্ম প্রচলিত দাম অপেক্ষা বেশি দাম ধার্য করলে ঐ জাতীয় দ্রব্যের অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের দাম বাড়াবে না। এর ফলে দাম বৃদ্ধিকারী ফার্মের বিক্রি বিশেষভাবে কমে যাবে। কারণ ঐ ফার্মকে পরিত্যাগ করে ক্রেতারা অন্যান্য ফার্মের দিকে ঝুঁকতে থাকবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত দামের উপর চাহিদারেখার যে অংশটি আছে সেটি অপেক্ষাকৃত স্থিতিস্থাপক হবে। নিচে এরূপ একটি কোণ-যুক্ত চাহিদারেখা আঁকা হ'ল।

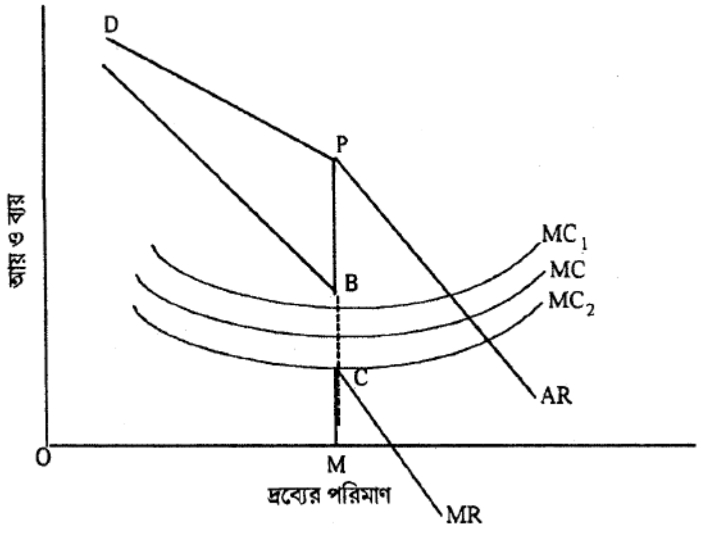

৫৭.১ নং চিত্র

উপরের চিত্রে DPAR রেখাটি হ'ল অলিগোপলি (Oligopoly) বাজারে একটি ফার্মের কোণ-যুক্ত চাহিদা রেখা P বিন্দুতে একটি কোণের সৃষ্টি হয়েছে। চাহিদারেখার দুটি পৃথক অংশ থাকায় প্রান্তিক আয়রেখার একটি বিচ্ছিন্ন অংশ (Discontinuous portion)-এর সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি MR = AR $\left(1-\frac{1}{e}\right)$ (এখানে e = চাহিদার দাম স্থিতিস্থাপকতা P) বিন্দুর উপরে চাহিদারেখার যে অংশ আছে এবং নিচে যে অংশ আছে— এই দুটি অংশের স্থিতিস্থাপকতার বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। সেই কারণে P বিন্দুর ঠিক নিচে প্রান্তিক আয়রেখারও বিচ্ছিন্নতা দেখা যায়। চাহিদারেখার দুটি অংশের স্থিতিস্থাপকতার পার্থক্য যত বেশি হবে MR রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের বিস্তৃতিও তত বেশি হবে। চিত্রে MC রেখা হ'ল ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখা MC রেখা MR রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উৎপাদনের পরিমাণ OM অপেক্ষা কম হলে প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা বেশি হবে এবং সেক্ষেত্রে ফার্ম উৎপাদন

বাড়ালে তার মুনাফার পরিমাণও বাড়বে। অপরপক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ OM অপেক্ষা বেশি হলে MR অপেক্ষা MC বেশি হয় এবং সেক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ কমিয়ে দিলেই ফার্মের মুনাফা বেড়ে যায়। অতএব আমরা দেখলাম, উৎপাদনের পরিমাণ OM অপেক্ষা কম হ'লে ফার্ম উৎপাদন বাড়াবে এবং উৎপাদন OM অপেক্ষা বেশি হ'লে সে উৎপাদন কমাবে। অতএব ঠিক যখন উৎপাদনের পরিমাণ OM হবে, তখনই ফার্মের মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে।

এখন ফার্মের উৎপাদন ব্যয়ের যদি পরিবর্তন ঘটে, তবে MC রেখারও যদি স্থান পরিবর্তন (Shift) ঘটবে। উৎপাদন বেড়ে গেলে নতুন MC রেখা হবে MC_1 রেখা এবং উৎপাদন ব্যয় কমে গেলে নতুন MC রেখা হবে MC_2 রেখা। পুরনো MC রেখার ন্যায় এই MC_1 বা MC_2 রেখা যদি MR রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়ে যায় (যেমন চিত্রে দেখানো হয়েছে), তবে উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটলেও ফার্মের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এর থেকে অলিগোপলি (Oligopoly) বাজারে দামের পরিবর্তনশীলতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

আবার কখনও কখনও এরূপ ঘটতে পারে যে, বাজারে সামগ্রিকভাবে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটল। সেক্ষেত্রে ফার্মের চাহিদারেখাও ডান দিকে সরে যাবে। তবে চাহিদারেখা ডান দিকে সরে গেলেও পুরনো চাহিদারেখায় ঐ একই দামে কোণের সৃষ্টি হতে পারে। এখন MC রেখা যদি নতুন MR রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে যায় তবে চাহিদার পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও দ্রব্যের দামের কোন পরিবর্তন হবে না। কেবলমাত্র দ্রব্যটির বিক্রয়ের পরিমাণ বেড়ে যাবে।

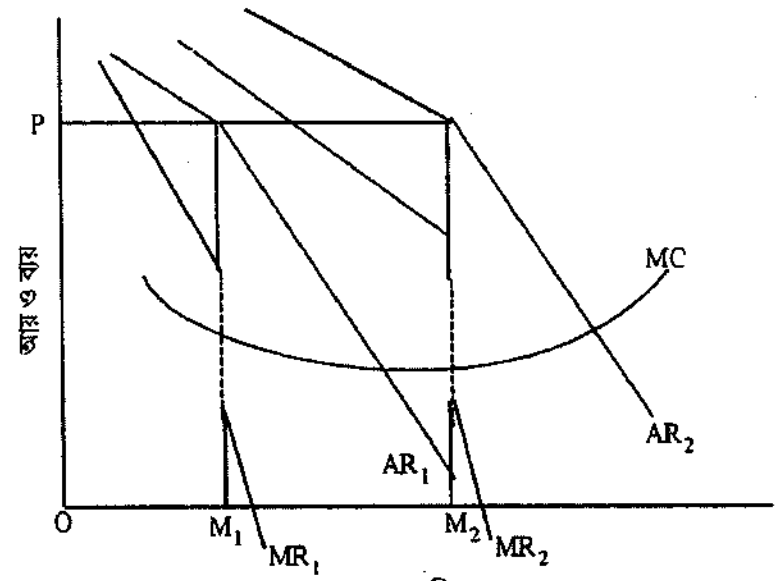

৫৭.২ নং চিত্র

উপরের চিত্রে চাহিদারেখা AR_1 রেখা থেকে AR_2 রেখায় স্থানান্তরিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট MR রেখাটিও MR_1 রেখা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে MR_2 রেখা হয়েছে। MC রেখা MR_1 রেখা এবং MR_2 রেখা উভয় রেখার বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ফলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটা সত্ত্বেও দামের কোন পরিবর্তন ঘটল না। কেবলমাত্র বিক্রয়ের পরিমাণ OM_1 থেকে বেড়ে OM_2 হ'ল।

সুইজির কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার মডেলে অলিগোপলি বাজারে একবার দাম স্থির হয়ে গেলে, কেন সেই দামের সচরাচর কোন পরিবর্তন হয় না, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে কিভাবে পূর্বের দাম নির্ধারিত হয়েছিল তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। এটাই হ'ল মডেলের প্রধান ত্রুটি।

৫৭.৩ সারাংশ

যে ক্ষেত্রে কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান বাজারে কোন দ্রব্যের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে অলিগোপলি বলে। অলিগোপলি বাজারে প্রত্যেক ফার্ম অপর ফার্মগুলির বিক্রয়ের পরিমাণ ও দামনীতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে এবং সেই অনুযায়ী নিজ নিজ বিক্রয়ের পরিমাণ ও দাম নির্ধারণ করে। বিক্রেতার সংখ্যা স্বল্প হওয়ার দরুন প্রত্যেক বিক্রেতা বাজারে সমগ্র যোগানের একটা মোটা অংশ যোগান দেয় এবং উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটিয়ে বাজার দামের উপর প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে। প্রত্যেক বিক্রেতাই জানে দাম, দ্রব্যের উৎপাদন, দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ, বিক্রয় ব্যয়, মুনাফার পরিমাণ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে এবং এ সকল বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য বিক্রেতার কার্যকলাপও প্রথমোক্ত বিক্রেতার উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে।

পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া বাজার বা একচেটিয়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এ ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সম্পর্ক থাকে না। ফলে প্রত্যেক বিক্রেতাই পরস্পরের উপর কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করেই স্বাধীনভাবে তার দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করতে সক্ষম। এই কারণে ঐ সকল বাজার প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখা বা গড় আয়রেখা এবং প্রান্তিক আয়রেখা সঠিকভাবে পাওয়া যায়। কিন্তু অলিগোপলি বাজারে কোনও বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদারেখা সঠিকভাবে পাওয়া যায় না, কারণ এই বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতার দ্রব্যের চাহিদা কি হবে, তা নির্ভর করে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দ্রব্যের দাম, দ্রব্যের গুণাগুণ, বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কে কি নীতি বা কৌশল অবলম্বন করবে তার উপর।

অলিগোপলিতে কোনও বিক্রেতা তার দ্রব্যের দাম কতটা ধার্য করবে এবং দ্রব্যটি কতটা পরিমাণ উৎপাদন করবে তা স্থির করতে গেলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অনুমান ধরে নিয়ে এগোতে হয়। এই এক এক ধরনের অনুমানের উপর ভিত্তি করে অর্থনীতিবিদরা অলিগোপলিতে ভারসাম্য অবস্থা নিরূপণ করতে গিয়ে এক একটি মডেলের অবতারণা করেছেন। এক একজন অর্থনীতিবিদের নামে এরূপ এক একটি মডেল যুক্ত হয়ে রয়েছে।

অলিগোপলি বাজারে দামের অনমনীয়তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অধ্যাপক পল সুইজি "কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার" ধারণাটি অবতারণা করেছেন। সুইজির অনুমান হল যে, কোনও একজন বিক্রেতা দাম কমিয়ে তার দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বাড়াতে পারবে না, কারণ একজন বিক্রেতা দাম কমালে সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিক্রেতারাও দাম কমাবে। কিন্তু কোন একজন বিক্রেতা যদি দ্রব্যের দাম কমিয়ে দেয় তবে অন্যান্য বিক্রেতারা তাদের দামের কোন পরিবর্তন করবে না। ফলে যে বিক্রেতা দাম বাড়াল, তার দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ কমে যাবে। তাই সুইজি মডেল অনুযায়ী আমরা চলতি দামে কোনও একজন বিক্রেতার চাহিদারেখায় একটি "মোচড়" বা "কোণ" দেখতে পাই। এই কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার মাধ্যমে এটা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়, কেন উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন ঘটলেও ফার্মের দাম ও উৎপাদনের পরিমাণে কোন পরিবর্তন ঘটে না। অথবা বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটলেও কেন দামের কোন পরিবর্তন ঘটে না। অতএব সুইজির মডেলে অলিগোপলি বাজারে একবার দাম স্থির হয়ে গেলে কেন সেই দামের সচরাচর কোন পরিবর্তন হয় না, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে কিভাবে পূর্বের দাম নির্ধারিত হয়েছিল, তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

৫৭.৪ অনুশীলনী

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। অলিগোপলিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি ঐ ধরনের বাজারে ভারসাম্যের আলোচনাকে দুরূহ করে তোলে সেগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। অলিগোপলি বাজারে ভারসাম্য অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে আমরা মডেলের সাহায্য নিয়ে থাকি—ব্যাখ্যা করুন।

৩। অলিগোপলি বাজারে দামের অনমনীয়তা বা অপরিবর্তশীল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার সাহায্য নেওয়া হয়—ব্যাখ্যা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। ফার্মের প্রান্তিক ব্যয়রেখার যদি ঊর্ধ্বমুখী অপসরণ ঘটে, তবে কোন ক্ষেত্রে ফার্ম তার দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করবে না?

২। বাজারে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও কেন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে না, কোণ-যুক্ত চাহিদারেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। পূর্ণাঙ্গ অলিগোপলি ও পৃথকীকৃত অলিগোপলির মধ্যে পার্থক্য করুন।

২। অলিগোপলি বাজারে একটি ফার্মের চাহিদা রেখা কোণ-যুক্ত হয় কেন?

৩। অলিগোপলি বাজারে একটি ফার্ম দাম কমালে অন্যান্য ফার্মগুলিও দাম কমায়—কিন্তু একটি ফার্ম দাম বাড়ালে অন্যান্য ফার্মগুলি দাম বাড়ায় না কেন?

একক ৫৮ ◆ উপাদানের দাম তত্ত্ব

গঠন

৫৮.০ উদ্দেশ্য

৫৮.১ উপাদানের দাম তত্ত্বের বিশেষত্ব

৫৮.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বলতে কি বোঝায়?

৫৮.৩ বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

৫৮.৩.১ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা

৫৮.৩.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘকালীন ভারসাম্য

৫৮.৪ উপাদানের দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব

৫৮.৫ সারাংশ

৫৮.৬ অনুশীলনী

৫৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- **উপাদানের দাম তত্ত্বের বিশেষত্ব—দ্রব্যের দাম ও উপাদানের দামের মধ্যে পার্থক্য**
- **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কাকে বলে?**
- **উপাদানের দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব**

৫৮.১ উপাদানের দাম তত্ত্বের বিশেষত্ব

উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, দ্রব্য এবং উৎপাদনের উপাদানের দাম যদি একই

নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে উৎপাদনের উপাদানসমূহের জন্য স্বতন্ত্র মূল্যতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা কি? এর উত্তরে বলা যায়, উপাদানের বাজারে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুণ উপাদানগুলির দাম নির্ধারণের জন্য পৃথক মূল্যতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। নিচে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

(ক) চাহিদার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় দ্রব্যের চাহিদা হল সরাসরি চাহিদা বা প্রত্যক্ষ চাহিদা, কিন্তু উপাদানের চাহিদা হল উদ্ভূত চাহিদা (derived demand)। দ্রব্য থেকে ভোগকারী সরাসরি উপযোগ পেয়ে থাকে, কিন্তু উপাদানগুলির থেকে সরাসরি কোনও উপযোগ পাওয়া যায় না। দ্রব্যের চাহিদা থাকলেই ঐ দ্রব্যগুলি উৎপাদন করতে যে উপাদানের প্রয়োজন হয় তারও চাহিদা হবে এবং তখনই নিয়োগকর্তার নিকট উপাদানের উপযোগিতা দেখা দেবে।

(খ) কয়েকটি বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ছাড়া (যেমন গাড়ি ও পেট্রোল, চা ও চিনি ইত্যাদি) অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে যুক্ত চাহিদার (joint demand) সৃষ্টি হয় না। কিন্তু উপাদানের চাহিদা হল মূলত যুক্ত চাহিদা, কারণ একযোগে বহু সংখ্যক উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি হয়—কোন একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে শ্রম, মূলধন, জমি ও সংগঠকের একযোগে প্রয়োজন হয়।

(গ) যোগানের দিক থেকেও উপাদানের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। দ্রব্যের যোগান চাহিদা অনুযায়ী বাড়ান কমান যায়। কিন্তু কিছু কিছু উপাদানের যোগান (বিশেষত জমির যোগান) ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না।

(ঘ) দ্রব্যের যোগানের ক্ষেত্রে উৎপাদকের বিশেষ নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু উপাদানের যোগানের ক্ষেত্রে উপাদানের মালিকের সব সময় নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন—মূলধন যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে দেশে জাতীয় আয়, লোকের সঞ্চয় প্রবণতা, সঞ্চয় সংগ্রহ করার ব্যবস্থা ইত্যাদির উপর। জমির যোগান অনেকাংশেই নির্ভর করে প্রকৃতির উপর ইত্যাদি।

(ঙ) সাধারণত সকল দ্রব্যের দাম একই দাম তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য বিশেষ বিশেষ দাম তত্ত্বের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু পৃথক পৃথক উপাদানের দাম নির্ধারণের জন্য পৃথক পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন হয়। খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফা নির্ধারণের জন্য একই তত্ত্বের প্রয়োগ চলে না।

(চ) উপাদানের দাম নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনায় উপাদানের বাজার ও দ্রব্যের বাজার উভয় বাজারের প্রকৃতি বিবেচনা করতে হয়। উভয় বাজারে প্রতিযোগিতার ধরণ অনুযায়ী দাম নির্ধারণের পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে হয়। কিন্তু দ্রব্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র দ্রব্যের বাজারের প্রকৃতি বিবেচনা করি—উপাদানগুলির দাম অপরিবর্তিত থাকে—এরূপ ধরে নেওয়া হয়।

নয়া-ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ—জে. বি. ক্লাক (J. B. Clerk) উইকস্টীড (Wicksteed) প্রভৃতি—উপাদানের দাম নির্ধারণ সম্পর্কে বণ্টনের (জাতীয় আয় উপাদানের উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয় খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফা হিসাবে) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। উৎপাদন কার্যে সহায়তা করে বলেই উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী উপাদানকে দাম দেওয়া হয়। এটাই হল এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয়।

৫৮.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বলতে কি বোঝায়?

আমরা তিন প্রকারের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। যথা—(ক) প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন (Marginal Physical Product; M.P.P), (খ) প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (Value of Marginal Physical Product; V. M. P. P.), (গ) প্রান্তিক রেভিনিউ বা আয় উৎপন্ন (Marginal Revenue Product; M.R.P.)

অন্যান্য যাবতীয় উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে যদি একটি পরিবর্তনশীল উপাদান (ধরা যাক শ্রম) অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করা হয়, তবে কোনও দ্রব্যের উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে তাকেই শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন বলে। ধরা যাক অন্যান্য উপাদানের সাথে যখন 10 একক শ্রম নিয়োগ করা হয়, তখন দ্রব্যটির মোট উৎপাদন হয় 50 একক। এখন অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে যদি 11 একক শ্রম নিয়োগ করা হয়, তবে মোট উৎপাদন হয় 52 একক। সেক্ষেত্রে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন = 52–50 = 2 একক।

শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে দ্রব্যটির বাজার-দাম দ্বারা গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায়, তাই হল শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য। ধরা যাক দ্রব্যটির বাজার দাম হল 5 টাকা, সেক্ষেত্রে উপরের দৃষ্টান্তে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য = 2 একক × 5 টাকা = 10 টাকা।

অন্যান্য যাবতীয় উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করা হলে, নিয়োগকারী উৎপাদকের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাকেই শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বলে। দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তাহলে একজন বিক্রেতা দ্রব্যটি একটি নির্দিষ্ট দামে যে পরিমাণ ইচ্ছা বিক্রি করতে পারে। দ্রব্যটি যখন সে 50 একক বিক্রি করে; তখন যদি দ্রব্যটির দাম 5 টাকা হয়, তাহলে যখন সে দ্রব্যটি 52 একক বিক্রি করবে; তখনও ঐ দ্রব্যের দাম 5 টাকাই থাকবে। সেক্ষেত্রে উপরের দৃষ্টান্তে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = 52×5–50 × 5 = 260–250 টাকা = 10 টাকা।

অতএব দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (V.M.P.P.) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (M.R.P.) পরস্পর সমান হবে।

দ্রব্যের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে কোন একজন বিক্রেতা আগের তুলনায় দ্রব্যটি বেশী পরিমাণে বিক্রি করতে গেলে তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হবে। ধরা যাক বিক্রেতা যখন দ্রব্যটি 50 এককের পরিবর্তে 52 একক বিক্রি করে তখন তাকে দ্রব্যের দাম 5 টাকা থেকে কমিয়ে 4.90 টাকা করতে হয়। সেক্ষেত্রে উপরের দৃষ্টান্তে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য = 2 একক × 4.90 টাকা = 9.80 টাকা। কিন্তু শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = 52 একক × 4.90 টাকা—50 একক × 5 টাকা = 254.80 টাকা — 250 টাকা = 4.80 টাকা। অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন-র মূল্য অপেক্ষা কম হবে। বিষয়টিকে নিম্নলিখিত ভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়।

মনে করি MRP, TR, TP, MPP এবং L হল যথাক্রমে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন, মোট আয়, মোট উৎপাদন, শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন এবং শ্রমের পরিমাণ।

সংজ্ঞানুযায়ী $MRP = \frac{\Delta TR}{\Delta L}$................(1)

এখন প্রান্তিক আয় $(MR) = \frac{\Delta TR}{\Delta TP}$................(2)

or, $\Delta TR = MR \times \Delta TP$ ....(2)

অনুরূপভাবে $MPP = \frac{\Delta TP}{\Delta L}$

or, $\Delta L = \frac{\Delta TP}{MPP}$................(3)

(2) নং ও (3) নং সমীকরণ থেকে (1)-নং সমীকরণের মান বসিয়ে পাই,

$$MRP = \frac{MR \times \Delta TP}{\frac{\Delta TP}{MPP}}$$

or, $MRP = MR \times MPP$ .... (4)

আবার আমরা জানি, $VMPP = P \times MPP$ .... (5)

দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে P = MR, সেক্ষেত্রে ওপরের (4) নং ও (5) নং সমীকরণ থেকে পাই, VMPP = MRP।

অপরপক্ষে দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে P > MR

অতএব (4) নং ও (5) নং সমীকরণ থেকে পাই VMPP > MRP বা MRP < VMPP।

৫৮.৩ বণ্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে বলা হয়, যে কোন একটি পরিবর্তনশীল উপাদানের দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের (VMPP) সমান হয়। পরিবর্তনশীল উপাদানটি যদি শ্রম হয় তবে শ্রমের মজুরী তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হবে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বে নিম্নলিখিত অনুমানগুলি ধরে নেওয়া হয়।

1. পরিবর্তনশীল উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব।
2. উপাদানটির বিভিন্ন একক সমজাতীয়। এবং একে অপরের সম্পূর্ণ পরিবর্ত।
3. উপাদানটি সম্পূর্ণ চলনশীল।

4. উপাদানটির পূর্ণ নিয়োগ বজায় আছে।

5. যে অনুপাতে বিভিন্ন উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয় তা প্রয়োজনমত পরিবর্তন করা সম্ভব।

6. উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনীয় অনুপাত বিধি (ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি) কার্যকরী আছে।

7. নিয়োগকারী সর্বদাই মুনাফা সর্বাধিক করতে চায়।

8. দ্রব্যের বাজার এবং উপাদানের বাজার, উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা রয়েছে।

ধরা যাক পরিবর্তনশীল উপাদানটি হল শ্রম। একটি নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক মুনাফার্জনের উদ্দেশ্যে, ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে যেখানে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয়, তা বিক্রি করে নিয়োগকারীর মোট আয় যে পরিমাণ বাড়ে, অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে নিয়োগকারীর মোট ব্যয়ও ঠিক সেই পরিমাণ বাড়বে। অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বাড়ে তা বিক্রি করে নিয়োগকারীর মোট আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) বলে। অপরপক্ষে অতিরিক্ত একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে নিয়োগকারীর মোট ব্যয় যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে প্রান্তিক মজুরী বলে (Marginal Wage)। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) পরস্পর সমান হয়। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে একটি নির্দিষ্ট মজুরীতে নিয়োগকারী যে পরিমাণ ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রমের মজুরীর হার (গড় মজুরী বা AW) এবং প্রান্তিক মজুরী (MW) পরস্পর সমান হবে। অতএব দ্রব্যের বাজার এবং শ্রমের বাজার উভয় বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে একজন নিয়োগকারী সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের জন্য ঠিক

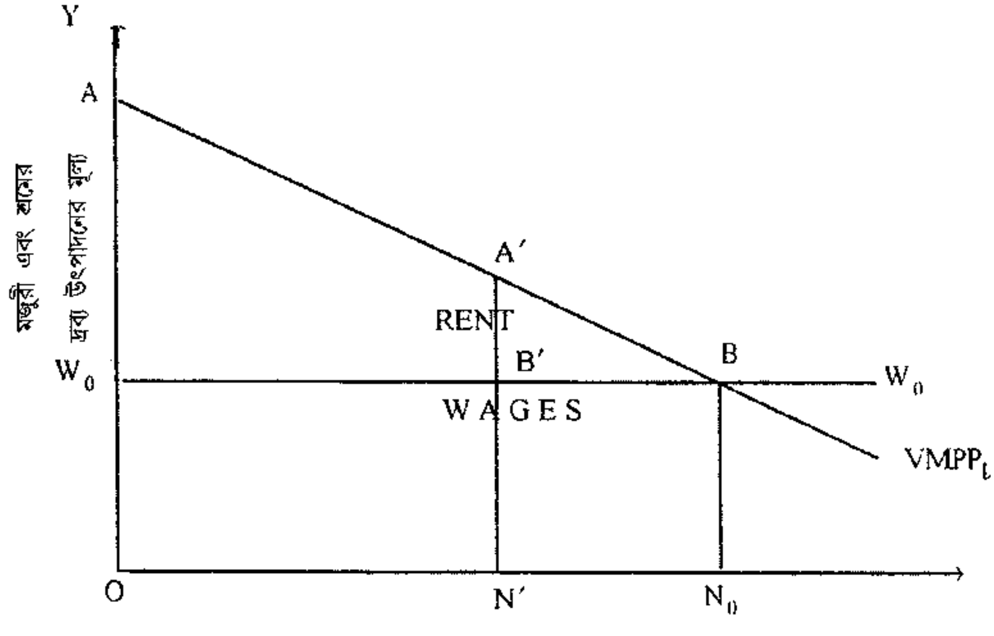

রেখাচিত্র ৫৮.১ ঃ শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ

সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে, যেখানে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) এবং শ্রমের মজুরী পরস্পর সমান হবে। যদি শ্রমের VMPP তার মজুরী অপেক্ষা বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করলে নিয়োগকারীর মোট ব্যয় যে পরিমাণে বাড়বে, মোট আয় তার তুলনায় বেশী পরিমাণে বাড়বে, অর্থাৎ তার মোট মুনাফা বেড়ে যাবে। এই অবস্থায় সে বেশি বেশি শ্রম নিয়োগ করবে। অপরপক্ষে শ্রমের VMPP যদি তার মজুরী অপেক্ষা কম হয়, তবে অতিরিক্ত একক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে নিয়োগকারীর ব্যয় যে পরিমাণ বাড়বে মোট আয় তার তুলনায় কম পরিমাণে বাড়বে। অর্থাৎ তার মোট মুনাফা কমে যাবে। এই অবস্থায় সে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। অতএব শ্রমের VMPP এবং মজুরী যেখানে পরস্পর সমান হবে, সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলেই নিয়োগকারীর মোট মুনাফা সর্বাধিক হবে।

আমরা রেখাচিত্রের সাহায্যে এটি দেখাতে পারি, নীচের রেখাচিত্রে OX অক্ষে শ্রমের নিয়োগ, OY অক্ষে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনের মূল্য ও মজুরীর পরিমাপ করা হয়েছে। এখানে $VMPP_1$ হল শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপাদনের মূল্য রেখা। W_0W_0 হল মজুরী রেখা। উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে কোনও একটি ফার্ম মজুরীর হারকে পরিবর্তন করতে পারবে না, নির্দিষ্ট মজুরীতে যে কোন পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে পারবে। কাজেই মজুরী রেখাটি শ্রম-অক্ষের সমান্তরাল হবে। এখানে W_0W_0 রেখা $VMPP_1$ রেখাকে (DD রেখা) B বিন্দুতে ছেদ করেছে। B বিন্দুতে মজুরীর হারে = শ্রমের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের মূল্য। ফার্ম ON_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। এখানে মজুরীর হার = OW_0 নিয়োগ = ON_0 অতএব ON_0 সংখ্যক শ্রমিকদের জন্য লাগবে $OW_0 \times ON_0 = OW_0BN_0$ (মজুরী বা wages) কিন্তু ফার্মের মালিক ON_0 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে মোট উৎপাদন পাবেন $OABN_0$ এর থেকে OW_0BN_0 মজুরী বাদ দিলে মালিকের মুনাফা (Rent element) থাকবে AW_0B নামক ত্রিভুজটি। এটিই সর্বাধিক মুনাফা। তিনি যদি ON_0 অপেক্ষা কম শ্রম নিয়োগ করতেন এবং প্রত্যেক শ্রমিককে তার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার চেয়ে কম মজুরী দিতেন, তাহলে তাঁর মুনাফা কমে গিয়ে হোত $W_0A'A'B'$ নামক ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্রটি (যেটি AW_0B ত্রিভুজ অপেক্ষা কম)। অতএব ফার্মের স্বার্থেই শ্রমিকদের মজুরী তাদের প্রান্তিক বাস্তব উৎপাদনের মূল্যের সমান হওয়া উচিত। এটিই হল প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য এবং এই বক্তব্যটি শ্রম ছাড়া উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল—পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক উপাদানের বাজারে যে কোন উপাদানের পারিশ্রমিক সে উপাদানের প্রান্তিক বস্তুগত উৎপাদনের মূল্যের সমান হবে। এর ফলে উপাদানের মালিকেরাও ন্যায্য পাওনা পাবেন এবং উপাদানের নিয়োগকারীর মুনাফাও সর্বাধিক হবে।

৫৮.৩.১ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের সমালোচনা

(i) টাউজিগ্ (Taussig) ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) প্রমুখ লেখকরা দেখিয়েছেন সে পরিবর্তনশীল উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায় না। অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ স্থির রেখে পরিবর্তনশীল উপাদানটি অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়ে তা শুধু ঐ পরিবর্তনশীল উপাদানটিরই উৎপাদন নয়, সকল উপাদানের সম্মিলিত উৎপাদন। অন্যান্য উপাদানের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা থাকার ফলেই ওই অতিরিক্ত উৎপাদনের উদ্ভব হয়।

(ii) সংশ্লিষ্ট উপাদানটির পূর্ণ নিয়োগ থাকলেই উপাদানটির দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হয়। শ্রমের পূর্ণ নিয়োগ থাকলেই মজুরী শ্রমের VMPP-র সমান হয়। কিন্তু বাস্তবে শ্রমের পূর্ণ

নিয়োগ সর্বদা ঘটে না। এবং সে ক্ষেত্রে শ্রমের যে এককগুলি নিয়োগহীন অবস্থায় থাকে, তারা শ্রমের VMPP অপেক্ষা কম মজুরীতেও কাজ করতে রাজি থাকে।

(iii) বিভিন্ন উপাদানের এককগুলি বিভিন্ন নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে চলনশীল হলেই উপাদানগুলির দাম সকল নিয়োগের ক্ষেত্রে অভিন্ন হবে। এবং উপাদানের দাম তার VMPP-র সমান হবে। কিন্তু বাস্তবে উপাদানের বিভিন্ন এককগুলি সম্পূর্ণ চলনশীল নয় (অর্থাৎ একটি ক্ষেত্র থেকে আরেকটি ক্ষেত্রে অবাধে যেতে পারে না। সেক্ষেত্রে উপাদানের দাম কোনও কোনও নিয়োগের ক্ষেত্রে তার VMPP অপেক্ষা কম হতে পারে।

(iv) কোন একটি উপাদানের দাম এবং তার VMPP পরস্পর সমান হলেই যে ঐ উপাদানটির নিয়োগকারী ফার্মে মুনাফা সর্বাধিক হবে এমন কোনও কথা নেই। সর্বাধিক মুনাফার্জনের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি শর্তের প্রয়োজন। সেই শর্তটি হল ঃ —ভারসাম্য বিন্দুতে VMPP রেখা অবশ্যই নিম্নগামী হবে। কেবলমাত্র ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি যেখানে প্রযোজ্য হবে, সেখানেই এই শর্তটি ঘটবে। কিন্তু পরিবর্তনশীল উপাদানটির প্রান্তিক উৎপাদন যদি ক্রমবর্ধমান হয়, তবে যত বেশি বেশি পরিমাণে ঐ উপাদানটি নিয়োগ করা হবে, নিয়োগকারীর মোট মুনাফাও ততই বাড়তে থাকে। সেক্ষেত্রে কখনই নিয়োগকারীর ভারসাম্য হবে না।

(v) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, বিভিন্ন উপাদানের সকল এককগুলি সমজাতীয়। কেবলমাত্র সে ক্ষেত্রেই পরিবর্তনশীল উপাদানটির সকল এককের দাম অভিন্ন হবে। কিন্তু বাস্তবে কোন উপাদানের সকল একক সমজাতীয় এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। যেমন—শ্রমের সকল একক কখনোই সমজাতীয় হতে পারে না। বিভিন্ন এককের প্রশিক্ষণ, কর্মদক্ষতা, অভিজ্ঞতা এবং কাজ করার আগ্রহ বিভিন্ন হয় এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন এককের মজুরী বিভিন্ন হয়।

(vi) দ্রব্যের বাজার ও উপাদানের বাজার উভয় বাজারেই পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলেই এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু বাস্তবে পূর্ণ-প্রতিযোগিতা কদাচিৎ দেখা যায়। সুতরাং বাস্তব জীবনে, প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের কোন বিশেষ ভূমিকা নেই। তবে অধ্যাপক চেম্বারলীন (Chamberlin) দেখিয়েছেন যে যদি দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে সংশোধিত আকারে এই তত্ত্বটি প্রযোজ্য হবে। সেক্ষেত্রে উপাদানটির দাম তার VMPP-র সমান না হয়ে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের (MRP)-র সমান হবে। কিন্তু উপাদানের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, যেমন মনোপ্সনি (Monopsony), তবে কিন্তু এই তত্ত্বটি আদৌ খাটবে না। কারণ সেক্ষেত্রে উপাদানটির দাম তার VMPP এবং MRP উভয়র তুলনায় কম হবে।

(vii) এই তত্ত্ব উপাদানের শুধু চাহিদার দিক নিয়ে আলোচনা করে এবং যোগানের দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। কিন্তু বাস্তবে দ্রব্যের ন্যায় কোনও উপাদানেরও দাম তার চাহিদা ও যোগান উভয় বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে। এই অর্থে এই তত্ত্বটি অসম্পূর্ণ।

(viii) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে উপাদানসমূহের সংমিশ্রণের অনুপাত সর্বদা পরিবর্তনশীল। যেক্ষেত্রে উপাদানসমূহের অনুপাত পরিবর্তন করা যায় না সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি প্রয়োগ করা যায় না। যেমন উৎপাদন পদ্ধতি যদি এরূপ হয় যে একটি যন্ত্রের

সঙ্গে সর্বদাই একজন শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় তাহলে যন্ত্রের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে শ্রমিকের সংখ্যা এক একক বাড়ান হলে কোনও অতিরিক্ত উৎপাদন হবে না এবং শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনও নির্ণয় করা যাবে না।

(ix) অনেক সময় এই তত্ত্বকে বর্তমানে আয়-বন্টনের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক উপাদান তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী দাম পায়। সুতরাং ধনী লোকের উৎপাদনশীলতা বেশি বলে তার আয়ও বেশি এবং দরিদ্র লোকের উৎপাদনশীলতা কম বলে তার আয়ও কম। কিন্তু এই যুক্তি কর্মগত বন্টন ও ব্যক্তিগত বন্টনের পার্থক্য বিবেচনা করে না। ধনী ব্যক্তিদের অধিক আয়ের কারণ অনেক সময়ই সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম, খুব কম ক্ষেত্রেই এটা অধিক উৎপাদনশীলতার ফল।

(x) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে সকল উপাদানকে যদি তাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী দাম দেওয়া হয় তবে মোট উৎপাদন নিঃশেষিত হয়ে যায়। সমহার প্রতিদানের নিয়ম (Constant returns to scale) কার্যকরী হলে গাণিতিক পদ্ধতি (Euler's Theorem) অনুযায়ী এটা প্রমাণ করা যায়। কিন্তু উৎপাদনক্ষেত্রে যদি ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (Increasing returns to scale) বজায় থাকে তবে প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী সকল উপাদানকে দাম দেওয়া হলে উপাদানগুলির মোট প্রাপ্য মোট উৎপাদন অপেক্ষা বেশি হবে। অপরপক্ষে উৎপাদন ক্ষেত্রে যদি কেবলমাত্র ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের বিধি (decreasin returns to scale) কার্যকরী হয়, তবে সম্পূর্ণভাবে সমজাতীয় সকল উপাদানকে যদি তাদের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অনুযায়ী দাম দেওয়া হয় তবে তাদের প্রতিও ন্যায়বিচার করা হবে এবং পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে উৎপাদকের মুনাফাও সর্বাধিক হবে।

৫৮.৩.২ প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘকালীন ভারসাম্য (Long Run Equilibrium Under Marginal Production Theory)

স্বল্পকালে পরিবর্তনশীল উপাদানটি যে পরিমাণ নিয়োগ করা হবে তাতে ফার্মের স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা হতে পারে, ঠিক স্বাভাবিক মুনাফা হতে পারে, আবার স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম মুনাফা অর্থাৎ লোকসানও হতে পারে। পরিবর্তনশীল উপাদানটিকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তা যদি ঐ উপাদানটির গড় নীট আয় উৎপন্ন (Average Net Revenue Product) অপেক্ষা কম হয় তবে স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা (Supernormal Profit) অর্জন করা হবে; উপাদানটির দাম যদি তার গড় নীট আয় উৎপন্নের সমান হয় তবে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করা হবে; উপাদানটির দাম যদি গড় নীট আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হয় তবে নিয়োগকারী ফার্মের লোকসান হবে। [অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিবর্তনশীল উপাদানটি নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্মের মোট যে আয় উপার্জিত হবে তাকে ঐ পরিবর্তনশীল উপাদানটির মোট আয় উৎপন্ন বলে। ঐ মোট আয় উৎপন্ন থেকে পরিবর্তনশীল উপাদানটি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের জন্য যে ব্যয় হয়, তা বাদ দিলে পরিবর্তনশীল উপাদানটির "মোট নীট আয় উৎপন্ন" (Total Net Revenue) পাওয়া যায়। এই "মোট নীট আয় উৎপন্নকে পরিবর্তনশীল উপাদানটির পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে ঐ উপাদানটির গড় নীট আয় উৎপন্ন নির্ণয় করা যায়। কিন্তু দীর্ঘকালে ফার্মগুলির অবাধ প্রবেশ এবং প্রস্থানের ফলে এমন একটি অবস্থার

সৃষ্টি হবে যখন সবকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। স্বল্পকালে পরিবর্তনশীল উপাদানটির দাম তার গড় নীট আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হলে নতুন নতুন ফার্ম শিল্পে প্রবেশ করবে। এর ফলে ঐ উপাদানটির চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং উপাদানটির দামও বৃদ্ধি পাবে। দাম বৃদ্ধি পেয়ে যখন তা উপাদানটির গড় নীট আয় উৎপন্নের সমান হবে তখন ফার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। অপরপক্ষে, পরিবর্তনশীল উপাদানটির দাম তার গড় নীট আয় উৎপন্ন অপেক্ষা বেশি হলে, পুরাতন ফার্মগুলি একে একে শিল্পপরিত্যাগ করে চলে যাবে, উপাদানটির চাহিদা কমে যাবে এবং তার পারিশ্রমিকও কমে যাবে। উপাদানটির দাম কমে গিয়ে যখন তা গড় নীট আয় উৎপন্নের সমান হবে তখন আবার ফার্মগুলি কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। সুতরাং দীর্ঘকালীন অবস্থায়, উপাদানটির দাম = উপাদানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন = উপাদানটির গড় নীট আয় উৎপন্ন।

৫৮.৪ উপাদানের দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্ব

বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে কেবলমাত্র উপাদানের চাহিদার দিকটিকে বিবেচনা করা হয় এবং যোগানের দিকটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়। এই কারণে এই তত্ত্বটিকে আর আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ উপাদানের দাম-নির্ধারণের সন্তোষজনক বা পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বরূপে গ্রহণ করতে রাজি নন। বর্তমান কালের লেখকগণ তাই "চাহিদা ও যোগান তত্ত্বের" মাধ্যমে উপাদানের দাম নির্ধারণ করার পক্ষপাতী। দ্রব্যের দাম যেভাবে তার চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে নির্ধারিত হয়, উপাদানের দামও ঠিক একই রকমভাবে নির্ধারিত হওয়া উচিত।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে আমরা দেখেছি যে উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হল তার উৎপাদনশীলতার দরুণ উপাদানটির নিয়োগকর্তা কখনই কোনও উপাদানকে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (Marginal Revenue Product) অপেক্ষা বেশি দাম দিতে সম্মত হবে না। সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ফার্ম একটি উপাদান ঠিক সেই পরিমাণ নিয়োগ করবে যেখানে উপাদানটির দাম তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হবে। [দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য পরস্পর সমান হয়, কিন্তু দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়।] সুতরাং কোন উপাদানের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখাই হবে একটি ফার্ম বা নিয়োগকর্তার দিক থেকে উপাদানটির চাহিদা রেখা। এই রেখাটি ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হবে, কারণ উপাদানটির নিয়োগ যত বাড়ান হবে ততই তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন হ্রাস পাবে। উপাদানটির একটি নির্দিষ্টি দামে বিভিন্ন ফার্ম উপাদানটি যে যে পরিমাণ নিয়োগ করতে চাইবে তার সমষ্টিই ঐ দামে সামগ্রিকভাবে উপাদানটির বাজার-চাহিদা নির্দেশ করবে। বিভিন্ন দামে উপাদানটির চাহিদা ফার্মের দিক থেকে বিভিন্ন হবে এবং ফার্মগুলির চাহিদার সমষ্টি হিসাবে উপাদানটির বাজার-চাহিদাও বিভিন্ন হবে। বিভিন্ন দামে যে বিভিন্ন বাজার-চাহিদা দেখা দেবে সেগুলিকে একটি রেখাচিত্রে স্থাপন করলে আমরা উপাদানটির বাজার চাহিদা রেখা পেতে পারি।

দ্রব্যের যোগান এবং উপাদানের যোগানের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। সকল উপাদানের যোগান প্রয়োজনমত বাড়ানো যায় না (যেমন জমির যোগান প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ, শ্রমের যোগান জনসংখ্যাবৃদ্ধির

উপর নির্ভরশীল, মূলধনের যোগান অতীত সঞ্চয়ের দ্বারা সীমিত ইত্যাদি) এবং অনেক সময়ই উপাদানের যোগান উপাদানের মালিকের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তবুও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে প্রতিটি উৎপাদনক্ষেত্রে উপাদানের একটি যোগান দাম থাকে। এই যোগান-দাম হল উপাদানটির সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)। বর্তমান কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হওয়ার ফলে উপাদানটি বিকল্প কর্মক্ষেত্রে উপার্জনের যে সুযোগ পরিত্যাগ করেছে সেটাই বর্তমান কর্মক্ষেত্রে উপাদানটি সুযোগ ব্যয় বা যোগান দাম নির্দেশ করে। কোন উপাদানকে বর্তমান কর্মক্ষেত্রে ধরে রাখতে হলে বিকল্প কর্মক্ষেত্রে সর্বাধিক যে দাম সে পেতে পারে বর্তমান কর্মক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে সেই দামটি দিতে হবে নচেৎ সে অন্যত্র চলে যাবে। সামগ্রিকভাবে হয়তো অনেক উপাদানের যোগানই অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষ বা শিল্প বিশেষের দিক থেকে যোগান মোটামুটি স্থিতিস্থাপক। উপাদানটির যোগান দাম অনুযায়ী উপাদানটিকে পারিশ্রমিক দিলেই উপাদানটির যোগান নিশ্চিত করা যায়।

কোনও উপাদানের দাম, তার চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের প্রভাবে স্থির হয়। উপাদানের প্রান্তিক আয়, উৎপন্ন রেখা থেকেই উপাদানটির সামগ্রিক চাহিদা রেখা পাওয়া যায়। উপাদানের সামগ্রিক যোগান-রেখা অবশ্য বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কোনও কোনও উপাদানের ক্ষেত্রে এই যোগান-রেখা সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক (অর্থাৎ দাম যাই হোক না কেন যোগান সর্বদা স্থির থাকে); আবার কোনও কোনও উপাদানের ক্ষেত্রে উপাদানটিকে বেশি দাম দেওয়া হলে তার যোগানও বেড়ে যায় অর্থাৎ যোগান রেখাটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়। উপাদানের চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে সেখানেই উপাদানের ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয়।

৫৮.৫ সারাংশ

উৎপাদন ফার্মের জন্য চারটি উপাদানের প্রয়োজন হয়—জমি, শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা। এই উপাদানগুলির উৎপাদনে কিছু অবদান থাকে এবং সেজন্য এরা দাম পেয়ে থাকে। এই চারটি উপাদান সম্মিলিতভাবে যে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার মোট মূল্যই এই উপাদানগুলির মধ্যে আয় হিসাবে বন্টিত হয়। জমি ব্যবহারের জন্য জমির মালিক যে দাম পায় তা হল খাজনা (Rent); শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে যা পায় তাকে বলা হয় মজুরি (Wages); ঋণমূলধনের জন্য ঋণদাতা যে দাম পায় তা হল সুদ (Interest) এবং উদ্যোক্তার সেবাকার্যের ও ঝুঁকিবহনের পুরস্কারকে বলে মুনাফা (Profit)। এই কারণে উপাদানের দাম নির্ধারণের তত্ত্বকে অর্থবিদ্যায় "ক্রিয়াগত বন্টনের তত্ত্ব" (Theory of functional distribution) বলা হয়।

উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর দামের ন্যায় চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে উপাদানের বাজারে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যার দরুণ উপাদানগুলির দাম নির্ধারণের জন্য স্বতন্ত্র একটি মূল্যতত্ত্বের প্রয়োজন হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ (i) দ্রব্যের চাহিদা হ'ল সরাসরি চাহিদা, কিন্তু উপাদানের চাহিদা হ'ল উদ্ভূত চাহিদা, দ্রব্যের চাহিদা থাকলেই এ দ্রব্য উৎপাদন করতে যে উপাদানের প্রয়োজন হয় তারও চাহিদা হবে; (ii) উপাদানের চাহিদা হল মূলত যুক্ত চাহিদা—একযোগে বহুসংখ্যক উপাদানের চাহিদা সৃষ্টি হল; (iii) কোন কোন উপাদানের যোগান ইচ্ছামত বাড়ানো যায় না। (যেমন জমির যোগান); (iv) উপাদানের যোগানের ক্ষেত্রে উপাদানের মালিকের সবসময়

নিয়ন্ত্রণ থাকে না। (v) পৃথক পৃথক উপাদানের দাম নির্ধারণের জন্য পৃথক পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজন হয়; (vi) উপাদানের দাম নির্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনায় উপাদানের বাজার ও দ্রব্যের বাজার উভয় বাজার উভয় বাজারের প্রকৃতি বিবেচনা করতে হয়।

উৎপাদনকার্যে সহায়তা করে বলেই উপাদানের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং এই উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনশীল অনুযায়ী উপাদানকে দাম দেওয়া হয়। আমরা তিন প্রকারের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে পার্থক্য করতে পারি। অন্যান্য যাবতীয় উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে যদি একটি পরিবর্তনশীল উপাদান (ধরা যাক শ্রম) অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করা হয় তবে কোন দ্রব্যের মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বাড়ে তাকেই ঐ পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন বলে। এই প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে দ্রব্যটির বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তাকে ঐ পরিবর্তনশীল উপাদানটির প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য বলে। আবার অন্যান্য যাবতীয় উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করা হলে নিয়োগকারী উৎপাদকের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যে পরিমাণ বাড়ে তাকেই পরিবর্তনশীল উপাদানটির (শ্রমের) প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বলে। প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে প্রান্তিক আয় দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তাই হবে এই প্রান্তিক আয় উৎপন্ন। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে দাম এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান হয় এবং উপাদানের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান হয়। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে প্রান্তিক আয় দ্রব্যের বাজার দাম অপেক্ষা কম হবে এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হবে।

দ্রব্যের বাজার এবং উপাদানের বাজার—উভয় বাজারেই যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে নিয়োগ কর্তার মুনাফা সেখানেই সর্বাধিক হবে যেখানে (i) উপাদানের দাম = উপাদানটির প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) এবং (ii) এই VMPP রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে অবশ্যই নিম্নগামী হবে। দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (মনোপলি) এবং উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে নিয়োগকর্তার ভারসাম্য অবস্থায় উপাদানটির দাম তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের (MRP) সমান হবে এবং প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হবে। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, কিন্তু উপাদানের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (মনোপ্সনি—একজন ক্রেতা বহুসংখ্যক বিক্রেতা) থাকলে উপাদানটির দাম তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (= প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য) অপেক্ষা কম হবে।

বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের যথার্থতা নিয়ে অর্থনীতিবিদ্গণ প্রশ্ন তুলেছেন এবং তত্ত্বটি নানাদিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ বলে তাঁরা দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ যে অনুমানগুলির উপর ভিত্তি করে এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেই অনুমানগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই তত্ত্বটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে এই তত্ত্বটি উপাদানের যোগানের দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবলমাত্র চাহিদার দিক নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু বাস্তবে দ্রব্যের ন্যায় উপাদানের দাম ও চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে নির্ধারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে তার উৎপাদনশীলতার উপর এবং যোগান নির্ভর করে স্থানান্তর আয় বা সুযোগ ব্যয়ের উপর। যেখানে চাহিদা ও যোগান রেখাদ্বয় পরস্পরকে ছেদ করে সেখানেই উপাদানটির ভারসাম্য দাম এবং নিয়োগের পরিমাণ একযোগে নির্ধারিত হয়।

৫৮.৬ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় উপাদানের দাম কিভাবে নির্ধারিত হয়?

২। সংক্ষেপে বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। এর ত্রুটিগুলি কি কি?

৩। উপাদানের দাম নির্ধারণের আধুনিক তত্ত্বটি (অর্থাৎ চাহিদা ও যোগান তত্ত্বটি) ব্যাখ্যা করুন।

৪। কোনও উপাদানের দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হওয়ার প্রবণতা থাকে—ব্যাখ্যা করুন।

৫। বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্বের মূল অনুমানগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ

১। উপাদানের দাম নির্ধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র দাম-তত্ত্বের প্রয়োজন হয় কেন?

২। বিভিন্ন ধরনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার মধ্যে পার্থক্য করুন।

৩। কর্মগত বন্টন ও ব্যক্তিগত বন্টনের মধ্যে পার্থক্য কি?

৪। বন্টনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় একটি ফার্মের ভারসাম্যের শর্ত কী হবে?

৫। যদি প্রতিটি উপাদানকে তার প্রান্তিক উৎপাদন অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তবে কোন্ পরিস্থিতিতে মোট উৎপাদন নিঃশেষিত হয়ে যাবে? কোন্ পরিস্থিতিতেই বা মোট উৎপাদন কম পড়বে বা বেশী হয়ে যাবে?

৬। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটিকে সমাজে আয় বন্টনের যে বৈষম্য রয়েছে সেটা সমর্থন করার জন্য ব্যবহার করা হয়—ব্যাখ্যা করুন।

বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য হল প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন × দ্রব্যের দাম। প্রান্তিক আয় উৎপন্নকে কিভাবে প্রকাশ করা যায়?

২। কি ধরনের বাজার বর্তমান থাকলে উপাদানের দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হয়?

৩। কোন্ ধরনের বাজারে উপাদানের দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য, উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, কিন্তু প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়?

৪। বাজারের কিরূপ পরিস্থিতিতে নিয়োগকর্তার ভারসাম্য অবস্থায় উপাদানের দাম তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন—উভয়ের তুলনায় কম হয়?

৫। বন্টন তত্ত্বে দ্রব্যের বাজার এবং উপাদানের বাজার উভয় বাজারকে বিবেচনা করা হয় কেন?

৬। উপাদানের গড় নীট উৎপন্ন কিরূপে নির্ণয় করা যায়?

একক ৫৯ ◆ খাজনা তত্ত্ব

গঠন

৫৯.০ উদ্দেশ্য

৫৯.১ চুক্তিবদ্ধ খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা

৫৯.২.১ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা

৫৯.২.২ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সমালোচনা

৫৯.৩ খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব

৫৯.৩.১ জমির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক খাজনা

৫৯.৩.২ মজুরীর মধ্যে খাজনার অংশ

৫৯.৩.৩ সুদের মধ্যে খাজনার অংশ

৫৯.৩.৪ মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ

৫৯.৪ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক

৫৯.৫ আধা খাজনা ও অপূর্ণাঙ্গ খাজনা

৫৯.৬ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও খাজনা

৫৯.৭ খাজনা তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য

৫৯.৮ সারাংশ

৫৯.৯ অনুশীলনী

৫৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- **চুক্তিবদ্ধ খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা কাকে বলে**
- **রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব কি**
- **খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব**
- **খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক**
- **খাজনা তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য**

৫৯.১ চুক্তিবদ্ধ খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনা

জমি জায়গা বা বাড়ীঘর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তে মালিককে যে টাকা দিতে হয় তাকে সাধারণ ভাষায় খাজনা বলে। এই খাজনা চুক্তিমত স্থির করা হয় এবং সেই কারণে একে বলা হয় চুক্তিবদ্ধ খাজনা (Contract rent)। অর্থনীতিতে যখন আমরা খাজনা নিয়ে আলোচনা করি তখন সেই খাজনা চুক্তিবদ্ধ খাজনা নয়, তা হল অর্থনৈতিক খাজনা।

জমি বা বাড়ির মালিক চুক্তি অনুযায়ী যে খাজনা পায় তার মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় অর্ন্তভূক্ত থাকে যা প্রকৃত অর্থে খাজনা নয়। যেমন জমি বা বাড়ির মালিক যে মূলধন নিয়োগ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে সে সুদ আদায় করে, খাজনা আদায় করার জন্য মালিককে যে পরিশ্রম করতে হয় তার জন্য সে মজুরি পেয়ে থাকে, হিসাবপত্র রাখার জন্য যদি কোনও খরচ হয় তার জন্যও সে কিছু অর্থ নিয়ে থাকে, ইত্যাদি। এগুলি হল মোট বা স্থূল খাজনার উপাদান। মোট চুক্তিবন্ধ খাজনা থেকে এগুলি বাদ দিলে নীট খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনা পাওয়া যায়। শুধুমাত্র জমির ব্যবহারের দরুণ জমির মালিককে যে দাম দিতে হবে, তাকেই অর্থনৈতিক খাজনা বলা হয়।

অর্থনৈতিক খাজনাকে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত হিসাবে গণ্য করা হয়। কোনও এক খণ্ড জমিতে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে একদিকে যেমন বিক্রয়লব্দ আয় পাওয়া যায় অন্যদিকে তেমনি ফসল উৎপাদন করতে গিয়ে কিছু ব্যয় বহন করতে হয়। মোট বিক্রয়লব্দ আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই অর্থনৈতিক খাজনা বলে। কৃষক যদি স্বয়ং জমি খণ্ডটির মালিক হয় তাহলে সে নিজেই এই উদ্বৃত্ত ভোগ করবে। আর যদি সে অন্যের জমিতে কাজ করে তবে জমির মালিক ঐ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করবে।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্ ডেভিড রিকার্ডোর মতে কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রেই ‘খাজনা’ বা উৎপাদকের উদ্বৃত্তের ধারণাটি প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ খাজনার ধারণাটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। যখন উৎপাদনের কোনও উপাদান যতটা ন্যূনতম দাম পেলে বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে রাজি থাকবে তার তুলনায় অতিরিক্ত কিন্তু উপার্জন করে তখন ঐ অতিরিক্ত উপার্জনটুকুই হল খাজনা। এই অতিরিক্ত উপার্জন শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রেই দেখা যায় না। মজুরি, সুদ ও মুনাফার মধ্যেও এই উদ্বৃত্ত উপার্জন থাকতে পারে।

৫৯.২ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব

৫৯.২.১ তত্ত্বটির ব্যাখ্যা ঃ

প্রখ্যাক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ডেভিড রিকার্ডো খাজনা সম্পর্কে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। রিকার্ডোর মতে জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা ব্যবহারের জন্য জমির উৎপন্নের যে অংশ জমির মালিককে দেওয়া হবে তাই হল খাজনা। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটির মূল ভিত্তি হল বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তি বা উর্বরতার তারতম্য। কতকগুলি জমিখণ্ড অন্যান্য জমিখণ্ডের তুলনায় অধিকতর উর্বর বলে তাদের উৎপাদন খরচ কম হয় এবং ঐ জমিগুলির মালিক কিছু উদ্বৃত্ত আয় উপার্জন করে। এই উদ্বৃত্তই হল খাজনা। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী খাজনা হল বিভিন্ন জমিখণ্ডের উর্বরতাশক্তির পার্থক্য জনিত আয়। কিরূপে খাজনার উদ্ভব হয় তা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো যেতে পারে।

ধরা যাক্ ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন এমন তিনটি জমি নেওয়া হল যাতে গম উৎপাদন করা সম্ভব। মনে করি, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে 100 টাকা বিনিয়োগ করে গম পাওয়া যায় 200 কিলোগ্রাম। উৎপাদিকা শক্তির দিক থেকে যে জমির স্থান দ্বিতীয় সেই জমিতে সম পরিমাণ অর্থ অর্থাৎ 1000 টাকা ব্যয় করে গমের উৎপাদন হয় 150 কিলোগ্রাম এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিতে 1000 টাকা ব্যয় করে পাওয়া যায় 100 কিলোগ্রাম গম।

জনসংখ্যার পরিমাণ যদি এমন থাকে যে 200 কিলোগ্রাম গম উৎপাদন করলেই সামগ্রিকভাবে লোকের

চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় তাহলে কেবলমাত্র প্রথম জমিখণ্ডটি চাষের আওতায় আনা হবে। সেক্ষেত্রে বাজারে গমের দাম হবে প্রতি কেজি 5 টাকা (পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় দাম গড় ব্যয়ের সমান হয়) দেশে যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে বেশি গম উৎপাদন করার প্রয়োজন দেখা দেবে এবং উর্বরতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত জমি খণ্ডটিকেও চাষের আওতায় আনা হবে। এবার দ্বিতীয় জমি খণ্ডটি চাষ করতে গড়গড়তা যে ব্যয় হয় তার সংকুলান করতে গেলে বাজারে দাম অন্তত 6.67 টাকা হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় জমিখণ্ডটিতে কোন উদ্বৃত্ত না হলেও প্রথম জমিখণ্ডটিতে উদ্বৃত্ত দেখা দেবে। প্রথম জমিখণ্ডটিতে উৎপাদিত 200 কিলোগ্রাম গম প্রতি কিলোগ্রাম 6.67 টাকা দরে বিক্রি করে মোট 1334 টাকা পাওয়া যাবে। সেক্ষেত্রে ঐ জমিতে খাজনার পরিমাণ দাড়াবে 334 টাকা (1334 টাকা—1000 টাকা) দ্বিতীয় জমি খণ্ডটিতে চাষ করা হল বলেই প্রথম জমিখণ্ডটিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনা পাওয়া গেল। এখন জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজারে গমের চাহিদা আরও বেড়ে গেল এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমিটিকেও চাষের আওতায় আনা হল। সেক্ষেত্রে বাজারে ফসলের দাম অবশ্যই প্রতি কিলোগ্রাম 10 টাকা হতে হবে। এ অবস্থায় সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার পরিমাণ দাঁড়াবে 100 টাকা [= 2000 টাকা — 1000 টাকা] এবং উর্বরতার দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত জমিটিতে খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে 500 টাকা [= 1500 টাকা—1000 টাকা]। অতএব আমরা দেখলাম ক্রমাগত নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমি চাষ করা হলে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিতে উদ্বৃত্ত বা খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে। যতগুলি জমি চাষের আওতায় আনা হয় তার মধ্যে নিকৃষ্টতম জমিটিতে কোনও খাজনা থাকবে না। এই জমিটিকেই প্রান্তিক বা খাজনা বিহীন জমি বলে। প্রান্তিক জমির তুলনায় চাষের অন্তর্গত অন্যান্য জমিতে যে উদ্বৃত্ত আয় হবে তাই হল খাজনা এবং যে জমির উৎপাদিকা শক্তি যত বেশি সেই জমিতে খাজনার পরিমাণও তত বেশি।

নিচের চিত্রে রিকার্ডোর পার্থক্য জনিত খাজনার ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করা হল।

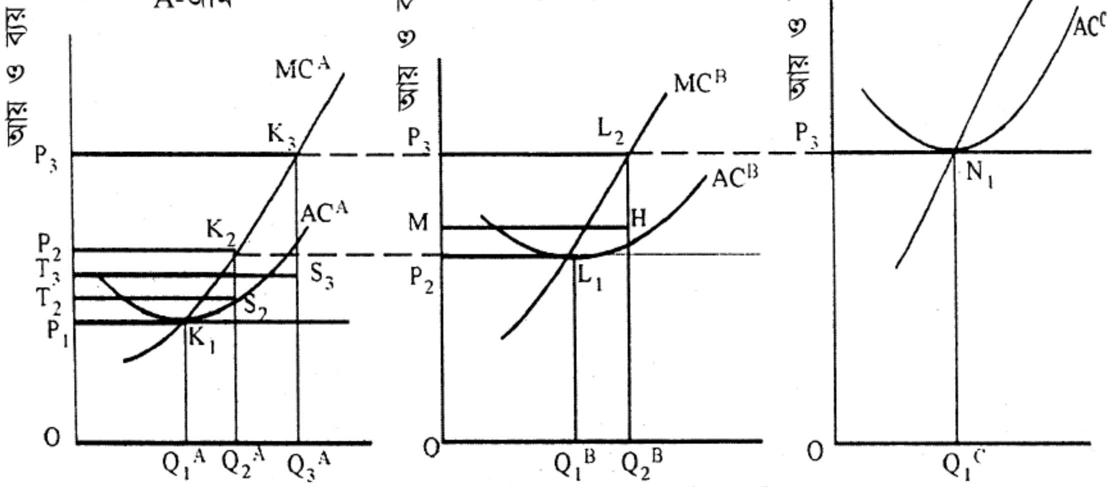

রেখাচিত্র ৫৯.১ : রিকার্ডোর পার্থক্য জনিত খাজনা

উপরের চিত্রে বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন তিনটি জমিখণ্ডকে ধরা হয়েছে—A জমিখণ্ড, B জমিখণ্ড এবং C জমিখণ্ড। তিনখণ্ড জমির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি উর্বরতা সম্পন্ন জমি হল A জমি, উর্বরতার দিক থেকে দ্বিতীয়

স্থানে অবস্থিত জমি হল B জমি এবং সর্বাপেক্ষা কম উর্বরতা সম্পন্ন জমি অর্থাৎ প্রান্তিক জমি হল C জমি। ধরা যাক্ প্রথমে বাজারে দ্রব্যের চাহিদা কম হওয়ায় দ্রব্যের দাম হল OP_1। এই দামে B জমি এবং C জমি চাষ করা হবে না, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই দামের তুলনায় গড় ব্যয় বেশি এবং ঐ জমি দুটিতে চাষ করলে উৎপাদকের লোকসান হয়। কেবলমাত্র A জমিখণ্ডটি চাষ করা হবে এবং K_1 বিন্দু অনুযায়ী উৎপাদন হবে OQ_1^A। K_1 বিন্দুতে ভারসাম্য হবে কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় দাম গড় ব্যয় এবং প্রান্তি ব্যয় উভয়ের সমান হবে। [AC^A রেখা হল গড় ব্যয় রেখা এবং MC^A রেখা হল প্রান্তিক ব্যয় রেখা] A জমিতে কিন্তু এখন কোনও উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবে না, কারণ দাম ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান। এবারে বাজারে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধরা যাক্ দাম হল OP_2। সেক্ষেত্রে B জমিটি চাষের আওতায় আসবে এবং L_1, বিন্দু অনুযায়ী B জমিতে OQ_1^B পরিমাণ উৎপাদন হবে। OP_2 দামে দ্রব্যটি OQ_1^B পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রি করা হলে B জমিতে কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাওয়া যাবে, কারণ L_1 বিন্দুতে দাম গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সমান। [AC^B এবং MC^B রেখা হল B জমিতে উৎপাদনের যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা।] OP_2 দাম হলে A জমিতে K_2 বিন্দু অনুযায়ী OQ_2^A পরিমাণ উৎপাদন করা হবে। মোট উৎপাদন ব্যয় হবে $OQ_2^A\ S_2T_2$ এবং মোট আয় হবে $OQ_2^AK_2P_2$। ফলে এই জমিতে এখন উদ্বৃত্ত বা খাজনার পরিমাণ দাঁড়াবে $T_2S_2K_2P_2$। B জমিতে কোন খাজনা বা উদ্বৃত্ত হবে না কারণ ঐ জমির ক্ষেত্রে দাম এবং গড় ব্যয় পরস্পর সমান।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধরা যাক দাম বৃদ্ধি পেয়ে নতুন দাম হল OP_3। এখন এই দামে C জমিটিও চাষের আওতায় আসবে। OP_3 দামে N_1 বিন্দু অনুযায়ী C জমিতে OQ_1^C পরিমাণ উৎপাদন হবে,কিন্তু দাম ও গড় ব্যয় পরস্পর সমান হওয়ায় এই জমিতে এখন কোনও উদ্বৃত্ত বা খাজনা হবেনা। [AC^c এবং MC^c হল যথাক্রমে C জমিতে উৎপাদনের গড় ব্যয় এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা।]। OP_3 দামে B জমিতে খাজনার পরিমাণ দাঁড়াবে $HML_2P_3(=OQ_2^BL_2P_3–OQ_2^BHM)$ এবং A জমিতে খাজনার পরিমাণ দাঁড়াবে $T_3S_3{}^KP_3(=OQ_3^AK_3P_3–OQ_3^AS_3T_3)$

আমরা দেখলাম দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উর্বরতা সম্পন্ন জমিতে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যায়। যে জমিটি প্রান্তিক জমি ছিল এবং আগেকার দামে যে জমিতে কোনও খাজনার সৃষ্টি হোত না, এখন নতুন দামে সেই জমিটি প্রান্তোর্ধ জমিতে পরিণত হবে এবং সেখানে খাজনার সৃষ্টি হবে।

রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুযায়ী জমির অবস্থানের তারতম্যের জন্যও খাজনার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন সমান উর্বরতা সম্পন্ন দুটি জমির একটি জমি বাজারের কাছে অবস্থিত এবং আর একটি জমি বাজার থেকে বেশ কিছুটা দূরে অবস্থিত। বাজারের কাছের জমি থেকে বাজারে ফসল নিয়ে আসতে পরিবহণ ব্যয় খুব কম হয় এবং দূরের জমিটি থেকে বাজারে ফসল নিয়ে আসতে পরিবহণ ব্যয় খুব বেশি হয়। অথচ উভয় জমির ফসলই একই দামে বিক্রি করা হয়। এই ফলে বাজারের কাছের জমিটি দূরের জমিটির তুলনায় কিছু উদ্বৃত্ত বা খাজনা ভোগ করে। এই জাতীয় খাজনাকে "অবস্থান জনিত খাজনা" (Situation rent) বলে।

ফ্রান্সে ফিজিওক্রাট (Physiocrats) নামক এক শ্রেণীর অর্থনীতিবিদগনের মতে প্রকৃতির বদান্যতার জন্য খাজনার সৃষ্টি হয়। কিন্তু রিকার্ডো এই ধারণার বিরোধিতা করে দেখান যে প্রকৃতির বদান্যতা নয় বরং

কৃপণতার জন্য খাজনার সৃষ্টি হয়। উৎকৃষ্ট জমির যোগান অসীম হলে নিকৃষ্ট জমি চাষ করার প্রয়োজন হোত না; ফলে খাজনার উদ্ভব ঘটত না। উৎকৃষ্ট জমি বেশি নেই বলে অর্থাৎ প্রকৃতি কৃপণ বলেই নিকৃষ্ট জমি চাষের আওতায় আসে এবং উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনা দেখা যায়।

রিকার্ডোর মতে খাজনা দামের দ্বারা নির্ধারিত হয় কিন্তু খাজনা কোনও মতেই দামকে নির্ধারণ করে না অর্থাৎ খাজনার দামের অঙ্গীভূত হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনও দ্রব্যের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে পান্তিক উৎপাদন ব্যয় বলতে প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয় বোঝায়। কিন্তু প্রান্তিক জমি হল এমন একটি জমি যাতে কোন খাজনা নেই। ফলে খাজনা দামের অন্তর্গত নয়। তবে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ফসলের দাম বৃদ্ধি পায় তখন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি চাষের আওতায় আসে এবং উৎকৃষ্ট জমি খণ্ডগুলিতে খাজনার সৃষ্টি হয়। অতএব দাম বৃদ্ধি পেলে যে জমিতে আগে খাজনার সৃষ্টি হোত না সে জমিতে খাজনার সৃষ্টি হবে এবং যে জমিতে আগে খাজনা ছিল সেই জমিতে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে। অতএব আমরা দেখলাম, খাজনা দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

৫৯.২.২ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সমালোচনা :

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌রা রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে নানা দিক থেকে সমালোচনা করেছেন।

(i) **মৌলিক এবং অবিনশ্বর শক্তি বলে কিছু নেই ঃ—**

বাস্তবে জমির কোন শক্তির মৌলিক এবং কোন শক্তি মৌলিক নয় তা নির্ধারণ করা কঠিন। আবার জমির যে কিছু অবিনশ্বর শক্তি আছে সেটাও মেনে নেওয়া যায় না। কৃষিকার্যের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়; অপরদিকে সার প্রয়োগ করে এবং উন্নত সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে জমির উর্বরতা শক্তি রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যায়। সুতরাং জমির মৌলিক অবিনশ্বর শক্তির জন্য খাজনার সৃষ্টি হয় এ কথা বলা ঠিক নয়। তবে এ কথাও ঠিক জমির কতগুলি উপাদান আছে যা মানুষ পরিবর্তন করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ—জমির অবস্থান, জমিতে বৃষ্টিপাত ও সূর্যকিরণের পরিমাণ ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা বলতে রিকার্ডো সম্ভবত এগুলিই বোঝাতে চেয়েছেন।

(ii) **খাজনাবিহীন বা প্রান্তিক জমির সন্ধান পাওয়া যায় না ঃ**

রিকার্ডো-কল্পিত খাজনা বিহীন জমি বা প্রান্তিক জমির সন্ধান বাস্তবে পাওয়া যায় না। এই সমালোচনার উত্তরে বলা যায়, প্রকৃত যে খাজনা দেওয়া হয়। তা জমিতে মূলধন প্রয়োগের সুদ বাবদ পাওনা ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাই আপাতদৃষ্টিতে প্রান্তিক জমিতে যে খাজনা দেওয়া হয় বলে মনে হয় সেটা অর্থনৈতিক খাজনা নয়, মূলধনের সুদ মাত্র।

(iii) **খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত নয় এ কথা সর্বদা ঠিক নয় ঃ**

রিকার্ডোর মতানুসারে খাজনা দামের অঙ্গিভূত নয়। তার কারণ ফসলের দাম প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু প্রান্তিক জমিতে কোনও উদ্বৃত্ত বা খাজনা থাকে না। তাই খাজনা দামের অর্ন্তভুক্ত হয় না। বরং ফসলের দাম বাড়লে ক্রমাগত নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জমি চাষ করা হয় এবং এর ফলে উৎকৃষ্ট জমিতে খাজনার পরিমাণ বাড়ে। অতএব খাজনা দামকে প্রভাবিত করতে পারে না। বরং খাজনা

দামের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা দেখিয়েছেন যে কোন ফার্মের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খাজনাকে অবশ্যই মোট ব্যয়ের অর্ন্তভুক্ত করা হয় এবং দাম নির্ধারণের সময়ও দামের মধ্যে খাজনাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কারণ খাজনা বাড়লে মোট উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দাম বাড়বে। অতএব খাজনা বাড়লে দাম বাড়বে।

(iv) **ক্রমপ্রসারের ধারণাটি ভ্রান্ত ঃ**

রিকার্ডোর মতে প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি, তারপর নিকৃষ্ট জমি, তারপর নিকৃষ্টতর জমি—এইভাবে জমির চাষ করা হবে। কিন্তু কেরী (Carey) ও রশার (Roscher) বলেন, উর্বরতা অপেক্ষা জমির অবস্থান বিচার করেই কৃষকরা জমি চাষ করে থাকে। নিকটবর্তী জমি সর্বাপেক্ষা আগে চাষ করা হয়। সে জমির উর্বরতা যাই হোক না কেন। এই সমালোচনার বিশেষ কোন মূল্য নেই কারণ কোন্ জমি আগে চাষ করা হল, এবং কোন্ জমি পরে চাষ করা হল সেটা খাজনার উদ্ভবের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন শ্রেণীর জমির উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেই রিকার্ডোর মতে খাজনার উদ্ভব হবে।

উপসংহার ঃ খাজনা সম্পর্কে রিকার্ডোর তত্ত্বটির নানা দিক থেকে সমালোচনা করা হলেও অধ্যাপক রর্বাট সনের (Robert Son) মতে রিকার্ডোর তত্ত্ব খাজনা সম্বন্ধে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান দেয় এবং সেইগুলি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের দিক থেকে প্রয়োজনীয়। তাই আধুনিক লেখকগণ রিকার্ডের খাজনা তত্ত্বকে পরিত্যাগ করেন নি। তারা খাজনার ধারণাটিকে প্রসারিত করেছেন মাত্র। রিকার্ডোর মতে কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রেই খাজনার উদ্ভব হয় কিন্তু আধুনিক লেখকদের মতে যাবতীয় উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনাজাতীয় অংশ থাকতে পারে।

৫৯.৩ খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্ব

(i) রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্গণ কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রে খাজনার বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু আধুনিক লেখকগণ একে ব্যাপকভাবে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করার পক্ষপাতী। খাজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল—যে এটি এক ধরনের উদ্বৃত্ত আয়। যখন কোন একটি উপাদান যতটা ন্যূনতম দাম পেলে বর্তমান নিয়োগে নিযুক্ত থাকতে সম্মত হবে তার তুলনায় অধিক উপার্জন করে থাকে, তখন এই ন্যূনতম আয়ের উপর যে অতিরিক্ত আয় বা উদ্বৃত্ত থাকে তাকেই অর্থনৈতিক খাজনা বলে অভিহিত করা হয়। যে ন্যূনতম দাম পেলে, উপাদানটি বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে রাজি থাকবে তাকে ঐ উপাদানটির যোগান দাম বা সুযোগ ব্যয় বা স্থানান্তর আয় বলে। বিকল্প কর্মক্ষেত্রে উপাদানটি সর্বাধিক যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে, তাই হল বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাদানটির যোগান দাম বা স্থানান্তর আয়। ন্যূনতম এই দামটি না পেলে উপাদানটি বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে স্থানান্তরিত করবে। অতএব অর্থনৈতিক খাজনা হল, কোনও উপাদানের যোগান দাম বা স্থানান্তর আয়ের উপর যে অতিরিক্ত আয় তাই।

অর্থনৈতিক খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয়ের উদ্ভব তখনই হতে পারে যখন কোনও উপাদানের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্তিতিস্থাপক হয়। এবং যখন ঐ উপাদানটি নির্দিষ্ট কোনও নিয়োগে বিশেষ উপযোগী হয়। কোনও উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে একই দামে ঐ উপাদানটির বিভিন্ন একক নিয়োগ কারা যায় এবং সেক্ষেত্রে উপাদানের প্রকৃত উপার্জন এবং তার যোগান দাম বা স্থানান্তর আয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য

থাকে না। ফলে সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় না। উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক না হলে, কোনও একটি কর্মক্ষেত্রে উপাদানটি যত বেশি পরিমাণে নিয়োগ করা হবে, ততই তার দাম বেড়ে যাবে এবং প্রথমদিকে উপাদানের যে এককগুলি নিযুক্ত ছিল তাদের আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত বা খাজনা জাতীয় আয় দেখা যাবে। দ্বিতীয়—যখন কোনও উপাদান বিশেষীকৃত ধরনের হয়, তখন একটিমাত্র কর্মক্ষেত্রেই উপাদানটি নিযুক্ত হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে উপাদানটির কোনও বিকল্প নিয়োগের সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ ঐ নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ঐ উপাদানটির যোগান দাম শূন্য হয়ে পরে। সেক্ষেত্রে উপাদানটি যা কিছু উপার্জন করবে, তার সম্পূর্ণটাই হবে অর্থনৈতিক খাজনা।

বিভিন্ন উপাদানের আয়ের মধ্যে, কিরূপ খাজনা জাতীয় অংশ দেখা যায়, তা নীচে দেখানো হল—

৫৯.৩.১ জমির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক খাজনা

রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল লেখকগণ ধরে নিয়েছেন যে কেবল একটা ফসল (গম) উৎপাদনের ক্ষেত্রেই যাবতীয় জমি ব্যবহার করা যায়। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে জমির কোনও যোগান দাম নেই। কারণ জমির কোনও বিকল্প ব্যবহার নেই। আবার একটা বিশেষ নিয়োগের ক্ষেত্রে জমি

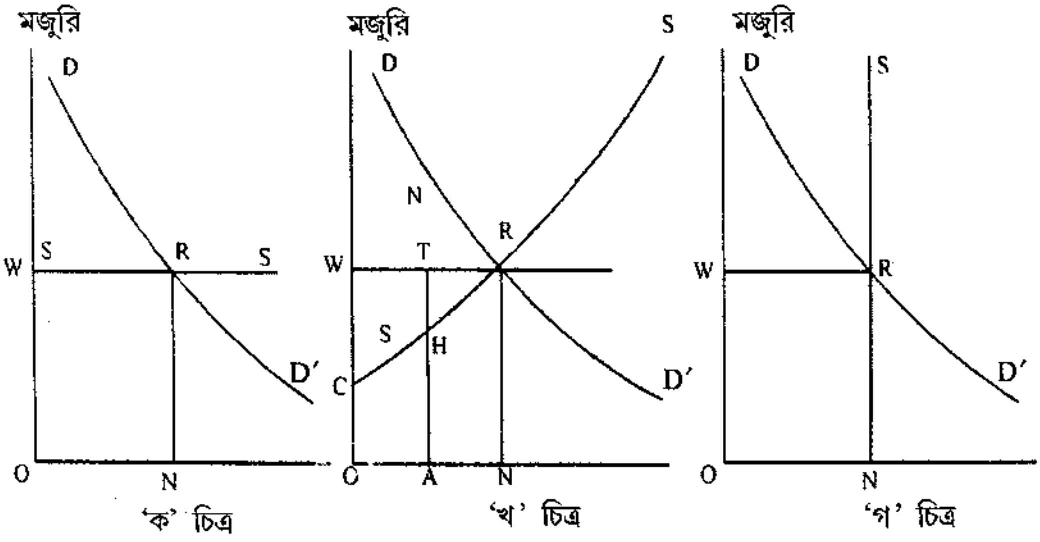

রেখাচিত্র ৫৯.২ : শ্রমের পরিমাণ

যেহেতু বিনির্দিষ্ট, সেইহেতু জমির আয়ের সম্পূর্ণ অংশই হল অর্থনৈতিক খাজনা। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে, কোনও ব্যক্তি বিশেষের বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, জমির নানাবিধ বিকল্প ব্যবহার আছে এবং যে কোনও একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে জমির ন্যূনতম যোগান দাম আছে। যেমন, কোনও এক খণ্ড জমিতে ধান, গম, তুলা প্রভৃতি নানাবিধ বিকল্প ফসলের চাষ হতে পারে। আবার ঐ জমিটি পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে বা কলকারখানা, বসত বাড়ি ইত্যাদি নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। ফলে কোনও একটি বিশেষ ব্যবহারে জমিটিকে কাজে লাগাতে হলে, অন্য ব্যবহারে জমির মালিক, জমিটি থেকে সর্বাধিক যে অর্থ উপার্জন করতে পারে, বর্তমান ব্যবহারকারীকে অন্ততঃ সেই অর্থ জমির মালিককে দিতে হবে। এই কারণে আধুনিক

লেখকগণের মতে জমির যোগান দাম বা স্থানান্তর আয় অবশ্যই থাকবে এবং ঐ স্থানান্তর আয়ের উপর যে অতিরিক্ত উপার্জন হবে তাই হবে জমির মালিকের অর্থনৈতিক খাজনা।

৫৯.৩.২ মজুরীর মধ্যে খাজনার অংশঃ

সকল শ্রমিকের যোগান অপেক্ষাকৃত অস্থিতিস্থাপক বা যে সকল শ্রমিকের সেবাকার্য বিনির্দিষ্ট বা যে সকল শ্রমিকের যোগানের তুলনায় চাহিদা অনেক বেশী সেইসকল শ্রমিকের মজুরীতে খাজনা জাতীয় উপাদানের বিশেষ প্রাধান্য দেখা যায়।

'ক' চিত্রে শ্রমের যোগান রেখা হল অনুভূমিক অর্থাৎ একটি বিশেষ নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান এখানে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক। শ্রমের প্রত্যেক এককের যোগান দাম অভিন্ন (OW-এর সমান)। DD' রেখা হল শ্রমের চাহিদা রেখা। চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে যে মজুরীর হার নির্ধারিত হোল তা হোল NR = OW। শ্রমিকের প্রকৃত উপার্জন এবং যোগান দাম পরস্পর সমান। অতএব এক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরির মধ্যে কোনও খাজনা জাতীয় উপাদান নেই।

'খ' চিত্রে শ্রমের যোগান রেখাটি ধনাত্মক চাপ সম্পন্ন হয়েছে অর্থাৎ কোনও একটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে বিচার করলে, সকল শ্রমিকের যোগান দাম এক হবে না। প্রথমদিকে যে সকল শ্রমিকেরা নিযুক্ত হবে, তাদের বিকল্প ক্ষেত্রে বেশি উপার্জন করার সুযোগ না থাকায়, তারা বর্তমান কর্মক্ষেত্রে অল্প মজুরিতে নিযুক্ত হতে রাজি থাকবে। অর্থাৎ তাদের যোগান দাম কম হবে। কিন্তু শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত যত বাড়ানো হবে, ততই বিকল্প কর্মক্ষেত্রে যে সকল শ্রমিকের বেশি উপার্জন করার সুযোগ ছিল, তাদের সেই ক্ষেত্রগুলি থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে, বর্তমান কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ যত বেশি বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হবে ততই শ্রমিকের যোগান দাম বেড়ে যাবে। 'খ' চিত্রে চাহিদা ও যোগান রেখা পরস্পর R বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারসাম্য মজুরির হার হবে NR = OW। OA-তম শ্রমিকের যোগান দাম হল AH, কিন্তু তার মজুরি বা প্রকৃত উপার্জন হল, AT = OW। অতএব এ ক্ষেত্রে OA-তম শ্রমিকের মজুরির মধ্যে খাজনা জাতীয় আয় হল, HT। মোট ON পরিমাণ শ্রমিকের মজুরির মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশ হবে CRW।

'গ' চিত্রে ধরা যাক, শ্রমিকের যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। একটা বিশেষ নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রমিক সম্পূর্ণ বিনির্দিষ্ট হলে এরূপ হতে পারে। এখানে শ্রমিকের যোগান দাম হল শূন্য। তাই ON সংখ্যক শ্রমিকের যা প্রকৃত উপার্জন (ONRW) তার সম্পূর্ণটাই হল অর্থনৈতিক খাজনা।

অতএব আমরা দেখলাম, শ্রমের যোগান যত বেশি অস্থিতিস্থাপক হবে, ততই শ্রমিকের আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশ বেশি হবে।

কোনও কোনও শ্রমিক বিশেষ নৈপুণ্য বা বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অনেক বেশি উপার্জন করে। একে 'নৈপুণ্যের খাজনা' বা (Rent of ability) বলা হয়। এ ছাড়া যোগানের তুলনায় সমাজের চাহিদা বেশি বলে, প্রখ্যাত চিত্র তারকা বা গায়ক বা খেলোয়াড় প্রভৃতি ব্যক্তিদের আয়ে একটা বিরাট উদ্বৃত্ত বা খাজনার অংশ দেখা যায়। বিকল্প কাজের সুযোগ বিশেষ নেই বলে, কোন প্রখ্যাত অন্ধ গায়কের আয়ের সম্পূর্ণ অংশই উদ্বৃত্ত বা খাজনা হয়ে পরে।

৫৯.৩.৩ সুদের মধ্যে খাজনার অংশ

ধরা যাক কোনও ব্যক্তির সঞ্চয়ের পরিমাণ বেশি বলে সে 5% সুদের হারে **ঋণ মূলধন** যোগান দিতে (অর্থাৎ টাকা ধার দিতে) রাজি আছে। কিন্তু যে সকল সঞ্চয়কারীর বিকল্প ব্যবহারে ঋণ মূলধন খাটিয়ে 5% অপেক্ষা বেশি সুদ আয় করার সুযোগ আছে, তার 5% সুদে ঋণ মূলধন যোগান দিতে রাজি হবে না। বাজারে ঋণ মূলধনের চাহিদা অনেক বেড়ে যাওয়ায়, যারা 5% সুদে ঋণ মূলধন যোগান দিতে রাজি নয়, তাদের কাছ থেকে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করার জন্য সুদের হার বাড়িয়ে, ধরা যাক, 6% করা হল। সেক্ষেত্রে যারা 5% সুদে টাকা যোগান দিতে রাজি ছিল, তারাও 6% সুদ পাবে এবং তাদের সুদের মধ্যে 1% হবে খাজনা জাতীয় আয়। তবে প্রান্তিক ঋণ মূলধন সরবরাহকারীর (যে ব্যক্তি 6% সুদ না পেলে টাকা ধার দিতে রাজি ছিল না) আয়ের সম্পূর্ণই হবে যোগান দাম। অর্থাৎ তার সুদের মধ্যে খাজনা জাতীয় কোনও অংশ থাকবে না।

৫৯.৩.৪ মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ

স্বল্পকালীন সময়ে সুদক্ষ ও কুশলী উদ্যোক্তার যোগান সীমাবদ্ধ থাকার জন্য ঐ সকল উদ্যোক্তারা উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করতে পারে। অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফার অধিক আয় উপার্জন করতে সক্ষম হয়। ঐ উদ্বৃত্ত আয় হল, মুনাফার মধ্যে খাজনার অংশ। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, উদ্যোক্তাদের মধ্যে পরিচালনার যোগ্যতার তারতম্য থাকে। কোনও উদ্যোক্তার পরিচালন শক্তি এমন, যে সে কোনওক্রমে স্বাভাবিক মুনাফাটুকু আয় করতে পারে। তাকে বলে প্রান্তিক উদ্যোক্তা। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ (প্রান্তোর্দ্ধ উদ্যোক্তাগণ) প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিকতর মুনাফা অর্জন করতে পারে, অতএব সেই উদ্বৃত্তকে খাজনা রূপে গণ্য করা চলে। **স্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্যোক্তার ন্যূনতম যোগান দাম।** স্বাভাবিক মুনাফার তুলনায় যতটুকু বেশি মুনাফা উদ্যোক্তা উপার্জন করবে, সেইটুকুই হবে তার অর্থনৈতিক খাজনা।

সুতরাং দেখা যায়, মজুরী, সুদ ও মুনাফার মধ্যেও খাজনার উপাদান দেখা দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে জমির খাজনা ও অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত অংশ একই বৃহৎগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কোনও একটি নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি উপাদানের যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা বা বিনির্দিষ্টতার জন্যই উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনার অংশ দেখা যায়। জমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে যে উদ্বৃত্ত বা খাজনা দেখা দেয় তা স্বল্পকালীন সময়েই সম্ভব, কারণ দীর্ঘকালে কোনও একটি বিশেষ নিয়োগের ক্ষেত্রে উপাদানটির চাহিদা বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গে তার যোগানের বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রতিযোগিতার দরুণ খাজনা জাতীয় উদ্বৃত্ত আয়ের অবসান ঘটে। কিন্তু জমির আয়ের ক্ষেত্রে এই খাজনা দীর্ঘকালেও বজায় থাকে, কারণ জমির যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই সীমাবদ্ধ থাকে (জমি প্রকৃতির দান)। এই কারণেই অধ্যাপক মার্শাল জমির খাজনাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার না করে একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রধান শাখা (Leading species of large genus) হিসাবে গণ্য করার নির্দেশ দিয়েছেন।

৫৯.৪ খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক

রিকার্ডোর মতানুসারে খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না, বরং খাজনা দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। অধিক খাজনা অধিক দামের কারণ নয়—অধিক খাজনার কারণ হল অধিক দাম। তাই রিকার্ডো মন্তব্য করেছেন, খাজনা দেওয়া হয় বলে ফসলের দাম বেশি এ কথা ঠিক নয়, ফসলের দাম বেশি বলেই খাজনার উদ্ভব ও বৃদ্ধি হয়। রিকার্ডোর যুক্তিটি নিম্নরূপ।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে দ্রব্যের দাম তার প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় বলতে প্রান্তিক জমির (চাষের আওতায় আনা হয়েছে এমন সকল জমির মধ্যে নিকৃষ্টতম জমি) উৎপাদন ব্যয় বোঝায়। প্রান্তিক জমিতে কোনও উদ্বৃত্ত বা খাজনার উদ্ভব হয় না। সুতরাং খাজনা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের কোনও উপাদান হতে পারে না এবং তা দামের অঙ্গীভূতও হতে পারে না। অপর দিকে ফসলের চাহিদা বেড়ে গেলে তার দাম বেড়ে যাবে। যে নিকৃষ্টতর জমি পূর্বে প্রান্তনিম্ন জমি ছিল, যার গড় উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষাকৃত বেশি বলে যে জমিতে চাষ হত না, তা এখন চাষের আওতায় আসবে এবং এই অধিক উৎপাদন ব্যয় সম্পন্ন জমি প্রান্তিক জমিতে পরিণত হবে। আগে যে জমি প্রান্তিক জমি ছিল তা এখন প্রান্তোর্দ্ধ জমিতে পরিণত হবে এবং তাতে খাজনার উদ্ভব হবে। অন্যান্য যে সকল জমি আগে প্রান্তোর্দ্ধ জমি ছিল সে সকল জমিতেও খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে। অতএব দেখা গেল ফসলের চাহিদা ও দাম দ্বারা খাজনার পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

সামগ্রিক ভাবে সমাজের দিক থেকে চিন্তা করলে বা জমি একটি মাত্র ফসল উৎপাদনের উপযোগী ধরে নিলে রিকার্ডোর যুক্তিই ঠিক। জমি প্রকৃতির দান বলে জমির কোনও উৎপাদন ব্যয় থাকে না, এবং সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে জমির কোনও স্থানান্তর ব্যয় বা যোগান দাম নেই। সুতরাং জমির আয়ের সম্পূর্ণটাই উদ্বৃত্ত বা খাজনা এবং তা ফসলের দামকে প্রভাবিত করতে পারে না।

কিন্তু রিকার্ডোর এই যুক্তি ও বিশ্লেষণ আধুনিক লেখকরা গ্রহণ করেননি। তাঁদের মতে জমির কোনও যোগান দাম নেই, এ কথা সকল অবস্থাতেই ঠিক নয়। কোনও দেশের বা সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে জমির কোন যোগান দাম নাও থাকতে পারে; কিন্তু কোনও বিশেষ ব্যবহারের দিক থেকে বা কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষের দিক থেকে বিচার করলে জমির অবশ্যই যোগান দাম থাকবে। কোনও একটি বিশেষ শিল্পে বা ব্যবহারে জমি নিয়োগ করা হলে অন্য কোনও বিকল্প ক্ষেত্রে আর জমিটিকে পাওয়া যাবে না। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে জমিটিকে কাজে লাগাতে হলে অন্য শিল্পে বা ব্যবহারে জমিটি সর্বাধিক যে আয় উপার্জন করতে পারে তা ঐ জমি ব্যবহারকারী অবশ্যই জমির মালিককে দিতে বাধ্য। নতুবা জমি বিকল্প ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হবে, যেমন একই জমিতে গম চাষ, ধান চাষ বা পাট চাষ হতে পারে, আবার ঐ জমিতে কলকারখানা, সিনেমা হল বা বসত বাড়ি তৈরি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জমিটি যদি ধান চাষে ব্যবহার করতে হয় তা হলে অন্যান্য বিকল্প নিয়োগের ক্ষেত্রে জমিটি যে বিভিন্ন পরিমাণ আয় উপার্জন করতে পারে তার মধ্যে যেটি সর্বাধিক ধান চাষী অবশ্যই তা জমির মালিককে দিতে বাধ্য। ধান চাষীর দিক থেকে এই প্রদেয় অর্থই হল জমির স্থানান্তর ব্যয় বা সুযোগ ব্যয়। এ ব্যয় দামের অঙ্গীভূত। অর্থাৎ ধানের দাম থেকে অন্যান্য ব্যয়ের সাথে এই সুযোগ ব্যয়কেও মেটাতে হবে। তা না হলে জমি অন্যত্র ব্যবহূত হবে। জমির মালিককে যা কিছু দেওয়া হয় তাকেই যদি ব্যাপকার্থে খাজনা বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খাজনা দামের অন্তর্ভুক্ত হবে। এই কারণেই কেয়ার্ন ক্রস (Cairn Cross) মন্তব্য করেছেন, জমির একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে চাষ কার্যের প্রান্তসীমায় খাজনা ব্যয় বা দামের অন্তর্ভুক্ত নাও হতে পারে, কিন্তু জমির একাধিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থানান্তরের প্রান্তসীমায় খাজনা ব্যয় ও দামের অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে।

আবার কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে মজুরী, সুদ ও কাঁচা মালের দামের ন্যায় খাজনাও উৎপাদনের একটি প্রয়োজনীয় ব্যয়। কারণ জমির মালিককে খাজনা

না দিলে জমি ব্যবহার করা যাবে না। দাম নির্ধারণের সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিক এই খাজনাকেও দামের অন্তর্ভুক্ত করে থাকে। এবং সে যদি এই দাম থেকে তার মোট ব্যয় (উৎপাদন ব্যয় ও খাজনা) তুলতে না পারে তবে সে দীর্ঘকাল ধরে উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা গেল সমাজের বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে বা জমির একটি মাত্র ব্যবহার আছে এরূপ ধরে নিয়ে বিচার করলে জমির খাজনা উৎপাদন ব্যয় ও দামের অঙ্গীভূত হয় না। কিন্তু কোনও প্রতিষ্ঠান বিশেষের বা জমির নানাবিধ বিকল্প ব্যবহারের কোনও একটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খাজনা উৎপাদন ব্যয় ও দামের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কারণে অধ্যাপক স্যামুয়েলসন (Samuelson) মন্তব্য করেছেন—"জমির খাজনা দাম নির্ধারণকারী ব্যয় হবে কিনা তা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার করা হচ্ছে তার উপর।"

৫৯.৫ আধা খাজনা ও খাজনা

যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুণ অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয়। জমির ক্ষেত্রে স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই যোগান সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক বা সীমাবদ্ধ থাকায় (জমি প্রকৃতির দান) স্বল্পকাল এবং দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই জমি থেকে খাজনা বা উদ্বৃত্ত আয় পাওয়া যায়।

কিন্তু জমি ছাড়াও অন্যান্য কতগুলি উপাদানের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন সময়ে যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা দেখা দেয় এবং তার ফলে কিছু উদ্বৃত্ত আয়ের সৃষ্টি হয়। এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক মার্শাল (Marshall) সর্বপ্রথম আধা খাজনা ও অপূর্ণাঙ্গ খাজনার ধারণাটি বিশ্লেষণ করেন। মনুষ্য-সৃষ্ট স্থায়ী যন্ত্রপাতি ও মূলধন সামগ্রীর যোগান দীর্ঘকালের স্থিতিস্থাপক হয়। অর্থাৎ দীর্ঘকালের চাহিদানুযায়ী এদের যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি করা সম্ভবপর। কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে এদের যোগান অস্থিতিস্থাপক। যোগানের অস্থিতিস্থাপকতার দরুণ এ সকল সম্পদ থেকে স্বল্পকালীন সময়ে যে আয় হয়, তা নির্ভর করে এদের চাহিদার ওপর। চাহিদা বাড়লে আয় বাড়বে। চাহিদা কমলে আয় কমে যাবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ সকল উপাদানের যোগান বৃদ্ধি পায় বলে তখন এদের আয় স্বাভাবিক আয়ের সমান হয়ে পড়ে এবং তখন এদের আয়ের মধ্যে উদ্বৃত্ত আয় বা খাজনা জাতীয় উপাদান আর দেখা যায় না। স্বল্পকালীন সময়ে যন্ত্রপাতির আয় অনেকটা জমি থেকে যে উদ্বৃত্ত আয় হয় তার অনুরূপ। তাই একে 'খাজনা' বলা হয়েছে; কিন্তু দীর্ঘকালীন সময়ে প্রতিযোগিতার ফলে এই উদ্বৃত্ত আয় থাকে না। তাই একে অপূর্ণাঙ্গ বা 'আধা খাজনা' বলা হয়েছে। যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই আধা খাজনা দেখা দিতে পারে। হঠাৎ যদি কোনও কারণে শহরাঞ্চলে বাড়ি-ঘরের চাহিদা বেড়ে যায়, তাহলে সাময়িকভাবে বাড়ি ভাড়া বহুগুণ বেড়ে যাবে। দীর্ঘকালে অবশ্য চাহিদা পূরণের জন্য অনেক নতুন বাড়ি-ঘর নির্মিত হবে; ফলে বাড়ি ভাড়া স্বাভাবিক পর্যায়ে নেমে আসবে। স্বল্পকালীন অবস্থায় বাড়ি ভাড়া বাবদ যে অতিরিক্ত আয় হবে তাকেই অপূর্ণাঙ্গ খাজনা বলে অভিহিত করা যায়। সুদক্ষ ও বিশেষীকৃত কর্মীর ক্ষেত্রেও এই ধারণাটি প্রয়োগ করা যায়। যেমন—হঠাৎ যদি ইঞ্জিনিয়ারের চাহিদা বেড়ে যায়, তাহলে তাদের আয় বিশেষ ভাবে বেড়ে যাবে। কিন্তু দীর্ঘকালে এই বাড়তি আয় উপার্জনের উদ্দেশ্যে অনেক নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ার পাশ করে বেরিয়ে আসবে এবং তার ফলে প্রতিযোগিতার দরুণ ইঞ্জিনিয়ারদের অতিরিক্ত আয় অন্তর্হিত হবে। স্বল্পকালে এই যে অতিরিক্ত আয়

ইঞ্জিনিয়াররা লাভ করে তা অপূর্ণাঙ্গ খাজনা ছাড়া কিছুই নয়।

স্বল্পকালে একটি ফার্মের স্থির ব্যয় সঙ্কুলান না হলে কোনও ক্ষতি নেই। কারণ, ফার্ম যদি স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ করে দেয় তাহলেও তাকে স্থির ব্যয় বহন করে যেতে হয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ফার্ম তার পরিবর্তনশীল ব্যয় তুলে নিতে পারবে, ততক্ষণ লোকসান হওয়া সত্ত্বেও ফার্ম তার উৎপাদন চালিয়ে যাবে। এখন স্বল্পকালে কোন কারণে দাম বেড়ে গিয়ে যদি এরূপ হয়, যাতে ফার্ম তার মোট স্থির ব্যয়ের একাংশ তুলে নিতে পারে, তবে পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উপর ফার্ম যতটুকু উদ্বৃত্ত উপার্জন করতে পারবে তাই হবে আধা-খাজনা। দীর্ঘকালে অবশ্য যাবতীয় ব্যয়ই তুলে নিতে হবে, কারণ লোকসান স্বীকার করে কোনও ফার্মই দীর্ঘকাল উৎপাদন চালিয়ে যেতে পারে না। আধা খাজনার উৎস হল কোনও ফার্মের এই স্থির ব্যয়। দীর্ঘকাল যেহেতু কোনও স্থির ব্যয় থাকে না, সব ব্যয়ই পরিবর্তনশীল, তাই দীর্ঘকালে আধা-খাজনা বলেও কিছু থাকে না। নীচের চিত্রে কীভাবে আধা খাজনার উৎপত্তি হয় তা দেখানো হল।

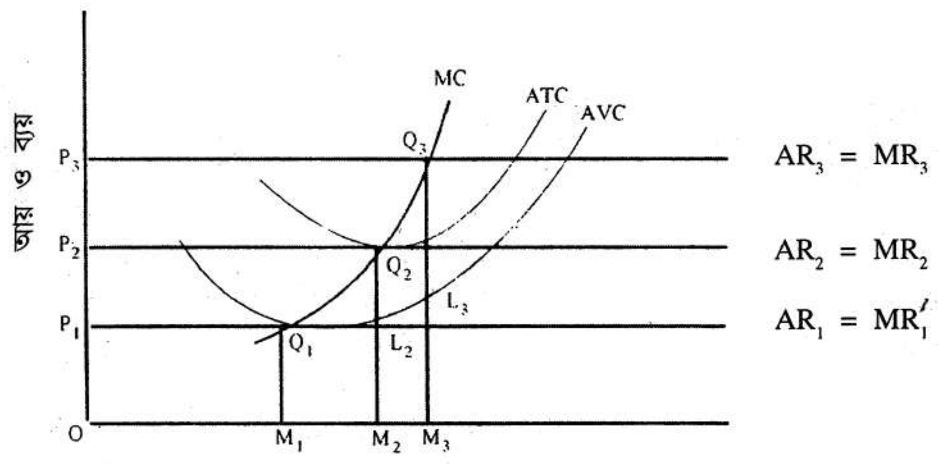

রেখাচিত্র ৫৯.৩ : দ্রব্যের পরিমাণ

উপরের চিত্রে AVC রেখা হল গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় রেখা। ATC রেখা হল গড় মোট ব্যয় রেখা এবং MC রেখা হল প্রান্তিক ব্যয় রেখা। AR = MR রেখা হল গড় আয় = প্রান্তিক আয় রেখা। দ্রব্যের দাম OP_1 হলে ফার্মের গড় আয় = প্রান্তিক আয় রেখা হবে $AR_1 = MR_1$ রেখা। Q_1 বিন্দুতে ফার্মের ভারসাম্য হবে, কারণ ঐ বিন্দুতে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে একটি ফার্মের ভারসাম্যের দুটি শর্তই [(i) দাম প্রান্তিক ব্যয় (ii) প্রান্তিক ব্যয় রেখা উর্ধ্বগামী] খাটছে। Q_1 বিন্দু অনুযায়ী ফার্ম দ্রব্যটি OM_1 পরিমাণ উৎপাদন করবে। এখানে দাম এবং গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় পরস্পর সমান। ফলে এখানে ফার্ম তার স্থির ব্যয়ের কোনও অংশই তুলতে পারবে না। এখানে আধা খাজনা হবে শূন্য। এখন দাম বেড়ে গিয়ে OP_2 হলে, ফার্ম তার পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সম্পূর্ণটা তুলে নিয়েও স্থির ব্যয়ের একাংশ নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে আধা খাজনার উদ্ভব ঘটবে। দাম যখন OP_2 তখন প্রতি এককে আধা খাজনা হবে L_2Q_2 এবং মোট আধা খাজনা হবে $L_2Q_2 \times OM_2$, দাম যখন আরও বেড়ে OP_3 হবে তখন প্রতি এককে তার আধা খাজনা হবে L_3Q_3 এবং মোট আধা খাজনা হবে $L_3Q_3 \times OM_3$ এখানে ফার্ম গড় মোট ব্যয়ও তুলে নিতে পারবে।

৫৯.৬ অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও খাজনা

কোন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান তিনটি নির্দেশক হল ঃ (i) জনসংখ্যা বৃদ্ধি (ii) পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং (iii) কৃষির উন্নয়ন। এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটির সঙ্গেই খাজনার সম্পর্ক রয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সাধারণতঃ খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিজ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে জমি প্রান্তনিম্ন জমি ছিল অর্থাৎ যে জমিতে এতকাল চাষ হোত না সে জমিও এখন চাষের আওতায় আসবে। বাজারে ফসলের দাম বেড়ে যাবে এবং এর ফলে প্রান্তোর্দ্ধ জমিতে খাজনার পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং যে জমি পূর্বে প্রান্তিক জমি ছিল সে জমিতেও খাজনা নামক, উদ্বৃত্ত দেখা দেবে। উপরন্তু, রাস্তাঘাট, রেলপথ, শহরাঞ্চল প্রভৃতি নির্মাণের ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যায় এবং এর ফলে জমির অপ্রাচুর্য জনিত খাজনার পরিমাণও বেড়ে যায়।

পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটলে বাজারের কাছে অবস্থিত জমি বাজার থেকে দূরে অবস্থিত জমি থেকে আর আগের মত অবস্থানগত সুবিধা ভোগ করতে পারবে না। এর ফলে বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত জমি এতদিন যে অবস্থানগত খাজনা ভোগ করে আসছিল তার পরিমাণ কমে যাবে।

কৃষির উন্নয়নের (উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি বা সারের প্রয়োগ) ফলে প্রতিখণ্ডে জমিতে ফসলের উৎপাদন বেড়ে পারে। সেক্ষেত্রে খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের যোগান বেড়ে যায়। এদের জন্য বাজারে চাহিদার পরিমাণ যদি না বাড়ে তা হলে এই কৃষিজাত দ্রব্যের দাম কমে যাবে। ফসলের দাম কমে গেলে যে জমি আগে প্রান্তিক জমি বা খাজনা বিহীন জমি ছিল সেই জমি প্রান্ত-নিম্ন জমিতে পরিণত হবে, প্রান্তোর্ধ জমি প্রান্তিক জমি হয়ে পড়বে এবং প্রান্তোর্ধ জমিতে খাজনার পরিমাণ কমে যাবে। আবার কৃষির উন্নয়ন যদি কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট জমির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে তবে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট জমির মধ্যে গুণগত পার্থক্য বেড়ে যাবে এবং উৎকৃষ্ট জমিতে পার্থক্যজনিত খাজনার পরিমাণও বেড়ে যাবে। অপরপক্ষে যদি কেবলমাত্র নিকৃষ্ট জমি খণ্ডগুলিই কৃষির উন্নয়নের সুফলগুলি পায় তবে বিভিন্ন ধরনের জমির মধ্যে উৎকর্ষের পার্থক্য কমে আসবে। ফলে উৎকৃষ্টতর জমির খাজনা কমে আসবে।

পরিশেষে, যে কোনও প্রকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে জনগণের জীবনযাত্রার মানেরও উন্নতি ঘটে। জনসাধারণের আয় ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটলে খাদ্যশষেস্যর উপর তাদের ব্যয়ের অনুপাত কমে যায়। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায় খাদ্যশষেস্যর আপেক্ষিক দাম কমে যায় ও কৃষিজমিতে খাজনার পরিমাণও কমে যায়।

৫৯.৭ খাজনা তত্ত্বের সামাজিক তাৎপর্য্য ঃ

খাজনা হল উদ্বৃত্ত ও অনুপার্জিত আয়। জমির মালিকের কোনওরূপ প্রচেষ্টা এবং ত্যাগ স্বীকার ব্যতিরেকেই তার পক্ষে এই উদ্বৃত্ত করা সম্ভব হয়। জমি প্রকৃতির দান এবং জমির যোগান স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক। জমির মালিককে খাজনা দেওয়া না হলেও জমির যোগানের কোনও পরিবর্তন হয় না। এই কারণে খাজনা হ'ল করস্থাপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। অন্যান্য উপাদানের আয়ের উপর করধার্য করা হলে সেই উপাদানের যোগানের উপর কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। লোকের কর্মস্পৃহা (মজুরী), সঞ্চয়ের ইচ্ছা (সুদ), ঝুকি গ্রহণের প্রবণতা (মুনাফা) ইত্যাদি কমে যেতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণ কমে যেতে পারে। কিন্তু জমির আয় বা খাজনার উপর

করধার্য করা হলে এ ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কোনটিই ঘটবে না। বরং এই কর ধার্য করা হলে সমাজ দুভাবে লাভবান হবে—সমাজে আয়-বৈষম্য হ্রাস পাবে এবং জমির অলস মালিকেরা নিরুপায় হয়ে অন্য কোনও জীবিকা অর্জনে সচেষ্ট হবে।

জমির খাজনার উপর কর ধার্যের বিরুদ্ধেও কয়েকটি যুক্তি দেখানো হয়।

১। জমি থেকে প্রাপ্ত খাজনার সবটাই হয়ত উদ্বৃত্ত আয় নয়। চুক্তিবদ্ধ খাজনার মধ্যে মূলধনের সুদ, জমির মালিকের শ্রমের মজুরি ইত্যাদিও থাকতে পারে। মোট খাজনা থেকে বিশুদ্ধ খাজনা নির্ধারণ করে কেবলমাত্র ঐ বিশুদ্ধ খাজনা বা অর্থনৈতিক খাজনার উপরই করস্থাপন করা যেতে পারে।

২। মাত্র জমির ক্ষেত্রেই উদ্বৃত্ত আয় দেখা দেয় না, অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যেও উদ্বৃত্ত থাকতে পারে। অন্যান্য উদ্বৃত্ত আয়কে কর থেকে অব্যাহতি দিয়ে কেবলমাত্র জমির খাজনার উপর কর বসানো হলে বিভেদমূলক আচরণ করা হবে।

উপসংহারে বলা যায় জমির আয়ের যে অংশে অনুপার্জিত অর্থাৎ যে অংশ প্রকৃত অর্থেই অর্থনৈতিক খাজনা ও কর ধার্যের উপযুক্ত ক্ষেত্র। বর্তমানে সমাজ-কল্যাণকর রাষ্ট্রে এ ধরনের উদ্বৃত্তের উপর কর ধার্যের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

৫৯.৮ সারাংশ

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণ জমি ব্যবহারের জন্য যে দাম দেওয়া হয় তাকেই খাজনা বলে অভিহিত করেছেন। কৃষক-প্রজা যখন জমির মালিককে জমি ব্যবহারের জন্য চুক্তি অনুযায়ী খাজনা দেয় তা কিন্তু চুক্তিবদ্ধ খাজনা। এই চুক্তিবদ্ধ খাজনার মধ্যে শুধুমাত্র জমির ব্যবহারের জন্য দেয় ছাড়াও সুদ, মজুরি ইত্যাদি থাকতে পারে। চুক্তিবদ্ধ খাজনা থেকে এই সুদ, মজুরি ও হিসাবপত্র রাখার জন্য জমির মালিকের যা খরচ হয় তা বাদ দিলে অর্থনৈতিক খাজনা পাওয়া যায়। এই অর্থনৈতিক খাজনা হল উৎপাদকের উদ্বৃত্ত। রিকার্ডোর মতে কেবলমাত্র জমি থেকে জমির মালিক যে উদ্বৃত্ত উপার্জন তাই হ'ল খাজনা। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ এই খাজনার ধারণাটিকে প্রসারিত করেছেন এবং তাঁরা দেখিয়েছেন যে জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় উপাদান বা উদ্বৃত্ত থাকতে পারে।

রিকার্ডোর মতে জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতার জন্য জমির মালিককে উৎপাদনের যে অংশ দিতে হয়, তাই হল খাজনা। এই খাজনাকে পার্থক্যজনিত আয় হিসাবে গণ্য করতে হবে। বিভিন্ন জমির উৎপাদিকা শক্তি বিভিন্ন। চাষের কাজ একই পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে প্রান্তিক জমির (চাষের আওতায় যতগুলি জমি আনা হয়েছে তার মধ্যে নিকৃষ্টতম জমি) তুলনায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিতে যে অতিরিক্ত ফসল ফলান যায় তাকেই পার্থক্যজনিত খাজনা বলা যায়। ফিজিওক্র্যাট নামে ফ্রান্সের একদল অর্থনীতিবিদ্দের মতে প্রকৃতির কৃপণতার জন্যই খাজনার সৃষ্টি হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে খাজনার উদ্ভবের মূলে তিনটি কারণের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় ঃ (i) জমির যোগানের সীমাবদ্ধতা (ii) জমির উর্বরতার তারতম্য এবং (iii) জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন কার্যকারিতা। তা ছাড়া, জমির অবস্থানের তারতম্যের ফলেও খাজনার সৃষ্টি হয়ে থাকে। বাজার থেকে দূরে অবস্থিত একটি জমির তুলনায় বাজারের সন্নিকটে অবস্থিত জমি যে উদ্বৃত্ত আয় ভোগ করতে পারে তাকেই অবস্থানজনিত খাজনা বলা হয়।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হল ঃ

(i) রিকার্ডোর জমি চাষের যে ক্রমপর্যায় দিয়েছেন—অর্থাৎ প্রথমে উৎকৃষ্ট জমি পরে নিকৃষ্টতর জমি, এবং সর্বশেষে নিকৃষ্টতম জমি চাষ করা হয়—তা ভ্রান্ত। (ii) জমির আদি ও অবিনশ্বর ক্ষমতা বলে কিছুই নাই। (iii) প্রান্তিক বা খাজনাবিহীন জমির সন্ধান বাস্তবে পাওয়া যায় না। (iv) জমিই একমাত্র উপাদান নয় যার যোগান সীমাবদ্ধ ও যা নির্দিষ্ট ব্যবহারে আবদ্ধ। জমি ব্যতীত অন্যান্য উপাদানও নির্দিষ্ট ব্যবহারে আবদ্ধ হতে পারে এবং তার যোগান অস্থিতিস্থাপক হতে পারে।

মিসেস্ জোন রবিনসন প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্গণ স্থানান্তর আয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক খাজনার ধারণাটি বিশ্লেষণ করেছেন। কোন একটি উপাদান ন্যুনতম যে দাম পেলে বর্তমান কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত হতে রাজি থাকবে তা হল ঐ স্থানটির যোগান দাম বা স্থানান্তর আয় বা সুযোগ ব্যয়। এই স্থানান্তর আয়ের অতিরিক্ত কোনও উপার্জন যদি সে বর্তমান কর্মক্ষেত্রে করতে পারে তবে এই বাড়তি উপার্জনটুকুই হবে বর্তমান কর্মক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক খাজনা। এই অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভবের কারণ হল : (i) উপাদানটির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম না হওয়া; (ii) বিশেষ একটি উৎপাদনক্ষেত্রে উপাদানটির বিনির্দিষ্টতা। কোন একটি উপাদানের যোগান একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে যদি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয় তবে একটি নির্দিষ্ট দামে উপাদানটির সকল একক সংগ্রহ করা যায় এবং সেক্ষেত্রে উপাদানটির প্রকৃত উপার্জন ও তার যোগান দাম বা স্থানান্তর আয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ উপাদানটির আয়ের মধ্যে কোনও অর্থনৈতিক খাজনা থাকবে না। অপরপক্ষে কোনও একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে একটি উপাদানের যোগান যদি সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক হয় অথবা উপাদানটি যদি বিনির্দিষ্ট হয় তবে ঐ কর্মক্ষেত্রে উপাদানটির কোনও যোগান দাম থাকবে না এবং উপাদানটির আয়ের সম্পূর্ণ অংশই হবে অর্থনৈতিক খাজনা। যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা এবং বিনির্দিষ্টতা যত বেশি হবে, উপাদানটির আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশও তত বেশি হবে।

রিকার্ডোর মতে খাজনা দামের অঙ্গীভূত হয় না, বরং খাজনা দামের দ্বারা নির্ধারিত হয়। খাজনা দেওয়ার জন্য শস্যের দাম বেশি হয় না, বরং শস্যের দাম বেশি হওয়ায় খাজনার উদ্ভব হয়। সামগ্রিকভাবে সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে জমির কথা চিন্তা করলে এবং জমি একটিমাত্র ফসল উৎপাদনে সক্ষম এরূপ ধরে নিলে রিকার্ডোর মতটিই সঠিক। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ শিল্পের বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে বিচার করলে জমির স্থানান্তর ব্যয় বা দাম উৎপাদন ব্যয়কে প্রভাবিত করে ফসলের দামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাই জমির খাজনা দাম-নির্ধারণকারী ব্যয় হবে কিনা তা নির্ভর করে কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিচার-বিবেচনা করা হয়েছে তার উপর।

যে কোনও উপাদানের আয়ের মধ্যে যে খাজনা জাতীয় উদ্বৃত্ত দেখা যায় তার মূলে রয়েছে একটি বিশেষ কর্মক্ষেত্রে উপাদানটির যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা। জমির ক্ষেত্রে এই যোগানের অস্থিতিস্থাপকতা স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই বজায় থাকে। তাই জমিতে যে খাজনা দেখা দেয় তা হল প্রকৃত খাজনা বা পূর্ণাঙ্গ খাজনা। কিন্তু জমি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের যোগান স্বল্পকালে অস্থিতিস্থাপক থাকলেও দীর্ঘকালে চাহিদাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপাদানটির আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশটি কমে যায়। উপাদানটির যোগান দীর্ঘকালের সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়লে ঐ উপাদানটির আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় কিছুই আর থাকবে না। স্বল্পকালে উপাদানটির যোগানের সীমাবদ্ধতার দরুণ যে উদ্বৃত্ত আয় হয় এবং যে আয় দীর্ঘকালে অন্তর্হিত হয়ে যায় তাকেই অধ্যাপক মার্শাল আধা-খাজনা বা অপূর্ণাঙ্গ-খাজনা আখ্যা দিয়েছেন।

৫৯.৯ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন

১। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

২। অর্থনৈতিক খাজনার ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন। ''জমির খাজনা একটি বৃহৎ গোষ্ঠীর প্রধান প্রজাতি মাত্র'' ব্যাখ্যা করুন।

৩। খাজনা সম্পর্কে আধুনিক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন। রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের পার্থক্য কি?

৪। দেখান যে যাবতীয় উপাদানের আয়ের মধ্যে খাজনা জাতীয় অংশ থাকতে পারে।

৫। অর্থনৈতিক খাজনার সঙ্গে উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করুন।

৬। খাজনা ও দামের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুণ। ''খাজনাকে দাম-নির্ধারণকারী ব্যয় হিসাবে গণ্য করা যাবে কিনা তা নির্ভর করে আমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করছি তার উপর''—ব্যাখ্যা করুন।

অথবা,

খাজনাকে সাধারণত ব্যয় হিসাবে গম্য করা হয়। রিকার্ডোর তত্ত্বে কিন্তু খাজনাকে পার্থক্যজনিত আয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই দুটি অভিমতের সামঞ্জস্য বিধান কি রূপে করবেন?

৭। খাজনা ও আধা-খাজনার মধ্যে পার্থক্য করুন। উভয়ের সঙ্গে উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতার সম্পর্ক কি?

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন

১। চুক্তিবদ্ধ খাজনা ও অর্থনৈতিক খাজনার মধ্যে পার্থক্য করুন।

২। ''উৎপাদনের যে কোনও উপাদানের যোগান সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক বলে উপাদানের সম্পূর্ণ আয়ই অর্থনৈতিক খাজনা হিসাবে গণ্য হবে''—ব্যাখ্যা করুন।

৩। উৎপাদনের উপাদানের যোগান কোন একটি দামে সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক হলে অর্থনৈতিক খাজনার পরিমাণ কি হবে? ব্যাখ্যা করুন।

৪। কর্ষণযোগ্য জমির উর্বরতার তারতম্যের দরুণ বিরূপে খাজনার উদ্ভব হয় তার একটি বর্ণনা দিন।

৫। আধা খাজনাকে ঐ নামে অভিহিত করা হয় কেন?

৬। অপ্রাচুর্যতা জনিত খাজনা ও পার্থক্যজনিত খাজনার মধ্যে পার্থক্য করুন।

(গ) বস্তু-ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। "প্রান্তিক জমি" বলতে কি বোঝায়?

২। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কি খাজনার কারণ হতে পারে?

৩। অবস্থানজনিত খাজনা বলতে কি বোঝায়?

৪। "স্থানান্তর আয়" কি?

৫। জমির মৌলিক ও অবিনশ্বর ক্ষমতা কি?

৬। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে আয়ের সম্পূর্ণটাই অর্থনৈতিক খাজনা হয়?

একক ৬০ ◆ মজুরী তত্ত্ব

গঠন

৬০.০ উদ্দেশ্য

৬০.১ প্রস্তাবনা

৬০.২ মজুরীর হারের তামতম্য

৬০.২.১ মজুরীর সমতাকারী পার্থক্য

৬০.২.২ মজুরীর বৈষম্যকারী পার্থক্য

৬০.৩ মজুরী নির্ধারণ

৬০.৩.১ জীবনধারণোপযোগী মজুরী তত্ত্ব

৬০.৩.২ জীবনযাত্রার মান তত্ত্ব

৬০.৩.৩ মজুরী-তহবিল তত্ত্ব

৬০.৩.৪ মজুরীর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

৬০.৩.৫ মজুরী নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব

৬০.৩.৬ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরীর হার নির্ধারণ

৬০.৪ শ্রমিক সংঘ ও মজুরী

৬০.৪.১ শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা ও শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী

৬০.৪.২ শ্রমিক সংঘ কি মজুরী বাড়াতে পারে

৬০.৪.৩ শ্রমিক সংঘের মজুরী বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা

৬০.৫ শ্রমের যোগান রেখা প্রকৃতি

৬০.৬ শ্রমিকের শোষণ বা বঞ্চনা

৬০.৭ সারাংশ

৬০.৮ অনুশীলনী

৬০.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন

- আর্থিক মজুরী ও প্রকৃত মজুরী কাকে বলে

- মজুরীর হারের তারতম্য কিভাবে হয়
- শ্রমিক সংঘ ও মজুরীর মধ্যে সম্পর্ক কি
- শ্রমের যোগান রেখার প্রকৃতি কিরূপ
- শ্রমিকের শোষণ বা বঞ্চনার রূপ

৬০.১ প্রস্তাবনা

কোনও প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক বা দাম দেয় তাকে মজুরী বলে। এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক দুরকমই হতে পারে। শ্রমিককে তার কাজের বিনিময়ে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থের আকারে যে মজুরী দেওয়া হয় তাকে বলে আর্থিক মজুরী। তাই নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়ে শ্রমিক বাজারে গিয়ে যে পরিমাণ ভোগ্য দ্রব্যাদি বা সেবা সামগ্রী ক্রয় করে তা হল শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী। অনেক সময় শ্রমিককে তার মজুরীর এক অংশ টাকাকড়ির আকারে এবং অপর অংশ দ্রব্য সামগ্রীর মাধ্যমে দেওয়া হয়। যেমন আমাদের দেশে কৃষিকার্যে যে সমস্ত শ্রমিক নিযুক্ত থাকে অনেক সময় জমির মালিক তাকে যেমন প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তেমনি তার খোরাকি বাবদ কিছু চাল বা সব্জিও প্রদান করে। আবার অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যতীত শ্রমিককে তার বসবাসের জন্য বাড়ি, চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধা, কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসা এবং বাড়িতে পৌঁছ দেওয়ার জন্য গাড়ি এবং সস্তায় খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদি অনেক প্রকার সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী নির্ণয় করতে গেলে শুধু তাকে কতটা অর্থ প্রদান করা হয় তা বিচার করলেই চলে না, এই সমস্ত সুযোগ-সুবিধারও হিসাব করতে হয়।

শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী নিম্নলিখিত চারটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

1. **শ্রমিকের আর্থিক মজুরীর পরিমাণ ঃ** অন্যান্য যাবতীয় বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে শ্রমিকের আর্থিক মজুরী যত বেশি হবে তার প্রকৃত, মজুরীও তত বেশি হবে।

2. **টাকাকড়ির ক্রয় শক্তি ঃ** শ্রমিকের আর্থিক মজুরী অপরিবর্তিত থেকে শ্রমিক যে দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রীর উপর তার অর্থ ব্যয় করে সেগুলির দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কমে যায়। অপরপক্ষে আর্থিক মজুরী যদি একই থাকে কিন্তু মূল্যস্তর কমে যায় তাহলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বেড়ে যায়।

3. **নিয়োগের প্রকৃতি ঃ** নিয়োগের স্থায়িত্ব (অর্থাৎ কোনও একজন ব্যক্তি একটি কর্মক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হতে পারে, আবার অস্থায়ী ভাবেও নিযুক্ত হতে পারে)। কাজটি অপ্রীতিকর, বিপদসঙ্কুল অথবা পরিশ্রম সাপেক্ষ কিনা (যেমন রেলের ড্রাইভার, প্লেনের পাইলট ইত্যাদিরকাজ), ভবিষ্যতে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভবনা ইত্যাদির উপর একজন ব্যক্তির প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে বা কম অপ্রীতিকর এবং কম পরিশ্রম সাপেক্ষ কাজের জন্য আর্থিক মজুরী কম হলেও প্রকৃত মজুরী কিন্তু বেশি।

4. **অপরাপর সুবিধা ঃ** অধ্যাপক মার্শালের মতে প্রকৃত মজুরী সর্বদা আর্থিক মজুরীরর উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে মূলত কাজের নীট সুবিধার উপর। আর্থিক মজুরী কম হলেও যদি কাজটিতে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকে তাহলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কিন্তু আর্থিক মজুরীরর তুলনায় বেশি হবে। কোনও কোনও কাজে উপরি আয়ের সম্ভাবনা থাকে, যেমন শিক্ষকদের গৃহ শিক্ষকতার কাজ ও বই লেখা, রেল কর্মীদের বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণের সুবিধা, পুলিসের অল্প মূল্যে রেশন, কর্মচারীদের বিনা ব্যয়ে চিকিৎসা ও ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার অসুবিধা। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী হিসেব করার সময় এই বিষয়গুলিকে ধরতে হয়।

৬০.২ মজুরির হারের তারতম্য (Differences in Wages)

বাস্তব জগতে মজুরীর হারে তীব্র তারতম্য দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন পেশায়, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন দেশে মজুরীর হারের তারতম্য বজায় থাকে। মজুরীর হারের এই পার্থক্যকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। (ক) মজুরীর সমতাকারী পার্থক্য (Equalising differences) বা মজুরীর অনুভূমিক পার্থক্য (Horizontal differences) এবং (খ) মজুরীর বৈষম্যকারী পার্থক্য (Non equalsing differences) বা মজুরীর উলম্ব পার্থক্য (Vertical differences).

৬০.২.১ মজুরির হারে সমতাকারী পার্থক্য বা অনুভূমিক পার্থক্য

সমদক্ষতা সম্পন্ন এবং সমান প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরীর হারের পার্থক্য মজুরীর সমতাকারী পার্থক্য বলে। এই পার্থক্যের কারণগুলি হল ঃ

(i) **আর্থিক মজুরীরর তারতম্য ঃ** অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুজন শ্রমিকের আর্থিক মজুরীতে পার্থক্য থাকলেও প্রকৃত মজুরীতে হয়ত কোনও পার্থক্য থাকে না। যে সকল কর্মক্ষেত্রে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় (যেমন বিনা ভাড়ায় বসবাসের সুবিধা, বিনা ব্যয়ে পরিবহণের সুবিধা, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি) সেখানে আর্থিক মজুরী কম হলেও প্রকৃত মজুরী বেশি। এক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরী = আর্থিক মজুরী + অতিরিক্ত সুবিধা। তাই দুজন শ্রমিকের মধ্যে আর্থিক মজুরীতে তারতম্য থাকলেও প্রকৃত মজুরীতে কোনওরূপ তারতম্য নেই।

(ii) **বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন আকর্ষণ ঃ** যে সকল কাজ লোকে অপছন্দ করে অথবা সে সকল কাজে নিযুক্ত থাকলে সমাজের চোখে হেয় প্রতিপন্ন হতে হয় সে সকল কাজের আর্থিক মজুরী অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। এই কারণে সাধারণ শ্রমিকের মজুরী অপেক্ষা মেথরের মজুরী বেশি হয়। অপরপক্ষে যে সকল কাজ প্রীতিকর এবং যে সকল কাজে সামাজিক স্বীকৃতি বা সম্মান লাভ করা যায় (যেমন শিক্ষকদের কাজ) সেই সকল কাজে আর্থিক মজুরী কম হলেও প্রকৃত মজুরী বেশি হয়। আবার যে সকল কাজ অস্থায়ী ও অনিশ্চিত সেই সকল ক্ষেত্রে মজুরী স্থায়ীভাবে নিযুক্ত শ্রমিকদের মজুরীর তুলনায় বেশি হয়। কিন্তু এই অতিরিক্ত আর্থিক মজুরী উভয় প্রকার কাজের প্রকৃত মজুরীরর মধ্যে সমতা বিধান করে। ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা থাকলে লোকে বর্তমানে অল্প মজুরীতেও কাজ করতে রাজি হয়। (যেমন আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিরা) এক্ষেত্রেও আর্থিক মজুরীর তারতম্য থাকে বলেও প্রকৃত মজুরীরর মধ্যে সমতা দেখা দেয়। যে সকল কাজে

দায়িত্ব এবং ঝুঁকি কম সেই সকল কাজে আর্থিক মজুরীও কম হয়। অপরপক্ষে ঝুঁকিপূর্ণ এবং দায়িত্বপূর্ণ কাজের জন্য শ্রমিকের আর্থিক মজুরী বেশি হলেও কম ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কিন্তু সমান হয়।

(iii) **শ্রমের অনুভূমিক গতিশীলতার অভাব ঃ** শ্রমিকের এক স্থান থেকে অপর স্থানে যাতায়াত অথবা এক পেশা থেকে অন্য পেশা গ্রহণ করাকে শ্রমের গতিশীলতা বলা হয়। শ্রমের পূর্ণ গতিশীলতা থাকলে সকল কার্যে একই ধরনের শ্রমিকের আর্থিক মজুরী সমান হওয়ার কথা। কিন্তু নানা কারণে শ্রমিকের পূর্ণ গতিশীলতার অভাব দেখা দেয়। ভাষার বিভিন্নতা, ধর্মের পার্থক্য এবং সামাজিক প্রথার তারতম্য শ্রমের দেশগত গতিশীলতা অভাবের কারণ। এই গতিশীলতার অভাব ঘটলে দুজন শ্রমিকের মজুরীর হারের তারতম্য সহজেই ঘটতে পারে।

৬০.২.২ মজুরির হারে বৈষম্যকারী পার্থক্য বা উল্লম্ব পার্থক্য

শ্রমের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগের বিভিন্নতার কারণে মজুরীর হারের যে পার্থক্য দেখা দেয় তাকে মজুরীর বৈষম্যকারী পার্থক্য বা উল্লম্ব পার্থক্য বলে। দক্ষ শ্রমিকের মজুরী স্বভাবতই অদক্ষ শ্রমিকের মজুরী অপেক্ষা বেশি হবে। অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় দক্ষ শ্রমিকের এই অতিরিক্ত উপার্জনকে দক্ষতা জনিত খাজনা বলা যেতে পারে। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, অধ্যাপনা ইত্যাদি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের দীর্ঘদিন ধরে ব্যয় বহুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়। স্বভাবতই সাধারণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরীর তুলনায় এই সকল কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মজুরী বেশি হয়। তাই কম্পাউন্ডারের উপার্জনের তুলনায় ডাক্তারের উপার্জন অনেক বেশি এবং কশাই-এর উপার্জনের তুলনায় শল্য চিকিৎসকের উপার্জন অনেক বেশি। যদিও উভয়েই ছুরি, কাঁচি নিয়ে কাজ করে। আবার ধনীর সন্তান অপেক্ষা দরিদ্রের সন্তানের অধিকতর যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সুযোগ ও সুপারিশের অভাবে তাকে অল্প মজুরীতে কাজ করতে হয়। ভারতবর্ষের মত দেশে জাতিভেদ প্রথা থাকার ফলে অনেক সময় শ্রমিকেরা তাদের পৈতৃক পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় যেতে পারে না। ফলে এই সকল শ্রমিক অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতা করতে পারে না এবং শ্রমের বাজারে অপ্রতিযোগী শ্রমগোষ্ঠীর (Non-Competing groups) সৃষ্টি হয়। মজুরীর উল্লম্ব পার্থক্যের এটাই প্রধান কারণ।

৬০.৩ মজুরি নির্ধারণ

বিভিন্ন যুগে অর্থনীতিবিদ্‌গণ মজুরি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ নূন্যতম জীবনধারণের উপযোগী মজুরী তত্ত্ব, জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার উপযোগী মজুরিতত্ত্ব ও মজুরি তহবিল তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। নয়া ক্ল্যাসিক্যাল, অর্থনীতিবিদ্‌গণ ছিলেন মজুরীর প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রচারক। কিন্তু এই তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র যোগানের দিক (ক্ল্যাসিক্যাল) অথবা কেবলমাত্র চাহিদার দিকে (নয়া ক্ল্যাসিক্যাল) অলোকপাত করায় বর্তমানকালের লেখকগণ সেগুলিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন। এঁদের মতে মজুরি নির্ধারণ সম্পর্কে এমন একটি তত্ত্বের প্রয়োজন যা শ্রমিকের চাহিদা ও যোগান উভয় বিষয়ের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করে। এই কারণেই মজুরী নির্ধারণের চাহিদা

ও যোগান তত্ত্বটি মোটামুটি সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়। তবে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলেই শ্রমের চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের ঘাত প্রতিঘাতে ভারসাম্য মজুরীর হার স্থির হয়। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহ সর্বদা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। মালিক ও শ্রমিকদের একচেটিয়ামূলক সংগঠন, শ্রমিক ও মালিকদের এই সংগঠনগুলির যৌথ দরকষাকষি এবং শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ক্ষমতা—এগুলি হল আধুনিক যুগে শ্রম-বাজারের বৈশিষ্ট্য। এগুলিকে উপেক্ষা করে কোনওমতেই শ্রম-বাজারের ভারসাম্য অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মজুরি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

৬০.৩.১ জীবনধারণোপযোগী মজুরি তত্ত্ব (Subsistence Theory of Wages)

ফ্রান্সে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফিজিওক্রাট (Physiocrats) নামক একদল লেখকের লেখায় সর্বপ্রথম এই তত্ত্বের সূচনা হয়। পরবর্তীকালে জার্মাণ অর্থনীতিবিদ্ ল্যাসালে (Lassale) এই তত্ত্বকে মজুরির লৌহ নিয়ম (Iron Law of Wages) আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের (Malthus) জনসংখ্যা তত্ত্বের উপর এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত।

এই তত্ত্ব অনুসারে মজুরির হার শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে স্থির হয়। মালিকেরা সংখ্যায় অল্প এবং যথেষ্ট সংঘবদ্ধ। শ্রমিকেরা দরিদ্র এবং সংখ্যায় মালিকের সংখ্যার তুলনায় বহুগুণ। ফলে মালিক যে মজুরি দেয় শ্রমিকেরা সেই মজুরি নিতে বাধ্য হয়। অবশ্য কোনও অবস্থাতেই মালিক শ্রমিকের মজুরি তার জীবনধারণের জন্য নূন্যতম ব্যয়ের তুলনায় নিচু স্তরে নামাতে পারে না। মজুরি জীবিকা নির্বাহের যে সর্বনিম্ন ব্যয়ের প্রয়োজন, তার তুলনায় কম হলে শ্রমিকেরা সংসারী হবে না, সন্তান সন্ততি প্রতিপালনে আগ্রহী হবে না, জন্মের হার কমে যাবে এবং শ্রমের যোগান কমে যাবে। চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান কম হলে মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে আবার তা শ্রমিকের জীবন ধারণোপযোগী মজুরির স্তরে পৌঁছে যাবে। অপরপক্ষে মজুরির হার জীবনধারণোপযোগী ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে বিবাহিতের সংখ্যা বেড়ে যাবে, জন্মহার বাড়বে এবং শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাবে। চাহিদার তুলনায় যোগান বেড়ে গেলে শ্রমিকের মজুরি কমে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ের স্তরে নেমে আসবে। অতএব আমরা দেখলাম যে শ্রমিকের মজুরি সাধারণত তার জীবনধারণোপযোগী ব্যয়ের সমান হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করতেন যে উৎপাদন ব্যয় দ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয়। শ্রমের উৎপাদন ব্যয় হল তার জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় যে ব্যয় ঠিক তাই। ফলে শ্রমিকের মজুরি যে তার জীবিকা নির্বাহের জন্য ন্যূনতম ব্যয়ের সমান হবে এটাই স্বাভাবিক, কার্ল মার্কস্ এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই তাঁর উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Theory of Surplus Value) এবং শোষণ তত্ত্বের (Exploitation Theory) বিশ্লেষণ করেছেন।

সমালোচনা

(ক) এই তত্ত্ব ম্যালথাসের জনসংখ্যাতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানকালে কেহই আর এই তত্ত্ব পুরোপুরি সমর্থন করেন না, কারণ মজুরি বৃদ্ধি পেলেই যে শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাবে তা ঠিক নয়। মজুরি বৃদ্ধি পেলে বর্তমানে শ্রমিক তার সন্তানসন্ততির সংখ্যা না বাড়িয়ে বরং জীবন-যাপনের মান বাড়াতে সচেষ্ট হয়।

(খ) এই তত্ত্বটিতে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে শুধুমাত্র শ্রমিকের যোগানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, চাহিদার দিকটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে। শ্রম উৎপাদনশীল বলেই মালিকের নিকট তার চাহিদা রয়েছে। তাই শ্রমের উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুরির অবশ্যই সম্পর্ক থাকবে।

(গ) এই তত্ত্ব মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক সংঘের যে কোনও গুরুত্ব আছে তা স্বীকার করে না। শ্রমিক সংঘ শক্তিশালী হলে মজুরি অবশ্যই জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় অপেক্ষা বেশি হতে পারে।

(ঘ) বাস্তবে বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মজুরি যদি জীবনধারণোপযোগী ব্যয়ের সমান হোত তাহলে কিন্তু সকল পেশায় মজুরির হার অভিন্ন হওয়ার কথা, কারণ সকল শ্রমিকের জীবিকা নির্বাহের ন্যূনতম ব্যয় প্রায় একই হয়।

৬০.৩.২ জীবনযাত্রার মান তত্ত্ব (Standard of Living Theory) :

এই তত্ত্বটি জীবনধারণোপযোগী মজুরি তত্ত্বেরই সংশোধিত ও উন্নতর রূপ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরি কেবলমাত্র শ্রমিকের জীবনযাপনের জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন তার সমান হলেই চলবে না, শ্রমিক যে জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তার সমান হতে হবে। জীবনধারণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিই শুধুমাত্র এই অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মানের অন্তর্ভুক্ত হয় না, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিশ্রাম ও কিছু আরামদায়ক ব্যবস্থাকেও এর মধ্যে ধরতে হয়।
জীবনযাত্রার মান মজুরিকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে—এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শ্রমিকরা সর্বদাই তাদের অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে তৎপর থাকবে এটাই স্বাভাবিক। মালিক শ্রমিককে যদি এমন মজুরি দেয় যাতে সে তার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে সক্ষম হয় না তাহলে শ্রমিকেরা ধর্মঘট, বিক্ষোভ, প্রদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে তীব্র বিরোধিতা করে।

সমালোচনা

(ক) এই তত্ত্ব কেবলমাত্র শ্রমের যোগান-দাম অর্থাৎ শ্রমিক ন্যূনতম কি মজুরি চায় তা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মজুরি কেবলাত্র শ্রমের যোগান-দামের উপর নির্ভর করে না, মালিকের নিকট শ্রমের চাহিদাও থাকা চাই। এই চাহিদা নির্ভর করে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উপর। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান যাই হোক না কেন মালিক কখনই শ্রমিককে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা মজুরি দেবে না।

(খ) জীবনযাত্রার মান যেমন মজুরি নির্ধারণ করে, মজুরিও আবার জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করে। বিগত একশো বছরে শ্রমিকের মজুরি হার এবং জীবনযাত্রার মান উভয়ই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উচ্চ জীবনযাত্রার মানে দরুণ মজুরি হার বেশি হয়েছে না উচ্চ মজুরির দরুণ উচ্চ জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে তা নিশ্চিতভাবে বলা শক্ত।

(গ) শ্রমিকের প্রচলিত জীবনযাত্রার মান তার মজুরির হারকে কেবলমাত্র আংশিকভাবে নির্ধারিত করে। অন্যান্য আরো কয়েকটি বিষয়েরও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ণ, মূলধনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ, সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৬০.৩.৩ মজুরি তহবিল তত্ত্ব (Wages Fund Theory) :

এই তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন জন ষ্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মজুরির হার নির্ভর করে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের উপর, অর্থাৎ জনসংখ্যা ও মূলধনের অনুপাতের উপর। জনসংখ্যা বলতে শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পাওয়ার শর্তে যারা কাজ করতে আসে তাদের বোঝান হয় এবং মূলধন বলতে চলতি মূলধনের যে অংশ মজুরি দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তাকে বোঝায়। মালিক তার চলতি মূলধনের একটি নির্দিষ্ট অংশ দিয়ে মজুরি দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি মজুরি তহবিল গঠন করে। এই মজুরি তহবিলের উৎস হল অতীতের সঞ্চয় এই মজুরি তহবিল থেকে শ্রমের চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং মোট মজুরি-তহবিলকে শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাই হবে গড় মজুরি বা মজুরির হার।

দেশে সাধারণ মজুরির স্তর তখনই বাড়তে পারে যখন নিম্নলিখিত দুটি বিষয়ের যে কোনও একটি (বা উভয়ই) ঘটে; মজুরি-তহবিল বাড়ে অথবা শ্রমিকের সংখ্যা বা যোগান কমে। কিন্তু স্বল্পকালে মজুরি-তহবিল মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, কারণ যে কোনও দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ ধীর গতিতে বাড়ে। তাই শ্রমিক যদি তার অবস্থার উন্নতি ঘটাতে চায় তবে সন্তানসন্ততির সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তাকে শ্রমের যোগান কমাতে হবে। আবার, এক শ্রেণীর শ্রমিক যদি কোনও প্রকারে তাদের মজুরির হার বাড়াতে সক্ষম হয় তবে মজুরি-তহবিল অপরিবর্তিত থাকলে অন্য এক শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরির হার অবশ্যই কমে যাবে।

সমালোচনা

(ক) মজুরি-তহবিলের আয়তন সর্বদা নির্দিষ্ট থাকে একথা ঠিক নয়। মজুরি তহবিলকে হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অথবা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর সমষ্টি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। অর্থের পরিমাণ অবশ্যই স্থিতিস্থাপক—লাভ-ক্ষতির প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল এবং দেশের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রনাধীন। দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণও ইচ্ছামত বাড়ানো যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকরা তহবিল থেকে কি পরিমাণ মজুরি সংগ্রহ করতে পারবে তা তারা তহবিল সৃষ্টিতে কতটা সহায়তা করে তার উপর নির্ভর করে। যদি শ্রমিকদের দক্ষতা খুব বেশি হয় তবে জাতীয় আয়ের পরিমাণও খুব বেশি হবে এবং জাতীয় আয়ের যে অংশ শ্রমিক মজুরি হিসাবে পাবে সেটাও বেশি হবে।

(খ) এই তত্ত্বে শ্রমিকের চাহিদা নির্ভর করে মজুরি-তহবিলের আয়তনের উপর। মালিকের নিকট শ্রমিকের চাহিদা যে প্রধানত তার উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল এই তত্ত্ব সেটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

(গ) বিভিন্ন পেশায় যে মজুরির তারতম্য দেখা যায় এই তত্ত্ব তা ব্যাখ্যা করতে পারে না।

এই তত্ত্বটিতে নানা ত্রুটি থাকায় পরবর্তীকালে মিল নিজেই এই তত্ত্বটিকে পরিত্যাগ করেন।

৬০.৩.৪ মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory of Wages) :

নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ এই তত্ত্বের প্রচারক। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন জে. বি. ক্লার্ক (J.B.Clark), ষ্ট্যানলি জেভন্স (Stanley Jevons), ভন্ থুনেন (Von Thunen) এবং অ্যালফ্রেড মার্শাল Alfred Marsahall)। তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হবে। অন্যান্য

উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে শ্রমিকের সংখ্যা এক একক বৃদ্ধি করা হলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাকেই শ্রমের **প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন** (MPP) বলে। শ্রমের এই প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে দ্রব্যের বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যাবে তাকেই **শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য** (VMPP) বলে। এই প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যই হ'ল মালিকের দিক থেকে শ্রমের চাহিদা-দাম। মালিক কোনও অবস্থাতেই শ্রমিককে তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা বেশি মজুরী দেবে না।

শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে কোনও একটি ফার্মের পক্ষে একটি নির্দিষ্ট মজুরীতে যে পরিমাণ ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করা সম্ভব। ফলে শ্রমিকদের সংখ্যা যাই হোক না কেন মজুরির হার সর্বদা স্থির থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারে প্রচলিত মজুরির হার শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হবে ততক্ষণ পর্যন্ত অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগ করা মালিকের পক্ষে লাভজনক হবে। কিন্তু যত বেশি শ্রম নিয়োগ করা হবে ততই ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতার দরুণ শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন (এবং শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য) হ্রাস পাবে, যদিও শ্রমিকদের মজুরির হার অপরিবর্তিত থাকবে। এইভাবে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে থাকলে এমন একটি অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া যাবে যখন শ্রমিকের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য তার মজুরীর সমান হয়ে দাঁড়াবে। তখনই মালিকের মুনাফা সর্বাধিক হবে। অপরপক্ষে শ্রমিকের প্রচলিত মজুরির হার অপেক্ষা যদি তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য কম হয় তবে ক্রমাগত শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। এর ফলে মজুরির হার অপরিবর্তিত থাকলেও শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য ক্রমশ বাড়তে থাকবে। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে থাকলে এমন একটি অবস্থায় উপনীত হওয়া যাবে যেখানে শ্রমিকের মজুরি এবং তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য পরস্পর সমান হবে। মালিক তখন ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছে যাবে।

এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় সকল শ্রমিকই সমান দক্ষতাসম্পন্ন। সেই কারণে শেষ (বা প্রান্তিক) শ্রকিকে যে মজুরী দেওয়া হবে অন্যান্য শ্রমিকদেরও ঠিক তাই দেওয়া হবে। শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা এবং শ্রমের বাজারে প্রতিযোগিতা থাকলে সকল নিয়োগের ক্ষেত্রেই শ্রমের মজুরী অভিন্ন হবে এবং এই মজুরী শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হবে।

সমালোচনা

(ক) এই তত্ত্বে অনেকগুলি বিষয়কে ধরে নেওয়া হয়েছে—যেমন সকল শ্রমিকের সমান দক্ষতা এবং কাজ করার ব্যাপারে সমান আগ্রহ ও আন্তরিকতা, শ্রমের অবাধ গতিশীলতা, পূর্ণ নিয়োগ ইত্যাদি, এ সকল অনুমান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক ও বাস্তব নয়।

(খ) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে। বাস্তবে শ্রমের বাজারে অনেক সময়ই একচেটিয়া ক্রেতা (Monopsony) দেখা যায়। সেক্ষেত্রে শ্রমের মজুরি নিয়োগকর্তার সর্বাধিক মুনাফার অবস্থায় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন অপেক্ষা কম হয় এবং শ্রমিকের শোষণ ঘটে।

(গ) এই তত্ত্ব শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বাস্তবে কিন্তু অনেক উৎপাদন ক্ষেত্রেই শ্রমিক সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং শ্রমিক সংঘ ও মালিকপক্ষের যৌথ দর কষাকষির মাধ্যমে মজুরীর হার নির্ধারিত হচ্ছে। এই মজুরী শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান হবেই এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই।

(ঘ) দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলেই শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের (Value of Marginal Physical Product) সমান হয়। কিন্তু দ্রব্যের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে বাজারে একটি দ্রব্যটি যত বেশি বেশি পরিমাণে বিক্রী করা হবে ততই দ্রব্যের দাম কমে যাবে, শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (Marginal Revenue Product) তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হবে এবং মালিকের সর্বাধিক মুনাফার অবস্থায় শ্রমের মজুরি তার তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হবে। মজুরি তখন শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হবে।

(ঙ) এই তত্ত্বের বিরুধে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ হল যে এই তত্ত্ব শুধুমাত্র চাহিদার দিক থেকে বিষয়টিকে বিচার করে এবং শ্রমের যোগানের দিকটা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। কিন্তু কেবলমাত্র শ্রমের চাহিদার দ্বারা ভারসাম্য মজুরি নির্ধারিত হতে পারে না। শ্রমের যোগানেরও সমান ভূমিকা রয়েছে। তাই এই তত্ত্বটিকে মজুরি নির্ধারণের তত্ত্ব হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না।

(চ) এই তত্ত্ব তখনই কার্যকর হতে পারে যখন শ্রম ও অন্যান্য উপাদানের ব্যবহারের অনুপাত পরিবর্তনশীল হয়। কিন্তু শ্রম এবং অন্যান্য উপাদান যদি সর্বদাই একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে ব্যবহার করতে হয় তবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা যায় না। সেক্ষেত্রে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার সমান কিনা তা বলা যায় না।

৬০.৩.৫ মজুরি নির্ধারণের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Demand and Supply Theory of Wages) :

চাহিদা ও যোগান তত্ত্বকে আমরা মজুরি নির্ধারণের আধুনিক বা চূড়ান্ত তত্ত্ব বলে বর্ণনা করতে পারি। তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল যে, সাধারণ দ্রব্যমূল্যের মত শ্রমের মূল্য বা মজুরিও চাহিদা ও যোগান— উভয় শক্তির দ্বারাই নির্ধারিত হয়, শুধু চাহিদা বা শুধু যোগান দ্বারা নয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় শ্রমের চাহিদা রেখা এবং শ্রমের যোগান রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে সেখানেই একযোগে ভারসাম্য মজুরীর হার এবং শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়।

❒ শ্রমের চাহিদা ঃ—

শ্রমের চাহিদা হলো উদ্ভূত চাহিদা। শ্রমিক যে দ্রব্য উৎপন্ন করে, বাজারে সেই দ্রব্যের চাহিদা থাকলে শ্রমেরও চাহিদার সৃষ্টি হবে। শ্রম নিয়োগকারী একজন উৎপাদক শ্রমিককে সর্বাধিক যে দাম দিতে প্রস্তুত থাকে তাকে শ্রমিকের চাহিদা দাম (Demand Price) বলে। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে ঐ চাহিদা-দাম শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের (= শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন × দ্রব্যের দাম) সমান হবে। মালিক কখনই শ্রমিককে তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (V.M.P.P.) অপেক্ষা বেশি মজুরি দেবে না। সাধারণভাবে বলা যায় সে শ্রমের V.M.P.P রেখাই হল মালিকের নিকট শ্রমের চাহিদা-রেখা। তবে এই VMPP রেখার সম্পূর্ণ অংশই কিন্তু মালিকের নিকট শ্রমের চাহিদা রেখা হবে না। শ্রমের গড় আয় উৎপন্ন (Average Revenue Product of A.R.P) রেখার নীচে VMPP রেখার যে অংশটি থাকবে তাই হলো একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা কোনও মালিকের দিক থেকে শ্রমের চাহিদা রেখা। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন [■ MRP অর্থাৎ অন্যান্য যাবতীয় উপাদান-এর পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে অতিরিক্ত ১ একক শ্রম নিয়োগ করা হলে মালিকের মোট আয় যে পরিমাণ

বাড়ে] এবং প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) পরস্পর সমান হয়। অতএব VMPP রেখা ও MRP রেখা অভিন্ন হবে।

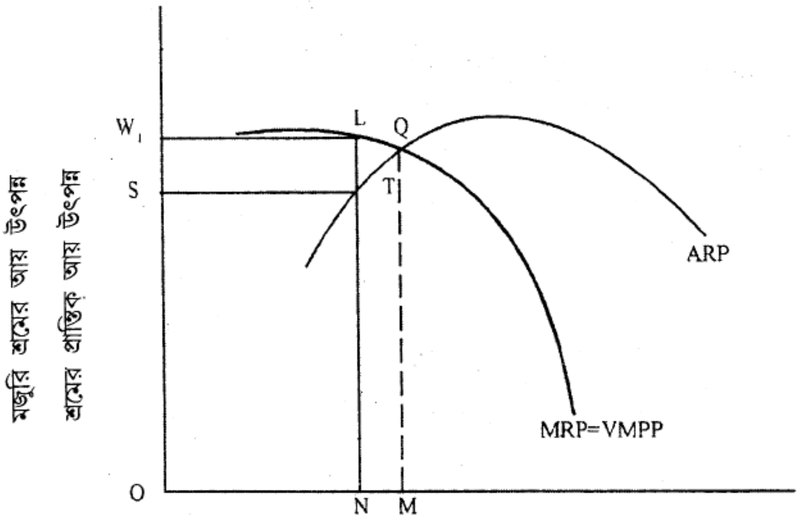

রেখাচিত্র ৬০.১ : শ্রমের পরিমাণ

উপরের চিত্রে ARP রেখা এবং MRP রেখা হলো যথাক্রমে শ্রমের গড়-আয় উৎপন্ন রেখা ও প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা। Q বিন্দু হল ARP রেখার সর্বোচ্চ বিন্দু। MRP রেখাকে Q বিন্দুতে ছেদ করে। মজুরীর হার যখন OW_1 তখন উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানটি MRP রেখার L বিন্দু অনুযায়ী ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে। [যেখানে মজুরী এবং শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য পরস্পর সমান হয় সেখানেই ভারসাম্য শ্রম নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।] মজুরী বাবদ মালিকের মোট ব্যয় হলে $ONLW_1$ কিন্তু এই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে মালিকের মোট আয় হয় ONTS (=গড় আয় উৎপন্ন শ্রমের × শ্রমের পরিমাণ)। এখানে মালিকের লোকসান হবে $STLW_1$। এই অবস্থায় সে নিশ্চয়ই ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে না। MQ অপেক্ষা মজুরির হার বেশি এরূপ পরিস্থিতিতে মালিক শ্রম নিয়োগ করলেই তার লোকসান হবে। তাই Q বিন্দুতে বা Q বিন্দুর উপরে MRP রেখার যে অংশটি আছে সেই অংশ অনুযায়ী মালিক কখনই শ্রম নিয়োগ করবে না। Q বিন্দুর নীচে MRP রেখার যে অংশটি আছে সেই অংশই হবে শ্রমের জন্য কোনও একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের চাহিদা রেখা।

এখন প্রশ্ন হলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শ্রমের চাহিদারেখা (VMPP) রেখা থেকে আমরা শ্রমের বাজার চাহিদা রেখা (Market Demand Curve) কিভাবে পাই? কোনও একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঐ দ্রব্যটির বিভিন্ন ক্রেতার ব্যক্তিগত চাহিদা রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলেই আমরা দ্রব্যটির বাজার চাহিদা-রেখা পাই। কিন্তু, শ্রমের চাহিদার ক্ষেত্রে এভাবে বাজার চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় না, কারণ বিভিন্ন মজুরীর হারে কোনও একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে শ্রমের VMPP রেখা বিভিন্ন হয়।

মজুরির হার কমে গেলে প্রত্যেকটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান আগের চেয়ে বেশি শ্রম নিয়োগ করবে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে দ্রব্যটির উৎপাদন ও বিক্রয়ের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়ে যাবে। দ্রব্যটির চাহিদার

অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে যোগান বেড়ে যাওয়ায় দ্রব্যের দাম কমে যাবে এবং এর ফলে প্রত্যেকটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে শ্রমের যে VMPP রেখা ছিল তা বাঁদিকে সরে আসবে। নতুন মজুরির হারে পুরাতন VMPP রেখা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করত এখন VMPP রেখা অনুযায়ী তার তুলনায় কম পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে।

নীচের চিত্রে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের VMPP রেখাগুলি থেকে কিভাবে শ্রমের বাজার চাহিদা-রেখা পাওয়া যায় তা দেখানো হল—

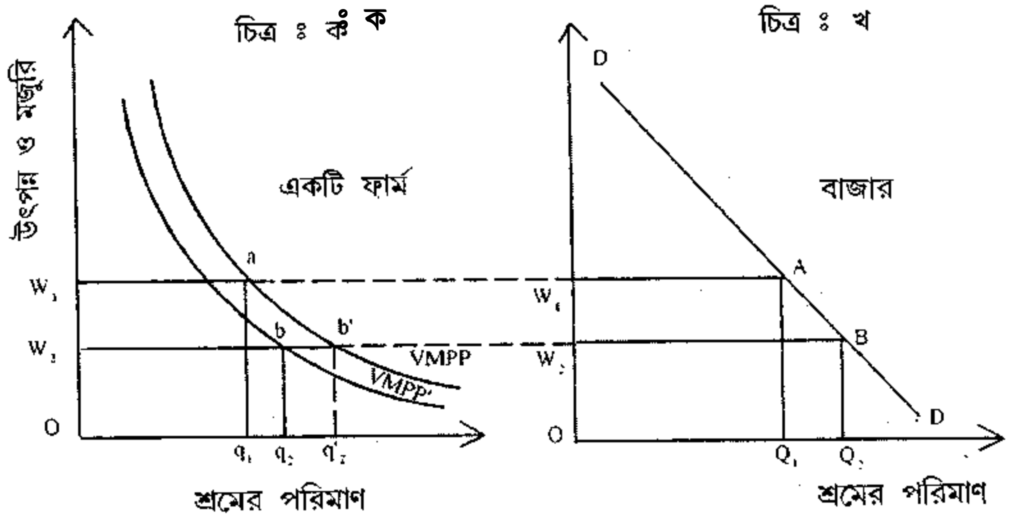

রেখাচিত্র ৬০.২

উপরের ক-চিত্রে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের শ্রমের চাহিদা দেখানো হয়েছে। ধরা যাক, VMPP রেখা হল প্রতিষ্ঠানটির শ্রমের জন্য পূর্বের চাহিদা রেখা। মজুরীর হার যখন OW_1 তখন VMPP রেখার 'a' বিন্দু অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির Oq_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। সকল প্রতিষ্ঠান মিলে, খ-চিত্রের OQ_1 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে অর্থাৎ OW_1 মজুরিতে আমরা খ-চিত্রের A বিন্দুটি পাই। এখন মজুরির হার কমে গিয়ে যদি OW_2 হয় তবে প্রতিষ্ঠানটির শ্রমের জন্য নতুন চাহিদা-রেখা হবে $VMPP^1$ রেখা। OW_2 মজুরিতে এই রেখার b বিন্দু অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটি Oq_2 পরিমান শ্রম নিয়োগ করবে। সকল উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মিলে এই মজুরিতে খ-চিত্রে OQ_2 পরিমান শ্রম নিয়োগ করবে। এইভাবে আমরা 'খ' চিত্রে B বিন্দু পাই। 'খ' চিত্রে A বিন্দু, B বিন্দু এবং এই ধরনের অন্যান্য বিন্দুগুলি যোগ করে যে রেখাটি পাওয়া যাবে (DD রেখা) তাই হল শ্রমের বাজার চাহিদা রেখা।

❒ শ্রমের চাহিদা ঃ—

শ্রমের যোগান নির্ভর করে তার যোগান দামের উপর। যোগান দাম বলতে সেই দামকে বোঝায় যে দাম না পেলে শ্রমিক কাজ করতে রাজি হবে না। শ্রমের যোগান দাম সাধারণত শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের উপর নির্ভর করে। যে সকল শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উঁচু তারা বেশি মজুরি পেলেই কাজ করতে রাজি থাকবে। সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে শ্রমিকের কোনও বিকল্প কর্মক্ষেত্র নেই।

সেক্ষেত্রে শ্রমের যোগান-দাম ঐ জীবন ধারণের ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। শ্রমের যোগান-রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে উর্দ্ধগামী অর্থাৎ, ধনাত্মক ঢাল-সম্পন্ন হবে।

❒ ভারসাম্য ঃ—

শ্রমের চাহিদারেখা এবং যোগনরেখা যে বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করে সেই বিন্দুতেই ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হয়। যদি বাজারে মজুরি এই ভারসাম্য মজুরির তুলনায় বেশি হয় তাহলে ঐ মজুরিতে শ্রমের চাহিদা অপেক্ষা শ্রমের যোগান বেশি হবে এবং শ্রমের মজুরি কমে যাবে। আবার বাজারের মজুরি যদি ঐ ভারসাম্য মজুরি অপেক্ষা কম হয় তবে শ্রমের চাহিদা তার যোগানের তুলনায় বেশি হবে এবং মজুরির হার বেড়ে যাবে।

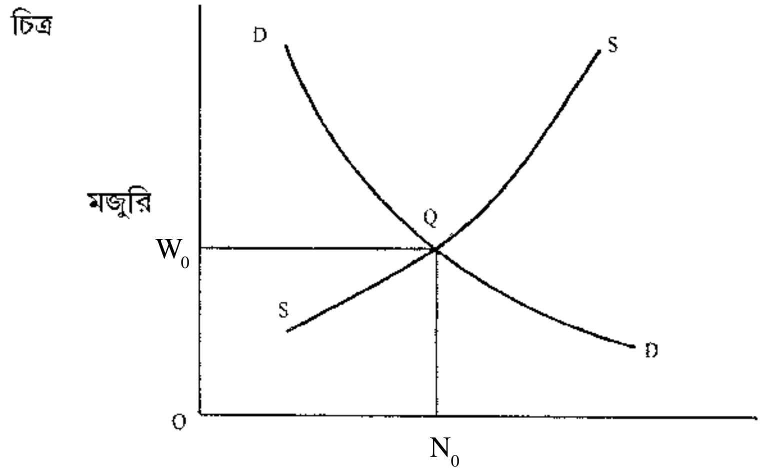

রেখাচিত্র ৬০.৩ : শ্রমের পরিমাণ

উপরের চিত্রে DD রেখা এবং SS রেখা হল যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা-রেখা এবং যোগান-রেখা। Q বিন্দুতে রেখা দুটি পরস্পরকে ছেদ করেছে। অতএব Q বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য মজুরির হার হবে OW_0। এই ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে ON_0।

স্বল্পকালীন অবস্থায় মজুরি প্রধানত শ্রমের চাহিদা-দাম বা শ্রমের প্রান্তিক-আয় উৎপন্নের দ্বারা নির্ধারিত হয়, কারণ স্বল্পকালে শ্রমিক এক কর্মক্ষেত্র থেকে অন্য কর্মক্ষেত্রে সহজে যেতে পারে না এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকের স্থানান্তর আয় বা যোগান দামের বিশেষ ভূমিকা থাকে না। কিন্তু দীর্ঘকালীন অবস্থায় যোগান-দাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ অন্যান্য শিল্পে বা অন্যান্য অঞ্চলের কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক যদি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষাকৃত অধিক হারে মজুরি পেতে থাকে বা অধিকতর সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে থাকে তবে বর্তমান কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে অন্য শিল্পে বা অন্য স্থানে শ্রমিকের চলে যাওয়া অনেক সহজেই সম্পন্ন করা যাবে। এর ফলে মজুরির উপর যোগান দামের প্রভাবও বাড়বে।

বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকায় মজুরির হার চাহিদার দিক থেকে সর্বোচ্চ সীমা—শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং যোগানের দিকে থেকে সর্বনিম্নসীমা—শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান—এই দুই

সীমার মধ্যে ওঠা নামা করে। সঠিক মজুরির হার কি হবে তা শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের যৌথ দর কষাকষির আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করে। শ্রমিকের শক্তি যদি বেশি হয় তবে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের কাছাকাছি থাকবে; অপরপক্ষের শক্তি যদি বেশি হয় তবে মজুরি শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের কাছাকাছি থাকবে।

৬০.৩.৬ অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরির হার নির্ধারণ (Determination of Wage Rate Under Imperfect Competition) :

অনিখুঁত প্রতিযোগিতা বলতে দ্রব্যের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং শ্রমের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা—উভয় প্রকারের অনিখুঁত প্রতিযোগিতাই বোঝানো যেতে পারে। আমরা অনিখুঁত প্রতিযোগিতার বাজারে মজুরি নির্ধারণের তত্ত্বকে তিনটি পৃথক অবস্থায় বিশ্লেষণ করতে পারি।

(ক) দ্রব্যের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা, কিন্তু শ্রমের বাজারে পূর্ণ (বা নিঁখুত) প্রতিযোগিতা

(খ) দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা, কিন্তু শ্রমের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা

(গ) উভয় বাজারেই অনিখুঁত প্রতিযোগিতা

নীচে এই তিনটি অবস্থাকে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হল ঃ—

(ক) দ্রব্যের বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) অপেক্ষা তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (MRP) কম হবে। এবং শ্রমিকের মজুরি তখন শ্রমের VMPP-এর সমান না হয়ে MRP-এর সমান হবে। কেন এরূপ হবে তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়।

নিয়োগকর্তা সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে যেখানে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে যা অতিরিক্ত উৎপাদন হয় তা বিক্রি করে নিয়োগ কর্তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যে পরিমাণ বাড়ে ঐ অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করতে গিয়ে তার মজুরি বাবদ মোট ব্যয়ও ঠিক সেই পরিমান বাড়ে। অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করার ফলে যে অতিরিক্ত উৎপাদন হয় তা বিক্রী করে নিয়োগকর্তার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় যতটা বৃদ্ধি পায় তাই হল শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন। শ্রমের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকায় একটি নির্দিষ্ট মজুরির হারে নিয়োগ কর্তা যে পরিমাণ ইচ্ছা শ্রম নিয়োগ করতে পারে। এ অবস্থায় শ্রমের গড় মজুরি (Average Wage বা AW) এবং প্রান্তিক মজুরি (Marginal Wage বা MW) পরস্পর সমান হয়। অতএব শ্রমের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা এবং দ্রব্যের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে কোনও একজন নিয়োগ কর্তার ভারসাম্য অবস্থায় শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং শ্রমিকের মজুরি পরস্পর সমান হয়, যদিও মজুরি শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (VMPP) অপেক্ষা কম হয়। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে গড় মজুরি এবং প্রান্তিক মজুরি কেন পরস্পর সমান হবে তা নিচের দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই বোঝা যায়। এখানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে শ্রমিকের সংখ্যা যাই হোক না কেন, শ্রমিকের মজুরির হার সর্বদা অপরিবর্তিত থাকে। এই মজুরির হার হল 100 টাকা।

শ্রমিকের সংখ্যা	গড় মজুরি (AW) বা মজুরির হার (টাকা)	মোট মজুরি (Total Wage) (টাকা)	প্রান্তিক মজুরি (MW) (টাকা)
1	100.00	100.00	100.00
2	100.00	200.00	100.00
3	100.00	300.00	100.00
4	100.00	400.00	100.00
5	100.00	500.00	100.00

গড় মজুরি বা মজুরির হারকে শ্রমিকের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে যে গুণফল পাওয়া যায় তাই হল মোট মজুরি। অন্যান্য যাবতীয় উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করা হলে নিয়োগকর্তার মজুরি বাবদ মোট ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাই হল প্রান্তিক মজুরি। উপরের দৃষ্টান্তে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ 3 একক থেকে বাড়িয়ে 4 একক করা হলে মোট মজুরি 300.00 টাকা থেকে বেড়ে 400.00 টাকা হয়। ফলে প্রান্তিক মজুরি হবে 400.00 টাকা—300.00 টাকা = 100.00 টাকা।

দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে নিয়োগকর্তার ভারসাম্য কোথায় ঘটবে তা নিচের চিত্রে দেখানো হচ্ছে।

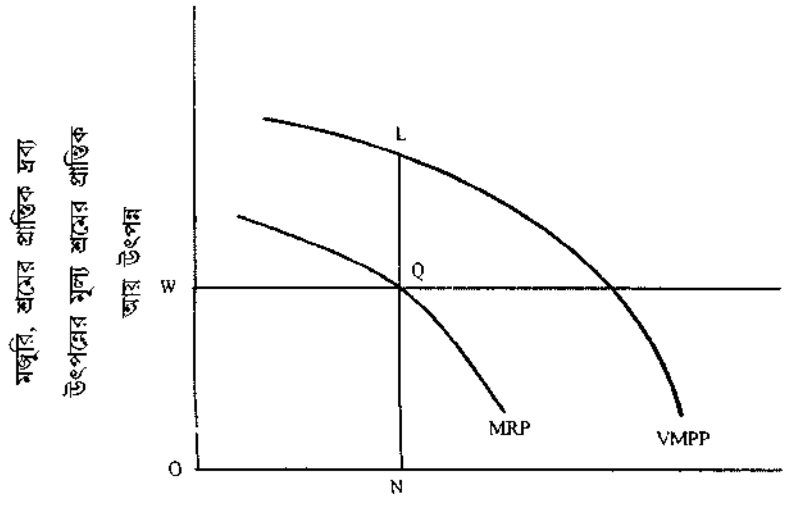

রেখাচিত্র ৬০.৪ : শ্রমের পরিমাণ

চিত্রে AW-MW রেখা হল শ্রমের গড় মজুরি = প্রান্তিক মজুরি রেখা। শ্রমের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিতা থাকায় এই রেখাটি অনুভূমিক হয়েছে। MRP এবং VMPP রেখা হল যথাক্রমে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা এবং শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য রেখা। দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দরুণ MRP সর্বদাই VMPP অপেক্ষা কম হয় এবং MRP রেখা সর্বদাই VMPP রেখার নিচে অবস্থার করে। Q বিন্দুতে MRP রেখা এবং AW=MW রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। অতএব এই বিন্দুটি হবে ভারসাম্য বিন্দু। এই বিন্দু অনুযায়ী নিয়োগকর্তা ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। শ্রমের মজুরি MRP-এর সমান হলেও VMPP অপেক্ষা কম হবে। চিত্রে যখন ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হয় তখন মজুরী হবে NQ = OW, কিন্তু শ্রমের VMPP হবে NL।

দ্রব্যের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে নিয়োগকর্তা বিভিন্ন মজুরির হারে কি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে তা শ্রমের MRP রেখা থেকে জানা যায়, VMPP রেখা থেকে নয়। অতএব কোনও একটি ফার্ম অর্থাৎ কোনও একজন নিয়োগকর্তার দিক থেকে বিচার করলে শ্রমের চাহিদা-রেখা হবে MRP রেখা, VMPP রেখা নয়। বিভিন্ন ফার্মের MRP রেখাগুলি থেকে আমরা শ্রমের বাজার চাহিদা রেখা পাব। এই বাজার চাহিদা রেখা যেখানে শ্রমের যোগান রেখাকে ছেদ করবে সেখানেই ভারসাম্য মজুরির হার নির্ধারিত হবে। প্রত্যেকটি ফার্ম এই মজুরির হারকে মেনে নিয়ে ঠিক সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে যেখানে মজুরি হার এবং শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পরস্পর সমান হবে।

(খ) যদি দ্রব্যের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকে তবে শ্রমের MRP এবং VMPP পরস্পর সমান হবে। শ্রমের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকায় (ধরা যাক্ শ্রমের বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু বহু বিক্রেতা রয়েছে—মানোপ্সনি বা Monopsony) নিয়োগকর্তা যত বেশি বেশি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে ততই তাকে মজুরির হার বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে শ্রমের নিয়োগবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গড় মজুরি (AW) এবং প্রান্তিক মজুরি (MW) উভয়ই বাড়বে এবং প্রান্তিক মজুরি গড় মজুরি অপেক্ষা বেশি হবে। AW রেখা এবং MW রেখা—উভয় রেখাই উর্ধ্বগামী হবে এবং MW রেখা AW রেখার উপরিভাগে অবস্থান করবে। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি সহজেই বোঝা যায়।

শ্রমিকের সংখ্যা	গড় মজুরি (AW) (টাকা)	মোট মজুরি (Total Wage) (টাকা)	প্রান্তিক মজুরি (MW) (টাকা)
1	100.00	100.00	100.00
2	11.00	220.00	120.00
3	120.00	360.00	140.00
4	130.00	520.00	160.00
5	140.00	700.00	180.00

নীচের চিত্রে দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং শ্রমের বাজারে মনোপ্‌নসনি থাকলে কোথায় নিয়োগকর্তার ভারসাম্য ঘটবে তা দেখানো হল।

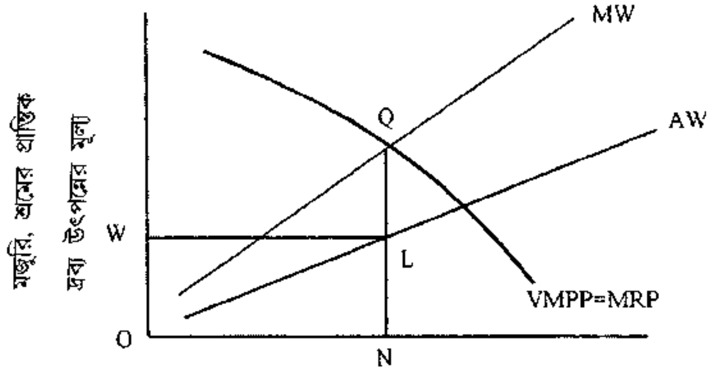

রেখাচিত্র ৬০.৫ : শ্রমের পরিমাণ

MRP যদি MW অপেক্ষা বেশি হয় তবে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার মোট আয় যতটা বাড়বে (অতিরিক্ত এক একক শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন যতটা বাড়বে তা বিক্রি করে নিয়োগকর্তার আয় বাড়বে) মজুরী বাবদ মোট ব্যয় তার তুলনায় কম বাড়বে। অর্থাৎ নিয়োগকর্তার মোট মুনাফা বেড়ে যাবে। এ অবস্থায় নিয়োগকর্তা ক্রমশ শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে চলবে। অপরপক্ষে MRP যদি MW অপেক্ষা কম হয় তবে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার মোট আয় যতটা বাড়বে মজুরি বাবদ মোট ব্যয় তার তুলনায় বেশি বাড়বে। ফলে নিয়োগকর্তার মোট মুনাফা কমে যাবে। এ অবস্থায় সে ক্রমশ নিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেবে। অতএব নিয়োগ কর্তার মোট মুনাফা সেখানেই সর্বাধিক হবে যেখানে MRP এবং MW পরস্পর সমান হবে। চিত্রে Q বিন্দুতে নিয়োগকর্তার মুনাফা সর্বাধিক হবে, কারণ ঐ বিন্দুতে MW রেখা এবং MRP = VMPP রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। Q বিন্দু অনুযায়ী নিয়োগকর্তা ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। কিন্তু ON পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করলে মজুরির হার বা গড় মজুরি হবে NL (= OW)। এক্ষেত্রে মজুরি MRP (= VMPP) অপেক্ষা কম হবে।

(গ) দ্রব্যের বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে VMPP অপেক্ষা MRP কম হবে এবং VMPP রেখার নিচে MRP রেখা অবস্থান করবে। শ্রমের বাজারে নিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে AW অপেক্ষা MW বেশি হবে এবং MW রেখা AW রেখার উপরে অবস্থান করবে। যেখানে MRP রেখা এবং MW রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে সেখানেই নিয়োগকর্তার ভারসাম্য ঘটবে। অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করলে নিয়োগকর্তার মোট আয় কি পরিমাণ বাড়বে তা শ্রমের MRP রেখা থেকে জানা যাবে, VMPP রেখা থেকে নয়। তাই MW রেখা এবং VMPP রেখার ছেদবিন্দুতে নিয়োগকর্তার ভারসাম্য ঘটতে পারে না।

উভয় বাজারে অনিখুঁত প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হবে তা নিচের চিত্রে দেখান হল।

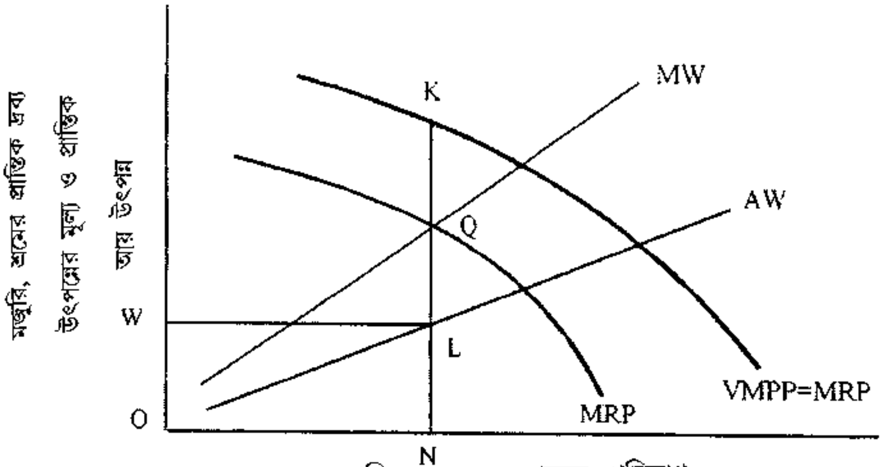

রেখাচিত্র ৬০.৬ : শ্রমের পরিমাণ

Q বিন্দুতে MRP রেখা এবং MW রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দু অনুযায়ী শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে ON। কিন্তু এই ON পরিমাণ শ্রমের গড় মজুরি বা হার হবে NL (= OW)। শ্রমের VMPP হবে NK। এখানে প্রান্তিক মজুরি (MW) VMPP অপেক্ষা কম হবে এবং মজুরির হার VMPP এবং MRP উভয়ের তুলনায় কম হবে।

৬০.৪ শ্রমিক সংঘ ও মজুরি

৬০.৪.১ শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা ও শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী

সিডনী ও বিয়াট্রিস ওয়েব (Sidney and Beatrice Webp) শ্রমিক সংঘের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, শ্রমিক সংঘ হল মজুরদের একটি নিরবচ্ছিন্ন সংগঠন, যার উদ্দেশ্য হল কাজের অবস্থান অবনতি রোধ করা অথবা উন্নতি সাধন করা। শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের সংঘ শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি করতে ও নানাভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে। মালিকেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী আর শ্রমিকেরা দুর্বল। তাই এককভাবে শ্রমিকেরা মালিকের সঙ্গে দরকষাকষিতে পেরে ওঠে না। কিন্তু সংঘবদ্ধ হলে শ্রমিকেরা মালিকের নিকট থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করে নিতে পারে। শিল্প-বিপ্লব কারখানা-ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে আর কারখানা-ব্যবস্থা থেকেই শ্রমিক সংঘের উদ্ভব ঘটেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প-বিপ্লবের সময় এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যেখানে শ্রমিককে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য শ্রমিক সংঘ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-স্বতন্ত্র্যবাদের যুগে শ্রমিকদের বহু দুঃখকষ্ট ও সামাজিক অবিচার-অত্যাচার সহ্য করতে হয়। নিজেদের আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে নিরুপায় শ্রমিকগণ নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। শ্রমিকদের মধ্যে ধীরে ধীরে এই উপলব্ধি ঘটেছে, সংববদ্ধ হয়ে যৌথভাবে দরকষাকষি করতে না পারলে মালিকদের দ্বারা শ্রমিকদের শোষণ অব্যাহত থাকবে।

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—(i) সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজ (Fraternal Activities) এবং (ii) সংগ্রামমূলক কাজ [Militant Activities]। শ্রমিক সংঘ শ্রমিক কল্যাণের জন্য এবং তার কর্মদক্ষতা বাড়াবার জন্য যে সকল কাজ করে তাকে সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজ বলে। নৈশ

বিদ্যালয় স্থাপন করে বয়স্ক শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখানো, শিল্প শিক্ষাদান, আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলার ব্যবস্থা করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রভৃতি হল সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজের উদাহরণ। অপরপক্ষে শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মজুরী বাড়ানোর জন্য, কাজের সময় হ্রাস করার জন্য, কাজের শর্তাদির উন্নতি সাধনের জন্য এবং ছাঁটাই রোধ করবার জন্য যখন মালিকের সঙ্গে দরকষাকষি করে তখন শ্রমিক সংঘ সংগ্রামমূলক কাজে লিপ্ত হয় বলে মনে করা যায়।

যৌথভাবে দরকষাকষির উদ্দেশ্যে শ্রমিকসংঘ নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে।

(i) মালিকের সঙ্গে কথাবর্তা চালিয়ে (Negotiation) নিজেদের দাবি-দাওয়া আদায়ের চেষ্টা করে।

(ii) একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও মালিকপক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বা আপসে (conciliation) উভয় পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান সূত্র খুঁজে বার করতে চেষ্টা করে।

(iii) আপসের মাধ্যমে কোনও বিরোধের নিষ্পত্তি না হলে বিচারালয় কর্তৃক বাধ্যতামূলক ভাবে বিরোধের মীমাংসা করা হয় (Compulsory Arbitration)।

(iv) শ্রমিক সংঘের দাবি আদায়ের প্রথম তিনটি হাতিয়ার ব্যর্থ হলে শ্রমিকেরা ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করে। অর্থাৎ সম্মিলিত ভাবে কাজ বন্ধ করে দেয়।

শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করে। কারখানায় শ্রমিক সংঘ গড়ে উঠলেই শ্রমিকেরা উপলব্ধি করে সে বিচ্ছিন্ন আর নিঃসঙ্গ নয়—তার অধিকারের সমর্থনে সংগ্রাম করবার জন্য সংগঠন রয়েছে এবং এই উপলব্ধিই তার মর্যাদাবোধকে জাগ্রত করে। শ্রমিক সংঘের গুরুত্ব মালিকের কাছেও উপেক্ষণীয় নয় কারণ শ্রমিক সংঘের মাধ্যমেই মালিকেরা শ্রমিকের অভাব অভিযোগ জানতে পারে এবং শ্রমিক সংঘের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শিল্প-বিরোধের নিঃষ্পত্তি ঘটতে পারে। এছাড়া সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজের দ্বারা শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ হয় এবং কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

তবে শ্রমিক সংঘ যে একেবারে দোষত্রুটির ঊর্ধ্বে এ কথা বলা চলে না। অনেক সময় শ্রমিক সংঘ শ্রমিকের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করে; কখনও কখনও এইরূপ নিয়ম করা হয় যে কেবলমাত্র শ্রমিক সংঘের সদস্যগণই কারখানায় শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত হতে পারবে। আবার অনেক সময় শ্রমিক সংঘ ছাঁটাই বন্ধ করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রের ব্যবহার এবং শিল্পের যুক্তি সিদ্ধ পূণর্বিন্যাস (Rationalisation) করতে বাধা দেয়। অত্যাধিক মজুরী দাবি করায় অনেক সময়ই নতুন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং মোট নিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। কখনও কখনও আবার শ্রমিক সংঘ ধীরে গতিতে উৎপাদনের (Go-Slow) নীতি গ্রহণ করায় উৎপাদন কম হয় এবং সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৬০.৪.২ শ্রমিক সংঘ কি মজুরি বাড়াতে পারে?

মজুরির প্রান্তিক উৎপদানশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী শ্রমিক যদি তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা অপেক্ষা বেশি মজুরি আদায় করতে সমর্থ হয় তাহলে হয় মালিকের মুনাফা কমে যাবে অথবা দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। মজুরির হার বেশি হলে মালিকের মুনাফা কমে যাওয়ার দরুণ সে তার উৎপাদন কমিয়ে দেবে এবং বহু শ্রমিক কর্মচ্যুত হয়ে পড়বে। আবার মালিক মুনাফা তার মুনাফার স্তর অপরিবর্তিত রাখার উদ্দেশ্যে যদি দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দেয় তাহলে দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে, মোট বিক্রির পরিমাণ কমে যাবে এবং এর ফলেও বহু শ্রমিক বেকার হয়ে পড়বে।

আবার দেশে একযোগে সকল শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পেলে সব কলকারখানায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে, সকল দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে এবং শ্রমিকের আর্থিক বৃদ্ধি পেলেও তার প্রকৃত মজুরী কমে যাবে। সুতরাং শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী অর্থহীন নতুবা বিপজ্জনক।

উপরের ঐ যুক্তি নানা কারণে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ বিশেষ পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বাড়াতে পারে। এগুলি হল ঃ

(ক) শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষা কম হয়। এ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ চাপ সৃষ্টি করে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পর্যন্ত বাড়তে পারে।

(খ) শ্রমিক সংঘ তার সৌভ্রাতৃত্বমূলক কাজের মাধ্যমে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং মজুরির হার বাড়িয়ে নিতে পারে।

(গ) শ্রমিক সংঘ কোনও কোনও শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। যেমন—রাজমিস্ত্রিদের সংঘ যদি শক্তিশালী হয় তবে অন্যান্য শ্রেণীর শ্রমিকদের ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও রাজমিস্ত্রিদের পক্ষে মজুরি বাড়িয়ে নেওয়া সম্ভব হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় শ্রমিক সংঘের পক্ষে নিয়োগের পরিমাণ না কমিয়ে মজুরি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতে মজুরির হার নির্ধারিত হয়। এ অবস্থায় শ্রমিক সংঘ যদি মজুরি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয় তবে নিয়োগের পরিমাণ কমে যাবে। নিচের চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা কর হল।

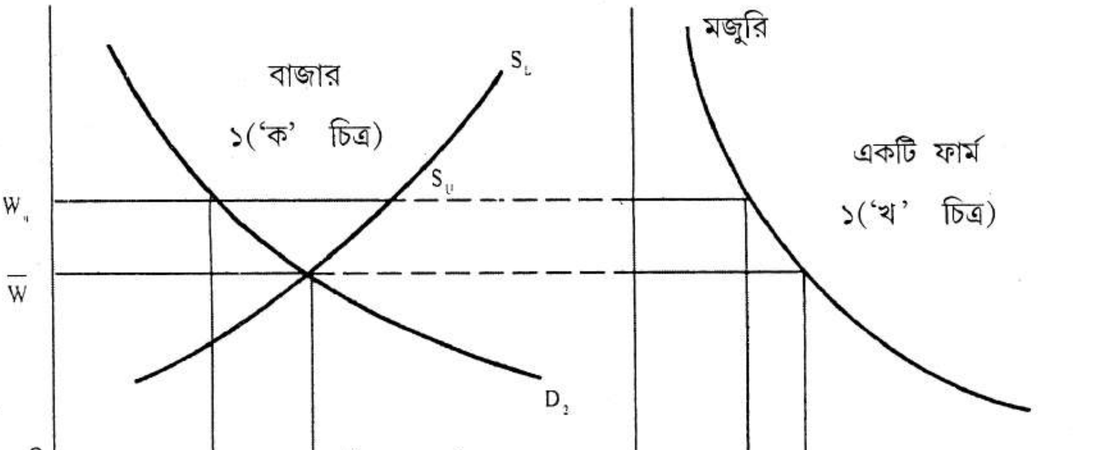

রেখাচিত্র ৬০.৭ : শ্রমের পরিমাণ

উপরে চিত্র (‘ক’) $D_L S_L$ রেখা হল যথাক্রমে শ্রমের চাহিদা ও যোগান রেখা। এই দুটি রেখা যেখানে ছেদ করেছে, সেই ছেদ বিন্দু অনুযায়ী মজুরীর হার হবে OW এবং শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে OQ।

'খ' চিত্র অনুযায়ী এই OQ মজুরিতে শ্রম নিয়োগকারী একটা ফার্ম OQ পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে (বিভিন্ন মজুরির হারে একটি ফার্ম কি পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করতে তা শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন বা MRP রেখা থেকে জানা যায়) এখন ধরা যাক শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে একটি শ্রমিক সংঘ গঠন করল এবং মজুরী হার OW থেকে OW_U পর্যন্ত বাড়াতে সক্ষম হল, সেক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা হবে W_U S_U S_L রেখা। W_U মজুরির হারে OQ_U পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হবে। শ্রম নিয়োগকারী ফার্ম এই মজুরির হারে OQ_U পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। অতএব আমরা দেখলাম শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিক সংঘ যদি মজুরি বাড়াতে চেষ্টা করে তবে শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ কমে যায়।

তবে এ কথার অর্থ এই নয় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের অবস্থায় শ্রমিক সংঘ তার সদস্যদের কোনও উপকারেই আসে না। শ্রমের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে মজুরির হার বেড়ে গেলে সকল শ্রমিককে মোট যে মজুরি দেওয়া হয় তার পরিমাণ বেড়ে যাবে, যদিও শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ কমে যাবে। এখন শ্রমিক সংঘ যদি মোট মজুরি সকল সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয় (যে সকল শ্রমিক কর্মচ্যুত হবে তারাই এই ভাগ পাবে) তবে আগের চেয়ে প্রত্যেকেই বেশি মজুরি পাবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের দ্বারা প্রত্যেক শ্রমিকই উপকৃত হবে।

কিন্তু শ্রমের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তবে শ্রমিক সংঘ চাপ সৃষ্টি করে মজুরির হার বাড়াতে সক্ষম হলেও শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ কমে যাবে এবং সকল শ্রমিক মিলে যে মোট মজুরি পাবে তার পরিমাণ আগের চেয়ে কমে যাবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ কোনওমতেই যে সকল শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়ল তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এদিক থেকে বিচার করলে আমরা বলতে পারি যে শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিক সংঘ সামগ্রিকভাবে শ্রমিকের পক্ষে অবিমিশ্র আশীর্বাদ স্বরূপ দেখা দেয় না।

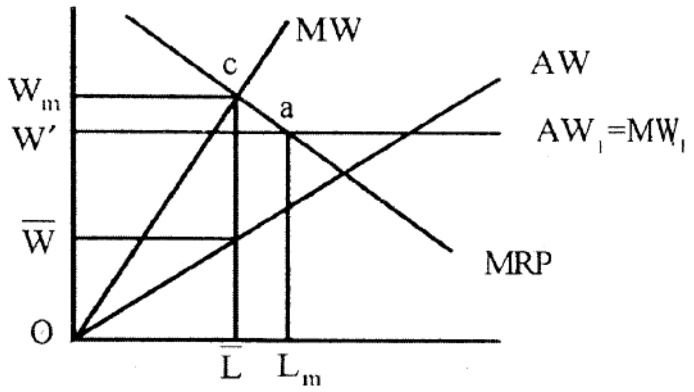

যদি শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে (মনোপ্সনি বা অলিগোপ্সনি), তবে কিন্তু শ্রমিক সংঘ সাধারণত মজুরির হার এবং শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি করতে পারে। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে যত বেশি বেশি শ্রমিক নিয়োগ করা হবে ততই মজুরির হার বাড়বে। সেক্ষেত্রে গড় মজুরি (Average Wage বা AW) রেখা এবং প্রান্তিক মজুরি (Marginal Wage বা MW) উভয় রেখাই বাঁদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হবে এবং MW এবং AW রেখার উপরিভাগে অবস্থান করবে। এ অবস্থায় যেখানে MRP এবং MW পরস্পর সমান হবে সেখানেই ভারসাম্য হবে। এই ভারসাম্য বিন্দু অনুযায়ী যে পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হবে তাদের মজুরির হার বা গড় মজুরি কিন্তু MRP অপেক্ষা কম হবে অর্থাৎ শ্রমিকের শোষণ ঘটবে। শ্রমিক সংঘ এক্ষেত্রে মজুরির হার বৃদ্ধি করে শ্রমিককে শোষণের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। বাঁদিকের পাতার চিত্রে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। চিত্রে AW

এবং MW রেখা হল যথাক্রমে গড় মজুরি এবং প্রান্তিক মজুরি রেখা। MRP রেখা হল শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা। যদি শ্রমিক সংঘের অস্তিত্ব না থাকতে তবে C বিন্দুতে ভারসাম্য হোত, কারণ ঐ বিন্দুতে MW রেখা এবং MRP রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। ঐ বিন্দু অনুযায়ী OL পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হবে। এবং গড় মজুরি বা মজুরির হার হবে OW। এখন ধরা যাক্ শ্রমিকেরা সংঘবন্ধ হয়ে একটি শ্রমিক সংঘ গড়ে তুলল। শ্রমিক সংঘ যদি শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ সর্বাধিক করতে চায়, তবে OW′ মজুরির হার ধার্য করা হবে। এখন a বিন্দুতে MW এবং MRP পরস্পর সমান হবে। অতএব শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে OL_m। এক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘের প্রভাবে নিয়োগের পরিমাণ OL থেকে বেড়ে গিয়ে OL_m হল, এবং মজুরির হার OW থেকে বেড়ে গিয়ে OW′ হল। অর্থাৎ মজুরি হার এবং শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল। অপরপক্ষে শ্রমিক সংঘ যদি মজুরির হার সর্বাধিক করতে চায় এবং নিয়োগের পরিমাণ পূর্বে যে স্তরে ছিল (OL) সেই স্তরে বজায় রাখতে চায়, তবে মজুরির হার হবে OW_m। এই মজুরি হবে সর্বাধিক মজুরি, যা নিয়োগের পরিমাণ না কমিয়ে শ্রমিক সংঘের পক্ষে আদায় করা সম্ভব হয়।

অতএব শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিক সংঘ কেবলমাত্র তখনই সদস্যদের সামগ্রিক স্বার্থের বিরোধী কাজ করতে পারে যখন শ্রমিক সংঘ OW_m অপেক্ষা বেশী মজুরী দাবী করে এবং শ্রমিকের চাহিদা যখন স্থিতিস্থাপক হয়।

৬০.৪.৩ শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা

উপরের আলোচনায় আমরা ধরে নিয়েছি শ্রমিক সংঘ যে মজুরির হার ধার্য করে, মালিক তাই মেনে নেয়। কিন্তু বাস্তব সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ। মালিক পক্ষ নানাভাবে চেষ্টা করে যাতে শ্রমিকের দাবী তাদের মানতে না হয়। অতএব বাস্তবে শ্রমিক সংঘ কতদূর মজুরি বাড়াতে সক্ষম হবে, তা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(ক) শ্রম এবং অন্যান্য উপদানের মধ্যে পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা ঃ শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধির দাবী করলে, মালিক প্রথমে শ্রমিকের পরিবর্তে অন্যান্য বিকল্প উপাদান ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে। এখন মালিকের এই প্রচেষ্টা কতদূর সফল হবে তা শ্রমিক এবং বিকল্প উপাদানগুলির পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতার উপর নির্ভর করবে। শ্রমিকের পরিবর্তে যদি অন্যান্য উপাদান (যেমন, যন্ত্রপাতি) সহজে ব্যবহার করা যায়, (অর্থাৎ পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা যদি খুব বেশি হয়) তবে শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বৃদ্ধি করা বিশেষ সম্ভব হবে না।

(খ) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা ঃ শ্রমিক ও অন্যান্য বিকল্প উপাদানের মধ্যে পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা বেশি হলেই যে মালিক শ্রমিকের পরিবর্তে এই বিকল্প উপাদান ব্যবহার করতে পারবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এই বিকল্প উপাদানগুলির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (অর্থাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী উপাদানগুলি সহজলভ্য কিনা) তাও বিবেচনা করতে হয়। বিকল্প উপাদানগুলি সহজলভ্য হলেই মালিকের পক্ষে শ্রমিকের পরিবর্তে এগুলি ব্যবহার করা সম্ভব হবে এবং শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতাও কমে যাবে।

(গ) উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা ঃ উৎপাদিত দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয়, তা হলে শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির দাবী বিশেষ কার্যকরী হবে না। শ্রমিক সংঘের দাবী অনুযায়ী মালিক

যদি বেশি মজুরি দিতে বাধ্য হয়, তবে সে দ্রব্যটির দাম বাড়িয়ে ক্রেতাদের উপর এই বোঝা স্থানান্তরিত করতে চেষ্টা করবে। দ্রব্যটির চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তবে দ্রব্যটির দাম বাড়ালে তার চাহিদা ভীষণভাবে কমে যাবে, ফলে মালিক উৎপাদন কমিয়ে দিতে এবং শ্রমিক ছাঁটাই করতে বাধ্য হবে। চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হলেই, শ্রমিক সংঘ কিছু পরিমাণ মজুরি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হবে, কারণ দ্রব্যের দাম বাড়ালেও দ্রব্যটির চাহিদা এক্ষেত্রে বিশেষ হ্রাস পাবে না।

(ঘ) মোট ব্যায়ের মধ্যে মজুরি বাবদ ব্যয়ের অনুপাত ঃ শ্রমিকের মজুরি যদি উৎপাদন ব্যয়ের বৃহৎ অংশ হয়, তাহলে শ্রমিকের মজুরি বেড়ে গেলে মালিকের মোট উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যাবে। মালিক তীব্রভাবে মজুরি বৃদ্ধিতে বাধা দেবে। অপর পক্ষে শ্রমিকের মজুরি যদি মোট উৎপাদন ব্যয়ের সামান্য অংশ হয়, তাহলে মজুরি কিছু বাড়লেও মোট উৎপাদন ব্যয় বিশেষ বাড়বে না এবং মালিক সামান্য মজুরি বৃদ্ধিতে বাধা দেবে না।

৬০.৫ শ্রমের যোগান রেখার প্রকৃতি

যোগানের নিয়ম অনুসারে কোন দ্রব্য বা সেবাসামগ্রীর দাম বাড়লে যোগাও বাড়বে এবং দাম কমে গেলে যোগানও কমে যাবে। শ্রমের ক্ষেত্রেও মজুরির হার বাড়লে শ্রমের যোগান সাধারণতঃ বেড়ে যায় কিন্তু অনেক সময় লক্ষ করা যায় যে মজুরির হার বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান বেড়ে না গিয়ে বরং কমে যায়। অর্থাৎ মজুরি বাড়লে কোন একজন শ্রমিক আগের চেয়ে কম সময় কাজ করতে রাজি হয়। মজুরির হার বাড়লে কখনো কখনো শ্রমের যোগান বেড়ে না গিয়ে কমে যায় কেন, তা মজুরির হার বৃদ্ধির আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

মজুরির হার বাড়লে বিশ্রাম (Leisure) শ্রমিকের নিকট ব্যয় বহুল হয়ে পড়ে অর্থাৎ বিশ্রামের সুযোগ ব্যয় বেড়ে যায়। আগে যখন মজুরির হার কম ছিল তখন কোনও একজন শ্রমিক এক ঘন্টা কাজ না করে বিশ্রাম করলে সে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করত, এখন মজুরির হার বেড়ে যাওয়ার পর সে যদি এক ঘন্টা বিশ্রাম ভোগ করে তবে তার তুলনায় বেশি অর্থ উপার্জনের সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে। স্বভাবতই মজুরির হার বেড়ে গেলে অধিক ব্যয় বহুল বিশ্রামের তুলনায় শ্রমিক অন্যান্য দ্রব্য বেশি করে ভোগ করতে চাইবে, অর্থাৎ কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে। (অন্যান্য দ্রব্য বেশি করে ভোগ করতে গেলে শ্রমিককে আগের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করতে হবে। এবং তা করতে গিয়ে তাকে আগের চেয়ে বেশি সময় কাজ করতে হবে) একে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব বলে।

অপরপক্ষে মজুরির হার বেড়ে গেলে একই সময় কাজ করে শ্রমিক আগের চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করতে পারে। অর্থাৎ শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বেড়ে গেলে একজন ব্যক্তি সকল স্বাভাবিক দ্রব্যই আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভোগ করে। বিশ্রাম যেহেতু "নিকৃষ্ট দ্রব্য" নয়, তাই আয় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ শ্রমিক আগের তুলনায় বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে চাইবে অর্থাৎ কাজের সময় কমিয়ে দিতে চাইবে। একেই মজুরি বৃদ্ধির "আয় প্রভাব" বলে। মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে কোনও একজন শ্রমিকের শ্রমের যোগান বাড়বে না কমবে তা পরিবর্ত প্রভাব এবং আয় প্রভাব এই পরস্পর বিরোধী দুটি প্রভাবের আপেক্ষিক শক্তির উপর নির্ভর করবে। যদি পরিবর্ত প্রভাব আয় প্রভাব অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় তবে মজুরি বেড়ে গেলে শ্রমের যোগান বেড়ে যাবে। অপর পক্ষে আয় প্রভাব যদি পরিবর্ত প্রভাব

অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হয়, তাহলে মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান কমে। শ্রমিকের মজুরির হার যখন কম থাকে তখন শ্রমিক যে মজুরি পায় তাতে তার পক্ষে সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মান বজায় রাখা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় মজুরির হার বাড়লে তার পক্ষে উচ্চতর জীবন যাত্রার লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং সে তখন বিশ্রামের পরিবর্তে আরো বেশি সময় কাজ করতে চায় অর্থাৎ আয় প্রভাবের তুলনায় পরিবর্তত প্রভাব অধিক শক্তিশালী হয়। কিন্তু মজুরির হার যখন বেশি থাকে তখন শ্রমিকের পক্ষে ইতিমধ্যেই সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মানে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়। সে ক্ষেত্রে আরও মজুরি বাড়লে সে উচ্চতর জীবনযাত্রার মানে উপনীত হতে আর আগ্রহী নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে কাজের সময় কমিয়ে দিয়ে সে বেশি বিশ্রাম ভোগ করতে আগ্রহী হয়। এক্ষেত্রে মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাবের তুলনায় আয় প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হয়।

নিরপেক্ষ রেখার মাধ্যমে আমরা মজুরি বৃদ্ধির এই আয় প্রভাব ও পরিবর্ত প্রভাব এবং এই দুটি প্রভাবের নীট ফল কি হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারি।

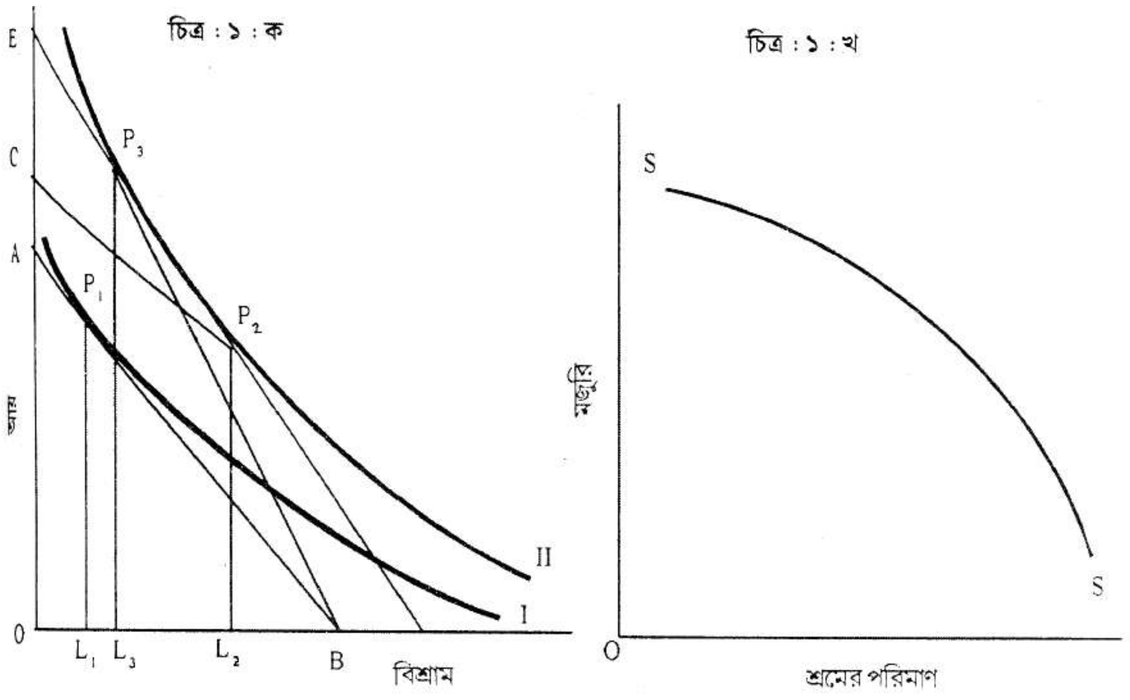

রেখা চিত্র ৬০.১০

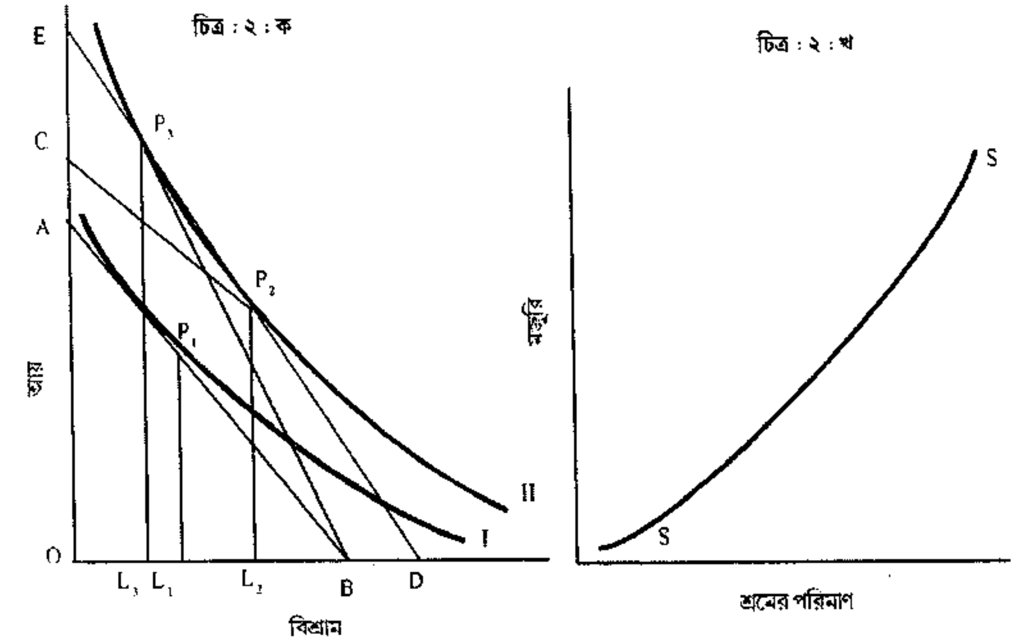

রেখা চিত্র ৬০.১০

উপরের ১(ক) ও ২(ক) চিত্রে অনুভূমিক অক্ষে একজন শ্রমিক কত সময় বিশ্রাম (Leisure) ভোগ করে তা দেখানো হচ্ছে। ধরা যাক্, একজন শ্রমিক সর্বাধিক OB পরিমাণ সময় বিশ্রাম ভোগ করতে পারে। সেক্ষেত্রে তার আয় হবে শূন্য। এই পরিমাণ সময় থেকে কিছু সময় যদি সে কাজ করে এবং অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম ভোগ করে তবে সে ঐ কাজের বিনিময়ে কিছু আয় উপার্জন করতে পারে। উল্লম্ব অক্ষে এই আয় পরিমাপ করা হচ্ছে। যদি নির্দিষ্ট মজুরিতে সে এই OB সময় সম্পূর্ণটাই কাজ করে তবে সে OA পরিমাণ আয় উপার্জন করতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে সময়ের প্রতি একক (ঘন্টা) পিছু মজুরির হার হল $\frac{OA}{OB} = AB$ রেখার ঢাল। নিরপেক্ষ রেখাগুলি শ্রম (আয়) ও বিশ্রামের মধ্যে শ্রমিকের রুচি ও পছন্দ কিরূপ তা নির্দেশ করে। পূর্বেকার মজুরি রেখা অনুযায়ী শ্রমিক P_1 বিন্দুতে ভারসাম্যে উপনীত হবে, কারণ ঐ বিন্দুতে মজুরি রেখা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ নিরপেক্ষ রেখাকে স্পর্শ করে। ধরা যাক্, মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন নতুন মজুরি রেখা হল EB রেখা। এখন OB পরিমাণ সময় কাজ করলে শ্রমিক OE পরিমাণ আয় উপার্জন করতে পারে অর্থাৎ নতুন মজুরির হাল হল $\frac{OE}{OB} = EB$ রেখার ঢাল। এই নতুন মজুরি রেখা অনুযায়ী শ্রমিকের P_3 বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটবে। ১(ক) চিত্র অনুযায়ী মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক তার বিশ্রামের সময় OL_1 থেকে বাড়িয়ে OL_3 করবে (অর্থাৎ কাজের সময় BL_1 থেকে কমিয়ে BL_3 করবে)। ২(ক) চিত্রে মজুরীর হার বেড়ে যাওয়ায় শ্রমিক তার বিশ্রামের সময় OL_1 থেকে কমিয়ে OL_3 করবে (অর্থাৎ কাজের সময় BL_1 থেকে বাড়িয়ে BL_3 করবে)। প্রথম ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎ-বক্রমুখী (Backward bending) অর্থাৎ ডানদিক থেকে বাঁদিকে উর্ধ্বগামী হবে (১(খ) চিত্র) । দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শ্রমের যোগান রেখা স্বাভাবিক আকৃতি সম্পন্ন হবে অর্থাৎ বাঁদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হবে। (২(খ) চিত্র)।

মজুরি বৃদ্ধির ফলে কোনও একজন শ্রমিক এই যে P_1 বিন্দু থেকে P_3 বিন্দুতে চলে যায় তাকে আমরা দুটি অংশে ভাগ করতে পারি। একটি হল মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব এবং দ্বিতীয়টি হোল মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব। মজুরি বৃদ্ধি পেলে শ্রমিক আগে যত সময় কাজ করতো এখনও যদি সেই সময় কাজ করে তবে তার আয় বাড়বে। এই আয় বৃদ্ধিকে আমরা CD রেখার সাহায্যে দেখাতে পারি। CD রেখায় দেখানো হয়েছে যেন মজুরির হারের কোনও পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু শ্রমিকের আর্থিক আয় AC পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে CD রেখা AB রেখার সমান্তরাল হয়েছে। আয় প্রভাবের দরুণশ্রমিক AB রেখার উপর অবস্থিত P_1 বিন্দু থেকে CD রেখার উপর অবস্থিত P_2 বিন্দুতে চলে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই এই আয় প্রভাব অনুযায়ী শ্রমিক আগের চেয়ে বেশি সময় বিশ্রাম ভোগ করতে চাইবে (OL_1থেকে OL_2) এবং কাজের সময় কমিয়ে দিতে চাইবে (BL_1 থেকে BL_2)। কিন্তু এই আয় প্রভাবই সব নয়। মজুরি বৃদ্ধির একটি পরিবর্ত প্রভাবও আছে। পরিবর্ত প্রভাব অনুযায়ী একই নিরপেক্ষ রেখা (II নং রেখা) ধরে শ্রমিক P_2 বিন্দু থেকে P_3 বিন্দুতে চলে যাবে। উভয় ক্ষেত্রেই পরিবর্ত প্রভাব অনুযায়ী শ্রমিক বিশ্রামের সময় কমিয়ে দেবে (OL_2 থেকে OL_3) এবং কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে। (BL_2 থেকে BL_3)। ১(ক) চিত্রে পরিবর্ত প্রভাবের তুলনায় আয় প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী, সেই কারণে মজুরির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক শেষ পর্যন্ত আগের তুলনায় বেশী সময় বিশ্রাম ভোগ করতে চাইবে অর্থাৎ মজুরি বাড়লে কাজের সময় কমিয়ে দেবে। ২(ক) চিত্রে আয় প্রভাবের তুলনায় পরিবর্ত প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী; সেই কারণে মজুরির হার বাড়লে শেষ পর্য্যন্ত শ্রমিক বিশ্রামের পরিমাণ কমিয়ে দেবে এবং কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে।

স্বল্পকালে কোনও বিশেষ ধরনের শ্রমের যোগান নির্ভর করে সমাজে ঐ কাজের জন্য দক্ষতা সম্পন্ন শ্রমিকের সংখ্যা, পরিবর্ত অন্যান্য চাকুরীতে কিরূপ মজুরি বা আনুষঙ্গিক সুবিধা পাওয়া যায়, পরিবর্ত চাকুরীর সম্ভাবনা প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপর। যদি বেকার শ্রমিক না থাকে তাহলে কোনও বিশেষ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের যোগান বেশি পেতে হলে অন্যান্য বিকল্প জীবিকা থেকে শ্রমিককে আকৃষ্ট করে ঐ জীবিকায় টেনে আনতে হবে। সাধারণত বিকল্প জীবিকা থেকে আকৃষ্ট করার উপায় হল বেশি মজুরী দেওয়া।

শ্রমিকের যোগান রেখার ঢাল কিরূপ হবে তা তিনটি প্রাথমিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে ঃ—

1. এই শিল্পে যা দক্ষতা বা নৈপুণ্যের প্রয়োজন তা কত তাড়াতাড়ি বিকল্প জীবিকাতে নিয়োজিত শ্রমিকেরা অর্জন করতে পারে।

2. মজুরি ছাড়াও চাকুরীর নানারূপ সুযোগ-সুবিধা (সম্মান, চাকুরীর স্থায়িত্ব, বার্ধক্যকালীন ভাতা বা পেনসন্ ইত্যাদি)।

3. এক চাকুরী থেকে অন্য চাকুরীতে সরে আসার আনুষঙ্গিক ব্যয়।

স্বল্পকালীন অবস্থায় মজুরির হার বাড়লেও অনেক সময় শ্রমের যোগান বেড়ে না গিয়ে কমে যেতে পারে কারণ এই কাজের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের সংখ্যা স্বল্পকালে মোটামুটি স্থির থাকে। স্বল্পকালে অন্যান্য বিকল্প ক্ষেত্র থেকে ঐ শিল্পে শ্রমিকের আগমনের সম্ভাবনা কম এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমিক ঐ শিল্পে আছে মজুরি বেড়ে যাওয়ায় তারা তাদের কাজের সময় দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালে শ্রমের যোগান অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, কারণ বিভিন্ন চাকীরর মধ্যে গমানাগমনের সম্ভাবনা দীর্ঘকালে অনেক বেশি। তাছাড়া বিশেষ জীবিকাতে সুদীর্ঘকাল উচ্চ মজুরি চলতে থাকলে ক্রমশ অধিক ব্যক্তি ঐ

শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে সচেষ্ট হবে। ফলে দীর্ঘকালে শ্রমের যোগানরেখা অবশ্যই ধনাত্মক ঢালসম্পন হবে।

৬০.৬ শ্রমিকের শোষণ বা বঞ্চনা

অধ্যাপিকা জোন রবিনসনের (John Robinson) মতে শ্রমিক যদি তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য (Value of Marginal Physical Product বা VMPP) অপেক্ষা কম মজুরি পায় তবে সে শোষণ বা বঞ্চনার শিকার হয়। দ্রব্যের বাজার এবং শ্রমের বাজার উভয় বাজারেই যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তবে শ্রমিকের মজুরি তার VMPP-এর সমান হয় এবং সেক্ষেত্রে শ্রমিকের কোনও শোষণ ঘটে না। কিন্তু দ্রব্যের বাজার অথবা শ্রমের বাজার যে কোনও একটি বাজারে যদি অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে কোনও না কোনওরূপ শ্রমিকের শোষণ অবশ্যই দেখা দেবে। অধ্যাপিকা রবিনসন দু প্রকারের শ্রমিক শোষণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন; একটি হল একচেটিয়া (একজন বিক্রেতা) বাজারে শ্রমিকের শোষণ (Monopolistic Expolation), এবং অপরটি হল মনোপস্নি জনিত (একজন ক্রেতা) শ্রমিকের শোষণ (Monopolistic Expolotion)।

দ্রব্যের বাজারটি যদি একচেটিয়া বাজার হয় তবে নিয়োগকর্তা ভারসাম্য অবস্থায় কখনই শ্রমিককে তার VMPP-এর সমান মজুরি দেবে না, MRP-এর সমান মজুরি দেবে, কারণ মজুরি এবং MRP পরস্পর সমান বলেই একচেটিয়া ফার্মের নিয়োগ ভারসাম্য ঘটবে। মজুরি যেহেতু এখানে VMPP

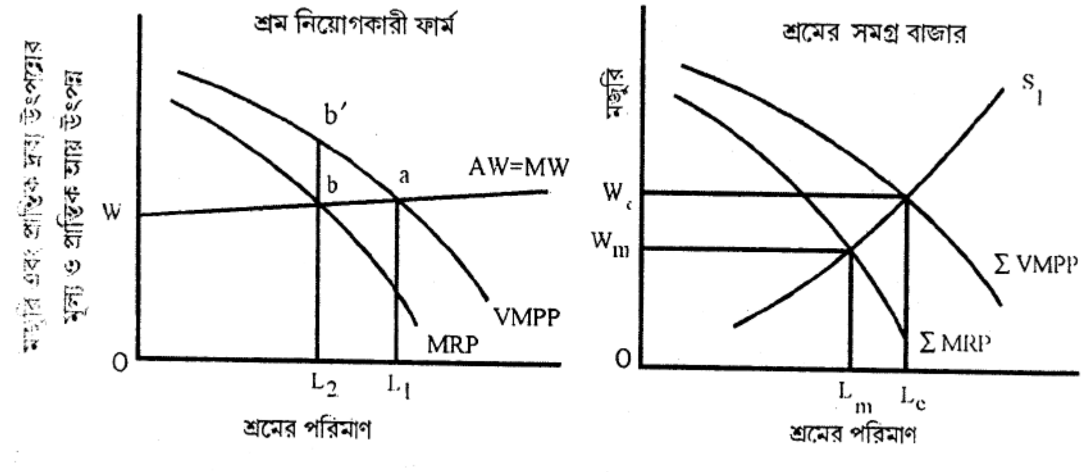

রেখা চিত্র ৬০.১১

অপেক্ষা কম হবে (দ্রব্যের বাজার একচেটিয়া হলে VMPP অপেক্ষা MRP সর্বদাই কম হবে), তাই এখানে একচেটিয়ামূলক শোষণ দেখা দেবে। নীচের চিত্রে একটি ফার্মের দিক থেকে এবং শ্রমের সমগ্র বাজারের দিক থেকে কিভাবে একচেটিয়ামূলক শোষণের আবির্ভাব ঘটে তা দেখানো হচ্ছে।

চিত্রে একচেটিয়া বাজারে নিয়োগকর্তার b বিন্দুতে ভারসাম্য ঘটবে কারণ ঐ বিন্দুতে গড় মজুরি = প্রান্তিক মজুরি (AW=MW) রেখা এবং MRP রেখা পরস্পরকে ছেদ করছে। দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ

প্রতিযোগিতা থাকায় MRP রেখা VMPP রেখার নীচে অবস্থান করে। আবার শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকায় গড়ে মজুরী এবং প্রান্তিক মজুরি পরস্পর সমান হবে এবং গড় মজুরি = প্রান্তিক মজুরি রেখাটি অনুভূমিক হবে। b বিন্দু অনুযায়ী নিয়োগকর্তা OL_2 পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করবে। এই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা হলে শ্রমের VMPP হবে L_2b' অথচ শ্রমের মজুরি হবে $L_2b(=OW)$ অতএব এখানে একচেটিয়ামূলক শোষণ হবে bb¢ দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকত তবে VMPP পরস্পর সমান হোত এবং শ্রমিকের কোনরূপ শোষণ ঘটত না।

চিত্রে ΣVMPP রেখা ও ΣMRP রেখা দুটি শ্রমের বাজারে বিভিন্ন ফার্মের যথাক্রমে VMP রেখা ও MRP রেখার সমষ্টি হিসাবে দেখানো হয়েছে। দ্রব্যের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে ΣVMPP রেখা হবে সামগ্রিকভাবে শ্রমের চাহিদা রেখা। এই রেখাটি যেখানে শ্রমের যোগান রেখাকে (S_1 রেখা) ছেদ করবে সেখানেই শ্রমের বাজারে ভারসাম্য ঘটবে। মজুরির হার হবে OW_m এবং শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে OL_C কিন্তু শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে ΣMRP রেখাটি হবে সামগ্রিকভাবে শ্রমের চাহিদা রেখা। এই রেখাটি যেখানে S_1 রেখাকে ছেদ করবে সেখানেই এখন শ্রমের বাজারে ভারসাম্য ঘটবে। তখন মজুরির হার হবে OW_m এবং শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে OL_m। W_cW_m হবে শ্রমিকের শোষণের পরিমাণ।

শ্রমিক সংঘ যৌথ দরকাষাকষির মাধ্যমে শ্রমিকের মজুরির হার চিত্রে OW থেকে বাড়াতে সক্ষম হলেও কিন্তু একচেটিয়ামূলক শোষণের অবসান ঘটাতে পারবে না। মজুরির হার OW অপেক্ষা বেশি হলে AW=MW রেখাটি উপরে উঠে যাবে এবং যেখানে এই নতুন AW=MW রেখা MRP রেখাকে ছেদ করবে সেখানে ফার্মের নতুন ভারসাম্য হবে। শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ OL_2 অপেক্ষা কম হবে। VMPP রেখা এবং MRP রেখার মধ্যে যে ব্যবধান তা কিন্তু যথারীতি বজায় থাকবে। বর্ধিত মজুরির হারে মজুরি MRP-এর সমান হলেও VMPP অপেক্ষা কম হবে অর্থাৎ শ্রমিকের শোষণ অব্যাহত থাকবে।

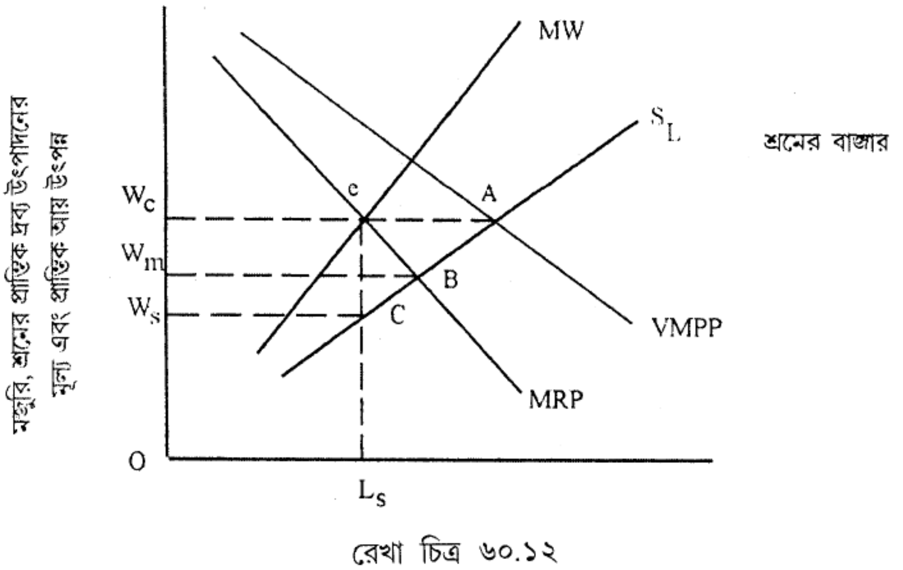

রেখা চিত্র ৬০.১২

শ্রমের বাজারে মনোপ্‌সনি (একজন ক্রেতা ও বহু বিক্রেতা) থাকলে কিভাবে শ্রমিক শোষণ বা বঞ্চনার সৃষ্টি হয় তা নিচের চিত্রে দেখান হল।

দ্রব্যের বাজার এবং শ্রমের বাজার উভয় বাজারেই যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে তবে A বিন্দুতে ভারসাম্য হবে, কারণ A বিন্দুতে শ্রমের চাহিদা রেখা (VMPP রেখা) এবং যোগান রেখা (S_1 রেখা) পরস্পরকে ছেদ করে। ভারসাম্য মজুরি হবে OW_C। শ্রমিকের মজুরি যেহেতু তার VMPP-এর সমান তাই এখানে শ্রমিকের কোনও শোষণ ঘটবে না। এখন যদি দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া অবস্থা (Monopoly) দেখা দেয়, কিন্তু শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় থাকে তবে B বিন্দুতে ভারসাম্য হবে, কারণ এই বিন্দুতে শ্রমের চাহিদারেখা (MRP রেখা—দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে MRP রেখাটিই হবে চাহিদা রেখা, VMPP রেখা নয়) এবং যোগান রেখা (S_L রেখা) পরস্পরকে ছেদ করে। এই B বিন্দু অনুযায়ী মজুরি হবে OW_m। W_eW_m হবে শ্রমের একচেটিয়ামূলক শোষণ। এখন ধরা যাক্ দ্রব্যের বাজারে একচেটিয়া অবস্থার সঙ্গে শ্রমের বাজারেও মনোপ্‌সনি দেখা দিল। সেক্ষেত্রে e বিন্দুতে শ্রমের বাজারে ভারসাম্য ঘটবে, কারণ ঐ বিন্দুতে MRP রেখা এবং প্রান্তিক মজুরি (MW) রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। এই e বিন্দু অনুযায়ী শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ হবে OL_s এবং মজুরি হবে OW_s। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় মজুরি (OW_e) এবং মনোপ্‌সনি অবস্থায় মজুরির (OW_s) মধ্যে পার্থক্যই (W_eW_s) হবে মোট মনোপ্‌সনিজনিত শোষণ। এই মোট শোষণকে দুটি ভাবে ভাগ করা যায়; মনোপলি জনিত শোষণ (W_eW_m) এবং বিশুদ্ধ মনোপ্‌সনি জনিত শোষণ (W_sW_m)।

শ্রমিক সংঘ কিন্তু নিয়োগকর্তার উপর চাপ সৃষ্টি করে যাতে শ্রমিক তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান মজুরি পায় সেরকম একটা অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। উপরে চিত্রে মনোপ্‌সনি অবস্থায় শ্রমিক সংঘের অনুপস্থিতিতে মজুরির হার হবে OW_s, যা শ্রমিকের MRP অপেক্ষা কম। এখন শ্রমিক সংঘ গঠিত হলে এই শ্রমিক সংঘ কিন্তু মজুরির হার OW_e পর্যন্ত বাড়াতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মজুরি এবং MRP পরস্পর সমান হয়ে পড়বে। শ্রমিক সংঘ যদি মজুরির হার OW_m পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয় তাহলেও মজুরি ও MRP পরস্পর সমান হয়। উভয়ক্ষেত্রেই মনোপ্‌সনিজনিত শোষণের অবসান ঘটে। অতএব শ্রমিক সংঘ মনোপলিজনিত শোষণের অবসান ঘটাতে না পারলেও মনোপ্‌সনিজনিত শোষণের অবসান ঘটাতে সক্ষম।

৬০.৭ সারাংশ

উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিককে মালিক তার শ্রমের বিনিময়ে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয় তাই হল শ্রমিকের মজুরি। টাকার অঙ্কে শ্রমিককে যা দেওয়া হয় তাকে আর্থিক মজুরি এবং শ্রমিক তার প্রাপ্য অর্থ দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাসামগ্রী ক্রয় করতে পারে তাকে প্রকৃত মজুরি বলে। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি নির্ণয় করতে গেলে তাকে কতটা অর্থ দেওয়া হয় শুধুমাত্র বিচার করলে চলে না, সে তার চাকুরীক্ষেত্র থেকে অন্যান্য যে সকল সুযোগসুবিধা পায় (বসবাসের জন্য বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার জন্য পরিবহণ, সস্তায় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ ইত্যাদি) সেগুলিকেও ধরতে হয়। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে সেগুলি হল ঃ (i) শ্রমিকের আর্থিক মজুরির পরিমাণ (ii) টাকাকড়ির ক্রয়শক্তি (iii) নিয়োগের প্রকৃতি, এবং (iii) অপরাপর সুযোগ-সুবিধা।

বাস্তব জগতে বিভিন্ন পেশায় মজুরির হারে তীব্র তারতম্য দেখা যায়। এই পার্থক্যকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়; মজুরির সমতাকারী পার্থক্য এবং মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্য। সমদক্ষতাসম্পন্ন এবং সমান প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিভিন্ন শ্রমিকের মজুরির হারের পার্থক্যকে মজুরির সমতাকারী পার্থক্য বা মজুরীর অনুভূমিক পার্থক্য বলে। এই পার্থক্যের কারণগুলি হল ঃ (i) আর্থিক মজুরির তারতম্য (ii) বিভিন্ন কাজের বিভিন্ন আকর্ষণ, (iii) শ্রমের অনুভূমিক গতিশীলতার অভাব ইত্যাদি। শ্রমিকের দক্ষতা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগের বিভিন্নতার কারণে মজুরির হারের যে পার্থক্য দেখা দেয় তাকে মজুরির বৈষম্যকারী পার্থক্য বা উল্লম্ব পার্থক্য বলে। মজুরির এই পার্থক্যের প্রধান কারণ হ'ল শ্রমের বাজারে অপ্রতিযোগী গোষ্ঠীর উপস্থিতি।

বিভিন্ন সময়ে অর্থনীতিবিদগণ মজুরি নির্ধারণ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বের প্রচার করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ ন্যূনতম জীবনধারণোপযোগী মজুরি তত্ত্ব, জীবনযাত্রার মান বজায় রাখার উপযোগী মজুরি তত্ত্ব ও মজুরি তহবিল তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ মজুরির প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু এই তত্ত্বগুলি হয় কেবলমাত্র যোগানের দিক (ক্ল্যাসিক্যাল) অথবা কেবলমাত্র চাহিদার দিকে (নয়া ক্ল্যাসিক্যাল) আলোকপাত করায় বর্তমানকালের লেখকগণ এগুলিকে অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন। এই লেখকগণের মতে দ্রব্যের মূল্য যেমন তার চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহের ঘাত-প্রতিঘাতে স্থির হয় তেমনি শ্রমের মূল্য বা মজুরিও শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। তবে শ্রমের বাজার এবং দ্রব্যের বাজার উভয় বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলেই এই চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে এবং শ্রমিকের মজুরি তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হয়। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে ভারসাম্য অবস্থায় মজুরি শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়, কিন্তু শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (মনোপ্সনি) থাকলে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষাও কম হয়।

মালিকেরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী আর শ্রমিকেরা দুর্বল। তাই এককভাবে শ্রমিকেরা মালিকের সঙ্গে দর কষাকষিতে পেরে ওঠে না, কিন্তু সংঘবদ্ধ হলে শ্রমিকেরা মালিকের নিকট থেকে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করে নিতে পারে। শ্রমিকদের সংগঠন বা শ্রমিক সংঘ শ্রমিকদের মজুরির হার বৃদ্ধি করতে ও নানাভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করে। শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বাড়াতে পারে কিনা এ ব্যাপারে কিছু বিতর্ক রয়েছে। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরি শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয় এবং এক্ষেত্রে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ না কমিয়ে শ্রমিক সংঘের পক্ষে মজুরি বাড়ান সম্ভব নয়। তবে শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ কমে গেলেই যে সামগ্রিকভাবে শ্রমিকরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে এমন কোনও কথা নেই। মালিকের কাছে শ্রমিকের চাহিদা যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তবে মজুরির হার বেড়ে গেলে শ্রমিককে মোট মজুরি যা দেওয়া হয় তার পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং এই মজুরি শ্রমিক সংঘের সকল সদস্যদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিলে সকলেই (এমন কি যারা কর্মহীন হয়ে পড়বে তারাও) লাভবান হবে। তবে শ্রমের চাহিদা যদি স্থিতিস্থাপক হয় তাহলে কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণী শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির প্রচেষ্টার ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। শ্রমের বাজারে যদি মনোপ্সনি (একজন ক্রেতা, বহুসংখ্যক বিক্রেতা) থাকে তবে শ্রমিক সংঘ

একযোগে শ্রমিকের মজুরি এবং নিয়োগের পরিমাণ উভয়ই বাড়াতে পারে। বাস্তবে শ্রমিক সংঘ কতদূর মজুরির হার বাড়াতে পারবে তা অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে : (i) শ্রম ও অন্যান্য উপাদানের পরিবর্ততার স্থিতিস্থাপকতা; (ii) বিকল্প উপাদানের যোগানের স্থিতিস্থাপকতা; (iii) উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা এবং (iv) মোট ব্যয়ের মধ্যে মজুরি বাবদ ব্যয়ের অনুপাত।

মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব এবং পরিবর্ত প্রভাবের মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়ে শ্রমের যোগান বেড়ে না গিয়ে কমে যায় কেন তার ব্যাখ্যা করা যায়। মজুরি বৃদ্ধি পেলে বিশ্রামের সুযোগ ব্যয় (কাজ না করে একঘণ্টা বিশ্রাম গ্রহণ করলে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পরিত্যাগ করতে হয়) বেড়ে যাবে এবং বিশ্রামের পরিবর্তে শ্রমিক তখন বেশি পরিমাণে কাজ করতে চায়। এটাই হল মজুরি বৃদ্ধির পরিবর্ত প্রভাব। অপরপক্ষে মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে একই সময়ে কাজ করে শ্রমিক আগে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করত এখন তার চেয়ে বেশি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবে এবং অন্যান্য স্বাভাবিক দ্রব্যের ন্যায় বিশ্রামও আগের চেয়ে বেশি পরিমাণে ভোগ করবে। (বিশ্রাম কখনই নিকৃষ্ট দ্রব্য নয়) এটাই হল মজুরি বৃদ্ধির আয় প্রভাব। এই দুটি প্রভাব বিপরীত দিকে কাজ করে। আয় প্রভাবের তুলনায় পরিবর্ত প্রভাব অধিকতর শক্তিশালী হলে শ্রমিক মজুরি বাড়লে কাজের সময় বাড়িয়ে দেবে। বিপরীত অবস্থায় সে কাজের সময় কমিয়ে দেবে। স্বল্পকালীন অকস্থায় মজুরির হার বাড়ালে শ্রমের যোগান বেড়ে না গিয়ে কমে যায় কারণ একটি কাজের জন্য দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকের সংখ্যা স্বল্পকালে মোটামুটি স্থির থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালে শ্রমের যোগান অনেক বেশি স্থিতিস্থাপক, কারণ বিভিন্ন চাকুরীর মধ্যে গমনাগমনের সম্ভাবনা দীর্ঘকালে অনেক বেশি। তাই স্বল্পকালে কোনও একটি বিশেষ শিল্পে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাৎ বক্রমুখী হলেও দীর্ঘকালে যোগান রেখা অবশ্যই ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হবে।

শ্রমিককে যদি তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম মজুরি দেওয়া হয় তবে শ্রমিকের শোষণ ঘটে। দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয় এবং প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্য অপেক্ষা কম হয়। এক্ষেত্রে শ্রমিকের একচেটিয়া মূলক শোষণ দেখা দেয়। শ্রমের বাজারে মনোপসনি থাকলে মজুরি প্রান্তিক আয় উৎপন্ন অপেক্ষাও কম হয় এবং তখন মনোপ্সসনিমূলক শোষণ ঘটে। শ্রমিকসংঘ এই মনোপ্সনিমূলক শোষণ দূর করতে সক্ষম, কিন্তু একচেটিয়ামূলক বা মনোপলি মূলক শোষণ শ্রমিক সংঘ দূর করতে পারে না।

৬০.৮ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরে প্রশ্ন ঃ

১। ''আর্থিক মজুরি'' ও প্রকৃত মজুরির মধ্যে পার্থক্য করুন। মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়?

২। বিভিন্ন পেশায় মজুরির হার বিভিন্ন হয় কেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় মজুরির হার কিভাবে নির্ধারিত হয়? দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে মজুরি নির্ধারণের বিষয়টি কিভাবে সংশোধিত হয়?

৪। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় মজুরি কিভাবে নির্ধারিত হয়?

৫। প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে শ্রমের মূল্যের নির্ধারণ হয়, একথা বলা চলে কি? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।

অথবা

মজুরির হার নির্ধারণে প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্বটি কি সন্তোষজনক? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৬। শ্রমিক সংঘের অর্থনৈতিক কার্যাবলী বর্ণনা করুন। শ্রমিকের নিয়োগের পরিমাণ না কমিয়ে শ্রমিক সংঘ কি মজুরির হার বাড়াতে পারে? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।

৭। কোন্ পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংঘ মজুরির হার বাড়াতে পারে? শ্রমিক সংঘের মজুরি বৃদ্ধির ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করুন।

৮। শ্রমের 'শোষণ' বলতে কি বোঝায়? শ্রমিক সংঘ কি শ্রমের এই 'শোষণ' দূর করতে পারে? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৯। মজুরির হার বাড়লে কি শ্রমের যোগানের পরিমাণ বাড়তে বাধ্য? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

১০। শ্রমের পশ্চাৎবক্রমুখী যোগান রেখার ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। এই প্রসঙ্গে মজুরি বৃদ্ধির 'আয় প্রভাব' ও 'পরিবর্ত প্রভাবে'র ভূমিকা আলোচনা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরে প্রশ্ন :

১। মজুরি ''সমতাকারী পার্থক্য'' ও ''বৈষম্যকারী পার্থক্যের'' প্রভেদ কি?

২। কি কারণে সুদক্ষ শল্য চিকিৎসকের আয় মাংস বিক্রেতার আয়ের থেকে বেশি হয়?

৩। শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিক সংঘ কি সামগ্রিকভাবে শ্রমি শ্রেণীর ক্ষতিসাধনই করে? উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।

৪। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে শ্রমিক সংঘ কিভাবে একযোগে মজুরির হার ও শ্রমের নিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে পারে দেখান।

৫। শ্রমের ''একচেটিয়ামূলক শোষণ'' ও ''মনোপ্সনি-মূলক শোষণে''র মধ্যে পার্থক্য করুন।

৬। কোন্ পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংঘ সামগ্রিকভাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের অনুকূলে কাজ করতে ব্যর্থ হয়?

৭। শ্রমের যোগানের ক্ষেত্রে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন অবস্থার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? আপনার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দিন।

(গ) বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন :

১। পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় কোনও একটি ফার্মের দিক থেকে শ্রমের চাহিদা রেখা কোন্ রেখাটি হবে?

২। দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে কোনও একটি ফার্মের দিক থেকে শ্রমের চাহিদা রেখাটি কি হবে?

৩। শ্রমের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা (বা মনোপ্‌সনি) থাকলে মজুরি কি শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নের মূল্যের সমান হবে?

৪। যৌথ দর কষাকষি বলতে কি বোঝায়?

৫। জীবনধারণোপযোগী মজুরি বলতে কি বোঝায়?

৬। শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে তার মজুরির সম্পর্ক কি?

৭। "মজুরি তহবিল" বলতে কি বোঝায়?

৮। "মজুরি লৌহ নিয়ম" বলতে কোন্ তত্ত্বটিকে বোঝান হয়?

একক ৬১ ◆ সুদ তত্ত্ব

গঠন

৬১.০ উদ্দেশ্য
৬১.১ প্রস্তাবনা
৬১.২ সুদের হারের তারতম্য
৬১.৩ সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব
৬১.৩.১ ভোগ বিরতি তত্ত্ব বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব
৬১.৩.২ সময় পছন্দ তত্ত্ব
৬১.৩.৩ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বা মূলধনের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব
৬১.৩.৪ ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব
৬১.৩.৫ কেইনসীয় নগদ পছন্দ তত্ত্ব
৬১.৪ সুদের হার কি কখনও শূন্যে পরিণত হ’তে পারে
৬১.৫ সুদ গ্রহণের যৌক্তিকতা
৬১.৬ সারাংশ
৬১.৭ অনুশীলনী

৬১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জানতে পারবেন—

- সুদ কাকে বলে ও স্থূল সুদ ও নীট সুদ কি
- সুদের হারের তারতম্য কিভাবে হয়
- সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব
- সুদ গ্রহণের যৌক্তিকতা

৬১.১ প্রস্তাবনা

উৎপাদন ক্ষেত্রে মূলধনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই মূলধন সৃষ্টি করতে গেলে প্রয়োজন হয় সঞ্চয়ের

বা ভোগ বিরতি। এই ভোগ বিরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতীক্ষা বা সময়প্রীতি বা বর্তমান ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে অতিক্রম করার প্রশ্ন জড়িত। ভোগ বিরতি প্রতীক্ষা বা সময়-পছন্দ অতিক্রম করার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কিছু পুরস্কার প্রত্যাশা করে। এই পুরস্কারই হল সুদ। সাধারণ অর্থে অবশ্য ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি তার ঋণ মূলধন অন্যকে ধার দেওয়ার জন্য যে দাম পায় তাকে সুদ বলে। ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণ মূলধন ব্যবহারের জন্য আসল ছাড়া যে অর্থ প্রদান করে থাকে তাই হ'ল সুদ।

স্থূল সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য করা যেতে পারে। স্থূল সুদের মধ্যে নীট সুদ ছাড়াও অন্যান্য আরো কয়েকটি উপাদান থাকতে পারে। প্রথমতঃ টাকা ধার দেওয়ার সর্বদাই কিছু ঝুঁকি থাকে। সময়মত টাকা ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে কিছু অনিশ্চয়তা বা আশঙ্কা থাকলে ঋণদাতা কিছু অতিরিক্ত অর্থ দাবী করতে পারে। দ্বিতীয়ত ঋণ গ্রহীতার নিকট টাকা আদায় করতে পরিশ্রম এবং অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। আবার, ঋণ সংক্রান্ত হিসাব পত্র রাখার জন্য, ঋণদাতাকে কিছু সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। এই সকল কারণে ঋণদাতা স্বভাবতই কেবলমাত্র ঋণ ব্যবহারের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে যে দাম প্রদান করতে হয় তার চেয়ে কিছু বেশি অর্থ দাবী করে। স্থূল সুদ থেকে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা এবং আদানপত্রের খরচ বাদ দিয়ে নীট সুদ পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রে এই নীট সুদের হার কিভাবে নির্ধারিত হয় সে বিষয়েই আলোচনা করা হয়। প্রতিযোগিতার দরুন নীট সুদের হার সর্বদাই সমান হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। কিন্তু স্থূল সুদের হার সর্বদাই সমান হয় না।

৬১.২ সুদের হারের তারতম্য

সুদের হার সবক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হয়। নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য সুদের হারের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

1. **ঝুঁকির বিভিন্নতা ঃ**—অনেক সময় সুদ এবং আসল আদায় সম্পর্কে যথেষ্ট ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে ঋণদাতা নীট সুদ ছাড়াও এই ঝুঁকি বহনের জন্য কিছু অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। এখন এই ঋণ প্রদানের সঙ্গে ঝুঁকির প্রশ্ন যত বেশি জড়িত থাকে সুদের হারও তত বেশি হয়। এই কারণেই সরকারকে বা কোনও নামকরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জনসাধারণ কম সুদের হারেও টাকা ধার দিতে রাজি থাকে। কারণ এ সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ খুবই কম।
2. **ঋণের মেয়াদ ঃ**—সাধারণ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ যত বেশী হবে সুদের হার তত বেশি হবে। এর কারণ হল দীর্ঘমেয়াদী ঋণ প্রদান করলে ঋণদাতার ভোগ বিরতির বা প্রতীক্ষার সময়ও দমিত হয় এবং তার সময়ের পছন্দও অধিক সময় ধরে দমিয়ে রাখতে হয়। স্বাভাবিক ভাবেই সে বেশি সুদ দাবী করে।
3. **জামিনের প্রকৃতি ঃ**—ঋণগ্রহিতার জামিন বা বন্ধকী দ্রব্যের তারল্যের উপরও সুদের হার নির্ভর করে। যে সকল বন্ধকী দ্রব্য সহজেই অর্থে রূপান্তরিত করা যায় (অর্থাৎ যে সকল দ্রব্যের তারল্য খুব বেশি) সে সমস্ত ক্ষেত্রে সুদের হার কম হয়। যেমন—সোনা বা সরকারী ঋণপত্রের তারল্য খুব বেশি। সুতরাং এ গুলো জামিন রেখে ঋণগ্রহীতা অল্প সুদে ঋণ পেতে পারে। কিন্তু জমি, জায়গা বাড়ি ঘর বন্ধক রেখে ঋণ নিলে সুদের হার বেশি হয় কারণ এদের তারল্য খুবই কম।

4. **ঋণের উদ্দেশ্য ঃ—**যে সকল ঋণ উৎপানের কাজে ব্যবহারের জন্য নেওয়া হয় সেই ঋণ সুদের হার অপেক্ষাকৃত কম হয় কারণ উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেই এই ঋণের আসল ও সুদ সহজেই ফেরত দেওয়া যায়। কিন্তু যে সকল ঋণ ভোগের প্রয়োজন মেটানোর জন্য নেওয়া হয় সেগুলির ক্ষেত্রে সুদের হার বেশি হয়। কারণ এই ঋণের আসল পরিশোধ দেওয়া এবং সময়মতো সুদ প্রদান করা ঋণগ্রহীতার কাছে খুব সহজ হয় না। এই কারণে ভারতীয় কৃষিজীবীরা গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে যে ঋণ নিয়ে থাকে তাতে সুদের হার খুব বেশি হয়।

5. **ঋণের বাজারের অপূর্ণাঙ্গতা ঃ—**মূলধনের বাজার বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে এবং বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রকম লেনদেন চলে। এই বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনওরূপ প্রতিযোগিতা থাকে না। কারণ ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতা মূলধনের বাজারের একাংশ থেকে অন্য অংশে সহজে সরে যেতে পারে না। এর ফলে বাজারে সুদের হার বিভিন্ন হয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রামাঞ্চলে কৃষিজীবিদের শিল্পাঞ্চলের ঋণগ্রহীতাদের তুলনায় বেশি সুদে টাকা ধার করতে হয়েছে কারণ গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক বা ঋণ বা প্রতিষ্ঠানগত ঋণ বিশেষ সহজলভ্য ছিল না।

৬১.৩ সুদ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বা তত্ত্ব

৬১.৩.১ ভোগ বিরতি বা প্রতীক্ষা তত্ত্ব (Abstinence or Waiting Theory)

ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ সিনিয়র (Senior) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। সিনিয়রের মতে সঞ্চয় করার অর্থ হল ভোগ থেকে বিরত হওয়া। আর সুদ হ’ল এই ভোগ বিরতির (Abstinence) পুরস্কার। ভোগ বিরতি একটি কষ্টকর বা অপ্রীতিকর ব্যাপার; লোকে ভোগ বিরতির সঙ্গে জড়িত কষ্ট স্বীকার করতে যাতে রাজি থাকে সেইজন্য তাকে সুদের আকারে কিছু প্রতিদান দিতে হবে।

“ভোগবিরতি” শব্দটির মধ্যে ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে সঞ্চয়ের প্রধান অংশ আসে ধনী ব্যক্তিদের নিকট থেকে এবং ধনী ব্যক্তিরা যখন সঞ্চয় করে তখন তাতে কোনও ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকারের প্রশ্ন থাকে না। তাদের ভোগের তুলনায় আয় এত বেশি যে সঞ্চয় না করে তাদের আর কোনও উপায় নেই। কার্ল মার্ক্সের (Karl Marx) এই সমালোচনার কারণেই মার্শাল (Marshall) ভোগ বিরতির ‘অপেক্ষা’ (Waiting) শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সঞ্চয়কারী ভবিষ্যতে বেশি ভোগ করার প্রত্যাশাতেই বর্তমানে ভোগ স্থগিত রাখে। তাই মার্শালের মতে সুদ হ’ল অপেক্ষার পুরস্কার। সুদের হার বেশি হলে সঞ্চয়কারী বেশি দিন অপেক্ষা করতে রাজি থাকে।

৬১.৩.২ সময়-পছন্দ তত্ত্ব

অধ্যাপক বম্-বোয়ার্ক (Bohm-Bawerk) ও অধ্যাপক আরভিং ফিশার (Irving Fisher) এই তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। মানুষ যেহেতু ভবিষ্যৎ ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করে সেইহেতু সুদের উৎপত্তি হয়। এই বর্তমান ভোগের প্রতি মানুষের পছন্দের পিছনে তিনটি কারণ রয়েছে বলে বম্-বোয়ার্ক উল্লেখ করেন।

(i) ভবিষ্যৎ অভাবের তীব্রতা বর্তমানের তীব্রতা অপেক্ষা কম।

(ii) ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

(iii) ভবিষ্যতের দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় বর্তমানের দ্রব্যসামগ্রী যান্ত্রিক প্রাধান্য (Technical superiority) অনেক বেশি। মূলধন ব্যবহার না করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় মূলধন প্রয়োগ করে উৎপাদন করা হলে তার তুলনায় অনেক বেশি উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এমন উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ যখন খুব বেশি তখনকার তুলনায় উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ যখন কম তখন দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব মানুষের কাছে বেশি থাকে। মানুষের এই বর্তমান ভোগের প্রতি আকর্ষণ বা সময়-প্রীতি (Time Preference) অতিক্রম করার জন্যই সঞ্চয়কারীকে সুদ দেওয়া প্রয়োজন।

ভোগ-বিরতি, অপেক্ষা বা সময়-পছন্দ তত্ত্বসমূহ সঞ্চয় বা মূলধনের যোগানের দিকটা ব্যাখ্যা করতে পারে, কিন্তু মূলধনের চাহিদা কেন হয় তার কোনও ব্যাখ্যা এই তত্ত্বগুলিতে নেই। কিন্তু যে কোনও দ্রব্যের দাম নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান (সুদ হল মূলধন নামক উৎপাদনের উপাদানের সবার দাম) উভয়েকই সামন গুরুত্ব থাকে। এই কারণে এই তত্ত্বসমূহ অসম্পূর্ণ।

৬১.৩.৩ ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব বা মূলধনের চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব (Classical Theory or Demand and Supply Theory)

এই তত্ত্ব অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে মূলধন ব্যবহার করলে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে বলেই মূলধনের চাহিদার সৃষ্টি হয়। কিন্তু অন্যান্য উপাদানের ন্যায় মূলধনের ক্ষেত্রেও ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় অর্থাৎ অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে উৎপাদনক্ষেত্রে মূলধনের প্রয়োগ যত বেশি ঘটে মূলধনের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন (Marginal revenue product) বা এক একক অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে উৎপাদকের অতিরিক্ত আয় ততই হ্রাস পেতে থাকে। মূলধনের প্রান্তিক আয়-উৎপন্ন কমতে কমতে যেখানে বাজারে প্রচলিত সুদের হারের সমান হয় উৎপাদক মূলধনের নিয়োগ ঠিক সেই পর্যন্ত নিয়ে যায় কারণ তখনই তার মুনাফা সর্বাধিক হয়। সুদের হার বেশি হলে মূলধনের চাহিদা কম হবে, কারণ এই অবস্থায় শুধুমাত্র অধিক উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ক্ষেত্রেই মূলধন ব্যবহার করা হবে। আবার যদি সুদের হার কম হয় তাহলে অল্প উৎপাদনশীল বিনিয়োগেও মূলধনের ব্যবহার ঘটবে। এখন মূলধনের প্রয়োগ বেশি হলেই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। তাই এ কথা বলা যায় যে সুদের হার যত কম হবে মূলধনের প্রয়োগ বা উৎপাদকের দিক থেকে মূলধনের চাহিদাও তত বেশি হবে। এই কারণে সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মূলধনের চাহিদারখো ঋণাত্মক চাহিদাও তত বেশি হবে। এই কারণে সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মূলধনের চাহিদারেখা ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়।

মূলধনের যোগান আসে লোকের সঞ্চয় থেকে। একথা ঠিক যে সুদ দেওয়া না হলেও কিছু লোক (ধনী ব্যক্তিরা) সঞ্চয় করবেই। তবে সেই সঞ্চয়ের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত হবে না। সুতরাং চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মূলধনের যোগান বাড়াতে গেলে যারা সঞ্চয় করবে তাদের অবশ্যই কিছু পুরস্কার বা সুদ প্রদান করতে হবে। সঞ্চয়ের সঙ্গে ভোগবিরতি, অপেক্ষা এবং সময়-প্রীতি অতিক্রম করার প্রশ্ন জড়িত। সুদের হার যত বেশি হবে সঞ্চয়েক পরিমাণ তত বেশি হবে। সুতরাং সুদের হার এবং সঞ্চয় বা মূলধনের যোগানের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় থাকে। ফলে সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে

মূলধনের যোগানরেখা ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়।

ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন মূলধনের চাহিদারেখা এবং ধনাত্মক সম্পন্ন মূলধনের যোগান রেখার ছেদবিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য সুদের হার কিরূপে নির্ধারিত হয় তা নিচের চিত্রে দেখান হ'ল।

চিত্রে I রেখা হ'ল মূলধনের চাহিদা রেখা বা বিনিয়োগ রেখা এবং S রেখা হ'ল মূলধনের যোগান রেখা বা সঞ্চয় রেখা। রেখা দুটি পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই ছেদ বিন্দু অনুযায়ী সুদের হার হবে Or এবং বিনিয়োগ = সঞ্চয়ের পরিমাপ হবে OM ।

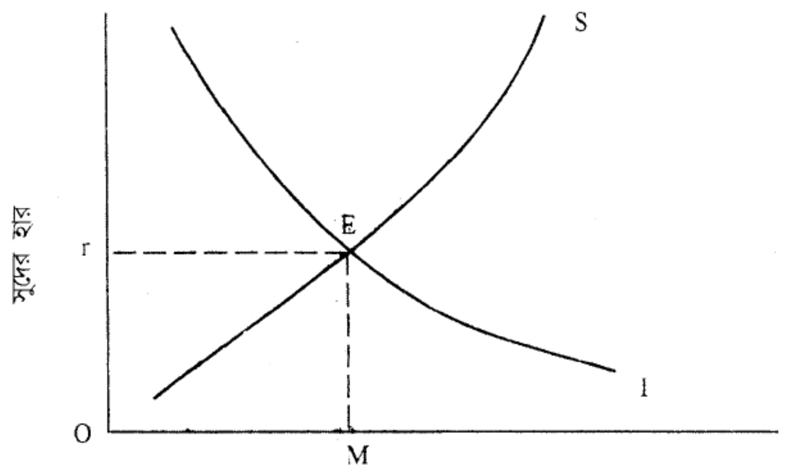

রেখাচিত্র ৬১.১ ঃ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

সমালোচনা ঃ সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বটির নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে।

(i) এই তত্ত্বটিতে উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় আছে এরূপ ধরে নেওয়া হয়েছে। পূর্ণ নিয়োগ বজায় থাকলেই মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে (অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়াতে হলে) ভোগদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণকে সেখান থেকে সরিয়ে এনে মূলধন দ্রব্যের উৎপাদনের কাজে লাগাতে হয়। কেবলমাত্র তখনই ভোগবিরতি, অপেক্ষা বা সময়-পছন্দ পরিত্যাগ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু দেশে যদি উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বলবৎ না থাকে তাহলে ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন না কমিয়েও মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ান যায়। সেক্ষেত্রে জনগণকে বর্তমান ভোগ থেকে বিরত করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ সুদ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

(ii) এই তত্ত্বে আয়ের উপর বিনিয়োগের যে প্রভাব আছে তা স্বীকার করা হয়নি। সুদের হার কমে গেলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু সুদের হার কমে গেলে বিনিয়োগ বাড়বে, বিনিয়োগ বাড়লে জাতীয় আয় বাড়বে এবং এর ফলে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে। অপরপক্ষে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা। কিন্তু সুদের হার বেড়ে গেলে বিনিয়োগ কমে যাবে জাতীয় আয় কমে যাবে এবং তার দরুণ সঞ্চয়ও কমে যাবে। সুতরাং বলা যায় যে সুদের হার বাড়লে সঞ্চয়ের যোগান না বেড়ে বরং কমে যেতে পারে এবং সুদের হার কমলে সঞ্চয়ের যোগান না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। তাই সুদের হার এবং সঞ্চয়ের মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে বলা হয়েছে তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে।

(iii) লর্ড কেইনস (Keynes) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের অনির্দিষ্ট (indeterminate)—এই যুক্তিতে তত্ত্বটির সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সঞ্চয় নির্ভর করে আয়স্তরের উপর—আয়স্তর বাড়লে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং আয়স্তর কমলে সঞ্চয়ের পরিমাণও কমে যায়। সুতরাং আয়স্তর জানা না থাকলে সঞ্চয়ের পরিমাণ জানা যায় না এবং সেক্ষেত্রে সুদের হার কি হবে তাও নিরূপণ করা যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকলে আমরা আয়ের স্তর জানতে পারি না। এই কারণে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের সুদের হার নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা যায় না।

(iv) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বে সুদের হার মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা, ভোগবিরতি, অপেক্ষা, সময়-পছন্দ পরিত্যাগ ইত্যাদি প্রকৃত (real) বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আর্থিক উপাদানগুলিকে (অর্থের চাহিদা এবং যোগান) এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু কেইনসের মতে সুদ সম্পূর্ণরূপে একটি আর্থিক বিষয়।

৬১.৩.৪ ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব

সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি উইকসেল (Wicksell), রবার্টসন (Robertson), ডেভেনপোর্ট (Devenport) প্রমুখ নয়া ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌গণ পৃথক পৃথক ভাবে প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্বটিকে সুদের নির্ধারণ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বটির আধুনিক ও সংশোধিত তত্ত্ব হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটি সুদের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রকৃত (Real) বিষয়গুলির উপর গুরত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এই পরিশোধিত তত্ত্বে প্রকৃত বিষয়সমূহের সঙ্গে সঙ্গে অর্থসংক্রান্ত (Monetary) বিষয়সমূহকে ও বিবেচনা করা হয়েছে। এই তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণপ্রদানের উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুণ দাম দেওয়া হয় তাকেই সুদ বলে অভিহিত করা হয়।

ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান ঃ—

ঋণমূলধনের তহবিলের যোগানের উৎস হল চারটি।

(i) **ব্যয় উপযোগী আয় থেকে স্বেচ্ছামূলক ঃ—**

এই সঞ্চয় জনসাধারণের সঞ্চয় হতে পারে আবার ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় হতে পারে। সাধারণ লোকের সঞ্চয় প্রধানত নির্ভর করে তাদের আয়ের উপর আর ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় হল মূলতঃ কারখানার অবণ্টিত মুনাফা (অর্থাৎ মুনাফার যে অংশ অংশীদারদের মধ্যে বন্টন না করে কারখানার ভবিষ্যৎ উন্নতির উদ্দেশ্যে আলাদা তহবিলে রেখে দেওয়া হয়)। জনসাধারণের সঞ্চয় এবং ব্যবসায়ীদের সঞ্চয় উভয় প্রকারের সঞ্চয়ই সুদের হারের উপর সরাসরি নির্ভরশীল। সুদের হার বেশি হলে, যেমন প্রত্যেক ব্যক্তি বেশি পরিমাণে সঞ্চয় করতে আগ্রহী হয় তেমনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলিও বাজার থেকে ঋণ করার পরিবর্তে সঞ্চয় করে নিজের মূলধনের প্রয়োজন মেটায়।

এই দু'প্রকারের সঞ্চয় ছাড়াও আমাদের সরকারি সঞ্চয়ের কথাও বিবেচনা করা দরকার। সরকারী সঞ্চয় পরিমাপের পদ্ধতি হল বাজেট—উদ্বৃত্তের হিসাব করা। উদ্বৃত্ত বাজেটের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারী করের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করে, সরকার সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াতে পারে। তবে সরকার যেহেতু কোনরূপ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয় না তাই সুদের হারের

সঙ্গে সরকারী সঞ্চয়ের কোনওরূপ সম্পর্ক নেই।

(ii) **অতীতের গচ্ছিত বা জমানো টাকা ছেড়ে দেওয়া** (Dishoarding) ঃ— নগদ টাকাকড়ির প্রতি পছন্দ থেকেই লোকে কিছু পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখে। সুদের হার বেশি হলে মজুত টাকাকড়ি নিষ্ক্রিয়ভাবে ধরে রাখার প্রবণতা কমে যায় এবং সুদের হার কম হলে নগদ পছন্দের প্রতি লোকের আকর্ষণ বেড়ে যায়। অর্থাৎ গচ্ছিত বা মজুত টাকা বাজারে ছেড়ে দেওয়ার পরিমাণ সুদের হারের উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়।

(iii) **ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ** (Bank money) ঃ—আধুনিক যুগে ঋণ যোগানের প্রধান সূত্র হল ব্যাঙ্কসমূহ। ব্যাঙ্কগুলি আমানত সৃজনের মাধ্যমে ঋণের যোগান দিয়ে থাকে। সাধারণতঃ ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা ভালো হলে এবং সুদের হার বেশি হলে ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদানের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার সময় সুদের হার যখন কমে যায়, তখন ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমে যায়।

(iv) **অবিনিয়োগ** (Disinvestment) ঃ—যন্ত্রপাতির ক্ষয়-ক্ষতির পূরণের জন্য (Depeciation) প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানই কিছু পরিমাণ অর্থ আলাদা একটি তহবিলে জমা করে রাখে এবং এই তহবিলে সঞ্চিত অর্থ থেকেই যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপনের (Replacement) প্রয়োজন মেটায়। এখন সুদের হার যদি খুব বেশি হয় তাহলে বাজার থেকে ঋণ না নিয়ে ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান তার এই অবপূর্তি তহবিল থেকে টাকা তুলে নিয়ে বর্তমান বিনিয়োগে টাকা খাটায়। একেই অবিনিয়োগ বলা হয়। কারণ অবপূর্তি তহবিলে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ মজুত করা না হলে ভবিষ্যৎ যন্ত্রপাতির পুনঃস্থাপনের প্রয়োজন মেটানো যায় না এবং তাতে সমাজে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ কমে যায়। সুদের হারের সঙ্গে এই অ-বিনিয়োগেরও একটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।

এই চারটি উৎস থেকে পৃথক পৃথক ভাবে যে ঋণযোগ্য তহবিল পাওয়া যায় তার সমষ্টি হল সমাজের মোট ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান। নীচের সমীকরণের সাহায্যে এই বিষয়টি দেখানো যেতে পারে।

$S_{LF} = S + DH + BM + DI$

[এখানে S_{LF} = ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান
S = সঞ্চয়
DH = মজুত বা গচ্ছিত অর্থ পরিত্যাগ
BM = ব্যাঙ্ক সৃষ্ট টাকা
DI = অ-বিনিয়োগ]

(B) **ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উৎস হল তিনটি**

(i) **বিনিয়োগ (Investment)** ঃ—ব্যবসায়ীরা ঋণ মূলধন সংগ্রহ করে তা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করে। এই ঋণ মূলধনের জন্য যাদের কাছে থেকে তারা এটি সংগ্রহ করে তাদের সুদ দিতে হয়। এখন অতিরিক্ত ঋণ মূলধনের নিয়োগের ফলে যতটা পরিমাণ অতিরিক্ত আয় হবে, তার চেয়ে কোনও অবস্থাতেই সে বেশি পরিমাণ সুদ দিতে রাজি হবে না। তাই বাজার থেকে ঋণ মূলধন সংগ্রহ করতে গিয়ে দুটি বিষয়ের দিকে নজর দেয়।

(ক) অতিরিক্ত মূলধন নিয়োগের ফলে প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কত হবে?

(খ) এই ঋণ মূলধনের জন্য তাকে কত সুদ দিতে হবে?

যেখানে ঋণ মূলধনের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এবং ঋণ মূলধনের জন্য প্রদেয় সুদ পরস্পরের সমান হয়, সেখানেই ব্যবসায়ী তার ঋণ মূলধন নিয়োগ করার পরিমাণ অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করবে। সুদের হার যত বেশি হবে এই বিনিয়োগের পরিমাণও তত কম হবে। তাই বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ মূলধনের চাহিদা সুরের হারের দিক থেকে বিপরীতমুখী হয়।

(ii) **ভোগ, অসঞ্চয় (Consumption, Disaving)** ঃ—

ঋণ মূলধন চাহিদার দ্বিতীয় উৎসটি হল ভোগ। অতিরিক্ত ভোগ করতে চাইলে ঋণ করতে হয়। সুদের হার কম হলে ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে (বিশেষত দীর্ঘস্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য বা Durable Consumable goods-এর ক্ষেত্রে) লোকের ঋণের চাহিদা বেড়ে যায়। আর সুদের হার বেড়ে গেলে এই চাহিদা কমে যায়। ফলে বিনিয়োগের ন্যায় ভোগের জন্য ঋণ মূলধনের চাহিদাও সুদের হারের দিক থেকে বিপরীতমুখী। জনসাধারণ যেমন ভোগের জন্য ঋণ করে তেমনি সরকারও নানাবিধ প্রয়োজনে জনসাধারণ এবং দেশে ব্যাঙ্কসমূহ থেকে নিয়মিত ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। যেমন যুদ্ধের সময় যুদ্ধ পরিচালনা এবং শান্তির সময় ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ণ, সমাজসেবা মূলক কাজ প্রভৃতি সম্পন্ন করার জন্য সরকার ঋণ সংগ্রহ করে। তবে সরকার কর্তৃক গৃহীত এই ঋণ সুদের হারের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

(iii) **অলস নগদ তহবিল ধারণ (Hoarding)** ঃ—

নগদ অর্থের প্রতি পছন্দ থেকে লোকে অলস নগদ তহবিল ধারণ করে। সুদের হার কম হলে সাধারণত এই নিষ্ক্রিয় অর্থ হাতে ধরে রাখার ইচ্ছা বেড়ে যায়। এবং সুদের হার অধিক হলে নগদ অর্থ নিষ্ক্রিয়ভাবে হাতে না রেখে লোকের অন্য কাউকে ধার দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। অতএব এক্ষেত্রেও ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা সুদের হারের বিপরীতমুখী হবে।

নীচের সমীকরণের সাহায্যে সমাজে মোট ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদাটিকে প্রকাশ করা যেতে পারে।

$D_{LF} = I + D_S + H$

এখানে D_{LF} = ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা

I = বিনিয়োগ

DS = অ-সঞ্চয়

H = অলস অর্থ ধরে রাখা

ভারসাম্য সুদের হার ঠিক সেই স্তরে নির্ধারিত হবে যেখানে, ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা এবং যোগান পরস্পর সমান হবে অর্থাৎ যেখানে,

$$S + DH + BM + DI = I + D_S + H$$

or

$$(S - D_S) + BM = (I - DI) + (H - DH)$$

নীট সঞ্চয় + ব্যাঙ্ক সৃষ্ট টাকাকড়ি = নীট বিনিয়োগ + নীট মজুত অর্থ।

নীচের চিত্রে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্ব অনুযায়ী সুদের হার কীভাবে নির্ধারিত হয় তা দেখান হল।

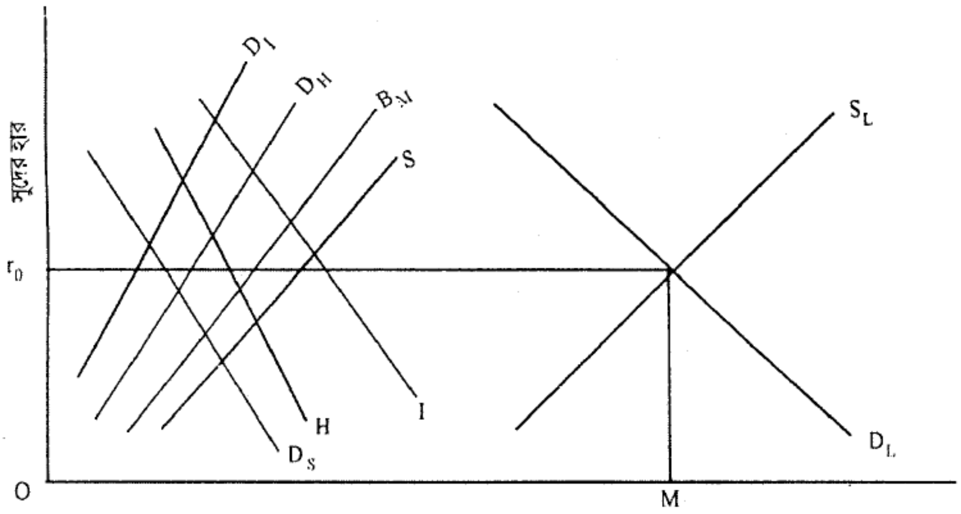

রেখাচিত্র ৬১.২ : ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ

উপরের চিত্রে D_S রেখা, H রেখা এবং I রেখা ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার বিভিন্ন দিক নির্দেশ করে। এই রেখাগুলির প্রত্যেকটি ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে সুদের হারের যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে তা প্রকাশ করে। এই কারণে এই তিনটি রেখাই ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন। এই রেখাগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে আমরা ঋণযোগ্য তহবিলের মোট চাহিদা রেখা (অর্থাৎ D_L রেখাটি) পাই। সুদের হারের সঙ্গে সামগ্রিকভাবেও ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক বজায় থাকে। তাই DL রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। অনুরূপভাবে D_I রেখা, D_H রেখা, B_M রেখা এবং S রেখা ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের বিভিন্ন উৎসগুলি নির্দেশ করে। যোগানের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সুদের হারের একটি সরাসরি বা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় থাকে অর্থাৎ সুদের হার বাড়লে ঋণযোগ্য তহবিলের প্রতিটি উৎস থেকেই যোগান বেড়ে যাবে এবং সুদের হার কমে গেলে প্রতিটি উৎস থেকেই যোগান কমে যাবে। এই কারণে D_I, D_H, B_M এবং S এই রেখাগুলির প্রত্যেকটি ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়েছে। যোগানের এই উৎসগুলিকে পাশাপাশি রেখে যোগ করলে ঋণযোগ্য তহবিলের মোট যোগান রেখা (অর্থাৎ SL রেখাটি) পাই। D_I, D_H, B_M এবং S রেখার ন্যায় এই SL রেখাটিও ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হবে, কারণ সুদের হার বেড়ে গেলে সামগ্রিকভাবে ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বেড়ে যাবে এবং সুদের হার কমে গেলে এই যোগান কমে যাবে।

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হয় (অর্থাৎ যে সুদের হারে D_L এবং S_L রেখা পরস্পরকে ছেদ করে) সেই সুদের হারই হবে ভারসাম্য সুদের হার। উপরের চিত্রে এই ভারসাম্য সুদের হার হল Or_0।

ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের সমর্থনে বলা হয় যে এতে সুদের হার নির্ধারণ সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। এই তত্ত্বটি সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব এবং কেইনসীয় নগদ পছন্দ তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। তৎসত্ত্বেও তত্ত্বটির কয়েকটি ত্রুটি নির্দেশ করা যায়। এই তত্ত্বনুযায়ী

সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ ও ঋণযোগ্য তহবিলের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণযোগ্য তহবিলের পরিমাণ যে যে বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে তার মধ্যে একটি বিষয় হল জনসাধারণের সঞ্চয়। এখন লোকের সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে আয়ের পরিমাণের উপর। সুতরাং আয়ের পরিমাণ জানা না থাকলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কি হবে তা জানা যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকলে আয়ের স্তর কি হবে তা নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ন্যায় ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটিও অনির্দিষ্ট (In-determinate)। কারণ, এখানে আয়স্তর অনির্ধারিত থেকে গিয়েছে।

এই তত্ত্বটি আসতে মজুত (Stock) এবং প্রবাহের (Flow) একটি সংমিশ্রণ। স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ বাবাদ ব্যায় হল প্রবাহের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। অপরপক্ষে অলস নগদ তহবিল ধারণ এবং ব্যাঙ্ক সৃষ্ট নতুন টাকাকড়ি মজুতের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। একই সঙ্গে মজুত ও প্রবাহের ধারণা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৬১.৩.৫ কেইনসীয় নগদ পছন্দ তত্ত্ব (Keynesian Liquidity Preference Theory of Interest)

1. কেইন্‌স-এর মতে সুদ নিছক টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপার অর্থাৎ টাকা ব্যবহারের জন্য দেয়কেই সুদ বলা হয়।

এখন সুদ যদি ঋণ দেওয়ার দান হয় তাহলে অন্যান্য দামের ন্যায় এই দামও চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যভাবে বলা যায় টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানের প্রভাব দ্বারা সুদ নির্ধারিত হয়।

টাকাকড়ির চাহিদার উদ্ভব হয় নগদ সম্পদের আকাংখা থেকে। সকল প্রকার সম্পদের মধ্যে টাকাকড়ি হল সর্বাপেক্ষা নগদ (Liquid)। টাকাকড়ির আকারে সম্পদ রাখার সুবিধা হল যে একে যখন তখন যে কোন ব্যবহারে নিয়োগ করা যায়। নগদের প্রতি আকাংখাকেই কেইন্‌স ''নগদ'' পছন্দ'' (Liquidity preference) আখ্যা দিয়েছেন। কেইন্‌স নগদ টাকা কড়ি ধরে রাখার তিন প্রকার উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন।

(ক) লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য

(খ) সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য

(গ) ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে

(ক) **লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য ঃ** লোকের হাতে আয় আসে সময় অন্তর। কেউ হয়ত সপ্তাহে একবার আয় উপার্জন করে, কেউ মাসে একবার, আবার কেউ কেউ বছরে একবার। কিন্তু লোকের বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় প্রায় প্রতিদিনই করতে হয়। অর্থাৎ অর্থব্যয়ের সময়ের ব্যবধান অর্থ প্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান অপেক্ষা কম। সুতরাং একবার আয়প্রাপ্তির পর পুনরায় আয়প্রাপ্তির পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ে ব্যয় করবার জন্য লোকের নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখতে হয়। এই লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে দেশের লোক মোট কত টাকা ধরে রাখবে তা নির্ভর করে এই আয়প্রাপ্তির সময়ের ব্যবধান এবং মোট আয়ের পরিমাণের উপর অর্থাৎ জাতীয় আয়ের উপর।

(খ) **সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য ঃ** আকস্মিক বিপদ আপদের কথা চিন্তা করেও লোকে কিছু পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখতে চায়। যেমন লোক দুর্ঘটনায় সম্মুখী হতে পারে অথবা ব্যাধিগ্রস্থ বা বেকার হয়ে পড়তে পারে। এই প্রকার বিপদের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য লোকে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখতে চায়। ব্যবসায়ীরাও অনির্দিষ্ট জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখে। এই প্রকার নগদ টাকাকড়ির পরিমাণ ব্যক্তি বিশেষের মানসিক বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। মোটামুটিভাবে অবশ্য বলা যায় যে সতর্কতামূলক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের লোক সম্মিলিতভাবে যে টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখে তার পরিমাণ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে।

(গ) **ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্য ঃ** বাজারের গতি-প্রকৃতি সুযোগ গ্রহণ করে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে লোকে নগদ টাকাকড়ি ধরে রাখে। বাজারে এমন কিছু ঋণপত্র (Bond) থাকে যা থেকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর একটি নির্দিষ্ট আয় উপার্জন করা যায়। এই ঋণপত্রের দাম কিন্তু বাজারে প্রতিনিয়তই ওঠানামা করে। ভবিষ্যতে এই ঋণপত্রের দান বৃদ্ধি পাবে যাদের এরূপ প্রত্যাশা আছে, তারা বর্তমানে ঋণপত্রগুলি ক্রয় করবে এবং ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে কম পরিমাণে নগদ অর্থ ধরে রাখবে। আবার ভবিষ্যতে ঋণপত্রের দাম কমে যাবে এরূপ যাদের প্রত্যাশা তারা বর্তমানে ঋণপত্রগুলি বিক্রয় করে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখে।

বাজারে সুদের হারের সঙ্গে ঋণপত্রের দামের একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ সুদের হার কমে গেলে ঋণপত্রের দাম বেড়ে যায় এবং সুদের হাম বেড়ে গেলে ঋণপত্রের দাম কমে যায়। অতএব যারা মনে করছে যে ভবিষ্যতে সুদের হার কমে যাবে (অর্থাৎ ঋণপত্রের দাম বেড়ে যাবে), তারা নগদ টাকা হাতে ধরে না রেখে ঋণপত্র কিনে রাখবে। আবার যারা মনে করছে যে ভবিষ্যতে সুদের হার বেড়ে যাবে (অর্থাৎ ঋণপত্রের দাম কমে যাবে) তারা বর্তমানে ঋণপত্র না কিনে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখবে। বর্তমানে বাজারে সুদের হার যদি খুব কম হয় তবে অধিকাংশ লোকের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে ভবিষ্যতে অবশ্যই সুদের হার বাড়বে (অর্থাৎ ঋণপত্রে দাম কমে যাবে)। এই পরিস্থিতির অধিকাংশ লোকই ঋণপত্র না কিনে নগদ টাকা ধরে রাখবে। অপর পক্ষে বর্তমানে সুদের হার যদি খুব বেশি হয়, অধিকাংশ লোকের মনে এই ধারণা জন্মাবে যে ভবিষ্যতে সুদের হার কমে যাবে (অর্থাৎ ঋণপত্রের দাম বেড়ে যাবে)। এই পরিস্থিতিতে সমাজে নগদ টাকাকড়ির চাহিদা কমে যাবে, কারণ অধিকাংশ লোকই তখন ঋণপত্র কিনে রাখবে।

অতএব ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে কি পরিমাণ নগদ টাকা হাতে ধরে রাখে হবে তা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। যখন সুদের হার কম তখন লোকে বেশি পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখবে এবং সুদের হার যখন বেশি তখন কম পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে ধরে রাখবে।

উপরের আলোচনায় আমরা দেখলাম, লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ টাকা হাতে ধরে রাখা হয়, তা জাতীয় আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং ফাটকা-কারবারীর উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি ধরে রাখা হয় তা সুদের হারের উপর নির্ভরশীল।

অতএব, টাকাকড়ির মোট চাহিদা $= L_1(Y) + L_2(r)$, এখানে $Y =$ জাতীয় আয়

$r =$ সুদের হার

$L_1, L_2 =$ টাকাকড়ির চাহিদার সঙ্গে

জাতীয় আয়ের এবং সুদের হারের যে সম্পর্ক রয়েছে তার নির্দেশক সূচক।

সুদের হার নির্ধারণের দ্বিতীয় দিক হল টাকাকড়ির যোগান। সমাজের মোট টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাঙ্ক অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে কি পরিমাণ নগদ টাকাকড়ির যোগান দেবে তা সুদের হারের উপর আদৌ নির্ভর করে না, কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অর্থ সংক্রান্ত কাজকর্মের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন করা নয়। সমাজের নানাবিধ প্রয়োজন বিবেচনা করেই কি পরিমাণ নগদ অর্থ বাজারে ছাড়া হবে তা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক স্থির করে। টাকাকড়ির যোগান সম্পূর্ণ সুদ-নিরপেক্ষ তাই টাকাকড়ির যোগান রেখাকে একটি উল্লম্ব রেখার সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে।

কেইন্সীয় নগদ পছন্দ তত্ত্বানুযায়ী সুদের হার সেই স্তরে নির্ধারিত হবে যেখানে লোকের নগদ পছন্দের দ্বারা নির্ধারিত টাকাকড়ির চাহিদার পরিমাণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দ্বারা নির্ধারিত টাকাকড়ির যোগানের পরিমাণের সমান হয়ে দাঁড়াবে। বিষয়টিকে রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

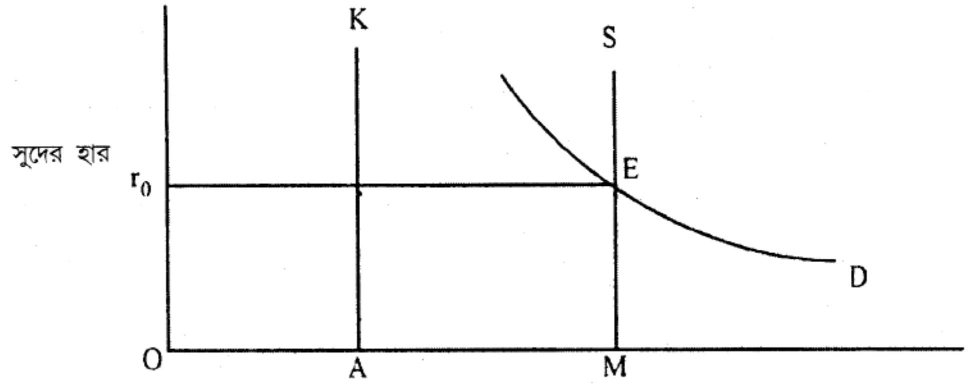

রেখাচিত্র ৬১.৩ : টাকাকড়ির পরিমাণ

উপরের চিত্রে D হল টাকাকড়ির চাহিদা রেখা বা নগদ পছন্দ রেখা। বর্তমানে দেশে যে জাতীয় আয় রয়েছে, সেই জাতীয় আয় অনুযায়ী লেনদেন এবং সতর্কতা মূলক উদ্দেশ্য OA পরিমাণ নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখা হবে, সুদের হার যাই হোক না কেন। টাকাকড়ির বাকি অংশ হল ফাটকা কারবারীর উদ্দেশ্যে নগদ পছন্দ। বিভিন্ন সুদের হারে ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে কত টাকা ধরে রাখা হবে তা AK উল্লম্ব রেখা এবং D রেখার মধ্যে অনুভূমিক পার্থক্যের দ্বারা দেখানো হচ্ছে। টাকাকড়ির যোগান রেখা হল MS রেখা, D রেখা এবং MS রেখা, D রেখা এবং MS রেখা পরস্পর E বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই ছেদবিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য সুদের হার হবে Or_1 টাকাকড়ির মোট যোগান হল OM_1 এই যোগানের মধ্যে লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে OA পরিমাণ টাকাকড়ি এবং ফাটকা কারবারীরর উদ্দেশ্যে AM পরিমাণ টাকাকড়ি ধরে রাখা হবে,

সমালোচনা ঃ—

(i) এই তত্ত্বে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু মূলধনের উৎপাদনশীলতা সম্পূর্ণ উপেক্ষনীয় নয়। উৎপাদন কার্য সম্পাদন করতে সময় লাগে এবং অনেকক্ষেত্রে অধিক মূলধন ব্যবহারকারী উৎপাদন পদ্ধতি অধিকতর উৎপাদনশীল। এই কারণে ঋণ মূলধনের চাহিদা হয় এবং সুদ দেওয়া হয়।

(ii) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে কেইনস্ যে অনির্দিষ্ট বলে সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচনা তার নগদ পছন্দ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেইন্‌সের তত্ত্বানুসারে সুদের হার টাকাকড়ির চাহিদা বা নগদ পছন্দ এবং টাকাকড়ির যোগনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু আয়ের পরিবর্তন হলে নগদ পছন্দরেখা পরিবর্তিত হয়, কারণ লেনদেনও সতর্কতা মূলক উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির কতটা চাহিদা হবে তা আয়ের স্তরের উপর নির্ভরশীল। অতএব যে পর্যন্ত না আয়ের স্তর জানা যাচ্ছে না সে পর্যন্ত ভারসাম্য সুদের হার কি হবে তা জানা যায় না। আবার সুদের হার কি তা যদি জানা না থাকে তাহলে আয়ের স্তর জানা যায় না।

(iii) অধ্যাপক সোমার্স (Somers) বলেছেন, ঋণপত্রের চাহিদা ও যোগান, নগদ পছন্দ মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা এবং সময় পছন্দ (Time-preference) সকলেই সুদের হার নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করে। কেইন্‌স শুধুমাত্র নগদ পছন্দ ও টাকাকড়ির যোগনকে হিসাবের মধ্যে ধরেছেন এবং অপর বিষয়গুলিকে উপক্ষা করেছেন।

(iv) অধ্যাপক ভাইনার (Viner) বলেছেন যে সঞ্চয় না থাকলে টাকাকড়ির নগদ পছন্দ থাকতে পারে না। কিন্তু কেইন্‌স্ সঞ্চয় এবং অপেক্ষার বিষয়গুলি গ্রাহ্য করেন নি।

৬১.৪ সুদের হার কি কখনও শূন্যে পরিণত হতে পারে?

চাহিদার দিক থেকে সুদের হার শূন্যে পরিণত হওয়ার অর্থ হল মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যে পরিণত হওয়া। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তখনই শূন্যে পরিণত হয় যখন উৎপাদন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত এক একক মূলধন নিয়োগ করা হলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তার পরিমাণ হয় শূন্য। সুদের হার কোনও অবস্থাতেই মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার চেয়ে বেশি হতে পারে না। তাই দীর্ঘকাল একটি দেশে উৎপাদন ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পেতে যদি এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া যায় যেখানে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি অনুযায়ী মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্যে পরিণত হয় তাহলে সুদের হারও শূন্যে পরিণত হয়। কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা কখনও দেখা দিতে পারে না কারণ মানুষের অভাব কখনোই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত হয় না। অভাব থাকলেই দ্রব্য সামগ্রীর জন্য মানুষের আকাঙ্খা থাকবে এবং ঐ দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করতে মূলধনের চাহিদা দেখা দেবে। ফলে সুদের হার কখনই শূন্যে পরিণত হতে পারে না। যোগানের দিক থেকে দেখা যায় যে দীর্ঘকালে সঞ্চয় এবং ঋণযোগ্য তহবিলের যোগান বাড়তে বাড়তে এমন একটি স্তরে পৌঁছে যেতে পারে যখন ঋণযোগ্য মূলধনের চাহিদার তুলনায় তার যোগান বেশি হয়ে পড়বে এবং তখনই সুদের হার শূন্যে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তবে এরূপ অবস্থা কখনই দেখা দিতে পারে না। কারণ সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ঋণযোগ্য মূলধনের যোগান যে হারে বৃদ্ধি পায় তার চাহিদাও সেই হারে বৃদ্ধি পেতে পারে। ফলে সুদের হার কখনই শূন্য হবে না। তাছাড়া সুদের হার শূন্য হওয়ার অর্থ হল কোনও প্রতিদানের প্রত্যাশা না করেই মানুষ সঞ্চয় করে। এসব কখনো বাস্তবে ঘটতে পারে না।

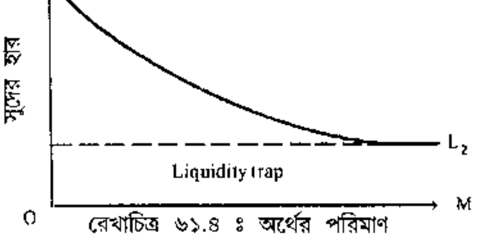

রেখাচিত্র ৬১.৪ ঃ অর্থের পরিমাণ

কেইন্‌স্ তাঁর নগদ পছন্দ তত্ত্ব দেখিয়েছেন যে

সুদের হার যখন খুব কম থাকে তখন অধিকাংশ লোকের মনে এই ধারণা জন্মায় যে ভবিষ্যতে সুদের হার অবশ্যই বাড়বে। অর্থাৎ ঋণপত্রে দাম কমে যাবে (সুদের হার ও ঋণপত্রের দামের মধ্যে সর্বদা একটি বিপরীত সম্পর্ক বজায় থাকে। সুদের হার এই স্তরে পৌঁছে গেলে ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থের চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়ে। লোকে তখন আর আদৌ কোনও ঋণপত্র নিতে চায় না। যাবতীয় সম্পদ নগদ অর্থের আকারে ধরে রাখে। ঋণপত্র ক্রয় না করার ফলে বাজারে ঋণপত্রের চাহিদার সৃষ্টি হয় না। তাদের দাম বাড়ে না। অর্থাৎ সুদের হার ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নীচে আর নামে না। এই অবস্থানটিকে কেইন্‌স "নগদ পছন্দের ফাঁদ" (Liquidity – Trap) আখ্যা দিয়েছেন। কেইন্‌স্ ধরেছিলেন $r = r\ min$ হলে $L_2 = \propto$ হবে। অপরপক্ষে সুদের হার যখন $r\ max$ তখন L_2 রেখা r অক্ষকে ছেদ করবে এবং $L_2 = 0$ হবে। আবার $r = r\ min$ হলে $L_2 = \propto$ হবে। কাজেই $r\ min$ হলে L_2 রেখাটি OM অক্ষের সমান্তরাল হবে, কেইন্‌স্-এর মতে সদের হার প্রায় 2% হলে বুঝতে হবে সুদের হার নিম্নতম স্তরে এসে পৌঁছেছে এবং নগদ পছন্দের ফাঁদে আটকে পড়েছে (উপরের রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে)।

হিক্স-হ্যানসেন তত্ত্ব (Hicks-Hansen Analaysis) :

সুদের হার নির্ধারণে উপরে আলোচিত প্রতিটি তত্ত্বেই আমরা দেখেছি আয়স্তর নির্ধারিত না হওয়ার জন্য সুদের হারও অনির্ধারিতই থেকে যাচ্ছে। অধ্যাপক হিক্স-হ্যানসেন প্রণীত তত্ত্বে একই সঙ্গে ভারসাম্য সুদের হার ও ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারিত হয়, ফলে স্থায়ী ভারসাম্য অবস্থা পাওয়া যায় (Stable euilibrium position)। এই তত্ত্ব ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্ব ও কেইন্‌সীয় তত্ত্বের সম্মিলিত রূপ। এই তত্ত্বে সুদের হার (r) নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঞ্চয় (s), বিনিয়োগ (I), অর্থের চাহিদা (L) এবং অর্থের যোগান (M) – সকলেরই গুরুত্ব আছে। ভারসাম্যের জন্য r এবং y-এর মান হওয়া চাই যাতে y এবং r-এর ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তনের ঝোঁক থাকবে না। এখানে ধরে নেওয়া হয় অর্থব্যবস্থায় দুটি মাত্র বাজার আছে—একটি হল দ্রব্যের বাজারে আছে চাহিদা ও অর্থের যোগান। আরও ধরা হয় দেশটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না এবং সরকারের কোনো অর্থনৈতিক কাজকর্ম নেই। এই রকম দেশে দ্রব্যের বাজারে আয়ের (y) চাহিদা = ভোগব্যায়ের চাহিদা (C) এবং বিনিয়োগের চাহিদা (I).

$Y = C + I$ ধরা যাক, S নির্ভর করে y এবং r-এর উপর

$\therefore Y - C = I$ এবং I নির্ভর করে r-এর উপর

$\therefore S = I \quad \therefore S = S(y, r)$ .... (1) সঞ্চয় অপেক্ষক

$I = I(r)$ .... (2) বিনিয়োগ অপেক্ষক

$S = I$ .... (3) ভারসাম্যের শর্ত

ধরা হয়, y বাড়লে S বাড়ে, r বাড়লে S বাড়ে

y কমলে S কমে, r কমলে S কমে

$\therefore \frac{ds}{dy} > 0$ এবং $\frac{ds}{dr} > 0$

বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধরা হয়, r বাড়লে I কমে, r কমলে I বাড়ে

$\therefore \frac{dI}{dr} < 0$

উপরের (1), (2) এবং (3) থেকে পাই, S(y, r) = I(r) .... (4)

4 নং সমীকরণে দুটি অজ্ঞাত বিষয় (y ও r) ও একটি সমীকরণ রয়েছে। তাই এখান থেকে আমরা y এবং r-এর একক মান পাব না। আমরা y এবং r-এর এমন কয়েকজোড়া মান পাব যাদের প্রত্যেকটির জন্য I = S হয়। সেই মানগুলিকে বসিয়ে আমরা IS রেখা পাব যেটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হবে কারণ y বাড়লে S বাড়ে তাহলে ভারসাম্যের জন্য I কেও বাড়াতে হবে, তার জন্য r কমাতে হবে। তাহলে y বাড়লে r কমে। y এবং r-এর বিপরীতমুখী সম্পর্কের জন্যই IS রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। IS রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নমুখী হয়। IS রেখার প্রতিটি বিন্দুতে S = I অর্থাৎ দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য অন্যদিকে, অর্থের বাজারে অর্থের চাহিদা আয়স্তর ও সুদের হারের উপর নির্ভর করে। ধরা যাক, অর্থের চাহিদা = L

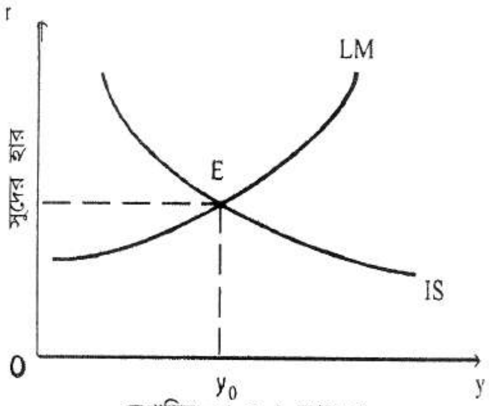

রেখাচিত্র ৬১.৫ ঃ আয়স্তর

L = L(y, r) .... (1) আয় বাড়লে কেনাকাটার প্রয়োজন বাড়ে বলে অর্থের চাহিদা বাড়ে। অতএব y বাড়লে L বাড়ে। আবার r বাড়লে অর্থ হাতে ধরে রাখার চাহিদা কমে। অপরদিকে, অর্থের যোগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক নীতির উপর নির্ভর করে। ফলে এই অর্থের যোগান (M) হল একটি ধ্রুবক। অর্থাৎ M = M0 .... (2) ∴ ভারসাম্যের জন্য L = M .... (3)। (1), (2), ও (3) নং সমীকরণ থেকে পাই, L (y, r) = M .... (4)। এই সমীকরণ থেকে আমরা y এবং r-এর এমন কয়েকজোড়া মান পাব যার প্রত্যেকটির জন্য L = M হবে অর্থাৎ অর্থের বাজারে ভারসাম্য আসবে। এই LM রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হবে কারণ y বাড়লে L ফলে অর্থের চাহিদা রেখা উপরের দিকে উঠে যাবে এবং r বেড়ে যাবে। উপরের রেখাচিত্রে IS এবং LM রেখার ছেদবিন্দুতে (E) যে y এবং r নির্ধারিত হল তাই ভারসাম্য আয়স্তর (Oy_0) এবং ভারসাম্য সূচিত হওয়ার ভারসাম্য আয়স্তর ও ভারসাম্য সুদের হার যুগপৎ নির্ধারিত হয়েছে।

৬১.৫ সুদ গ্রহণের যৌক্তিকতা

প্রাচীন কালের দার্শনিকগণ সুদে টাকা খাটানোকে এক গর্হিত কাজ বলে মনে করতেন। অ্যারিষ্টটলের মতে সুদ গ্রহণ করা অস্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়মবিরুদ্ধ ও অন্যায়। বিভিন্ন ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ীও সুদ গ্রহণ করা নিন্দনীয়। প্রাচীন কালের দার্শনিকদের ও ধর্ম শাস্ত্রবিদ্‌দের সুদের প্রতি এই বিরূপতার প্রধান কারণ হল এই যে সেই যুগে কেবলমাত্র দরিদ্র ব্যক্তিরাই ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণ করতে বাধ্য হোত। তাই দরিদ্র ব্যক্তিদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাদের সুদ প্রদান করাকে নিষ্ঠুরতা বলেই গণ্য করা হোত।

বর্তমান কালে ঋণযোগ্য তহবিল উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করা হলে উৎপাদকের মোট উৎপাদনের পরিমাণ

এবং মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং মূলধনের মালিক তার একাংশ যদি সুদ হিসাবে গ্রহণ করে তবে তা মোটেই অন্যায় ও অযৌক্তিক নয়। দ্বিতীয়তঃ সুদ প্রদান করা হলে লোকে সঞ্চয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠে। সঞ্চয় বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। আকর্ষণীয় হারে সুদ প্রদান করা না হলে সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাবে এবং দেশে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় হ্রাস পাবে। তৃতীয়তঃ সুদ অপ্রচুর মূলধনের কাম্য ও যথাযথ বণ্টন সম্ভব করে। উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করার মত মূলধন কোনও দেশেই থাকতে পারে না। সীমাহীন ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ মূলধনের যথাযোগ্য বণ্টনই হল অর্থনীতির একটি মৌলিক সমস্যা। উৎপাদনের যে ব্যবহারের মূলধনের নিয়োগ ঘটলে অধিক উৎপাদন হবে সেখানে মূলধন ব্যবহারকারী অধিক সুদ দিতে সক্ষম হবে এবং মূলধনকে অন্যান্য ক্ষেত্রে (যেখানে মূলধনের উপাদনশীলতা কম) থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কেবলমাত্র সে সকল ক্ষেত্রেই নিয়োগ করা হবে।

বর্তমানকালেও কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ্ মনে করেন যে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজে সুদের মাধ্যমে আয় উপার্জন হল আয় বৈষম্যের একটি প্রধান কারণ। এই কারণেই কার্ল মার্কস সুদকে শোষণের নিছক এক বুর্জোয়া কৌশল বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মানুষের অধিকারকে যদি স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে সেই সম্পত্তিকে ব্যবহার করে কিছু অর্থ উপার্জন করাকে হয়তো অন্যায় বলে মনে করা যায় না। তবে প্রয়োজনে অবশ্যই সুদের হারের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সমর্থনযোগ্য।

৬১.৬ সারাংশ

ঋণ প্রদানকারী ব্যক্তি তার ঋণ মূলধন অন্যকে ধার দেওয়ার জন্য যে দাম পায় তাকে সুদ বলে। সুদ দু-প্রকারের ঃ মূল সুদ ও নীট সুদ। সাধারণ অর্থে সুদ বলতে স্থূল সুদকেই বোঝান হয়। স্থূল সুদ থেকে ঋণ প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি, আসল ও সুদ আদায় করার পরিশ্রম ঋণ সংক্রান্ত হিসাবপত্র রাখার ঝামেলা ইত্যাদি বাবদ ঋণদাতা যে কিছু অতিরিক্ত অর্থ দাবী করে তা বাদ দিলে নীট সুদ পাওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রকার ঋণের জন্য বিভিন্ন হারে সুদ দিতে হয়। সুদের হারের এই তারতম্যের কারণ হল (i) ঝুঁকির বিভিন্নতা, (ii) ঋণ পরিশোধের মেয়াদের বিভিন্নতা (iii) জামিনের প্রকৃতির পার্থক্য (iv) কোন উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে পার্থক্য (v) ঋণের বাজারের অপূর্ণাঙ্গতা (vi) ঋণ আদায়ের ব্যাপারে বিভিন্ন ঋণের রকমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের ঝামেলা ও অসুবিধা (vii) ব্যবসায়ে তেজীভাব না মন্দাভাব ইত্যাদি।

সিনিয়রে মতে সুদ হ'ল "ভোগ বিরতি"র সঙ্গে জড়িত ত্যাগস্বীকার বা অপ্রীতিকর ব্যাপার মেনে নেওয়ার পুরস্কার।। মার্শাল অবশ্য "ভোগ বিরতি"র পরিবর্তে "অপেক্ষা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অধ্যাপক বম্ বোয়ার্ক ও অধ্যাপক আরভিং ফিশারের মতে মানুষ যেহেতু ভবিষ্যৎ ভোগ অপেক্ষা বর্তমান ভোগকে বেশি পছন্দ করে তাই মানুষের বর্তমান ভোগের প্রতি আকর্ষণ বা সময়-প্রীতিকে অতিক্রম করার জন্যই সুদের প্রয়োজন। তবে এই ভোগবিরতি, প্রতীক্ষা, সময়-পছন্দ ইত্যাদি তত্ত্বসমূহ মূলধনের যোগানের দিকটাই ব্যাখ্যা করে, মূলধনের চাহিদা হয় কেন সে বিষয়ে এই তত্ত্বসমূহ নীরব। তাই এই তত্ত্বগুলি অসম্পূর্ণ।

ক্ল্যাসিক্যাল বা সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বে মূলধনের চাহিদা ও যোগান উভয় দিকটাই আলোচনা করা হয়। মূলধনের চাহিদার মূলে রয়েছে তার উৎপাদনশীলতা আর যোগান বা সঞ্চয়ের মূলে রয়েছে ভোগ-বিরতি, প্রতীক্ষা এবং সময়-প্রীতি অতিক্রম করার ইচ্ছা। মূলধনের

চাহিদার সঙ্গে সুদের হারের একটি বিপরীত সম্পর্ক ও মূলধনের যোগানের সঙ্গে সুদের হারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় থাকে। তাই সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে চাহিদা রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন এবং যোগান রেখাটি ধনাত্মক ঢালসম্পন্ন হয়। যেখানে এই রেখাদুটি পরস্পরকে ছেদ করে সেখানেই ভারসাম্য সুদের হার নির্ধারিত হয়।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হ'ল ঃ (i) এই তত্ত্বে উপকরণের পূর্ণ নিয়োগ ধরে নেওয়া হয়; (ii) আয়ের উপর বিনিয়োগের প্রভাব এবং সঞ্চয়ের উপর আয়ের প্রভাব এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয় না এবং (iii) আয়ের স্তর জানা না থাকলে সুদের হার জানা যায় না এবং সুদের হার জানা না থাকলে আবার আয়স্তর জানা যায় না। তাই সুদের হার অনির্দিষ্ট।

সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হ'ল যে সুদের হার ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয়। ঋণ প্রদানের উপযোগী তহবিল ব্যবহারের দরুণ যে দাম দেওয়া হয় তাকেই সুদ বলে অভিহিত করা হয়। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উৎস হল তিনটি ঃ (i) বিনিয়োগ (ii) ভোগ ও অ-সঞ্চয় এবং (iii) অলস নগদ তহবিল ধারণ। অন্যদিকে ঋণমূলধনের যোগানের উৎস হল চারটি ঃ (i) স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয়, (ii) অতীতের গচ্ছিত জমানো টাকা ছেড়ে দেওয়া; (iii) ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ এবং (iv) অবিনিয়োগ। ঋণমূলধনের চাহিদার প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সুদের হারের একটি বিপরীত সম্পর্ক এবং যোগানের প্রতিটি উপাদানের সঙ্গে সুদের হারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বজায় থাকে। এই কারণে সুদের হারের দিক থেকে বিচার করলে চাহিদা রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন এবং যোগান রেখাটি ধনাত্মক ঢাল সম্পন্ন হয়। চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করে সেখানেই ভারসাম্য সুদের হার স্থির হয়।

ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বের ন্যায় এই তত্ত্বটিও অনির্দিষ্ট, কারণ আয়ের স্তর জানা না থাকলে সঞ্চয়ের পরিমাণ অর্থাৎ ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের প্রধান উপাদান জানা যায় না এবং সুদের হার জানা না থাকলে আবার আয়ের স্তর জানা যায় না। দ্বিতীয়তঃ এই তত্ত্বটি একই সঙ্গে মজুত (stock) ও প্রবাহের (flow) ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মজুত ও প্রবাহের এই সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

কেইন্‌সের মতে সুদ হ'ল নিছক অর্থ সংক্রান্ত বিষয়; অর্থাৎ অর্থ ব্যবহারের জন্য মালিককে দেয় অর্থই হল সুদ। সুদের হার নির্ধারিত টাকাকড়ির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাত দ্বারা। টাকাকড়ির চাহিদা বলতে নগদ টাকা হাতে ধরে রাখার ইচ্ছাকে বোঝায়। কেইনস্ নগদ টাকাকড়ি হাতে ধরে রাখার তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেনঃ (i) লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্য (ii) সর্তকতামূলক উদ্দেশ্য এবং (iii) ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্য। এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রথম দুটি উদ্দেশ্য ব্যক্তির আয়ের স্তর এবং সমগ্র সমাজের দিক থেকে বিচার করলে জাতীয় আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে এবং তৃতীয় উদ্দেশ্যটি সুদের হারের উপর নির্ভর করে—সুদের হার বাড়লে ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে নগদ টাকাকড়ির হাতে ধরে রাখার পরিমাণ কমে যায়। সমাজে মোট টাকাকড়ির যোগান নিয়ন্ত্রণ করে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা অর্থাৎ মলূতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। এই নগদ টাকাকড়ির যোগান সুদের হারের উপর আদৌ নির্ভরশীল নয়। সুদের হারের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে টাকাকড়ির চাহিদা রেখাটি ঋণাত্মক ঢালসম্পন্ন এবং যোগান রেখাটি উল্লম্ব হবে। এই রেখাদুটি ভারসাম্য সুদের হারে পরস্পরকে ছেদ করে।

কেইন্‌সীয় নগদ পছন্দ তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হ'ল ঃ (i) এই তত্ত্বে মূলধনের প্রান্তিক

উৎপাদনশীলতাকে উপেক্ষা করা হয়েছে; (ii) ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বকে কেইন্‌স যে অনির্দিষ্ট বলে সমালোচনা করেছেন সেই সমালোচনা তার নগদ পছন্দ তত্ত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সে পর্যন্ত না আয়ের স্তর জানা যায় সে পর্যন্ত লেনদেন ও সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদা কি হবে তা জানা যায় না। আবার সুদের হার জানা না থাকলে আয়ের স্তর কি হবে তাও জানা যায় না, (iii) কেইন্‌স সুদের হার নির্ধারণের পিছনে সে প্রকৃত বিষয়সমূহ কাজ করে,—যেমন মূলধনের উৎপাদনশীলতা, সময়-পছন্দ, ভোগবিরতি ও প্রতীক্ষা, ইত্যাদি—সেগুলিকে উপেক্ষা করেছেন। একমাত্র হিক্স-হ্যানসেন তত্ত্বে একই সঙ্গে অর্থের বাজারে ও দ্রব্যের বাজারে ভারসাম্য সূচিত হওয়ায় ভারসাম্য আয়স্তর ও ভারসাম্য সুদের হার যুগপৎ নির্ধারিত হয়েছে।

সুদের হার কখনও শূন্যে পরিণত হতে পারে কিনা এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে বাস্তবে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা কখনও শূন্য হয় না, কারণ দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি মানুষের আকাঙ্খা থেকেই দ্রব্য সামগ্রীর জন্য সর্বদা চাহিদা বজায় থাকবে এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে মূলধনেরও চাহিদা দেখা দেবে। আবার ধনাত্মক সুদ পাওয়া না গেলে মানুষ কোনওভাবেই সঞ্চয় করতে আগ্রহী হবে না। তাই সঞ্চয় সৃষ্টিতে উৎসাহদানের জন্যই সুদ দেওয়া প্রয়োজন। কেইন্‌স তাঁর ‘‘নগদ পছন্দের ফাঁদ’’ (Liquidity trap) ধারণাটির সাহায্যেও দেখিয়েছেন যে সুদের হার যখন খুব কম থাকে তখন নগদ অর্থের জন্য চাহিদা অসীম স্থিতিস্থাপক হয়ে পড়ে। ঐ নির্দিষ্ট স্তরের নীচে সুদের হার আর নামে না।

সুদ নেওয়া যুক্তিসংগত কিনা এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে দরিদ্র ব্যক্তিরা যদি ভোগের উদ্দেশ্যে ঋণ-গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তবে তাদের অসাহয়তার সুযোগ নিয়ে সুদ নেওয়া অন্যায় ও নিষ্ঠুরতারই নামান্তর। কিন্তু গ্রহণযোগ্য তহবিল উৎপাদন কার্যে নিয়োগ করার ফলে মোট উৎপাদনের পরিমাণ এবং মুনাফার পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তবে মূলধন ব্যবহারকারী মূলধনের মালিককে সুদ প্রদান করবে এটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিসংগত। তা ছাড়া আকর্ষণীয় হারে সুদ দেওয়া না হলে সমাজে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমে যাবে এবং দেশে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও আয় কমে যাবে। আবার সুদ অপ্রচুর মূলধনের কাম্য ও যথাযথ বণ্টন সম্ভব করে।

৬১.৭ অনুশীলনী

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন (Long-type question) :

১। সুদ বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন প্রকার ঋণের উপর সুদের হারের তারতম্যের কারণনির্দেশ। করুন।

২। সুদের ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন। কেন সুদ দেওয়া হয়? আপনার উত্তরে স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।

৩। সুদ সম্পর্কে কেইন্‌সীয় নগদ পছন্দ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।
অথবা, সুদের হারের বিষয়টি পুরোপুর অর্থসংক্রান্ত বিষয়—এ কথাটি কি সত্য?
অথবা, ‘‘অর্থের চাহিদা ও যোগান দ্বারা সুদের হার নির্ধারিত হয়’’—আলোচনা করুন।

৪। কি কি কারণে নগদ অর্থের চাহিদা হয়? অর্থের চাহিদা কিভাবে সুদের হারকে প্রভাবিত করে তা আলোচনা করুন।

৫। সুদের হার ও টাকার পরিমাণের মধ্যে সম্পর্কটি আলোচনা করুন।

৬। সুদের হার নির্ধারণ বিষয়ে ঋণযোগ্য তহবিল তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৭। সুদের হার নির্ধারণ সম্পর্কে ক্ল্যাসিক্যাল তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন (Short-type question) :

১। মোট সুদ ও নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য করুন।

২। সুদের কি কখনও শূন্য হতে পারে?

৩। নগদ পছন্দের প্রতি লোকের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলে সুদের হারের কিরূপ পরিবর্তন হবে?

৪। সমাজে টাকাকড়ির পরিমাণ বেড়ে গেলে সুদের হারের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে?

৫। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদার উৎসগুলি কি?

৬। ঋণযোগ্য তহবিলের যোগানের উৎসসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

৭। সুদগ্রহণ কি যুক্তিযুক্ত?

(গ) বস্তুভিত্তিক প্রশ্ন (Objective-type question) :

১। নগত পছন্দ বলতে কি বোঝায়?

২। লেনদেন সংক্রান্ত উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদা বলতে কি বোঝায়?

৩। ফাটকা কারবারের উদ্দেশ্যে টাকাকড়ির চাহিদাটি কি?

৪। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা বলতে কি বোঝায়?

৫। সমাজে সঞ্চয়ের উপর সুদের হারের পরিবর্তনের কি প্রভাব দেখা দেয়?

৬। বিনিয়োগের উপর সুদের হার কমার প্রভাব কি?

৭। বাজারে সুদের হার কমে গেলে বাজারে ঋণপত্রের দাম কমবে না বাড়বে?

৮। 'ভোগবিরতি' ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন।

৯। সুদের আলোচনা প্রসঙ্গে 'প্রতীক্ষা' ধারণাটির প্রাসঙ্গিকতা কি?

একক ৬২ ◆ মুনাফা তত্ত্ব

গঠন

৬২.০ উদ্দেশ্য

৬২.১ প্রস্তাবনা

৬২.৩ মুনাফা কাকে বলে

উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য

৬২.৪ মুনাফা ও প্রতিযোগিতা

৬২.৫ মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

৬২.৫.১ মুনাফার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

৬২.৫.২ মুনাফার খাজনা তত্ত্ব

৬২.৫.৩ মুনাফার মজুরি তত্ত্ব

৬২.৫.৪ মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্ব

৬২.৫.৬ মুনাফার অনিশ্চিয়তা বহন তত্ত্ব

৬২.৬ মুনাফা ও উৎপাদন ব্যয়

৬২.৭ সারাংশ

৬২.৮ অনুশীলনী

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি বুঝতে পারবেন—

- মুনাফা কাকে বলে?
- মুনাফার বিভিন্ন উপাদান কি কি?
- মুনাফা ও প্রতিযোগিতার সম্পর্ক কি?
- মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলি কি?
- মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্বগুলি কি?
- মুনাফার ও উৎপাদন ব্যয়

৬২.১ প্রস্তাবনা

মুনাফা হল একটি মিশ্র আয়। উদ্যোক্তার উপার্জন বিভিন্ন আয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। এর মধ্যে তার পারিশ্রমিক থাকতে পারে, একচেটিয়া কারবারের লাভ থাকতে পারে, নিজে যে যে উপাদানগুলি সরবরাহ করেছে তার দাম থাকতে পারে, ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনওগুলিকে বাদ দিয়ে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা হবে সে সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌গণ একমত নন। তাই টাউসিগের (Tausig) ভাষায় মুনাফা হল একটি পাঁচ মেশালি এবং বহু বিতর্কিত আয় (Profit is a mixed and vexed income).

৬২.২ মুনাফা কাকে বলে

সাধারণ ভাষায় মুনাফা বলতে আমরা বুঝি মোট আয় ও মোট ব্যায়ের পার্থক্য। উৎপাদক তার উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে যে অর্থ পেয়ে থাকে তা হল তার মোট আয়। আবার যে কোনও পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে উৎপাদককে বাজার থেকে বহুবিধ উৎপাদনের উপকরণ (যথা জমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি) ক্রয় করতে হয়। এই সমস্ত উপকরণ ব্যবহারের জন্য উৎপাদককে নানাবিধ ব্যয় বহন করতে হয়। এই ব্যয়গুলিকে সুস্পষ্ট ব্যয় (Explicit Cost)। মোট স্থূল মুনাফা হল এই মোট আয় এবং সুস্পষ্ট ব্যয়ের পার্থক্য। অনেক সময় এই স্থূল মুনাফার মধ্যে এমন কিছু উপাদান থাকে যে গুলি প্রকৃত পক্ষে মুনাফা নয় সেগুলি হল উৎপাদনের অন্য উৎপাদনের অন্য উপাদানের উপার্জন। যেমন সংগঠক স্বয়ং যোগান দিয়েছে এরূপ কিছু উপাদানের আয় স্থূল মুনাফার অর্ন্তভুক্ত হয়—তার নিজস্ব জমির খাজনা বা নিজস্ব মূলধনের সুদ, সংগঠকের নিজস্ব পারিশ্রমিক বা তত্ত্বাবধান ফার্মের মজুরি। এই উপাদানগুলি ব্যবহারের জন্য সরাসরি উৎপাদককে কোনও আর্থিক ব্যয় বহন করতে হয় না। অথচ এইগুলি অন্যত্র নিয়োজিত হলে উদ্যোক্তার কিছু উপার্জনের সুযোগ থাকত। উদ্যোক্তার নিজস্ব উপকরণ ব্যবহারের জন্য যে ব্যয় হয় সেই ব্যয়কে অন্তর্নিহিত ব্যয় বা অপ্রকাশ্য ব্যয় (Implict) বা সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost) বলে। উদ্যোক্তার স্থূলমুনাফা থেকে এই অন্তর্নিহিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া তাই হল নীট মুনাফা।

মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলিকে থাকে।

(i) **উদ্যোক্তার নিজস্ব জমির খাজনা বা নিজস্ব মূলধনের সুদ ঃ**

অনেক সময় উদ্যোক্তা নিজে জমি বা মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল ও জ্বালানি ইত্যাদির দাম দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার সবটাই উদ্যোক্তা নিজে গ্রহণ করে, কারণ জমি ও মূলধন তার নিজস্ব বলে খাজনা এবং সুদ বাবদ অপর কাউকে কিছু দিতে হয় না। হিসাবের বইতে এই সবটাই হল মুনাফা কিন্তু মূলধনের সুদ এবং জমির খাজনাকে এই মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে নীট মুনাফা নির্ধারণ করা উচিত।

(ii) **পরিচালনার পারিশ্রমিক ঃ**

উদ্যোক্তা নিজে ব্যবসা পরিচালনা করলে বেতনভূক ম্যানেজার নিয়োগ করলে তাকে যে পারিশ্রমিক দিতে হত এখন তা আর দিতে হয় না। উদ্যোক্তা যে পরিচালনার কাজ করে তার জন্য নিশ্চয়ই সে পারিশ্রমিক পেতে পারে। অন্যত্র কাজ করলে উদ্যোক্তা যে পরিমাণ বেতন পেত তাকেই বর্তমানক্ষেত্রে

উদ্যোক্তার পরিচালনা বাবদ পারিশ্রমিক বলে গণ্য করতে হবে। স্থূল মুনাফা থেকে এটিকে বাদ দিয়ে নীট মুনাফা বার করতে হয়।

(iii) **ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার ঃ**

উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহন করতে হয়। দ্রব্য উৎপাদন এবং বিক্রয় এই দুয়ের মধ্যে কালগত ব্যবধান থাকায় ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। দ্রব্যটির ভবিষ্যৎ দাম এবং চাহিদার কথা চিন্তা করে উদ্যোক্তাকে এইরূপ দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে যাতে তার লাভ সর্বাধিক হয়। কিন্তু উদ্যোক্তার অনুমান ভুল হতে পারে। যখন দ্রব্যটি বাজারে নিয়ে যাওয়া হল তখন হয়তো দেখা গেল বাজারে দ্রব্যটির কোনও চাহিদা নেই। এই সব ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা বহনের জন্য উদ্যোক্তা অতিরিক্ত কিছু দাবি করে নতুবা সে ব্যবসা ছেড়ে দেবে।

অধ্যাপক নাইট্ (Knight) ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। নাইটের মতে কতগুলি ঝুঁকি আছে যা আগে থেকেই জানা যায় এবং যার বিরুদ্ধে আগে থেকেই বীমার ব্যবস্থা করা যায়। ফলে এ ধরনের ঝুঁকি উদ্যোক্তা বহন করে না, বহন করে বীমা কোম্পানী এবং উদ্যোক্তা তার জন্য কোনওরূপ মুনাফাও দাবি করতে পারে না। আর কতগুলি ঝুঁকি আছে যা আগে থেকে অনুমান করা যায় না এবং যার বিরুদ্ধে কোনওরূপ বীমার ব্যবস্থা করা যায় না। এই অবীমাযোগ্য ঝুঁকি হল "অনিশ্চয়তা"। নাইটের মতে মুনাফা উদ্ভবের কারণ হল এই অনিশ্চয়তা বহন।

(iv) **নতুন উদ্ভাবনের দরুণ পুরস্কার ঃ**

উদ্যোক্তা কোন নতুন উদ্ভাবন করে মুনাফা বাড়াতে পারে। এখন এই উদ্ভাবন বলতে **সুমপিটার** (Schmpueter) নতুন দ্রব্যের উৎপাদন, নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদন, নতুন বাজার আবিষ্কার ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। যে উদ্যোক্তা এই উদ্ভাবনের (Innovation) সূচনা করে, অন্তত কিছু দিন সে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে। নতুন নতুন উদ্যোক্তা যখন তাকে অনুসরণ করে এই উদ্ভাবন শুরু করে তখন আবার প্রথম উদ্যোক্তার মুনাফা কমে যায়।

(v) **একচেটিয়া ক্ষমতার দরুণ মুনাফা ঃ**

উদ্যোক্তার যদি একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে তাহলে সে অধিক মুনাফা অর্জন করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালীন অবস্থায় সফল উদ্যোক্তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। কিন্তু একচেটিয়া কারবারী দীর্ঘকালেও স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

(vi) **সংগঠন দক্ষতার তারতম্য জনিত মুনাফা ঃ**

একই দ্রব্য উৎপাদনকারী দু'জন উদ্যোক্তার সংগঠন নৈপুণ্যের তারতম্যের দরুণ উপার্জনের পার্থক্য দেখা দিতে পারে। প্রান্তিক উদ্যোক্তার (অর্থাৎ যে কয়জন উদ্যোক্তা বাজারে রয়েছেন, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম সংগঠন নৈপুণ্যের অধিকারী উদ্যোক্তা) কোনও অতিরিক্ত মুনাফা হবে না, সে কেবল স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। অধিকতর দক্ষতা সম্পন্ন উদ্যোক্তারা অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে।

(vii) **আকস্মিক কারণে মুনাফা ঃ**

কখন কখন আকস্মিক অভাবনীয় কারণে মূল্য বৃদ্ধি পেলে উদ্যোক্তার মুনাফা বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ বাধলে

বৃহৎ শিল্পে ধর্মঘট দেখা দিলে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে কোনও কোনও উদ্যোক্তা আকস্মিক মুনাফা অর্জন করে।

৬২.৩ মুনাফা ও উৎপাদন অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য

উদ্যোক্তা ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে অন্যান্য উপাদান হল পরনিযুক্ত, কিন্তু উদ্যোক্তা স্বনিযুক্ত, উদ্যোক্তা নিজেই নিজের মালিক। এই পার্থক্যের দরুণ মুনাফার সঙ্গে মজুরী সুদ ও খাজনার নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি দেখা দেয়।

প্রথমত, অন্যান্য উপাদানের আয় হল চুক্তিবন্ধ আয়, কিন্তু উদ্যোক্তার মুনাফা হল অবশিষ্ট আয়। অপর সকল উপাদানের পাওনা মেটানোর পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবেই মুনাফা উদ্ভূত হয়। জমির মালিক জানে যে বৎসরান্তে ভাগচাষী বা জমি ব্যবহারকারীর নিকট থেকে সে কত খাজনা পাবে, শ্রমিক জানে সে শ্রমের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময় অন্তর কত মজুরি পাবে, ঋণদাতা বা মূলধনের মালিক জানে যে মূলধন নিয়োগ করে কত সুদ পাবে; কিন্তু উদ্যোক্তা জানে না যে সে বছর শেষ কত মুনাফা পাবে বা আদৌ কোনও মুনাফা পাবে কি না। বেনহামের কথায়, অন্যান্য উপাদান তাদের কাজের জন্য দাম পায়, কিন্তু উদ্যোক্তা পায় অনিশ্চিত পুরস্কার বা উদ্বৃত্তাংশ।

দ্বিতীয়ত, মুনাফার পরিমাণে প্রভূত ওঠা-নামা ঘাটে। কোনও বছর হয়তো বা প্রচুর লাভ দেখা গেল, পরের বছরই আবার ততোধিক ক্ষতি হল। কিন্তু মজুরি, সুদ ও খাজনার হারে তেমন একটা ওঠা-নামা ঘটে না, দীর্ঘকাল যাবৎ এগুলি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে।

তৃতীয়ত, খাজনা, সুদ বা মজুরি কখনও শূন্য বা ঋণাত্মক হয় না, কিন্তু মুনাফা শূন্য বা ঋণাত্মক হতে পারে। কখনও কখনও উদ্যোক্তা তার উৎপাদনের ব্যয়টুকুই শুধু তুলে নিতে পারবে, আবার কখনও সেটুকুও সে তুলতে পারবে না।

চতুর্থত, মুনাফা খুবই অনিশ্চিত এবং বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হারে বিরাট তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু মজুরি, সুদ ও খাজনা একরকম নিশ্চিত থাকে এবং তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তারতম্যের মাত্রা খুব বেশি হয় না।

পঞ্চমত, মুনাফার ক্ষেত্রে ঝুঁকির প্রাধান্য যতটা দেখা যায়, অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না, যদিও সকল আয়ের ক্ষেত্রেই কিছুটা ঝুঁকির উপাদান থাকে।

৬২.৪ মুনাফা ও প্রতিযোগিতা

ঝুঁকি বহন, অনিশ্চয়তা বহন, নতুন উদ্ভাবন ইত্যাদি হল বিশুদ্ধ মুনাফার উৎস। পরিচালনার পারিশ্রমিক এবং উদ্যোক্তা নিজে যে উপাদানগুলি যোগান দেয়, (যেমন জমি, মূলধন ইত্যাদি) সেগুলি বাবাদ প্রাপ্য আয় বিশুদ্ধ মুনাফার অর্ন্তগত হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা, সমজাতীয় দ্রব্য, ফার্মগুলির অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থান, বাজার সম্পর্কে প্রত্যেক ক্রেতা ও বিক্রেতার পরিপূর্ণ জ্ঞান ইত্যাদি, বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনও ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা দেখা যায় না, নতুন উদ্ভাবন বা

নতুন উৎপাদন কৌশনের প্রয়োগের বিশেষ সুযোগ থাকে না এবং সমাজে গতিশীল উপাদানগুলির অস্তিত্ব বিশেষ উপলব্ধি করা যায় না। নতুন নতুন ফার্মের অবাধ প্রবেশ ও পুরাতন ফার্মগুলির শিল্প থেকে অবাধ প্রস্থানের সুযোগ থাকায় স্বল্পকালে লাভ অথবা লোকসান যাই ঘটুক না কেন দীর্ঘকালে সবকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে। বিশুদ্ধ মুনাফা বলে এখানে কিছু থাকতে পারে না। (স্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্যোক্তার প্রত্যাশিত মুনাফা বা ন্যূনতম মুনাফা যা না পেলে সে উদ্যোগ গ্রহণে সম্মত হবে না এবং এই স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়েরই অংশ।)

কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় বাজারে ঝুঁকি, অনিশ্চয়তা, গতিশীল উপাদানগুলির, উপস্থিতি, একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ, দ্রব্য পৃথকীকরণ প্রভৃতি বর্তমান থাকে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ মুনাফা বজায় থাকে। তাই একথা বলা যায় যে ধনাত্মক মুনাফা হল অপূর্ণ প্রতিযোগিতারই ফল।

৬২.৫ মুনাফার উদ্ভব সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব (Different Theories of Profit)

৬২.৫.১ মুনাফার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতার তত্ত্ব

এই তত্ত্ব অনুযায়ী উদ্যোক্তার মুনাফা তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের (marginal revenue product) সমান হয়। তবে অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে উপাদানটির প্রান্তিক আয় উৎপন্ন যে ভাবে নির্ধারিত হয়, উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন কিন্তু সেভাবে নির্ধারণ করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন নির্ধারণ করতে গিয়ে কোনও একটি ফার্মে অতিরিক্ত এক একক শ্রম নিয়োগ করা হলে (অন্যান্য উপাদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত রেখে) মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাই হল শ্রমের প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন। এই প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্নকে দ্রব্যের বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে আমরা শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপন্ন পাই। কিন্তু উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, কারণ একটি ফার্মে একজন মাত্র উদ্যোক্তাই থাকে। তাই কোনও একটি ফার্মের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার প্রান্তিক দ্রব্য উৎপন্ন (এবং প্রান্তিক আয় উৎপন্ন) নির্ণয় করা যায় না।

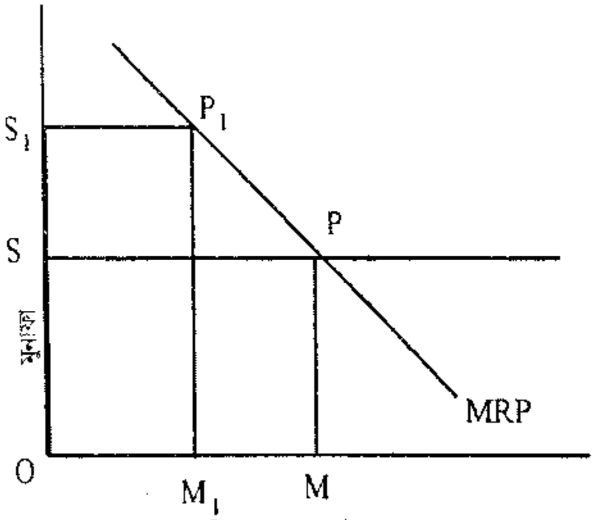

রেখাচিত্র ৬২.১ ঃ উদ্যোক্তার সংখ্যা

ফার্মের দিক থেকে উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন করা না গেলেও শিল্পের দিক থেকে এটা নির্ণয় করা যায়। শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা উদ্যোক্তার সংখ্যা এক একক বাড়লে বা কমালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ কতটা বাড়ে বা কমে তা সহজেই হিসাব করা যায়। অবশ্য শিল্পে কর্মরত সকল উদ্যোক্তাই সমজাতীয় (homogeneous) এটা ধরে নিতে হবে।

পাশের চিত্রে মুনাফার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হল।

MRP রেখা হল সমগ্র শিল্পের দিক থেকে

উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা, উদ্যোক্তার সংখ্যা যত বাড়বে তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন ততই হ্রাস পাবে; তাই রেখাটি বাঁদিক থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। SS রেখা হল উদ্যোক্তার যোগান রেখা। আমরা যেহেতু ধরে নিয়েছি যে সকল উদ্যোক্তা সমজাতীয় তাই প্রত্যেক উদ্যোক্তার স্থানান্তর আয় (transfer earning) একই হবে। সেই কারণে এই নির্দিষ্ট শিল্পের দিক থেকে উদ্যোক্তার যোগান দাম (বা যে ন্যূনতম মুনাফা পেলে সে উদ্যোগ গ্রহণ করতে রাজি হবে) সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে এবং যোগান রেখাটি অনুভূমিক (SS রেখা) হবে। ঐ শিল্পে উদ্যোক্তাকে ন্যূনতম OS পরিমাণ মুনাফা পেতে হবে। P বিন্দুতে উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন রেখা (বা শিল্পের দিক থেকে উদ্যোক্তার জন্য চাহিদা রেখা) এবং যোগান রেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে। এই ছেদ অনুযায়ী শিল্পে OM পরিমাণ উদ্যোক্তার নিযুক্ত হবে এবং প্রত্যেক উদ্যোক্তার মুনাফা হবে PM (=OS)। এই মুনাফা হল উদ্যোক্তার স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit)। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় এরূপই ঘটবে। অবশ্য স্বল্পকালে উদ্যোক্তার যোগান কম হলে প্রত্যেক উদ্যোক্তা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কিছুটা অতিরিক্ত মুনাফা লাভ করতে পারে। যেমন উদ্যোক্তার পরিমাণ যদি OM_1 হয় তবে প্রত্যেক উদ্যোক্তা SS_1 $(=OS_1-OS)$ পরিমাণ স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা ভোগ করতে পারবে। কিন্তু পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকালে নতুন নতুন উদ্যোক্তার অবাধ প্রবেশের ফলে কোন উদ্যোক্তাই আর এই অতিরিক্ত মুনাফা পাবে না। তবে বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে দীর্ঘকালেও এই অতিরিক্ত মুনাফা বজায় থাকবে।

সমালোচনা ঃ

১। একটি ফার্ম একজনমাত্র উদ্যোক্তা থাকে। তাই ফার্মের দিক থেকে উদ্যোক্তার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্ধারণ করা যায় না। তাই ফার্মের দিক থেকে বিচার করলে এই তত্ত্বটি মূল্যহীন।

২। শিল্পের দিক থেকেও বিভিন্ন উদ্যোক্তার দক্ষতা বিভিন্ন অর্থাৎ উদ্যোক্তা সমজাতীয় নয়। সেক্ষেত্রে বিভিন্ন উদ্যোক্তার উপার্জন অর্থাৎ মুনাফাও বিভিন্ন হবে। তাই এই তত্ত্ব অনুযায়ী দীর্ঘকালে প্রত্যেক উদ্যোক্তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করবে, এ কথাটি ঠিক নয়।

৩। এই তত্ত্বটি একচেটিয়া মুনাফা ব্যাখ্যা করতে পারে না, কারণ এক্ষেত্রে একটি শিল্পে একজন মাত্র উদ্যোক্তা থাকে; ফলে উদ্যোক্তার সংখ্যার পরিবর্তন ঘটিয়ে তার প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা নির্ণয় করা যায় না।

৪। এই তত্ত্ব আকস্মিক মুনাফার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। এ ধরনের মুনাফা দক্ষতা উপরও নির্ভর করে না।

৫। মুনাফার মধ্যে খাজনা জাতীয় উপাদান থাকতে পারে। প্রান্তিক উদ্যোক্তার (যে উদ্যোক্তার দক্ষতা সর্বাপেক্ষা কম) তুলনায় প্রান্তোর্ধ উদ্যোক্তা (অধিকতর দক্ষতাসম্পন্ন উদ্যোক্তা) যে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করে তা হল দক্ষতার খাজনা। এই তত্ত্ব মুনাফার এই উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৬২.৫.২ মুনাফার খাজনা তত্ত্ব

আমেরিকার অর্থনীতিবিদ্ ওয়াকার (Walker) এই মতবাদের প্রবর্তক। মুনাফা হল উদ্বৃত্ত, তাই একে

একপ্রকার খাজনা হিসাবে অভিহিত করা যায়। বিভিন্ন উর্বরতা-সম্পন্ন জমির মধ্যে যে জমিটি প্রান্তিক জমি (চাষের আওতায় যতগুলি জমি আনা হয়েছে তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জমি) সে জমিতে খাজনা থাকে না, অপেক্ষাকৃত অধিকতর উর্বরতা সম্পন্ন জমিতে (প্রান্তোর্দ্ধ জমিতে) খাজনা দেখা দেয়। বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন জমির মত উদ্যোক্তাদেরও দক্ষতার তারতম্য রয়েছে। যে উদ্যোক্তা শুধু পরিচালনার পারিশ্রমিক মাত্র লাভ করে সে হল প্রান্তিক উদ্যোক্তা। কিন্তু প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ (প্রান্তোর্দ্ধ উদ্যোক্তা গণ) যে অধিক মুনাফা উপার্জন করে তা হল এক ধরনের খাজনা—যোগ্যতার খাজনা।

এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়েছে ঃ—

১। এই তত্ত্ব মুনাফার প্রকৃতি ব্যাখ্যায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তাকে উপেক্ষা করে।

২। অনেক ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা মুনাফা উপার্জন করতে পারে না, তাকে লোকসান স্বীকার করতে হয়। ঋণাত্মক খাজনা নেই, কিন্তু ব্যবসাক্ষেত্রে ঋণাত্মক মুনাফা বা লোকসান থাকতে পারে।

৩। খাজনা বিহীন জমির ন্যায় মুনাফা বিহীন উদ্যোক্তা সমাজে দীর্ঘকাল থাকতে পারে না। মুনাফা খাজনার মত অনুপার্জিত আয় নয়। উদ্যোক্তাকে কাজে বহাল রাখতে হলে মুনাফার হারকে ধনাত্মক হতে হবে।

৪। উপরিউক্ত তত্ত্বের সাহায্যে বোঝা যায় না কেন উদ্যোক্তাদের মধ্যে মুনাফার পার্থক্য থাকে, কিন্তু মুনাফার প্রকৃতি বা গঠনকারী বিষয়গুলি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

৬২.৫.৩ মুনাফার মজুরী তত্ত্ব

এই তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, মুনাফার প্রকৃতি মজুরিরই মত, খাজনার মত নয়। তত্ত্বটির ব্যাখ্যাকর্তাগণ—টাউগিস্ (Toussig), ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) প্রভৃতি অর্থনীতিবিদ্গণ বলেন, সংগঠন শ্রমেরই একটি রূপ—যদিও উন্নততর রূপ। সুতরাং সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে কোনও পৃথক উপাদান নেই; ফলে মুনাফা বলে উপাদানের পৃথক আয়ও নেই। মুনাফাকে মজুরিরই অন্যতম রূপ বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হল—

১। উদ্যোক্তা ও বেতনভুক ম্যানেজারের কাজ এক নয়। উদ্যোক্তা অনিশ্চয়তা বহন করে, বেতনভুক ম্যানেজার তা করে না।

২। উদ্যোক্তা স্বয়ং নিযুক্ত, কিন্তু বেতনভুক ম্যানেজারসহ সকল শ্রমিকই পর নিযুক্ত।

৩। ম্যানেজারের আয় চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে, কিন্তু উদ্যোক্তাকে অনেক সময় ঋণাত্মক মুনাফাও বহন করতে হয়।

এ সকল কারণে মুনাফাকে মজুরি বলে গণ্য করা চলে না।

৬২.৫.৪ মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্ব

মুনাফার গতিশীলতার তত্ত্ব প্রচার করেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ জে. বি. ক্লার্ক (J. B. Clark)। যে সমাজে জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, উৎপাদনের পদ্ধতি মানুষের রুচি ও পছন্দ প্রভৃতি সর্বদা পরিবর্তনশীল তাকে গতিশীল সমাজে বলে। যে সমাজে এ সকল বিষয় পরিবর্তিত হয় না তা হল স্থিতিশীল সমাজ। স্থিতিশীল সমাজে বছরের পর বছর একই প্রকৃতির এবং একই পরিমাপের অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটতে

থাকে; যেখানে সকল কিছুই আগে থেকে সুনিশ্চিতভাবে জানা থাকে। সুতরাং এরূপ অর্থনীতিতে সকল সামগ্রীর চাহিদা ও যোগান শুধু পরস্পরের সমানই হয় না, এরা এরূপ দাম পরস্পরের সমান হয় যা গড় উৎপাদন ব্যায়ের সমান। স্বাভাবিক মুনাফা অবশ্যই গড় ব্যায়ের অর্ন্তভুক্ত থাকে। কিন্তু এই স্বাভাবিক মুনাফা উদ্যোক্তার ব্যবস্থাপনা কার্যের মজুরি ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং স্থিতিশীল অর্থনীতিতে কোনও উদ্বৃত্ত আয় বা মুনাফার সৃষ্টি হতে পারে না।

কিন্তু বাস্তব সমাজ এরূপ স্থিতিশীল সমাজ নয়। এখানে চাহিদা ও যোগানের শক্তিসমূহ সর্বদা এরূপ পরিবর্তনশীল যাতে দাম ও গড় ব্যায়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং উদ্বৃত্ত দেখা দেয়। চতুর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উদ্যোক্তারা এই সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাস্তব ঘটনা নিজের অনুকূলে টেনে এনে উদ্বৃত্ত উপার্জন করে। উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হল পরিবর্তন ঘটিয়ে স্থিতিশীল সমাজকে গতিশীল করে তোলা। গতিশীল পরিবর্তনের দারুণ দাম ও ব্যায়ের মধ্যে পার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং সেই সুযোগ উদ্যোক্তা মুনাফা উপার্জন করে। স্যুমপিটারের উদ্ভাবন তত্ত্বের সঙ্গে এই তত্ত্বের বহু সাদৃশ্য রয়েছে। গতিশীল অর্থব্যবস্থায় নতুন নতুন দ্রব্য বা নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন নতুন বাজার উদ্ভাবন করা উদ্যোক্তার নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্ভাবনকারী উদ্যোক্তার তুলনায় স্বল্পকালে কিছু অতিরিক্ত মুনাফা অর্জন করতে পারে।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হল ঃ—

১। সকল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফার উদ্ভব হয় না। যে সকল পরিবর্তন অনুমেয় তাদের বিরুদ্ধে বীমার ব্যবস্থা করে ঝুঁকি এড়ানো যায়।

২। আমরা গতিশীল জগতেই বাস করি বলে গতিশীল পরিবর্তনের ফলেই মুনাফা দেখা দেয় বলা আর মুনাফার অস্তিত্ব আছে বলা একই কথা।

৩। সংগঠন নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য যে মুনাফার পরিমাণে অনেকটা তারতম্য দেখা যায় তা এই তত্ত্ব স্বীকার করে না।

৪। অন্যান্য উপাদানের মত উদ্যোক্তারাও যে যোগান দাম আছে তা এই তত্ত্বে আলোচিত হয়নি।

৬২.৫.৫ মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্ব

অধ্যাপক হলি (Hawley) হলেই এই তত্ত্বের উদ্ভাবক এই তত্ত্ব অনুসারে উদ্যোক্তা যে ঝুঁকি বহন করে মুনাফা হল তারই পুরস্কার। ঝুঁকি যত বেশি হবে প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণও তত বেশি হওয়া চাই; নচেৎ পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তার সন্ধান মিলবে না। ব্যবসায়ের ঝুঁকি দু-প্রকারের হয়—ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি এবং ব্যবসা পরিচালনার ঝুঁকি। প্রথম ক্ষেত্রে বিনিয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা তা জানবার জন্য উদ্যোক্তাকে বিশেষীকৃত যন্ত্রপাতিতে মূলধন নিবদ্ধ করে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর বসে থাকতে হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে বাজারের তেজী মন্দা অবস্থা এবং ঐ বিশেষ পণ্যের চাহিদার পরিবর্তন জনিত সকল ঝুঁকি বহন করতে হয়। ঝুঁকি বহন করে কেবল সংগঠক বা উদ্যোক্তা। সকলে এই ঝুঁকি বহনে উৎসুক নয়, অথচ এটা বহন না করলে কোনও দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনই সংঘটিত হতে পারে না। অর্থাৎ ঝুঁকিবহন হল উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান এবং মুনাফা হল ঝুঁকি বহনকারীর পুরস্কার।

হলির প্রচারিত এই তত্ত্বটি মার্শাল সমর্থন করলেও এটা প্রবল সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। এর বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনাগুলি হল ঃ—

১। কার্ভারের (Carver) মতে মুনাফাকে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার না বলে ঝুঁকি এড়াবার পুরস্কার বলে গণ্য করাই উচিত। উদ্যোক্তা যত বেশি সুদক্ষ সে তত বেশি ঝুঁকি এড়াতে পারে বলেই তার মুনাফা তত বেশি হয়।

২। যে কোনও ঝুঁকির জন্য মুনাফার উৎপত্তি হতে পারে না। অধ্যাপক নাইটের মতে কারবারী ঝুঁকি প্রধানত দু প্রকারের ঃ এক শ্রেণীর ঝুঁকি আগে থেকেই অনুমান করা যায় এবং সেজন্য এর বিরুদ্ধে আগে থেকেই প্রতিকার মূল ব্যবস্থা (বীমা) গ্রহণ করা যায়। সুতরাং এই প্রকার ঝুঁকির জন্য মুনাফার উৎপত্তি হয় না। যে সকল ঝুঁকি আগে থেকে অনুমান করা যায় না এবং যার বিরুদ্ধে কোনও বীমার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা যায় না, কেবলমাত্র সে সকল ঝুঁকির জন্যই মুনাফার সৃষ্টি হতে পারে।

৩। উদ্যোক্তার উপার্জনের সমস্তটাই ঝুঁকি বহনের দরুণ নয়। এর মধ্যে তত্ত্বধানের জন্য পারিশ্রমিক, এক চেটিয়া কারবারের লাভ, সংগঠন নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য প্রাপ্য প্রভৃতি থাকে। আবার মুনাফার কিছু অংশ শিল্পগত উদ্ভাবনের দরুণ বা আকস্মিক কারণেও দেখা দেয়।

৬২.৫.৬ মুনাফার অনিশ্চিয়তা বহন তত্ত্ব

অধ্যাপক নাইট (Knight) মুনাফার অনিশ্চিয়তা বহন তত্ত্ব প্রচার করেন। একে ঝুঁকি বহন তত্ত্বের এক উন্নত রূপ বলে গণ্য করা যেতে পারে। নাইটের মতে কারবারী ঝুঁকি দু-প্রকারের—নিশ্চিত ঝুঁকি এবং অনিশ্চিত ঝুঁকি। আগুন, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুণ কিংবা অন্তর্ঘাত মূলক কার্যের দরুণ কারবারী সম্পত্তির যে ক্ষতি ঘটতে পারে তা হল নিশ্চিত ঝুঁকি এবং আগে থেকেই বীমার দ্বারা এই ঝুঁকি দূর করা যায়। সুতরাং নিশ্চিত ঝুঁকি উদ্যোক্তা বহন করে না এবং মুনাফা তার পুরস্কারও হতে পারে না। এছাড়া কারবারের আরেক প্রকার ঝুঁকি থাকে যা আগে থেকে অনুমান সাপেক্ষ নয় বলে একে অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চিয়তা বলা যায়। প্রতিযোগিতায় ঝুঁকি, নতুন আবিষ্কারের দরুণ যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অকেজো হয়ে পড়বার ঝুঁকি, সরকারী নীতি পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং বাণিজ্যচক্র জনিত পরিবর্তনের ঝুঁকি— এই চার প্রকার ঝুঁকি হল কারবারের অনিশ্চিত ঝুঁকি। বীমার দ্বারা এ সকল ঝুঁকি দূর করা সম্ভব নয় বলে উদ্যোক্তাকেই তা বহন করতে হয়। নাইটের মতে সকল ঝুঁকি বহন নয়, কেবল অনিশ্চয়তা বহনই উদ্যোক্তার অপরিহার্য কাজ এবং এই কারণেই মুনাফার উদ্ভব ঘটে। অনিশ্চয়তা বহনকে উৎপাদনের অন্যতম উপাদান বলে গণ্য করতে হবে। এর যোগান স্বল্প এবং সে কারণে এর যোগান দাম আছে। মুনাফাই হল এই যোগান দাম। মুনাফা নামক পুরস্কার না দিলে সমাজ কেহই কারবারের অনিশ্চিত ঝুঁকি বা অনিশ্চিয়তা বহনে সম্মত হবে না।

মুনাফার অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটি ঝুঁকি বহন তত্ত্ব অপেক্ষা উন্নত হলেও নিম্নলিখিত কারণে এই তত্ত্বকে সন্তোষজনক বলে গণ্য করা যায় না।

১। অনিশ্চয়তা বহন উদ্যোক্তার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। উদ্যোক্তা গ্রহণ, বিভিন্ন উপাদানের সংযোজন, দর কষাকষি ইত্যাদি অন্যান্য নানারূপ কাজও তার দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং মুনাফাকে কেবল অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার বলা যায় না।

২। অনিশ্চয়তা বহন একান্ত ভাবেই একটা মানসিক ধারণা। সেই কারণে এর কোন সুযোগ ব্যয় নেই এবং এর কোন যোগান দামও নেই।

৩। অনিশ্চয়তাকে পরিমাপ করবার কোনও নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড নেই। সেজন্য এই তত্ত্ব সঠিকভাবে মুনাফার পরিমাণ ব্যাখ্যা করতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষে মুনাফার এমন কোনও তত্ত্ব নেই যা মুনাফার সকল উপাদান ব্যাখ্যা করতে পারে। এই একটি তত্ত্ব মুনাফার বিশেষ একটি উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং অন্যান্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে উপেক্ষা করে। প্রতিটি তত্ত্বই নীট মুনাফা উদ্ভবের একটি মাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান ব্যাখ্যা করে কিন্তু কোনও তত্ত্বই নীট মুনাফা উদ্ভবের সবগুলি উপাদানকেই একই সঙ্গে ব্যাখ্যা করে না। সেইজন্য প্রতিটি তত্ত্বই নীট মুনাফা উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় কিন্তু কোনওটিই যথেষ্ট নয়। (Necessary but not sufficient) এই জন্যই বলা হয় মুনাফার কোনও সন্তোষজনক তত্ত্ব নেই।

৬২.৬ মুনাফা ও উৎপাদন ব্যয়

ওয়াকারের খাজনা তত্ত্ব ও ক্লার্কের গতিশীলতা তত্ত্ব অনুসারে দীর্ঘকালে বিশুদ্ধ মুনাফা শূন্য হবে। মুনাফার খাজনা তত্ত্ব অনুসারে খাজনার ন্যায় মুনাপাও পার্থক্যজনিত আয়। বিভিন্ন উদ্যোক্তার পরিচালন দক্ষতার তারতম্যের জন্য মুনাফার হারেও বিভিন্নতা লক্ষ করা যায়। মুনাফা শূন্য উদ্যোক্তা হল প্রান্তিক উদ্যোক্তা। উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দাম প্রান্তিক বা মুনাফা শূন্য উদ্যোক্তার উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয় বলে মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অর্ন্তগত নয়। তা ছাড়া মানুষ একটি স্বল্পকালীন ব্যাপারমাত্র, দীর্ঘকালে মুনাফার কোনও অস্তিত্ব থাকে না। তাই দীর্ঘকালীন ভিত্তিতেও মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অর্ন্তগত হয়ে বাজার দামকে প্রভাবিত করে না। গতিশীলতা তত্ত্বের প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্থিতিশীল অবস্থায় প্রতিযোগিতার প্রভাবে মুনাফা অন্তর্হিত হয়। একমাত্র গতিশীল অর্থব্যবস্থায় সদা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা সাময়িকভাবে মুনাফা অর্জন করে।

অপরপক্ষে মার্শালের মতে, পর্যাপ্ত সংখ্যক উদ্যোক্তাকে ঝুঁকি গ্রহণে আকৃষ্ট করতে হলে অবশ্যই মুনাফাকে ধনাত্মক হতে হবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুনাফাকে ব্যবসাক্ষেত্রে উদ্যোক্তার যোগানদাম হিসাবে গণ্য করতে হবে। খাজনাবিহীন জমি থাকতে পারে, কিন্তু মুনাফাবিহীন উদ্যোক্তা থাকতে পারে না। এই মুনাফা হল উদ্যোক্তার প্রত্যাশিত মুনাফা বা স্বাভাবিক মুনাফা। এই স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে না পারলে উদ্যোক্তা ব্যবসা বন্ধ করে দেবে। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অঙ্গীভূত হয়ে দামকে প্রভাবিত করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে শিল্পের দীর্ঘকালীন ভারসাম্য অবস্থায় উদ্যোক্তা এই স্বাভাবিক মুনাফাই অর্জন করে।

অধ্যাপক জোন রবিনসনের বক্তব্য অনুযায়ী স্বাভাবিক মুনাফা হ'ল সেই মুনাফা যা উপার্জন করলে (ক) দামের উৎপাদন হ্রাস বা বৃদ্ধির কোনও প্রবণতা থাকে না; (খ) কোনও নতুন ফার্মের শিল্পে প্রবেশ ঘটে না এবং (গ) কোন পুরানো ফার্ম শিল্প ছেড়ে যায় না।

স্বাভাবিক মুনাফা (normal profit) উৎপাদন ব্যয়ের অর্ন্তভুক্ত হলেও লব্ধ মুনাফা (realised profit) কিন্তু উৎপাদন ব্যয়ের অর্ন্তগত নয়। উৎপাদকের মোট বিক্রয়লব্ধ আয় ও মোট উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তাই হল লব্ধ মুনাফা। এই লব্ধ মুনাফা বাজার দাম দ্বারা নির্ধারিত হয়। লব্ধ মুনাফা স্বাভাবিক

মুনাফা অপেক্ষা বেশি হলে উদ্যোক্তারা তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে এবং তখন দ্রব্যের দাম কমে গিয়ে লব্ধ মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার স্তরে নেমে আসবে। অপরপক্ষে লব্ধ মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা কম হলে উৎপাদন কমিয়ে দেওয়া হবে এবং তখন লব্ধ মুনাফা বেড়ে গিয়ে স্বাভাবিক মুনাফার পর্যায়ে উপনীত হবে।

৬২.৭ সারাংশ

মুনাফা হল একটি মিশ্র আয়—উদ্যোক্তার মুনাফা বিভিন্ন ধরনের আয়ের সংমিশ্রণে গঠিত। মোট মুনাফার মধ্যে সাধারণত নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে ঃ (i) উদ্যোক্তার নিজস্ব জমির খাজনা বা নিজস্ব মূলধনের সুদ (ii) পরিচালনার পারিশ্রমিক (iii) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার (iv) নতুন উদ্ভাবনের জন্য পুরস্কার (v) একচেটিয়া ক্ষমতার দরুণ আয় (vi) সংগঠন নৈপুণ্যের তারতম্যের জন্য আয় এবং (vii) আকস্মিক প্রাপ্তি।

মুনাফার সঙ্গে অন্যান্য আয়ের পার্থক্য আছে। (i) মজুরি, সুদ ও খাজনা হল চুক্তিবদ্ধ আয়, মুনাফা হল অবশিষ্ট আয় (ii) মজুরি, সুদ ও খাজনা কখনও ঋণাত্মক হয় না, কিন্তু মুনাফা ঋণাত্মক হতে পারে। (iii) অন্যান্য উপাদানের আয়ের খুব একটা ওঠা-নামা ঘটে না—এগুলি মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। কিন্তু মুনাফার পরিমাণে প্রভূত ওঠানামা ঘটে। (iv) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হারে বিরাট তারতম্য দেখা যায়, কিন্তু অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎপাদনে খুব একটা তারতম্য দেখা যায় না। (v) মুনাফার ক্ষেত্রে ঝুঁকির প্রাধান্য যতটা দেখা যায়, অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে ততটা দেখা যায় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্বল্পকালে ফার্মের লাভ অথবা লোকসান যাই হোক না কেন, দীর্ঘকালে সবকটি ফার্ম কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে। স্বাভাবিক মুনাফা হল উদ্যোক্তার প্রত্যাশিত মুনাফা বা ন্যূনতম মুনাফা যা না পেলে সে বর্তমান উৎপাদন ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করতে রাজি হবে না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দীর্ঘকাল কোনও ফার্মেই স্বাভাবিক মুনাফা অপেক্ষা অতিরিক্ত মুনাফা (যাকে বিশুদ্ধ মুনাফা বা Pure Profit বলা হয়) অর্জন করতে পারে না। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থায় স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল উভয় অবস্থাতেই বিশুদ্ধ মুনাফা বজায় থাকে।

মুনাফার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বহু তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে।

প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্বে বলা হয় যে উদ্যোক্তার মুনাফা তার প্রান্তিক আয় উৎপন্নের সমান হয়। তবে ফার্মের দিক থেকে উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন নির্ণয় করা যায় না। কারণ কোন একটি ফার্মে একজন মাত্র উদ্যোক্তাই থাকে। শিল্পের দিক থেকে অবশ্য উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন সহজেই নির্ণয় করা যায়; শিল্পে উদ্যোক্তার সংখ্যা এক একক বাড়ালে মোট উৎপাদনের পরিমাণ যতটা বাড়ে তাই হবে উদ্যোক্তার প্রান্তিক উৎপন্ন। প্রত্যেক উদ্যোক্তা সমজাতীয় এটা ধরে নিলে শিল্পের থেকে সকল উদ্যোক্তার যোগান-দাম (অর্থাৎ যে ন্যূনতম মুনাফা পেলে উদ্যোক্তা উদ্যোগ গ্রহণ করতে সম্মত হবে) অভিন্ন হবে। দীর্ঘকালে উদ্যোক্তার প্রান্তিক আয় উৎপন্ন এই যোগান-দামের সমান হবে, যদিও স্বল্পকালে উদ্যোক্তার যোগান সীমাবদ্ধ থাকায় তার মুনাফা (= প্রান্তিক আয় উৎপন্ন আয়) এই যোগান দাম অপেক্ষা বেশি হতে

পারে। তবে বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকলে দীর্ঘকালেও উদ্যোক্তার মুনাফা তার স্বাভাবিক মুনাফা বা যোগান-দাম অপেক্ষা বেশি হবে।

আমেরিকার অর্থনীতিবিদ্ **ওয়াকার** (Walker) প্রণীত **মুনাফার খাজনাতত্ত্বে** বলা হয় মুনাফা যেহেতু এক ধরনের উদ্বৃত্ত, তাই একে এক প্রকার খাজনা হিসাবে গণ্য করা চলে। বিভিন্ন উর্বরতা সম্পন্ন জমির মত উদ্যোক্তাদের দক্ষতারও তারতম্য রয়েছে। প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনার অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তারা যে অধিক মুনাফা উপার্জন করে তা খাজনারই নামান্তর মাত্র। এ খাজনা হল যোগ্যতার খাজনা (rent of a ability).

টাউসিগ্ (Taussig) ও **ড্যাভেনপোর্ট** (Davenport) প্রণীত **মুনাফার মজুরি তত্ত্বে** বলা হয় যে সংগঠন শ্রমেরই একটি রূপ—যদিও উন্নততর রূপ। তাই মুনাফাকে মজুরিরই অন্যতম রূপ বলে গণ্য করা যুক্তিযুক্ত। সংগঠক বা উদ্যোক্তা বলে পৃথক কোনও উপাদান নেই; ফলে মুনাফা নামে পৃথক কোনও আয়ের অস্তিত্বই নেই।

আমেরিকার অর্থনীতিবিদ্ **জে. বি. ক্লার্ক** (G. B. Clark) **তাঁর মুনাফার গতিশীল তত্ত্বে** দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র গতিশীল অর্থব্যবস্থাতেই মুনাফার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। স্থিতিশীল সমাজে সবকিছুই আগে থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় বলে সকল দ্রব্যের দাম চাহিদা ও যোগানের ঘাতপ্রতিঘাতে এমনভাবে নির্ধারিত হয় যাতে সকল উদ্যোক্তা কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফাটুকুই সংগ্রহ করতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও উদ্বৃত্ত বা মুনাফার সৃষ্টি হতে পারে না। স্যুমপিটার (Schumpeter) তাঁর **উদ্ভাবন** বা **নতুন প্রচলন** (Innovation) **তত্ত্বেও** একই রকম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গতিশীল অর্থব্যবস্থায় নতুন নতুন দ্রব্য বা নতুন নতুন উৎপাদন পদ্ধতি বা নতুন নতুন বাজার উদ্ভাবন করে উদ্যোক্তা স্বল্পকালে যে উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করতে পারে তাই হল মুনাফা।

হলি (Hawley) বর্ণিত **মুনাফার ঝুঁকি বহন তত্ত্বে** বলা হয় যে মুনাফা হল ঝুঁকি বহনের পুরস্কার। ঝুঁকি যত বেশি হবে। প্রত্যাশিত মুনাফার পরিমাণও তত বেশি হবে। ঝুঁকি বহন হল উৎপাদনের একটি অপরিহার্য উপাদান এবং এর বিনিময়ে উদ্যোক্তার যদি কিছু প্রাপ্য না হয় তবে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উদ্যোক্তার সন্ধান মিলবে না।

ঝুঁকি বহন তত্ত্বের উন্নততর রূপই হল অধ্যাপক **নাইটের** (Knight) **অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্ব।** নাইটের মতে যে কোনও ঝুঁকির জন্য মুনাফার উৎপত্তি হতে পারে না। যে সকল ঝুঁকি আগে থেকে অনুমান করা যায় না এবং যার বিরুদ্ধে কোনরূপ বীমার ব্যবস্থা করা যায় না—যাকে নাইট অনিশ্চয়তা বলেছেন—কেবলমাত্র সে সকল ঝুঁকির জন্যই দেখা দেয়। অনিশ্চয়তা বা অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বহনকে উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান হিসাবে গণ্য করতে হবে। মুনাফা হল এই অনিশ্চয়তা বহনের যোগান দাম। এই যোগান দাম না পেলে ব্যবসা ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার যোগান সুনিশ্চিত হবে না।

মুনাফা উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ্ যে তত্ত্বগুলির অবতারণা করেছেন, সমালোচকরা তার প্রতিটিরই নানাবিধ ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে মুনাফার এমন কোন তত্ত্ব নেই যা মুনাফার সকল উপাদানকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে বর্তমান অর্থনীতিবিদ্গণ মুনাফার **অনিশ্চয়তা বহন তত্ত্বটিকেই** সর্বাপেক্ষা কম ত্রুটিপূর্ণ বা অ-সন্তোষজনক বলে মনে করেন।

৬২.৮ অনুশীলনা

(ক) দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্ন (Long-Type question) :

১। মুনাফার প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

২। মুনাফার ও ঝুঁকি বহনের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা করুন।

৩। মুনাফা হল অবীমাযোগ্য ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহনের পুরস্কার—ব্যাখ্যা করুন।

৪। আপনি কি এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত যে, মুনাফার কোন সন্তোষজনক তত্ত্ব নেই?

৫। মুনাফার উদ্ভব হয় কেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দিন।

৬। মুনাফার সংজ্ঞা দিন এবং এর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।

(খ) সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন :

১। মুনাফার উপাদানগুলি আলোচনা করুন।

২। মোট মুনাফা ও অন্যান্য নীট মুনাফার মধ্যে পার্থক্য দেখান।

৩। মুনাফা ও অন্যান্য উপাদানের আয়ের মধ্যে পার্থক্য করুন।

৪। মুনাফার সঙ্গে খাজনা পার্থক্য কি?

৫। বিশুদ্ধ মুনাফা ও স্বাভাবিক মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কি?

৬। কেবলমাত্র গতিশীল সমাজেই মুনাফার উদ্ভব হয়—ব্যাখ্যা করুন।

(গ) বস্তু ভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য কি?

২। মুনাফা কি কখনও ঋণাত্মক হতে পারে?

৩। মুনাফার প্রকৃতি কি খাজনারই অনুরূপ?

৪। একথা কি ঠিক যে মুনাফার প্রকৃতি মজুরিরই মত?

৫। স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন ব্যয়ের অঙ্গীভূত হয় কেন?

৬। একথা কি ঠিক যে নতুন উদ্ভাবনের দরুণই মুনাফার উদ্ভব ঘটে?

৭। মুনাফার সঙ্গে একচেটিয়া কারবারের সম্পর্ক কি?

৬২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। অলক ঘোষ ও বিশ্বনাথ ঘোষ ঃ অর্থনৈতিক তত্ত্ব, দি নিউ বুক স্টল

২। জয়দেব সরখেল ঃ অর্থনৈতিক তত্ত্ব, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিঃ

৩। ধীরেশ ভট্টাচার্য ও প্রণব কুমার চক্রবর্তী ঃ ব্যবসায়িক অর্থবিদ্যার মূল তত্ত্ব, মর্ডান বুক এজেন্সি

৪। সম্পৎ মুখার্জি ও দেবেশ মুখার্জি ঃ সমকালীন অর্থবিদ্যা, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি

৫। Gould and Lazear : Micro Economic Theory 6th Edition, All India Traveller and Book Seller

৬। A Koutsoyinnis : Modern Micro Economics, ELBS/MacMillan Second Edition

৭। Paul A Samuelson William D. Nord Raus : Economics, McGraw-Hill Inc. Fifteenth Edition.

৮। জিতেন্দ্রকুমার মিত্র ঃ আধুনিক অর্থনীতি ও পরিকল্পনা, ওয়ার্ল্ড প্রেস

৯। হরিদাস আচার্য ঃ আধুনিক অর্থনীতি, দে বুক কনসার্ণ

একক ৬৩ ◆ জাতীয় আয়

গঠন

৬৩.১ উদ্দেশ্য

৬৩.২ প্রস্তাবনা

৬৩.৩ জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা

৬৩.৪ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

৬৩.৪.১ মোট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন

৬৩.৪.২ মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়

৬৩.৪.৩ মাথাপিছু আয়

৬৩.৪.৪ আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়

৬৩.৪.৫ প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাপ

৬৩.৫ কীভাবে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা যায়

৬৩.৫.১ জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা যায়

৬৩.৫.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জাতীয় আয় পরিমাপ

৬৩.৬ জাতীয় আয়ের পরিমাপের অসুবিধা

৬৩.৭ অনুশীলনী

৬৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে ঃ

- জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা
- জাতীয় আয় কিভাবে পরিমাপ করা যায়
- জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয়

৬৩.২ প্রস্তাবনা

সমষ্টিগত অর্থনীতিতে জাতীয় আয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। জাতীয় আয় সংক্রান্ত আরও ধারণা আছে, যেমন মোট জাতীয় উৎপাদন, নিট জাতীয় উৎপাদন, মোট জাতীয় আয়, নিট জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় ইত্যাদি। কোনও দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের তিনটি পদ্ধতি আছে-উৎপাদন পদ্ধতি, আয় পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি। যে কোনও পদ্ধতিতেই জাতীয় আয় পরিমাপ করা হোক না কেন জাতীয় আয় পরিমাপের সময় বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। সমস্যাগুলি মূলত ধারণাগত ও পরিসংখ্যানগত।

৬৩.৩ জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা

কোনও দেশের জনসাধাণ একটি নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার অর্থমূল্যের সমষ্টিকেই জাতীয় আয় বলে। জাতীয় আয়কে সাধারণত তিন দিক দিয়ে দেখা হয়।

জাতীয় আয়কে উৎপাদনের সমষ্টি বা জাতীয় উৎপাদন হিসাবে দেখা যেতে পারে। উৎপাদনের উপাদানগুলি অর্থাৎ, জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন মিলিত হয়ে যে সব দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য উৎপাদন করে তাকেই জাতীয় উৎপাদন করে। যেহেতু বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এককগুলি বিভিন্ন (যেমন লিটার, মিটার, কুইন্টাল) তাই এইগুলিকে যোগ করার জন্য আগে অর্থমূল্যে প্রকাশ করতে হয়। এই অর্থমূল্যের সমষ্টিই মোট জাতীয় আয় উৎপাদন।

জাতীয় আয়কে উৎপাদনের উপাদানগুলির আয়ের সমষ্টি দেখা যেতে পারে। উপাদানগুলি জাতীয় উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে আয় বর্জন করে। দেশের মোট উৎপাদন খাজনা, সুদ, মজুরি ও মুনাফার আকারে উপাদানগুলির মধ্যে বণ্টিত হয়। সুতরাং, এই সকল আয়ের সমষ্টিই জাতীয় আয়।

জাতীয় আয়কে আবার মোট ব্যয়ের সমষ্টি হিসাবেও দেখা যেতে পারে। জাতীয় আয় মোট ভোগ ব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি। দেশের জনসাধারণ জীবনধারণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করে তাকে মোট ভোগব্যয় বলে। আর উৎপাদনের বৃদ্ধির জন্য মূলধন গঠনের কাজে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাকে বিনিয়োগ ব্যয় বলে। মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করলে মোট জাতীয় ব্যয় পাওয়া যাবে।

জাতীয় আয়ের এই তিনটি ধারণার মধ্যে কোনও মৌলিক পার্থক্য নেই, যে কোনও একটি ধারণার মাধ্যমেই জাতীয় আয়কে প্রকাশ করা যায়।

৬৩.৪ জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা

জাতীয় আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা আছে, যেমন জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয়, আর্থিক জাতীয় আয়, প্রকৃত জাতীয় আয় ইত্যাদি। এখন এইসব ধারণাগুলি আমরা আলোচনা করব।

৬৩.৪.১ মোট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদন

কোনও দেশ একটি নির্দিষ্ট সময়ে, ধরা যাক এক বছরে, তার প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর শ্রম, মূলধন, কারিগরী জ্ঞান প্রয়োগ করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তাদের আর্থিক মূল্যের যোগফলই মোট জাতীয় উৎপাদন।

দেশের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক ক্ষেত্রের উৎপাদন, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের উৎপাদন ও তৃতীয় পর্যায়ের ক্ষেত্রের উৎপাদন। কৃষি কাজ, বনজ বস্তু সংগ্রহ, শিকার, মৎস্য চাষ, পশু, পক্ষী, মক্ষিকা ও কীটপালন ইত্যাদি প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে সব রকমেপ শিল্প, যেমন কুটির শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর, অফিস, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, জলসেচ ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্মাণকার্য এবং বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জলসরবরাহ ইত্যাদি। তৃতীয় ক্ষেত্রের মধ্যে থাকে ব্যবসা-বাণিজ্য, যোগাযোগ, পরিবহন স্বয়ং নিযুক্ত ও পরনিযুক্ত পেশা, সরকারি সেবা ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রে উৎপাদিত হয় দ্রব্য ও তৃতীয় ক্ষেত্রে সেবা। বিভিন্ন দ্রব্যের একক বিভিন্ন। আবার সেবার একক ও দ্রব্যের এককও এক নয়। কাজেই দ্রব্য ও সেবার বাস্তব পরিমাণকে যোগ করা যায় না। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অর্থমূল্যে প্রকাশ করে দ্রব্য ও সেবার অর্থমূল্যের যোগফলকে হিসাব করা হয়। বিষয়টি একটু সহজভাবে বোঝান যেতে পারে। ধরা যাক, উৎপাদনের তিনটি ক্ষেত্র মিলিয়ে একটি দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে $x_1x_2x_3$...........x_n ইত্যাদি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করা হয়, এখন মোট জাতীয় উৎপাদন নির্ধারণ করার জন্য দ্রব্যগুলির উৎপন্নের পরিমাণকে দ্রব্যগুলির ঐ বছরের বাজার দাম দিয়ে গুণ করতে হবে। ধরা যাক, চলতি বছরে x_1-এর দাম p_1,p_x-এর দাম p_3 এবং এইভাবে x_n-এর দাম p_n

∴ মোট জাতীয় উৎপাদন

$$= p_1x_1 + p_2x_2 + ... + p_nx_n$$

এখানে বর্তমান বছরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিক মূল্য বর্তমান বছরের বাজার দামে বা চলতি দামে হিসাব করা হচ্ছে। তাই একে বাজারে দামে বা চলতি দামে মোট জাতীয় উৎপাদন বলা হয়।

সরকার যে পরোক্ষভাবে আদায় করেন তা বাজার দামের অন্তর্ভুক্ত থাকে। পরোক্ষভাবে দ্রব্যের ওপর বসানো কর এবং এই কর দ্রব্যের দামের সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। উৎপাদন দ্রব্য সামগ্রীকে বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে বাজার দামে যে জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায় তার মধ্যে পরোক্ষ কর বাদ দিলে উৎপাদনের ব্যয়ে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

নিট জাতীয় উৎপাদন ঃ

জাতীয় উৎপাদনের কাজে নানাবিধ মূলধনী দ্রব্য ব্যবহৃত হয়। ফলে, এই মূলধনী দ্রব্যের একটি অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। উৎপাদন ধারা অব্যাহত রাখতে হলে, এই সকল মূলধনী দ্রব্যের মেরামতি ও পরিবর্তন প্রয়োজন। ঐ উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তাকে অবচয় বলা হয়। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে যন্ত্রপাতি, কারখানা, ঘর ও অন্যান্য স্থায়ী মূলধন সম্পদের অবচয় বিয়োগ করে জাতীয় উৎপাদনের যে হিসাব পাওয়া যায় তাকেই নিট জাতীয় উৎপাদন বলে।

নিট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন – অবচয়।

নিট জাতীয় উৎপাদনকেও বাজার দামে অথবা উৎপাদন ব্যয়ে প্রকাশ করা যায়।

৬৩.৪.২ মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়

একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের প্রতিটি অর্থ-উপার্জনকারী একক বাজার সংক্রান্ত লেনদেনের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করে তার সমষ্টিকেই জাতীয় আয় বলে। মোট জাতীয় আয় বিভিন্ন উপাদানের আয়ের সমষ্টি। আমরা জানি যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করতে প্রয়োজন হয় বিভিন্ন উপাদানের। ঐ সব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর অর্থমূল্য থেকেই উৎপাদনের উপাদানগুলিকে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। উৎপাদনের অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলিকে সাধারণত চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—জমি, মূলধন, শ্রম ও সংগঠন। উৎপাদনের জন্য যে জমির প্রয়োজন হয় তা যোগান দেন জমির মালিকেরা, বিনিময়ে পান খাজনা, মূলধন সরবরাহকারীরা পান সুদ, শ্রমের যোগান দেন শ্রমিকেরা, বিনিময়ে পান মজুরি। আর যাঁরা উৎপাদনকার্য পরিচালনা করেন সেই সংগঠকেরা পান মুনাফা। এক নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত জমির মোট খাজনা, সরল শ্রমিকেরা মোট মজুরি, সব মূলধনের সুদ এবং সব সংগঠনের মোট মুনাফা যোগ করলেই আমরা মোট জাতীয় আয় পেতে পারি।

এখন এই মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধনের অবচয় বাদ দিলেই নিট জাতীয় আয় পাওয়া যাবে।

অর্থাৎ নিট জাতীয় আয় = মোট জাতীয় আয় – অবচয়

= খাজনা + সুদ + মজুরি + মুনাফা – অবচয়

= খাজনা + সুদ + মজুরি + নিট মুনাফা।

কোনও দেশের নিট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় উৎপাদন অভিন্ন, যে কোনও উৎপাদন কার্যের দু'টি দিক থাকে। একটি উৎপাদনের দিক আর একটি উৎপাদনের পদ্ধতিতে যারা অংশগ্রহণ করছে তাদের আয়ের দিক। উৎপাদনের ফলে মূল্য সংযোজিত হয়। সেই সংযোজিত মূল্য থেকেই উৎপাদন পদ্ধতিতে অংশগ্রহণকারী উপাদানগুলিকে অর্থ প্রদান করা হয়। তবে বাজারে দামে উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা হ'লে তার মধ্যে পরোক্ষকর যুক্ত থাকে বলে পরোক্ষ কর বাদ দিলে তবেই নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়। আবার সরকার যদি কোনও দ্রব্যের ওপর ভর্তুকি দেন তবে উৎপাদন ব্যয়ের থেমে কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হয়। সেক্ষেত্রে বাজার দামে উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করে ভর্তুকির পরিমাণ যোগ দিতে হবে।

৬৩.৪.৩ মাথাপিছু আয়

কোনও নির্দিষ্ট বছরের জাতীয় আয়কে ঐ বছরের দেশের সমগ্র জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় জানা যায়। মাথাপিছু আয় থেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। জনসংখ্যা তুলনায় জাতীয় আয়ের পরিমাণ কত এবং দেশের জনসংখ্যার মধ্যে এই আয় সমানভাবে বণ্টন করে দিলে প্রত্যেকের ভাগে কত পড়ে তা মাথাপিছু আয় থেকে জানতে পারা যায়।

$$\text{২০০০ সালের মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{২০০০ সালের জাতীয় আয়}}{\text{২০০০ সালের দেশের জনসংখ্যা}}$$

৬৩.৪.৪ আর্থিক জাতীয় আয় ও প্রকৃত জাতীয় আয়

যদি উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয় তবে যে বছরের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ধরা হচ্ছে সেই বছরের দামস্তর দিয়ে গুণ করে অর্থমূল্যগুলি যোগ করলে বর্তমান মূল্যে জাতীয় আয় বা আর্থিক জাতীয় পাওয়া যাবে। ধরা যাক্, আমরা ১৯৯৯ সালের আর্থিক জাতীয় আয় নির্ণয় করতে চাই। তবে ১৯৯৯ সালে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়েছে তাদের পরিমাণকে ১৯৯৯ সালের দামস্তর দিয়ে গুণ করলে ১৯৯৯ সালের আর্থিক জাতীয় আয় পাওয়া যাবে। অন্যদিকে প্রকৃত জাতীয় আয় বলতে বোঝায় কোনও নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হচ্ছে তাকেই। যদি পরপর দুবছর একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হয় তবে বলা হবে প্রকৃত জাতীয় আয়ের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে প্রথম বছরের তুলনায় দ্বিতীয় বছরে যদি দামস্তর বাড়ে তবে আর্থিক জাতীয় আয় বাড়বে। অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় একই থাকা সত্ত্বেও আর্থিক জাতীয় আয় বাড়বে। আবার দামস্তর যদি স্থির থাকে কিন্তু আর্থিক জাতীয় আয় বেড়ে যায় তবে বুঝতে হবে প্রকৃত জাতীয় আয় বেড়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে কিনা বোঝার জন্য প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাপ জানা দরকার।

৬৩.৪.৫ প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাপ

দামসূচকের সাহায্যে প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা যায়। কোনও বছরের দামসূচক একটি সংখ্যা যার সাহায্যে কোনও ভিত্তি বছরের তুলনায় ঐ বছরের দামস্তর কতটা বেড়েছে তা জানা যায়। ভিত্তি বছরের দামসূচককে ১০০ ধরা হয়। যদি ১৯৯৫ সালকে ভিত্তি বছর করে ১৯৯৯ সালের দামসূচক ৩০০ হয় তবে ১৯৯৫ সালের তুলনায় ১৯৯৯ সালের দামস্তর তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনও বছরের আর্থিক জাতীয় আয়কে সেই বছরের দামসূচক দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করলে সেই বছরের প্রকৃত জাতীয় আয় জানা যাবে।

$$\text{১৯৯৯ সালের জাতীয় আয়} = \frac{\text{১৯৯৯ সালের আর্থিক জাতীয় আয়} \times \text{১০০}}{\text{১৯৯৯ সালের দামসূচক (১৯৯৫ সালকে ভিত্তি বছর ধরে)}}$$

৬৩.৫ কিভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়

৬৩.৫.১ জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

জাতীয় উৎপাদন বা আয় পরিমাপ করার পদ্ধতি তিনটি ঃ (ক) উৎপাদন পদ্ধতি, (খ) আয় পদ্ধতি ও (গ) ব্যয় পদ্ধতি

উৎপাদন পদ্ধতি ঃ জাতীয় আয় অর্জিত হয় উৎপাদন কার্যের মাধ্যমে। এই উৎপাদন কার্য অবিচ্ছিন্নভাবে চলে। জমিতে কৃষিকাজ হয়, কারখানায় বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, খনি থেকে খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা হয়, শিক্ষক শিক্ষাদান করেন, চিকিৎসক চিকিৎসা করেন, বিচারপতি বিচার করেন, পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করে ইত্যাদি। এইরকম বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মানুষের অভাবপূরণের জন্য অনেক রকমের দ্রব্য ও সেবা প্রস্তুত হয়। কিন্তু জাতীয় আয় পরিমাপ করবার জন্য এদের বস্তুগত পরিমাণ যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ১০০০০ মিটার কাপড় + ৫০০০ মিটার কেরোসিন তেল + ৩০০০০ কিলোমিটার

রাস্তা + ১০০০০ কুইন্টাল কয়লা যোগ দেওয়া যায় না। এই সমস্ত দ্রব্যগুলির উৎপাদনের পরিমাণকে বাজার দাম দিয়ে গুণ করলে মোট উৎপাদনের আর্থিক মূল্য পাওয়া যাবে।

আবার, এমন অনেক দ্রব্য আছে যার বাজার দাম হয় না; সরকার যে রাস্তাঘাট তৈরি করেন তাদের পরিমাণ জানা যায় কিন্তু বাজার দাম জানা যায় না। রাস্তাঘাট, সেতু, পানীয় জলের যোগান, বিদ্যুৎ, জলসেচ প্রভৃতি বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। এসব ব্যয়ের হিসেব করতে হলে তাতে উৎপাদনের মূল্য ধরা হয়। যেমন, একটি রাস্তায় মূল্য = রাস্তায় পরিমাণ × প্রতি একক রাস্তার জন্য ব্যয়।

আবার সরকারের প্রতিরক্ষা বা প্রশাসনিক সেবারও কোনও রাজার দর নেই। সেইক্ষেত্রে উৎপাদনের মূল্য জানার জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য ব্যয় যোগ করতে হবে। সরকারে প্রতিরক্ষা নামক সেবা উৎপাদনের মূল্য = সামরিক বাহিনীর লোকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যয়।

দেশের সরকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনও করে। সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি যে সব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে তা বাজার দমে জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরকার অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ও সেবার ওপর উৎপাদন শুল্ক, বিক্রয় কর প্রভৃতি ধার্য করে। এই ধরনের পরোক্ষকর চাপানোর ফলে দ্রব্যের বাজারে দাম বৃদ্ধি পায়। বাজার দাম হল দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও পরোক্ষ করের সমষ্টি। বাজার দামে যে জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায় তার থেকে পরোক্ষ কর বিয়োগ করলে উপাদান ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করবার সময়ে কয়েকটি বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন একটি দ্রব্য যেন একেবারের বেশি গণনা না করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক বছরে যা গম উৎপাদিত হয় তার থেকে ময়দা, পাঁউরুটি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। এখন জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে যদি উৎপাদিত গমের মূল্য, ময়দার মূল্য ও পাঁউরুটির মূল্য ধরা হয় তবে ময়দা ও পাঁউরুটির জন্য যতটা গম ব্যবহৃত হয়ছে সেই অংশটুকুর মূল্য আরও দু'বার ধরা হচ্ছে। এইভাবে একই দ্রব্যের উৎপাদন মূল্য একাধিকবার গণনা করা হচ্ছে। এই পদ্ধতি পরিহার না করলে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য বেড়ে যাবে।

দু'ভাবে এই ভুল এড়ানো যায় ঃ (১) যদি কেবলমাত্র শেষ উৎপন্ন দ্রব্য ধরা হয়। (২) যদি উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে যুক্ত অতিরিক্ত মূল্য ধরা হয়।

সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়—অন্তর্বর্তী দ্রব্য ও শেষ উৎপন্ন দ্রব্য। যে দ্রব্য যে বছর উৎপন্ন হচ্ছে সেই বছরই অন্য দ্রব্যের উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়ে নিঃশেষিত হয় তাকে বলা হয় অন্তর্বর্তী দ্রব্য। কোনও দ্রব্য অন্তর্বর্তী দ্রব্য না হলে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হবে। তবে দ্রব্যের এই বিভাগ দ্রব্যের ব্যবহার অনুযায়ী হয়। একই দ্রব্য একই সময়ে অন্তর্বর্তী দ্রব্য না হলে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। যেমন, কোনও বছরে উৎপন্ন কয়লা ইস্পাত তৈরীর কারখানায় জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে আবার গৃহস্থের বাড়িতে রান্নার কাজে জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম ক্ষেত্রে কয়লা অন্তর্বর্তী দ্রব্য কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শেষ উৎপন্ন দ্রব্য।

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করবার সময় শুধু শেষ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যকেই ধরতে হবে এবং অন্তর্বর্তী দ্রব্যের উৎপাদন মূল্যকে ধরা হবে না। তবেই একাধিকবার গণনা বন্ধ হবে। আর যে উপায়ে একাধিকবার গণনার সমস্যাটি পরিহার করা যায় তা হ'ল মূল্য সংযোজন পদ্ধতি। এর মাধ্যমে উৎপাদনের প্রতি স্তরে কতটা মূল্য সংযোজিত হয়েছে তা নির্ণয় করা হয় এবং যোগ করা হয়। কোনও উৎপাদন পদ্ধতিতে মূল্য সংযোজন সেই উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যবহৃত নিঃশেষিত কাঁচামালের মূল্যের এবং সেই বছরেই উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান।

একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের সব উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট কত মূল্য সংযোজিত হচ্ছে তার যোগফল থেকে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যাবে। বিষয়টি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, কোনও কৃষক টম্যাটো উৎপাদন করে ৫ টাকা কেজি দরে সেই টম্যাটো কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি করে দিল। সেই উৎপাদন প্রতিষ্ঠান টম্যাটো পেস্ট তৈরি করল এবং তার থেকে সস প্রস্তুত করল। তারপর এক কেজির দাম ১৫ টাকা ধরে কোনও রেস্তোরাঁর মালিককে সেই সস বিক্রি করল। রেস্তোরাঁ তার খরিদ্দারের কেজি প্রতি ২০ টাকা দাম ধরে নিয়ে অন্যান্য খাবারের সাথে সেই সস পরিবেশন করল। এখন মূল্য সংযোজন পদ্ধতি অনুসারে টম্যাটোর সংযোজিত মূল্য + টম্যাটো সসের সংযোজিত মূল্য + খাবার সুস্বাদু করবার জন্য রেস্তোরাঁয় টম্যাটো সসের ব্যবহারের ফলে সংযোজিত মূল্য

= ৫ টাকা + (১৫ - ৫) টাকা + (২০ - ১৫) টাকা

= ৫ টাকা + ১০ টাকা + ৫ টাকা

= ২০ টাকা

আবার, শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি অনুসারে কেজি প্রতি ২০ টাকা দামের সস মোট জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং, শেষ উৎপন্ন দ্রব্য পদ্ধতি এবং মূল্য সংযোজন পদ্ধতিতে একই ফল পাওয়া যায়।

মূল্য সংযোজন পদ্ধতি যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সুবিধাজনক। সব যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানকেই কোম্পানি আইন অনুসারে আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখতে হয় এবং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে বার্ষিক সাধারণ সভায় তা দাখিল করতে হয়। ব্যয়ের হিসাবে দু'টি উপাদান আছে। একটি উপাদান হ'ল প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়। এক অবচয় বা ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় বলা যেতে পারে।

মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে অবচয় বাদ দেবার পরে যে অর্থ থাকে, সেই সংযোজিত মূল্য থেকেই প্রতিষ্ঠান মজুরি, খাজনা, সুদ, ডিভিডেন্ড বিলি করে। এইগুলি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের দ্বিতীয় অংশ। এই পদ্ধতি অংশীদারী বা এক-মালিকানা প্রতিষ্ঠানেও ব্যবহার করা যায়। তবে এর সার্থকতা নির্ভর করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়ার ওপরে।

উৎপাদন পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করবার সময় আরও কয়েকটি বিষয়ে নজর দিতে হয়। যে সব উৎপাদন অর্থনৈতিক অর্থে উৎপাদন নয় তাদের জাতীয় আয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। যেমন, কোনও কৃষক বিক্রয়ের জন্য শাকসব্জি উৎপাদন করলে তা জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু কোনও গৃহবধূ বাড়ির লাগোয়া এক টুকরো জমিতে শাকসব্জি উৎপাদন করে তবে তাকে উৎপাদন বলা হবে না। কারণ এখানে উৎপাদন বিক্রয়ের জন্য নয়।

নিট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করতে হলে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিতে হয়। দ্রব্য বা সেবা উৎপাদনে যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় তার ক্ষয়ক্ষতি হয়। একে বাদ না দিলে মোট উৎপাদনের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাজার দামে মধ্যে পরোক্ষ কর থাকে। বাজার দামে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করার সময় তাতে কর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। জাতীয় উৎপাদনের মূল্য থেকে পরোক্ষ কর বাদ দিলে তবেই উৎপাদনের উপাদান ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যাবে। এটি দেশের জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান হয়।

অনুরূপভাবে সরকার কোনও দ্রব্যের ওপর ভর্তুকি দিয়ে থাকেন। কোনও দ্রব্যের ভর্তুকি দিলে সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের থেকে কম দামে দ্রব্যটি বিক্রি করা হয়। সুতরাং, বাজার দামে মোট উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করে যেমন পরোক্ষ কর বাদ দিতে হয় তেমন ভর্তুকি যোগ দিতে হয়। তবেই উপাদানের ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য পাওয়া যাবে। এটি জাতীয় আয়ের সঙ্গে সমান হবে।

পরিশেষে দেশটি যদি বর্হিবাণিজ্যে লিপ্ত হয় তবে বর্হিবাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত নিট আয় জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

আয় পদ্ধতি ঃ

কোনও একটি দেশের মোট জাতীয় আয় হল, একটি নির্দিষ্ট বছরে দেশের বিভিন্ন অর্থ উপার্জনকারী একক বাজার সংক্রান্ত লেনদেনের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন করে তার সমষ্টি। অর্থাৎ, মোট জাতীয় আয় হল বিভিন্ন উপাদানের আর্থিক আয়ের সমষ্টি। আমরা জানি যে, যাবতীয় দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদনের উদ্দেশ্যে উপাদানগুলিকে খাজনা, মজুরি, সুদ ও মুনাফা হিসাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। সুতরাং, উৎপাদনের উপাদান সমূহের সেবার দাম বা আয়ের সমষ্টিই হল জাতীয় আয়।

প্রকৃত অর্থে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় অভেদ মাত্র।

আয় পদ্ধতি জাতীয় আয় পরিমাপ করবার সময় কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়।

(১) উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করে দ্রব্য বা সেবা প্রস্তুত করলে যে আয় প্রাপ্তি ঘটে তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু দান বা ভিক্ষার মাধ্যমে যদি কোনও আয়প্রাপ্তি হয় তবে তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

(২) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্ট আয়কে উদ্ভূত আয় বলে। এই আয়ই উৎপাদনে নিযুক্ত সব উপাদানগুলির মধ্যে ভাগ করা হয়। একে প্রাপ্ত আয় বলে। এখন কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যদি উদ্ভূত আয় সবটা না বণ্টন করে তবে উদ্ভূত আয় থেকে প্রাপ্ত আয় কম হবে। অনেক সময় যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি মজুরি, সুদ, খাজনা মিটিয়ে দিয়ে মুনাফার একটি অংশ অবণ্টিত রাখে। এটি ভবিষ্যতে আর্থিক প্রয়োজন মেটাবার জন্যই করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের সময় বণ্টিত মুনাফা ও অবণ্টিত মুনাফা দুইই যোগ করতে হবে।

(৩) অনেক ব্যক্তি পরনিযুক্ত না থেকে স্বয়ং নিযুক্ত থাকেন এবং আয় করেন। যেমন, ওকালতিতে নিযুক্ত উকিল, স্বাধীন, প্র্যাকটিস রত ডাক্তার, হিসাব পরীক্ষক, তাঁদের আয়কেও জাতীয় আয়ের মধ্যে গণনা করতে হবে।

(৪) জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি অংশ সরকারকে আয়কর হিসেবে দেয়। যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি মুনাফার ওপর কর বা কর্পোরেশন করে দেয়। এই সব প্রত্যক্ষ কর জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(৫) এক ধরনের আয় জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না যদিও তা ব্যক্তিগত আয় হিসাবে গণ্য হয়। তাকে মূলধনী লাভ বলে। কোনও ব্যক্তি কোনও সম্পত্তি কম দামে কিনে বেশি দামে বিক্রি করলে ঐ ব্যক্তির যে লাভ হয় তাকে মূলধনী লাভ বলে। যেমন, কোনও ব্যক্তি ৫০,০০০ টাকায় জমি কিনে ১,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করলে তার লাভ হয় ৫০,০০০ টাকা। এই টাকা তার ব্যক্তিগত টাকা হ'লেও জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আবার, কোনও ব্যক্তি তার পূর্বেকার বসতবাড়ি বিক্রি করে যে অর্থ পায় তাও জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ এইসব ক্ষেত্রে সম্পত্তির হস্তান্তর হয় মাত্র, জাতীয় উৎপাদন বাড়ে না।

(৬) আয় পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে মালিকেরা নিজস্ব যে সব উপাদান উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তাদের পাওনাও যেন জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, কোনও ব্যক্তির নিজের বাড়িতেই যদি উৎপাদন কার্য হয় তার অনুরূপ বাড়ি ভাড়া নিতে যত টাকার প্রয়োজন হত, সেই পরিমাণ অর্থকেই ঐ বাড়ির ভাড়া হিসাবে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৭) কিছু কিছু দ্রব্য বা সেবাকার্য আছে যার উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ করা যায় না বলে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না। যেমন, গৃহের অভ্যন্তরে যে সব দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হয় যার জন্য কোনও অর্থ প্রদান

করা হয় না। বাড়িতে মায়ের সেবা কোনও অর্থমূল্য সৃষ্টি করে না বলে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু একই সেবা যদি কোনও গৃহপরিচায়িকা প্রদান করে এবং তার জন্য মজুরি বা বেতন পায় তবে তার আয় জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার বাড়িতে রাঁধুনি রাখলে তার পাওনা জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু বাড়ির গৃহিনী রান্নার কাজ করলে সেই কাজকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হবে না।

(৮) নিট জাতীয় আয় নির্ধারণ করবার সময় জাতীয় মূলধনের অবচয় বাদ দিতে হয়। অবচয় বাদ দিয়েই নিট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

(৯) কোনও দেশ বর্হিবাণিজ্যে লিপ্ত থেকে তার যে আয় পায় সেটি জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরতে হবে। তবে এই বিষয়ে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন আছে।

আয় পদ্ধতিটি খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু এর প্রধান অসুবিধা এই যে, এই পদ্ধতিতে আয় নির্ধারণ করতে হলে উপার্জনকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সেই কাজ মোটেই সহজসাধ্য নয়।

ব্যয় পরিমাপ পদ্ধতি

কোনও দেশের উৎপাদন ব্যবস্থায় যে সব দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপন্ন হয় তাদের কিছু কিছু ব্যক্তি ও পরিবারগুলি নিজেদের অভাব পরিতৃপ্তির জন্য ভোগ করে থাকে। উৎপন্ন দ্রব্যের বাকি অংশ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মূলধন ভাণ্ডারে জমা হয় মূলধন দ্রব্য হিসাবে এবং এর ফলে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধি ঘটে। একেই বলে বিনিয়োগ।

ব্যক্তি বা পরিবারসমূহ ভোগকারী হিসাবে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করবার জন্য যে ব্যয় করে তাকে ভোগব্যয় বলে। ভোগব্যয়, মোট ব্যয়ের একটি অংশ। মোট ব্যয়ের অপর অংশটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমূহের বিনিয়োগ ব্যয়। অতএব, দেশের মোট ব্যয়কে মোট ভাগ ও মোট ব্যয়ের মধ্যে ভাগ করা যায়।

দেশের সরকারের যদি অর্থনৈতিক কাজ থাকে তবে মোট ব্যয়ের মধ্যে ভাগ করা যায়।

মোট ব্যয় = মোট ভোগ ব্যয় + মোট বিনিয়োগ ব্যয় + সরকারি ব্যয়।

সরকারি ব্যয়কে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ে ভাগ করা যায়। সরকার দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি অসংখ্য কাজে অর্থ ব্যয় করেন। আবার প্রতিরক্ষামূলক ও প্রশাসনিক কাজের জন্য পুলিশ, সেনাবাহিনী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য অসংখ্য সরকারি কর্মচারী নিয়োগ করেন। এঁদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দিতে সরকারের যে ব্যয় হয় তাকেও ভোগব্যয় হিসাবে গণ্য করা হয়; তাছাড়া দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সরকারকে ত্রাণমূলক ও কল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এই ধরনের ব্যয়কেও ভোগব্যয় বলে।

সরকার নিজেই উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে দ্রব্য উৎপাদন করতে পারেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে আধুনিক জনকল্যাণমূলকরাষ্ট্রে সরকার যে শুধু নিজের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করেন তা নয়, দেশের সব শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধার জন্য, আরও ব্যাপক অর্থে সমাজের সুবিধার জন্য, সরকারকে সামাজিক মূলধনের বৃদ্ধির জন্য অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। দেশের সরকার রাস্তাঘাট রেলপথ, অন্যান্য পরিবহন, সেতু, জলসেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করেন, কারিগরি শিক্ষায় যে অর্থ বিনিয়োগ করেন, চিকিৎসক তৈরি করতে যে অর্থ বিনিয়োগ করেন তাকেও সামাজিক বিনিয়োগ বলা যায়।

তাহলে দেশের মোট ব্যয় সরকারি ও বেসরকারি ভোগব্যয় এবং সরকারি ও বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফলের সমান হবে।

৬৩.৫.২ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং জাতীয় আয় পরিমাপ

আধুনিক পৃথিবীর সব দেশেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লিপ্ত দেশের অর্থনীতিকে উন্মুক্ত অর্থনীতি বলে। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে দেশের আমদানি-রপ্তানি বিবেচনা করতে হয় এবং বিদেশের সঙ্গে অন্য যে সমস্ত লেনদেন থাকে তাকে হিসাবের মধ্যে আনতে হয়।

উন্মুক্ত অর্থনীতিতে মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদন এই দুটি ধারণা পাওয়া যায়। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলতে দেশের অভ্যন্তরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপন্ন হচ্ছে তার সামগ্রিক অর্থমূল্যকে বোঝায়। অন্যদিকে, জাতীয় উৎপাদন বলতে দেশের নাগরিকরা স্বদেশে ও বিদেশে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করার ফলে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করছে তার সমষ্টিকে বোঝায়। কোনও ভারতীয় নাগরিক যদি আমেরিকায় কাজ করে অর্থ উপার্জন করে তবে তার আয় ভারতের জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে নয়। আবার আমেরিকার কোনও প্রতিষ্ঠান যদি ভারতে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে মুনাফা অর্জন করে তবে সেই মুনাফা আমেরিকার জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে, কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে নয়। এখন আমরা দেখি কীভাবে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন হল তার একটি অংশই রপ্তানি হয়। তাই রপ্তানির মূল্য অবশ্যই জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। দেশে যে সব দ্রব্য প্রস্তুত হচ্ছে সেগুলি ক্রেতারা ভোগদ্রব্য হিসাবে ক্রয় করছে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন দ্রব্য হিসাবে ক্রয় করছে অথবা সরকার ক্রয় করছে। দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে তা বিদেশে রপ্তানি হয়। আর যে দ্রব্য আমদানি করা হচ্ছে সেগুলি হয় ভোগদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা অন্তর্বর্তী দ্রব্য হিসাবে উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্য নির্ণয় করতে হলে যে সব আমদানিকৃত দ্রব্য অন্তর্বর্তী দ্রব্য বা কাঁচামাল হিসাবে দেশীয় দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবহৃত হচ্ছে এবং নিঃশেষ হচ্ছে তার মূল্য বাদ দিতে হবে।

আবার, দেশের উৎপাদনের কাজে যদি বিদেশীরা যুক্ত হয় তবে তাদের যে অর্থ মজুরি হিসাবে দেওয়া হচ্ছে তা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের নয়। আবার, দেশের যে নাগরিকরা বিদেশে উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করছে এবং তার ফলে অর্থ উপার্জন করছে তা অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অংশ নয়, কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের অংশ। অনুরূপভাবে, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের কাজে যদি বিদেশি মূলধন নিয়োজিত থাকে তবে তার জন্য সুদ বা লভ্যাংশ বিদেশি মূলধন মালিকদের প্রাপ্য। সেই বাবদ অর্থ অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে নয়। আবার দেশের মূলধন বিদেশে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত থাকলে তার জন্য প্রাপ্ত সুদ বা লভ্যাংশ জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মূল্য থেকে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য বের করতে হলে বিদেশীদের পাওনা সুদ, মজুরি, মুনাফা প্রভৃতি বিয়োগ দিতে হবে আর বিদেশে কর্মরত দেশের নাগরিকদের এই বাবদ পাওড়া যোগ দিতে হবে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় যোগ করলেই জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যাবে।

এই জাতীয় উৎপাদন জাতীয় আয়ের সমান হবে। তবে জাতীয় আয় বলতে দেশের নাগরিকদের সেই আয়গুলিকেই ধরা হচ্ছে যা পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ করার জন্য অর্জিত হচ্ছে।

এই জাতীয় উৎপাদন জাতীয় ব্যয়ের সঙ্গেও সমান হবে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশে প্রস্তুত দ্রব্য ও সেবা, ব্যক্তি ও পরিবার ভোগদ্রব্য হিসাবে ক্রয় করেছে (Cd); উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি মূলধন দ্রব্য হিসাবে ক্রয় করছে (Id); দেশের সরকার ক্রয় করছে (Gd) এবং বাদবাকি অংশ রপ্তানি হচ্ছে।

GNP (Gross National Product, অর্থাৎ মোট জাতীয় উৎপাদন) = Cd + Id + Gd + X.

ক্রেতারা দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করার সাথে সাথে বিদেশে উৎপন্ন দ্রব্যও ক্রয় করছে। মোট ভোগব্যয়ের মধ্যে আমদানি করা দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যেও অন্তর্ভুক্ত। আবার দেশের উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিও মূলধনী দ্রব্য আমদানি করছে। সুতরাং, মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের মধ্যে আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের অর্থমূল্য যুক্ত। সরকারের মোট ব্যয়ের মধ্যে বিদেশী দ্রব্যের জন্য ব্যয়, বিশেষ করে সেবার জন্য ব্যয়, যেমন সরকারি দূতাবাসগুলি বা দেশের সেনাবাহিনী রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য ব্যয় অন্তর্ভুক্ত।

$C = Cd + Mc$

মোট ভোগ ব্যয় = দেশের উৎপন্ন ভোগদ্রব্যের জন্য ব্যয় + আমদানিকৃত ভোগ্য দ্রব্যের জন্য ব্যয়।

$I = Id + Mi$

Id = দেশে প্রস্তুত মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয় + আমদানিকৃত মূলধন দ্রব্যের জন্য ব্যয়।

$G = Gd + Mg$

সরকারের মোট ব্যয় = দেশে উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ব্যয় + আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য ব্যয় বিশেষ করে সেবার জন্য ব্যয়

X = রপ্তানির মূল্য

$$
\begin{aligned}
GNP &= Cd + Id + Gd + X \\
&= (C - Mc) + (I - Mi) + (G - Mg) + X \\
&= C + I + G - Mc - Mi - Mg + X \\
&= C + I + G + X - M
\end{aligned}
$$

অর্থাৎ, দেশে মোট ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, সরকারের ব্যয় প্রভৃতির মধ্যে যেহেতু আমদানি করা দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অন্তর্ভুক্ত, তাই এটি বিয়োগ হয়।

৬৩.৬ জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা

জাতীয় আয় পরিমাপের সময় বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এগুলি মূলত ধারণাগত পরিসংখ্যাগত অসুবিধা।

● ধারণাগত অসুবিধার মধ্যে কাকে উৎপাদন বলা হবে আর কাকে বলা হবে না তাই নিয়েই যথেষ্ট মতভেদ আছে। সাধারণত যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য আসে জাতীয় আয় নির্ধারণ করবার সময় সেইসব দ্রব্যসামগ্রীর আর্থিকমূল্য ধরা হয়। এখন স্বল্পোন্নত দেশে কৃষকেরা যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে তার একটা বড় অংশই নিজেরা ভোগ করে। তাই যে অংশটি বাজারে বিক্রির জন্য এল শুধু সেটিকেই মোট উৎপাদন ধরা হলে মোট উৎপাদনের মূল্য অনেক কমে যেতে বাধ্য। অনুরূপভাবে কেউ যদি ফুল, ফলের চাষ করে, কিন্তু বিক্রির জন্য বাজারে না নিয়ে আসে তবে সেই ফুল-ফল উৎপাদন বলে গণ্য হবে না এবং জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

● উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ বাজারে অবিক্রীত অবস্থায় থাকে সেই অংশটি উৎপন্ন দ্রব্যের মজুত ভাণ্ডার বাড়িয়ে দেয়। মজুত ভাণ্ডারের এই বৃদ্ধি জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরতে হয়। কিন্তু যেহেতু এই অংশটি

বাজারে বিক্রি হচ্ছে না সেইজন্য অবিক্রীত অংশটির মূল্য নির্ধারণে অসুবিধার সৃষ্টি হয় কারণ বাজারে চলতি মূল্যের ভিত্তিতে এই অংশটি বিক্রি করা যায়নি।

● যে সমস্ত সেবামূলক কাজের জন্য কোনও বেতন দেওয়া হয় না সেইগুলি জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় না। কোনও ব্যক্তি যদি তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে বেতন দেন তবে সেটি জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ যদি স্ত্রী বা পরিবারের অন্য সদস্যরা করে দেন তবে তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

● অনগ্রসর দেশে বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরদের উৎপাদিত শস্যের অংশ দেওয়া হতে পারে এবং আর্থিক মজুরি না-ও দেওয়া হতে পারে। দ্রব্যের মাধ্যমে মজুরি দিলে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। অথচ এক্ষেত্রে ক্ষেতমজুরদের আয় হচ্ছে।

● আবার সরকার প্রতিরক্ষা, আইন ও বিচার ব্যবস্থা, প্রশাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে অর্থ ব্যয় করেন সেটি জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। অনেকের মতে এগুলি অন্তর্বর্তী দ্রব্য। সুতরাং এদের ওপর সরকারের অর্থ ব্যয়কে জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয়। আবার, অনেকে এগুলিকে কোনস্তরের সেবাকার্য হিসাবে গণ্য করেন এবং এগুলি জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত বলে মনে করেন।

● জাতীয় আয়ের পরিমাপের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানগত অসুবিধাও আছে। পরিসংখ্যানগত অসুবিধার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়ার অসুবিধা। দেশে ছোট ছোট উৎপাদক আয় ব্যয়ের কোনও হিসাব রাখে না। অনেকেই পারিবারিক ভিত্তিতে বা অতি ক্ষুদ্রায়তনের উৎপাদনের কাজ সম্পাদন করে। এদের মধ্যে সকলেই শিক্ষিত নয় যার দরুন হিসাব রাখতে পারে না বা হিসাব রাখার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। এইসব ক্ষুদ্র ও পারিবারিক ক্ষেত্রের উৎপাদনকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অনুমানের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। সেবাক্ষেত্রেও সরকারি ও বড় বেসরকারি ক্ষেত্রের ব্যয় হয়তো জানা যায় কিন্তু ছোট ক্ষেত্রে, স্বয়ংনিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য পাওয়ার অসুবিধা আছে। অনেক সময় তথ্য গোপনও করা হয়। তথ্য সংগ্রাহকরাও ফাঁকি দেয়। তথ্যসংগ্রহের জন্য নমুনা সমীক্ষা করতে হয়। উপযুক্ত ব্যক্তিদের অভাব ঘটলে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা দেখা যায়।

● যে আজ আইনসঙ্গত নয় বা যে আয়ের হিসাব সরকারের কাছে ঘোষণা করা হয় না সেই আয়কে জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। সেই কারণে কোনও দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় আর পরিমাপ করা জাতীয় আয়ের মধ্যে সব সময়েই পার্থক্য থাকে।

(১) দামস্তর ও দামসূচকের ব্যাখ্যা ঃ

সকল দ্রব্যের দামের গড়কে দামস্তর বলে। দামের গড় সরল গড় বা গুরুত্বযুক্ত গড় হতে পারে।

সরল গড় হলে বাজারে n সংখ্যক দ্রব্যের দাম যথাক্রমে $p_1p_2, p_3 \cdots p_n$ হলে সরল গড় বলতে

$\frac{p_1 + p_2 + p_3 \cdots\cdots + p_n}{n}$ কে বোঝায়।

অন্যদিকে যদি আমরা ধরি p_1 দামের গুরুত্ব w_1, p_2 দামের গুরুত্ব w_2 এবং এইভাবে p_n দামের গুরুত্ব w_n, তাহলে গুরুত্বযুক্ত গড় হ'ল—

$$\frac{p_1w_1 + p_2w_2 + \cdots\cdots + p_nw_n}{w_1 + w_2 + \cdots\cdots + w_n}$$

দামসূচক হ'ল একটি সংখ্যা যার মাধ্যমে দামস্তরকে প্রকাশ করা হয়। দামসূচক নির্ণয় করার জন্য দু'টি বছর বেছে নিতে হয়। একটি বছরকে বলা হয় ভিত্তি বছর ও অপর বছরটিতে চলতি বছর। ভিত্তি বছরের দামসূচককে সব সময় ১০০ ধরা হয়।

দামসূচক গঠন করার কাল্পনিক পদ্ধতি ঃ

ধরা যাক, পাঁচটি দ্রব্য নেওয়া হ'ল চাল, ডাল, চা, মাছ ও দুধ। চাল, ডাল, চা, মাছ কেজিতে প্রকাশ করা হচ্ছে; দুধ লিটারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এই পাঁচটি দ্রব্যের দু'টি করে দাম নেওয়া হয়েছে। একটি ভিত্তি বছরের দাম ও অপরটি চলতি বছরের দাম।

১৯৯৯ সালের দামসূচক নির্ণয় (১৯৯০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে)

দ্রব্যের নাম (একক)	**১৯৯০ সালের** দাম একক (p_0)	**১৯৯৯ সালের** দাম (p_n)	$\frac{P_n}{P_0} \times 100$	
চাল (কেজি)	১০	১৫	$\frac{15}{20} \times 100 = 150$	
ডাল (কেজি)	৮	১৬	$\frac{16}{8} \times 100 = 200$	গড় $= \frac{150+200+200 \quad 150+200}{5}$
চা (কেজি)	৫০	১০০	$\frac{100}{50} \times 100 = 200$	= ১৮০
মাছ (কেজি)	১০০	১৫০	$\frac{150}{100} \times 100 = 150$	ভিত্তি বছরে দামস্তর ১০০ হলে চলতি বছরে
দুধ (লিটার)	৫	১০	$\frac{10}{5} \times 100 = 200$	১৮০ হচ্ছে অর্থাৎ ৮০ বৃদ্ধি পেয়েছে

এটি সরল পদ্ধতি। বিভিন্ন দ্রব্যের গুরুত্ব বিভিন্ন হ'লে গুরুত্বযুক্ত গড় পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত।

৬৩.৭ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। জাতীয় আয় কাকে বলে?
২। হস্তান্তর আয় বলতে কি বোঝেন?
৩। অন্তর্বর্তী দ্রব্য ও শেষ উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য কি?

৪। প্রকৃত জাতীয় আয় বলতে কি বোঝেন?

৫। জাতীয় ব্যয় কাকে বলে?

৬। আমদানি ও রপ্তানির মূল্যকে জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় কীভাবে ধরা হয়?

৭। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও মোট জাতীয় উৎপাদন কি এক হয়?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মোট জাতীয় উৎপাদন ও নিট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য দেখান। মোট জাতীয় আয় ও নিট জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিন এবং এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখান।

২। জাতীয় আয় পরিমাপের উৎপাদন পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করুন।

৩। জাতীয় আয় পরিমাপের আয় পদ্ধতিটি ব্যাখ্যা করে এই পদ্ধতিতে কোন্ কোন্ আয়কে ধরা হয় না সেটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান।

৪। জাতীয় ব্যয় কাকে বলে? কীভাবে ব্যয় পদ্ধতির মাধ্যমে জাতীয় ব্যয় পরিমাপ করা যায় সেটি দেখান।

৫। উন্মুক্ত অর্থনীতিতে কীভাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায় দেখান।

৬। কোনও দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের সময় কী কী অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হয় ব্যাখ্যা করুন।

নিম্নলিখিত উক্তিগুলি সযত্নে অনুধাবন করুন এবং উক্তিগুলি ঠিক না ভুল বলুন।

ক) সরকার প্রদত্ত বেকার ভাতা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

খ) উপাদান ব্যয়ে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য ও বাজার দামে জাতীয় উৎপাদনের মূল্য একই।

গ) অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পেনশন জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ) কোনও যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে মুনাফার যে অংশটুকু শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয়নি তাও জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঙ) কোনও ব্যক্তি ১০,০০০ টাকায় জমি কিনে ২০,০০০ টাকায় বিক্রি করলে তার যে লাভ হয় তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে।

একক ৬৪ ◆ ভোগ অপেক্ষক এবং গুণক

গঠন

৬৪.১ উদ্দেশ্য

৬৪.২ প্রস্তবনা

৬৪.৩ ভোগ অপেক্ষকের সংজ্ঞা

৬৪.৩.১ ভোগরেখা ও তার প্রকৃতি

৬৪.৪ গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা

৬৪.৪.১ গড় ভোগ প্রবণতার পরিমাপ

৬৪.৪.২ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাপ

৬৪.৫ সঞ্চয় আপেক্ষক

৬৪.৫.১ গড় সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা

৬৪.৬ ভোগব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

৬৪.৭ জাতীয় আয় নির্ধারণের সরল কেইন্‌সীয় তত্ত্ব

৬৪.৮ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় নির্ধারণ

৬৪.৯ মিতব্যয়িতার গুণক তত্ত্ব

৬৪.১০ কেইন্‌সীয় গুণক তত্ত্ব

৬৪.১০.১ গুণক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

৬৪.১১ অনুশীলনী

৬৪.১ উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে—

- ভোগ অপেক্ষকের সংজ্ঞা
- আয়ের পরিবর্তন কীভাবে ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে
- ভোগব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ কি কি
- ভোগব্যয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে কীভাবে জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়
- কেইন্‌সীয় গুণক তত্ত্ব কাকে বলে।

৬৪.২ প্রস্তাবনা

সমষ্টিগত অর্থনীতিতে অন্যতম আলোচ্য বিষয় ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ লর্ড কেইন্‌সের ভোগতত্ত্ব জাতীয় আয় নির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেইন্‌সের আগে সমষ্টিগত অর্থনীতিতে ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বের মাধ্যমে অর্থনীতির সামগ্রিক কাজকর্ম ব্যাখ্যা করা হ'ত। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানই চাহিদার সৃষ্টি করে। যোগান বাড়ার অর্থ নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়া; নিয়োগ বাড়লে পরিবারগুলির আয় বাড়বে অর্থাৎ চাহিদা বাড়বে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে পারবে। ক্ল্যাসিকাল তত্ত্বে অর্থনৈতিক মন্দার হাওয়া সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে দেয়। উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকে। মানুষের ক্রয় করবার ক্ষমতা ভীষণভাবে হ্রাস পায়। এই পরিস্থিতির ব্যাখ্যা করেন কেইন্‌স তাঁর ভোগতত্ত্বে (Consumption Function) মাধ্যমে।

কেইন্‌সের মতে, সাধারণত ভোগব্যয় নির্ভর করে আয়স্তরের ওপর। ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করতেন, ভোগ ও সঞ্চয় সুদের হারের ওপর নির্ভরশীল। সুদের হার বেশি হলে লোকে সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়। ভোগ কমে যায়। সুদের হার কমলে সঞ্চয় কমে ও ভোগ বাড়ে। কেইন্‌স দেখলেন, ভোগের সঙ্গে আয়ের সম্পর্ক বেশি ঘনিষ্ঠ। আয় বাড়লে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। কাজেই ভোগব্যয় বাড়ে। এর ফলে অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে। ফলে, প্রয়োজন হয় সামগ্রিক যোগান বৃদ্ধির। তখনই দেশের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

৬৪.৩ ভোগ অপেক্ষকের সংজ্ঞা

দেশের সমগ্র জনসাধারণের মোট ভোগব্যয় ও জাতীয় আয়ের মধ্যে সম্পর্ককে একটি অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। একেই ভোগ অপেক্ষক বলে। মোট ভোগব্যয়, মোট আয় ছাড়াও সম্পত্তির পরিমাণ, সুদের হার, আয়ের বন্টন প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে। সম্পত্তির পরিমাণ বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে, সুদের হার বাড়লে মানুষ সঞ্চয় করতে উৎসাহী হবে। অতএব ভোগব্যয় কমবে। আয়ের সুফল বন্টন হলে দেশের অধিকাংশ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে। ভোগব্যয় বাড়বে। এইভাবে দেশের সামগ্রিক ভোগব্যয়ের সঙ্গে ভোগব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়গুলির যে গাণিতিক সম্পর্ক বিদ্যমান তাকেই ভোগ-অপেক্ষক বলে। কিন্তু ভোগ-অপেক্ষকের এই সাধারণ রূপটি এক বিশেষ আকারে প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়। দেশের আয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়গুলি স্থির আছে ধরলে, দেখা যায়, মোট ভোগব্যয় মোট আয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে, অর্থাৎ $C = C(Y)$। এখানে C বলতে পরিকল্পিত ভোগব্যয় এবং Y বলতে প্রত্যাশিত আয়কেই বোঝায়।

৬৪.৩.১ ভোগরেখা ও তার আকৃতি

আয় এবং ভোগব্যয়ের মধ্যে সম্পর্ক ধনাত্মক। আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে। আয় কমলে ভোগব্যয় কমবে। পাশের রেখাচিত্রে ভোগরেখা অঙ্কিত হল। এটি একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা। এখানে অনুভূমিক অক্ষে জাতীয় আয় ও উল্লম্ব অক্ষে পরিকল্পিত ভোগব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে।

মূলবিন্দুতে জাতীয় আয় শূন্য হলেও ভোগব্যয় OC। ভোগব্যয় শূন্য হওয়া সম্ভব নয়। তাহলে ভোগকারীদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। OC হল স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়। আয় যখন OY_1, মোট ভোগব্যয় OC_1। আয় বেড়ে OY_2 হলে মোট ভোগব্যয় বেড়ে OC_2 হবে। C_1C_2 = মোট ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি QR, Y_1Y_2 = আয়ের বৃদ্ধি। $y_1y_2 = PQ > QR = C_1C_2$ অর্থাৎ আয়ের তুলনায় ভোগব্যয় কম বাড়ে।

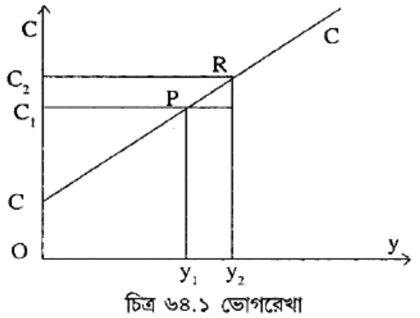

চিত্র ৬৪.১ ভোগরেখা

৬৪.৪ গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তির ভোগ প্রবণতা

ভোগ অপেক্ষক C = C(Y) থেকে আমরা দুটি ধারণা পেতে পারি—গড় ভোগ প্রবণতা এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। ভোগ করার ইচ্ছেকেই ভোগ প্রবণতা বলা হয়। মোট ভোগব্যয়কে মোট আয় দিয়ে ভাগ করলে প্রতি একক আয় থেকে উদ্ভূত ভোগব্যয়ের যে হিসেব পাওয়া যায় তাকে গড় ভোগ প্রবণতা (Average propensity to consume) বলে। যদি c = মোট ভোগ ব্যয় এবং y = মোট আয় হয় তবে গড় ভোগ প্রবণতা $\frac{c}{y}$ কোনো দেশের ভোগব্যয় যদি ৫০০০ কোটি টাকা হয় এবং আয় ১০,০০০ কোটি টাকা হয় তবে,

$$\frac{c}{y} = \frac{\text{৫০০০ কোটি টাকা}}{\text{১০০০০ কোটি টাকা}} = \frac{১}{২}$$

গড় ভোগ প্রবণতা একটি বিশুদ্ধ সংখ্যা।

ভোগ অপেক্ষক থেকে দেখা যায় যে, সম্ভাব্য আয়ের পরিবর্তনের ফলে ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হয়। যদি আয়ের পরিবর্তনকে বড় Δy দিয়ে সূচিত করা হয় এবং উদ্ভূত ভোগব্যয়ের পরিবর্তনকে Δc দিয়ে সূচিত করা হয় তবে

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা = $\frac{\Delta c}{\Delta y}$

অতএব, অতিরিক্ত এক একক সম্ভাব্য আয়ের পরিবর্তন উদ্ভূত ভোগব্যয়ের যে পরিবর্তন আশা করা যায়, তাই হ'ল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা (Marginal propensity to consume)।

ধরা যাক। দেশের পরিবারগুলির আয় ৫০০ কোটি টাকা বাড়ল এবং ভোগব্যয় ৩০০ কোটি টাকা বাড়লে তবে

$$\frac{\Delta c}{\Delta y} = \frac{\text{৩০০ কোটি টাকা}}{\text{৫০০ কোটি টাকা}} = \frac{৩}{৫}$$

৬৪.৪.১ গড় ভোগ প্রবণতার পরিমাপ

ভোগ রেখার কোনও বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করতে হ'লে সে বিন্দু থেকে মূলবিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কন করতে হবে, সেই সরলরেখার ঢালই সেই বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা। পাশের রেখাচিত্রে cc' একটি ভোগ রেখা। এই ভোগ রেখার ওপর A ও B' দুটি বিন্দু। A বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের উপর AM লম্ব টানলাম। A বিন্দুতে আয় OM এবং ভোগব্যয় AM। সুতরাং $\frac{c}{y} = \frac{AM}{OM}$ বা OA সরলরেখার ঢালের সমান।

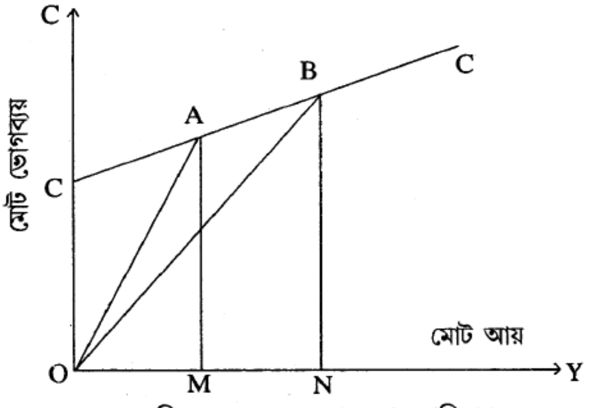

চিত্র ৬৪.২ ভোগ প্রবণতার পরিমাণ

অনুরূপভাবে বলা যায় B বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা $\frac{BN}{ON}$ বা OB সরলরেখার ঢালের সমান। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে OB সরলরেখার ঢাল সরলরেখার ঢালের থেকে কম। অর্থাৎ, B বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা A বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা থেকে কম।

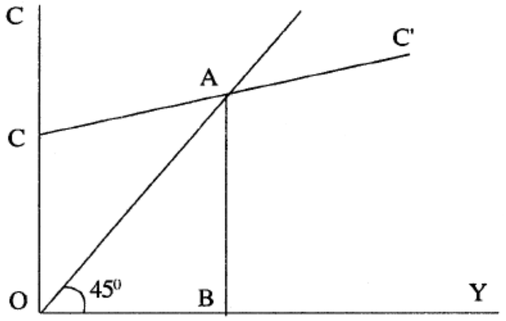

চিত্র ৬৪.৩ গড় ভোগ প্রবণতা এককের

পাশের রেখাচিত্রে ভোগ অপেক্ষকটি একটি উর্ধ্বমুখী সরলরেখা এবং এটি ৪৫° কোণ করা। রেখাটিকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। A বিন্দুতে $\frac{c}{y}=\frac{OB}{AB}=$ ১।

অর্থাৎ, A বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতার মান একের সমান।

A বিন্দুর বাঁদিকে ভোগব্যয় আয় অপেক্ষা বেশি। সুতরাং গড় ভোগ প্রবণতা এককের বেশি। A বিন্দুর ডানদিকে $\frac{c}{y}$ এককের কম। যদি $y = 0$ এবং c ধনাত্মক হয় তবে গড় প্রবণতা অসীম হবে। তবে, বাস্তবে গড় ভোগ প্রবণতা একের চেয়ে বেশি বা কম হবে। cc' রেখা থেকে দেখা যাচ্ছে ভোগরেখাকে বামদিক থেকে ডানদিকে যত যাওয়া যায় তত গড় ভোগ প্রবণতা কমবে।

৬৪.৪.২ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাপ

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ভোগ রেখার ঢাল। যদি ভোগরেখা একটি সরলরেখা হয় তবে তার ঢাল সব বিন্দুতেই সমান। সেক্ষেত্রে ভোগরেখার ঢালই প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা। কিন্তু ভোগরেখাটি যদি একটি বক্ররেখা হয় তবে বক্ররেখার ঢাল এক এক বিন্দুতে এক এক রকমের হবে। ভোগরেখার কোনও বিন্দুতে ঢাল সেই বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের ঢালের সমান হবে। সুতরাং, যে বিন্দুতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করতে হবে সেই বিন্দুতে একটি স্পর্শক টানলে সেই স্পর্শকের ঢাল যা ঢাল সেটিই হবে ঐ বিন্দুতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সমান।

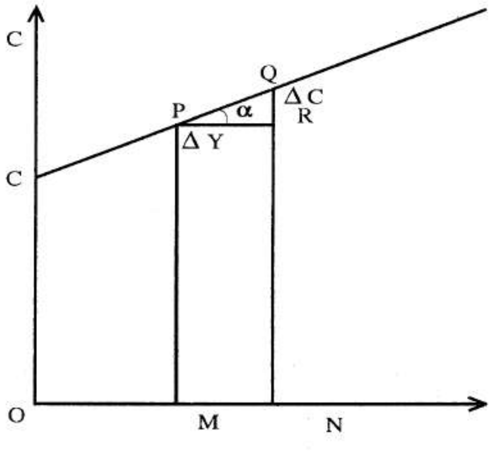

চিত্র ৬৪.৩ গড় ভোগ প্রবণতা এককের $\frac{C'}{Y}$

পাশের রেখাচিত্রে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাপ দেখানো হল। cc' একটি সরলরেখা। এর ওপর P ও Q যে কোনও দুটি বিন্দু। P বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের ওপর PM লম্ব টানা হল। Q বিন্দু থেকে অনুভূমিক অক্ষের ওপর QN লম্ব টানা হল। P বিন্দু থেকে Q বিন্দুতে আয়ের পরিবর্তন PR ও ভোগের ব্যয়ের পরিবর্তন QR। সুতরাং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $=\frac{QR}{PR}=cc'$ সরলরেখার ঢাল। যদি $\angle QPR$ কোণটিকে α দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তবে $\frac{QR}{PR}=\tan\alpha$, এখন cc' সরলরেখার যে কোনও বিন্দুতেই ঢালের মান একই হবে।

∴ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা $= \frac{\Delta c}{\Delta y} = \frac{dc}{dy}$

এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে—

১. যদি $\Delta c = 0$ হয় তাহলে MPc = 0 হবে।

২. যদি $\Delta c = \Delta y$ তবে MPC 0 মান এককের সমান হবে।

৩. যদি $\Delta c > \Delta y$ হয় তবে MPC 0 মান এককের চেয়ে বেশি হবে। কিন্তু ভোগের পরিবর্তন কখনোই আয়ের পরিবর্তনের থেকে বেশি হতে পারে না।

৪. যদি $\Delta c < 0$ (ঋণাত্মক) হয় তবে MPc < 0 হবে। কিন্তু ঋণাত্মক ভোগের কোন অর্থ হয় না।

৫. যদি $\Delta c < \Delta y$ হলে MPC 0 মান এককের কম হবে। ভোগের পরিবর্তন আয়ের পরিবর্তনের থেকে কমই হবে।

৬. সাধারণত, কেইনসের মতে, MPC-র মান শূন্য অপেক্ষা বেশি ও এক অপেক্ষা কম হয়।

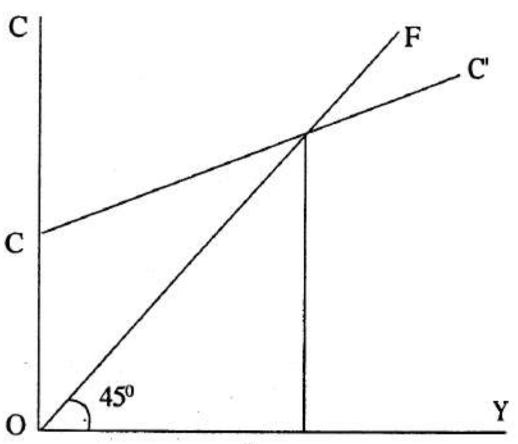

চিত্র ৬৪.৫

রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে OF একটি ৪৫° কোণ বিশিষ্ট রেখা। OF রেখার ঢাল এককের সমান। OF রেখার সঙ্গে তুলনা করে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। cc' রেখার ঢাল একের চেয়ে কম বলে এই রেখাটি ৪৫° রেখাকে বাঁদিক থেকে এবং ওপর দিক থেকে ছেদ করেছে। cc' রেখার প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা মান এককের সমান হয় তবে OFই হবে ভোগরেখা। যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূন্য হয় তবে cc' রেখাটি x অক্ষের সমান্তরাল হবে।

যদি প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান এককের বেশি হয় তবে cc' রেখাটি ডানদিক থেকে ও নীচের দিক থেকে OF রেখাকে ছেদ করবে।

ভোগরেখা বক্ররেখাও হতে পারে। তবে কোন বিন্দুতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করতে হলে সেখানে একটি স্পর্শক টানতে হবে। ভোগ অপেক্ষকের ঢাল স্পর্শকের ঢালের সমান হবে। রেখাচিত্রে P ও Q বিন্দুতে দুটি স্পর্শক অঙ্কন করা হয়েছে। এইভাবে ভোগরেখাটি সরলরেখাই হোক অথবা বক্ররেখাই হোক তার কোন বিন্দুতে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করা যায়।

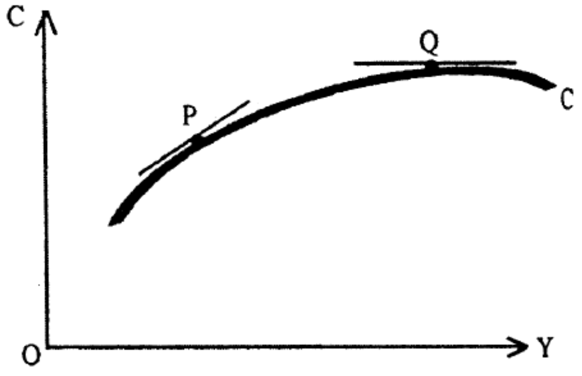

চিত্র ৬৪.৫ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার পরিমাপ

সমীকরণের সাহায্যেও ভোগ অপেক্ষককে প্রকাশ করা যেতে পারে। ধরা যাচ্ছে $c = a + by$ ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ। a ভোগ অপেক্ষকের উল্লম্ব অক্ষ থেকে ছেদিতাংশ এবং b ঢাল। যেহেতু ছেদিতাংশ ধনাত্মক ও ঢাল শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু একের চেয়ে কম, $a > 0$, $0 < b < 1$ হবে।

এখন c = a + by সমীকরণ থেকে গড় ভোগ প্রবণতা নির্ণয় করা যায়।

$$\frac{c}{y}=\frac{a}{y}+b$$

y যত বাড়বে $\frac{c}{y}$ তত কমবে। a ও b-র মান স্থির, অর্থাৎ জাতীয় আয় যত বাড়বে গড় ভোগ প্রবণতা তত কমবে।

আবার c = a + by সমীকরণটিকে অবকলন করে পাই $\frac{dc}{dy}=b$ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা b-এর সমান।

আমরা জানি, $\frac{c}{y}=\frac{a}{y}+b$

বা, $\frac{c}{y}=\frac{a}{y}+\frac{dc}{dy}$

a-র মান ধনাত্মক। সুতরাং, $\frac{c}{y}>\frac{dc}{dy}$, সুতরাং ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ c = a + by ধরনের হলে, গন ভোগ প্রবণতা, প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার থেকে বেশি হবে।

৬৪.৫ সঞ্চয় আপেক্ষক

মোট আয়ের যে অংশটি ভোগদ্রব্য ক্রয় করার কাজে ব্যয় করা হয় না তাকেই সঞ্চয় বলে। যদি ভোগব্যয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল হয় তবে সঞ্চয়ও আয়ের ওপর নির্ভরশীল হবে। সঞ্চয় অপেক্ষককে S = S (y) আকারে প্রকাশ করা যায়। এই অপেক্ষক থেকে জানা যায় প্রত্যাশিত আয় কত হ'লে পরিকল্পিত সঞ্চয় কত হবে। ভোগ অপেক্ষক থেকেই অপেক্ষককে নির্ণয় করা যায়। আমরা জানি,

y = c + s

অর্থাৎ প্রত্যাশিত আয়, পরিকল্পিত সঞ্চয় পরিকল্পিত ভোগব্যয়ের যোগফলের সমান।

S = y – c

সঞ্চয় রেখাও ভোগরেখা থেকেই অঙ্কন করা যায়। রেখাচিত্রে OF হল ৪৫° কোন বিশিষ্ট রেখা। এই রেখার ওপর প্রত্যেক বিন্দুর অনুভূমিক ও উল্লম্ব দূরত্ব সমান। cc' হল ভোগরেখা। ভোগরেখা থেকে জানা যায় যখন y = 0 তখন ভোগ = OC অর্থাৎ সঞ্চয় = –OC।

আয় যখন শূন্য তখন ভোগব্যয় ধনাত্মক হলে সঞ্চয় ঋণাত্মক হবে। পরিবারগুলি পূর্ব সঞ্চয় থেকে ভোগ করবে। রেখাচিত্রে দেখা যাচ্ছে, OC=OS। S বিন্দুটি মূলবিন্দুর নীচে আছে বলে এখানে সঞ্চয় ঋণাত্মক হবে। কোনও নির্দিষ্ট আয়স্তরে ৪৫° রেখা

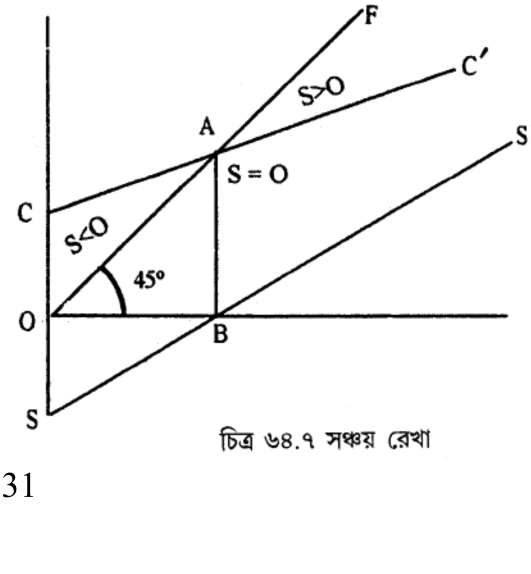

চিত্র ৬৪.৭ সঞ্চয় রেখা

এবং ভোগরেখার মধ্যে যে উল্লম্ব দূরত্বগুলি আছে সেই দূরত্বগুলিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করলে SS' সঞ্চয় রেখাটি পাওয়া যায়। cc' ভোগরেখা OF রেখাটিকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। এখানে আয় OB এবং ভোগব্যয় AB_1OB = AB অর্থাৎ A বিন্দুতে সঞ্চয় শূন্য। অতএব OB আয় স্তরে শূন্য। B বিন্দুতে সঞ্চয়রেখা অনুভূমিক অক্ষকে ছেদ করেছে। B বিন্দুর বাঁদিকে আয়ের থেকে ভোগব্যয় বেশি। সুতরাং সঞ্চয় ঋণাত্মক। B বিন্দুর ডানদিকে আগের চেয়ে ভোগব্যয় কম। সুতরাং সঞ্চয় ধনাত্মক। রেখাচিত্র দেখা যাচ্ছে OAC অংশে সঞ্চয় ঋণাত্মক। OBS অংশ OAC অংশের প্রতিবিম্ব হওয়ায় OBS অংশে সঞ্চয় ঋণাত্মক। আবার B বিন্দুর ডানদিকে FAC' অংশে সঞ্চয় ধনাত্মক। SBY' অংশের সঞ্চয় ধনাত্মক। S'BY অংশে FAC' অংশের প্রতিবিম্ব।

৬৫.৫.১ গড় সঞ্চয় প্রবণতা এবং প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা

গড় সঞ্চয় প্রবণতার অর্থ একক কিছু সম্ভাব্য আয়ের অনুপাতে সঞ্চয়ের পরিমাণ। কোনও দেশের পরিবারগুলির সম্ভাব্য আয় যদি ৫০,০০০ কোটি টাকা হয় এবং তার পরিবারগুলি যদি ১০,০০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করে তবে

গড় সঞ্চয় প্রবণতা $= \frac{\text{১০,০০০ কোটি টাকা}}{\text{৫০,০০০ কোটি টাকা}} = \frac{\text{১}}{\text{৫}}$

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার অর্থ বাড়তি আয়ের কতটা অনুপাত বাড়তি সঞ্চয় হচ্ছে। কোনও দেশের আয় যদি ১০,০০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় এবং তার থেকে পরিবারগুলি যদি ২০০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করে তবে

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা $= \frac{\text{২০০০}}{\text{১০০০০}} = \frac{\text{১}}{\text{৫}}$

গড় সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক প্রবণতা দুইই বিশুদ্ধ সংখ্যা।

গড় সঞ্চয় প্রবণতা এবং গড় ভোগ প্রবণতার যোগফল এককের সমান।

যেহেতু মোট আয়, মোট ভোগব্যয় ও মোট সঞ্চয়ের মধ্যে বন্টিত হয়, সুতরাং $y = c + s$

এখন উভয় পক্ষকে y দ্বারা ভাগ করে পাই বা, $1 = \frac{c}{y} + \frac{S}{y}$

বা গড় ভোগ প্রবণতা + গড় সঞ্চয় প্রবণতা = ১

গড় ভোগ প্রবণতা এবং গড় সঞ্চয় প্রবণতা একে অপরের পরিপূরক। গড় ভোগ প্রবণতা যদি বাড়ে, গড় সঞ্চয় প্রবণতা কমবে। আবার গড় সঞ্চয় প্রবণতা যদি বাড়ে গড় ভোগ প্রবণতা কমবে।

প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যোগফলও এককের সমান।

$y = c + s$

উভয়পক্ষকে y র সাপেক্ষে অবকলন করে পা—

$$1 = \frac{dc}{dy} + \frac{ds}{dy}$$

বা, $\frac{dc}{dy} = 1 - \frac{ds}{dy}$

অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা = 1– প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা। যেহেতু প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এককের কম, তাই প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতাও এককের কম হবে।

সঞ্চয় রেখার ওপর কোনও বিন্দুতে গড় সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা পরিমাপ করা যায়। সঞ্চয় রেখার ওপর কোনও বিন্দুতে গড় সঞ্চয় প্রবণতা হবে সেই বিন্দুর সঙ্গে মূলবিন্দু যোগ করলে যে সরলরেখাটি পাওয়া যায় সেই সরলরেখার ঢালের মান।

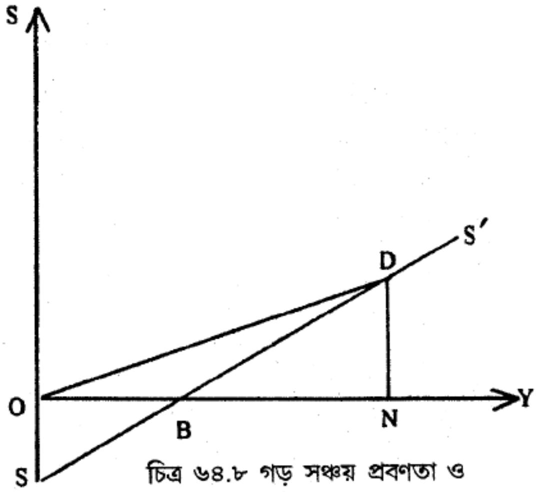

চিত্র ৬৪.৮ গড় সঞ্চয় প্রবণতা ও প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার পরিমাপ

ধরা যাক্, সরলেখার D একটি বিন্দু। D বিন্দুতে গড় সঞ্চয় প্রবণতা পরিমাপ করতে হ'লে D বিন্দু থেকে মূলবিন্দু পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কন করতে হবে। OD সরলরেখার ঢাল D বিন্দুতে গড় সঞ্চয় প্রবণতার সমান অর্থাৎ $\frac{DN}{ON}$ অন্যদিকে যেহেতু সঞ্চয় রেখাটি একটি সরলরেখা, তাই এর ঢাল প্রতিবিন্দুতে একই হবে। এই সঞ্চয়রেখার ঢালই প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা।

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা $\frac{DN}{BN}$

$\frac{DN}{BN} > \frac{DN}{ON}$

প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা গড় সঞ্চয় প্রবণতা অপেক্ষা বেশি। গড় সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ছে।

সমীকরণের মাধ্যমেও সঞ্চয় অপেক্ষককে প্রকাশ করা যায়। ধরা যাক্, ভোগরেখার সমীকরণ $c = a + by$ সুতরাং $S = y - c$

$$= y - a - by$$
$$= (1 - b)y - a$$
$$= -a + (1 - b)y$$

এই সরলরেখার ছেদিতাংশ $-a$ এবং ঢাল $(1 - b)$

সুতরাং এই ছেদিতাংশ $-a$ ঋণাত্মক। সঞ্চয় রেখার ঢাল শূণ্যের বেশি কিন্তু এককের কম।

আবার সঞ্চয় অপেক্ষকের সমীকরণ থেকে পাই—

$$S = -a + (1 - b)y$$

অথবা, $\frac{S}{y} = -\frac{a}{y} + (1 - b)$

$$= -\frac{a}{y} + \frac{ds}{dy}$$

$$\frac{s}{y} < \frac{ds}{dy}$$

এই সঞ্চয় অপেক্ষকের ক্ষেত্রে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা গড় সঞ্চয় প্রবণতার থেকে বেশি।

৬৪.৬ ভোগ ব্যয় নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

দেশের মোট ভোগব্যয় জাতীয় আয় ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। সেই বিষয়গুলিকে আমরা দু'ভাবে ভাগ করতে পারি। কতকগুলি বিষয়কে বলা যায় ব্যক্তিগত বিষয় আর কতকগুলি বস্তুগত বিষয়।

প্রথমে আমরা ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করব। ব্যক্তি বা পরিবারগুলি তাদের আয় থেকে ভোগব্যয় করে এবং সঞ্চয় করে। ভোগ করা হয় বর্তমান, তৃপ্তির জন্য আর সঞ্চয় করা ভবিষ্যতের সুরক্ষার জন্য। অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে, যে ব্যক্তি যত বেশি সতর্ক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, হিসেবী, উদ্যোগী, অহংকারী, স্বাধীন মনোভাবাপন্ন সে তত বেশী সঞ্চয়ী, অন্যদিকে যে ব্যক্তি শুধু বর্তমানই বেশি সুখ ভোগ করতে চায় তার প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশি হয়।

ভোগকারীদের আশা-আকাঙ্খা সংক্রান্ত বিষয়গুলিও ভোগ প্রবণতা নির্ধারণ করে। যদি ভোগকারীরা মনে করে যে ভবিষ্যতে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে তবে বর্তমানে তাদের ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে। আবার যদি ভোগকারীরা মনে করে যে ভবিষ্যতে দাম কমবে তবে বর্তমানে ভোগব্যয় হ্রাস পাবে। সরকারের কর সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তনের মাধ্যমেও ভোগপ্রবণতা হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভব। সরকার যদি প্রত্যক্ষ কর কমিয়ে দেয় তবে ভোগপ্রবণতা বাড়বে আবার পরোক্ষকর বাড়িয়ে দিলে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে, এবং ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমবে। যুদ্ধের সময় অথবা জরুরি অবস্থার সময় লোকে ভাবে যে জিনিসপত্রের যোগান কম হবে। সুতরাং ভোগপ্রবণতা বেড়ে যায়। মন্দার সময় লোকের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তখন ভোগব্যয় কমে যাবে।

যে বস্তুগত বিষয়গুলি ভোগব্যয়কে প্রভাবিত করে সেগুলি হ'ল সুদের হার, সম্পদের পরিমাণ, অর্থের পরিমাণ, বিজ্ঞাপন ব্যয়, ঋণের শর্ত প্রভৃতি।

সুদের হার ঃ সুদ হল সঞ্চয়ের পুরস্কার। সুদের হার বাড়লে লোকে ভোগব্যয় কমিয়ে বেশি সঞ্চয় করতে উৎসাহী হবে। কেইন্‌সের আগে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে, সঞ্চয় ও ভোগব্যয় প্রধানত সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। কেইন্‌স কিন্তু সুদের হারকে গুরত্ব দেননি। কেইন্‌সের মতে, ভোগব্যয় নির্ধারণে প্রধান গুরুত্ব বিষয় আয়, সুদের হার নয়।

মোট সম্পদ ঃ বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ পিগুর মতে, অন্যান্য সব বিষয় অপরিবর্তিত থাকলে কোনও ব্যক্তির হাতে সম্পদের পরিমাণ যত বাড়বে তত ভোগব্যয় বাড়বে। সম্পদের বাস্তবমূল্যের উপরেই ভোগব্যয় নির্ভর করে। যদি দামস্তর কম থাকে তবে সম্পদের বাস্তব মূল্য বাড়ে এবং ভোগব্যয়ও বাড়ে। আর দামস্তর বেশি হ'ল সম্পদের বাস্তবমূল্য কমে এবং ভোগব্যয়ও কমে। অধ্যাপক পিগু সম্পদের সঙ্গে ভোগব্যয়ের এই সম্পর্কটি উল্লেখ করেছিলেন বলে একে পিগু প্রভাব বলা হয়।

মোট সম্পদের একটি অংশ জনসাধারণ অর্থের আকারেও রাখে। অর্থের প্রকৃত মূল্যের উপর জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা নির্ভর করে, অর্থের পরিমাণ একই থাকা অবস্থায় যদি দামস্তর বাড়ে তবে ভোগব্যয় কমবে আর দামস্তর কমলে ভোগব্যয় বাড়বে।

বিজ্ঞাপন ব্যয় ঃ আধুনিক যুগে দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপনের এক বিশেষ ভূমিকা আছে। সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে দ্রব্য বাজারে আসার আগেই তার খবরাখবর

ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। ক্রেতাকে দ্রব্যটি ক্রয় করবার জন্য প্রলুব্ধ করা হয়। তাই ধরে নেওয়া যায় যে, বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ বাড়লে ক্রেতার ভোগব্যয় বাড়বে এবং এই খরচ কমলে ভোগব্যয় কমবে।

ভোগ্যদ্রব্য কেনার জন্য ঋণের শর্ত ঃ ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ঋণ নিয়ে অনেক সময় স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করা থাকে। সেই ঋণের শর্ত যদি সহজ হয় তবে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়বে এবং ভোগব্যয়ও বাড়বে।

ব্যক্তিগত ও বস্তুগত বিষয়গুলিও ছাড়াও ভোগব্যয় সমাজের আয় বণ্টন, জনসংখ্যার গঠন, যৌথমূলধনী কোম্পানির ডিভিডেন্ড বন্টন নীতি প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

আয় বন্টন ঃ ধরা যাক সমাজে শুধু দুই শ্রেণীর মানুষ বসবাস করে—শ্রমিক ও মালিক বা পুঁজিপতি। শ্রমিকেরা পান মজুরি আর মালিকেরা মুনাফা, অর্থাৎ মোট আয়কে দু'ভাবে ভাগ করতে পারি—

$Y = W + P$

W = মজুরি P = মুনাফা

এখন মোট আয় যদি স্থির থাকে কিন্তু মজুরি বাড়ে তবে ভোগব্যয়ের পরিবর্তন হবে।

আমরা ধরেই নিতে পারি যে, শ্রমিকদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা মালিক বা পুঁজিপতিদের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার চেয়ে বেশি। সুতরাং মোট আয়ের মধ্যে যদি মজুরির অংশ বৃদ্ধি পায় তবে ভোগব্যয় বাড়বে। একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, দেশের মোট আয় ৫০০ টাকা। তার মধ্যে মোট মজুরি ৩০০ টাকা ও মোট মুনাফা ২০০ টাকা। শ্রমিকেরা যদি তাদের আয়ের ৯০ শতাংশ ভোগ করেন আর মালিকেরা যদি আয়ের অর্ধেক ভোগ করেন তবে সমাজের মোট ভাগ হবে = ২৭০ টাকা + ১০০ টাকা = ৩৭০ টাকা।

এবার মোট আয় স্থির থেকে যদি শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে ৪০০ টাকা হয় তবে মুনাফা কমে গিয়ে ১০০ টাকা হবে। এইক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় হবে = ৩৬০ টাকা + ৫০ টাকা = ৪১০ টাকা; অর্থাৎ মোট ভোগব্যয় বাড়ল।

জনসংখ্যার গঠন ঃ মোট জনসংখ্যা স্থির থাকলেও যদি জনসংখ্যার গঠন পরিবর্তিত হয় তবে মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হবে। উদাহরণ স্বরূপ মোট জনসংখ্যা স্থির থেকে যদি শিশুর সংখ্যা ও বৃদ্ধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তবে ভোগব্যয় বাড়বে। কারণ শিশু ও বৃদ্ধের আয় করে না কিন্তু ভোগ করে।

যৌথ মূলধনী কারবারের ডিভিডেন্ড বন্টন নীতির পরিবর্তন ঃ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ার ক্রেতাদের মধ্যে মুনাফার একাংশ বন্টন করে এবং বাকি অংশ অবন্টিত রাখে ভবিষ্যৎ অর্থের প্রয়োজনে। কোনও নির্দিষ্ট বছরে মোট মুনাফার কতটা বন্টিত হবে সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত নেয়। একেই ডিভিডেন্ট বন্টন নীতি বলা হয়। এখন যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান যদি তার মুনাফার একটি বড় অংশ শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বন্টন করে তবে শেয়ার হোল্ডারদের আয় বাড়বে। ফলে ভোগ ব্যয়ও বাড়বে। আর যদি যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান লভ্যাংশ বন্টনের হার কমিয়ে দেয় তবে শেয়ার হোল্ডারদের আয় কমবে এবং ভোগব্যয়ও কমবে।

৬৪.৭ জাতীয় আয় নির্ধারণের সরল কেইন্‌সী তত্ত্ব

কোনও দেশের জাতীয় আয় যদি এক নির্দিষ্ট স্তরে স্থির থাকে তবে জাতীয় আয়ে ভারসাম্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। এখন দেখা যাক, জাতীয় আয়ে কীভাবে ভারসাম্য আসতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি অনুমান ধরে নেওয়া হচ্ছে।

প্রথমত, দেশে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে। সেই দ্রব্যটি ভোগদ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আবার সেটিই মূলধন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দেশের সমস্ত উপকরণের পূর্ণনিয়োগ হয়নি, অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণ নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়াবার অবকাশ আছে।

তৃতীয়ত, কেইন্‌সীয় ভোগতত্ত্ব অনুসারে মোট ভোগ ব্যয় জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। ধরে নওয়া হচ্ছে, ভোগ অপেক্ষকটি একটি সররেখা। আগের মত ভোগ অপেক্ষকের সমীকরণ—

$c = a + by$

c হল মোট ব্যয়ের পরিমাণ, y জাতীয় আয় এবং a ও b দুটি ধ্রুবক সংখ্যা। b প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, b-র মান শূন্যের বেশি কিন্তু একের কম। a ধ্রুবকটি উল্লম্ব অক্ষ থেকে ভোগরেখার ছেদিতাংশ। a হ'ল স্বয়ম্ভূত ভোগব্যয়।

চতুর্থত, দেশের মোট বিনিয়োগ আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি একটি বিশেষ স্তরে স্থির আছে। অর্থাৎ বিনিয়োগ হল স্বয়ম্ভূত।

পঞ্চমত, দেশটি বৈদেশিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে না, অর্থাৎ বিদেশের সঙ্গে কোনওরকম লেনদেন নেই। দেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা হয় না, আবার বিদেশ থেকে কোনও দ্রব্য সামগ্রী আমদানি করা হয় না।

ষষ্ঠত, দেশের সরকার কোনওরকম অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করে না। সরকারের কোনও আয় ব্যয় নেই।

সপ্তমত, দেশের পরিবারগুলি ভোগ ও সঞ্চয় করে এবং স্বাধীনভাবে ভোগ সংক্রান্ত বা সঞ্চয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অন্যদিকে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন করে এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা সম্ভব। অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে, যখন সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হবে তখনই ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলি কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করে এবং যোগান দেয় সেটিই দ্রব্যের পরিকল্পিত যোগান বা সামগ্রিক যোগান। একে y দ্বারা চিহ্নিত করা যায়।

আবার অনুমান অনুযায়ী দেশে যে দ্রব্যটি উৎপাদিত হচ্ছে সেটি ভাগ করবার জন্য ক্রেতাদের বা পরিবার সমূহের চাহিদা থাকবে। দ্রব্যটি ভোগ করার জন্য ক্রেতাদের মোট ব্যয়কে মোট ভোগব্যয় এবং উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির মোট ব্যয়কে বিনিয়োগ ব্যয় বলা যায়। যদি মোট ভোগব্যয়কে C দ্বারা চিহ্নিত করি এবং মোট বিনিয়োগকে I দ্বারা চিহ্নিত করি তবে দেশের সামগ্রিক চাহিদা $c + I$; এখন ভারসাম্য আয় নির্ধারিত হবে যখন সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হবে, অর্থাৎ $y = c + I$ হবে।

ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধরাণের শর্ত।

ভোগ অপেক্ষককে সমীকরণে মাধ্যমে প্রকাশ করল c = a + by হবে। অন্যদিকে যেহেতু, বিনিয়োগের পরিমাণ সব সময়েই স্থির আছে, সুতরাং I = Io ধরা যেতে পারে। c এবং I-এর মান ভারসাম্য শর্তটিতে বসিয়ে পাই—

$Y = a + by + Io$

অথবা, $(1 - b)y = a + Io$

অথবা $y = \frac{a + Io}{1 - b}$

এটিই ভারসাম্য আয়ের স্তর।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে।

ধরা যাক, ভোগ অপক্ষকের সমীকরণ

$c = 100 + \frac{1}{2}y$

$Io = 200$

$Y = 100 + \frac{1}{2}y + 200 = 300\frac{1}{2}y$

or, $\frac{1}{2}y = 300$ or $y = 600$

অর্থাৎ, ভারসাম্য আয় 600 টাকা। এখন এই আয়কে ভারসাম্য বলা হচ্ছে কেন তা দেখা যাক। ভোগ অপেক্ষক থেকে জানা যায় যে, যদি প্রত্যাশিত আয় 600 টাকা হয় তবে ভোগব্যয়ের পরিমাণ হবে।

$C = 100 + \frac{1}{2} \times 600 = 400$

বিনিয়োগ ব্যয় যেহেতু স্থির তাই উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি পরিকল্পিত বিনিয়োগ ব্যয় 200 টাকা।

মোট ব্যয় = 400 টাকা + 200 টাকা = 600 টাকা

সুতরাং, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি 600 টাকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে তবে পরিকল্পিত যোগান ও চাহিদা পরস্পর সমান হবে। কিন্তু উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি যদি 400 টাকার দ্রব্য উৎপাদন করে তবে পরিকল্পিত যোগান হবে 400 টাকা। পরিকল্পিত আয়ও হবে 400 টাকা। সুতরাং পরিকল্পিত ভোগব্যয় হবে।

$C = 100 + \frac{1}{2} \times 800$

$= 500$

কিন্তু পরিকল্পিত বিনিয়োগ সর্বস্তরেই 200 টাকা

সুতরাং মোট ব্যয় = 500 টাকা + 200 টাকা

= 700 টাকা

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি ৪00 টাকার দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করলে পরিকল্পিত চাহিদা ও পরিকল্পিত যোগান পরস্পর সমান নয়। যোগান এক্ষেত্রে চাহিদার থেকে 100 টাকা বেশি। অনুরূপভাবে যদি পরিকল্পিত যোগানের পরিমাণ 600 টাকার কম হয় তবেও সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান হবে না। একমাত্র 600 টাকা আয়স্তরেই পরিকল্পিত চাহিদা ও যোগান পরস্পর সমান।

রেখাচিত্রের মাধ্যমে ভারসাম্য আয় নির্ধারণ ঃ

রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর ও উলম্ব অক্ষে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় পরিমাপ করা হল। Io রেখাটি বিনিয়োগ ব্যয় রেখা। বিনিয়োগ ব্যয় স্থির। তাই Io রেখাটি অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল। C(y) হ'ল ভোগরেখা। এটিকে একটি সরলরেখা হিসাবে দেখানো হ'ল। এই সরলরেখাটি 45^0 সরলরেখাকে ওপর থেকে ছেদ করছে এবং উল্লম্ব অক্ষে ধনাত্মক দিকে এটির ছেদিতাংশ আছে। এখন ভোগরেখা এবং বিনিয়োগ রেখা যোগ করলে c(y) + Io রেখাটি পাওয়া যাবে। c(y) + Io রেখাটি c(y) রেখার সমান্তরাল। এই দুটি রেখার মধ্যেকার উল্লম্ব দূরত্ব Io-এর সমান। C(Y) + Io রেখাটি সামগ্রিক চাহিদারেখা অন্যদিকে 45^0 রেখাটি সামগ্রিক যোগানরেখা বা পরিকল্পিত যোগানরেখা।

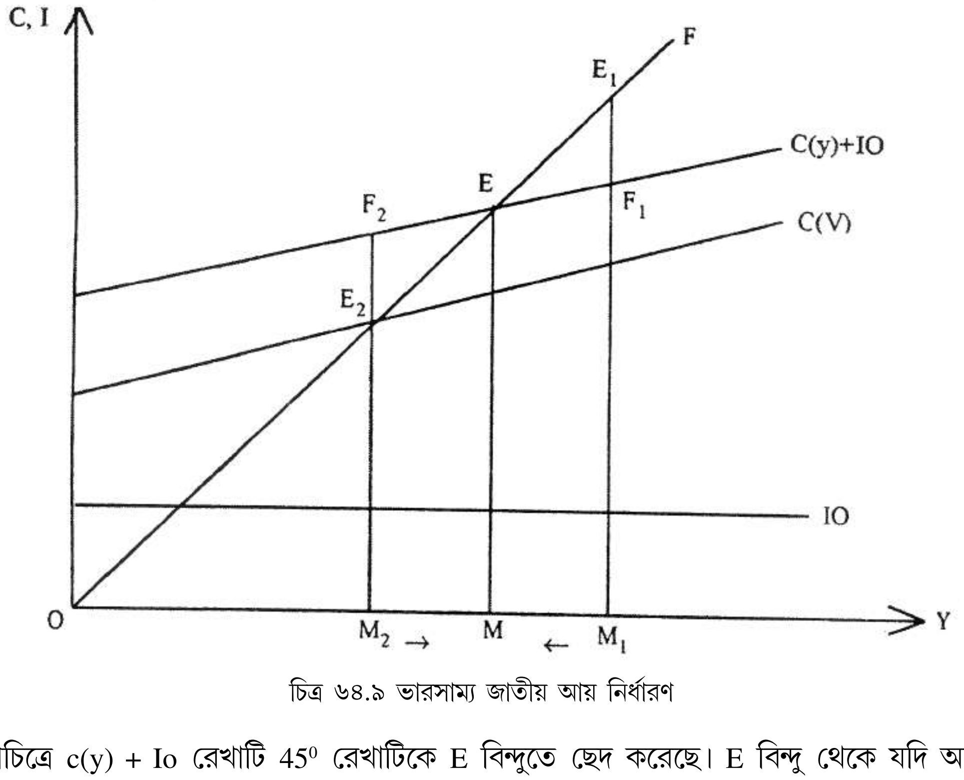

চিত্র ৬৪.৯ ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

রেখাচিত্রে c(y) + Io রেখাটি 45^0 রেখাটিকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। E বিন্দু থেকে যদি অনুভূমিক অক্ষের ওপর EM লম্ব টানা হয় তবে EM = OM হবে। OM ভারসাম্য জাতীয় আয় বা উৎপাদনের পরিমাণ Y = C + I শর্তটি E বিন্দুতে রক্ষিত হচ্ছে। সুতরাং OM আয়স্তরই ভারসাম্য আয়স্তর। C(Y) + Io সরলরেখা এবং 45^0 সরলরেখার ছেদবিন্দু ভারসাম্য বিন্দু।

অন্য কোনও আয়স্তরে যে ভারসাম্য হবে না তাও রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। যেমন OM_1 আয়স্তরে দ্রব্যের পরিকল্পিত যোগান E_1M_1 কিন্তু পরিকল্পিত চাহিদা F_1M_1। E_1F_1 বাড়তি যোগানের পরিমাণ,

উৎপাদকেরা যোগানের পরিমাণ কমাবে। জাতীয় আয়ও কমবে। আবার OM_2 আয়স্তরে পরিকল্পিত চাহিদার পরিমাণ F_2M_2 কিন্তু পরিকল্পিত যোগান E_2M_2 বাড়তি চাহিদা F_2M_2। অপরিকল্পিত মজুত ভাণ্ডার ঋণাত্মক হবার জন্য উৎপাদকেরা উৎপাদন বাড়াতে চাইবে। ফলে উৎপাদন বাড়বে। একমাত্র OM আয়স্তরেই ভারসাম্য আয়স্তর কারণ এখানে পরিকল্পিত চাহিদা ও যোগান সমান হচ্ছে।

ভারসাম্য আয়ের স্তর স্থায়ী বা অস্থায়ী হতে পারে। ভারসাম্য স্থায়ী হবে তখনই যখন ভারসাম্য থেকে একবার বিচ্যুত হলে আবার ভারসাম্যে ফিরে আসা সম্ভব হবে। যদি c(y) + Io রেখাটি 45^0 রেখাকে ওপর দিক থেকে ছেদ করে তবে যে ভারসাম্য বিন্দু পাওয়া যায় সেটি স্থায়ী ভারসাম্য বিন্দু। রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি OM_1 দ্রব্য উৎপাদন করলে বাড়তি যোগান থেকে যাচ্ছে। এই অবিক্রীত দ্রব্য সংরক্ষণ করতে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ব্যয় বেশি হবে। দ্রব্য পচনশীল হ'লে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন কমবে। আয়স্তরে OM হলে সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান সমান হবে। সম্পূর্ণ উৎপাদন বিক্রি করা সম্ভব হবে। অনুরূপভাবে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি OM_2 পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করলে উৎপাদনের তুলনায় ক্রেতাদের চাহিদা বেশি হচ্ছে। বাড়তি চাহিদার জন্য উৎপাদন বাড়বে। দ্রব্য উৎপাদন OM স্তরে এসে স্থির হবে। এখানেই স্থায়ী ভারসাম্য হবে। ভারসাম্য স্থায়ী হ'তে হ'লে ভোগ অপেক্ষকের ঢাল 1 অপেক্ষা কম হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু 1 অপেক্ষা কম হবে। তবেই ভোগরেখা 45^0 সরলরেখাকে ওপর দিক থেকে ছেদ করবে।

অন্যদিকে যদি ভোগরেখা নীচের দিক থেকে 45^0 রেখাকে ছেদ করে অর্থাৎ প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান 1-এর বেশি হয় তবে যে ভারসাম্য বিন্দু পাওয়া যাবে সেটি হবে অস্থায়ী ভারসাম্য বিন্দু। সেক্ষেত্রে কোনও সময় আয়স্তর যদি ভারসাম্য আয়স্তর অপেক্ষা বেশি হয় তবে আয়স্তর ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

আবার আয়স্তর যদি ভারসাম্য আয়স্তর অপেক্ষা কম হয় তবে আয়স্তর ক্রমাগত কমতেই থাকবে। অতএব ভারসাম্য বিন্দু হ'তে আয়স্তরের একবার বিচ্যুতি ঘটলে ঐ পুরাতন আয়স্তরে অর্থনীতি ফিরে আসবে না। পাশের রেখাচিত্রে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হ'ল। রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে y এবং উল্লম্ব অক্ষে c ও I কে পরিমাপ করা হচ্ছে। রেখাচিত্রে c(y) + Io রেখাটি ৪৫° রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করেছে। E বিন্দুটি ভারসাম্য বিন্দু OM ভারসাম্য আয়স্তর। এই আয়স্তরে OM = EM অর্থাৎ Y = c + I শর্তটি পালিত হচ্ছে। কিন্তু ভারসাম্য অস্থায়ী। ধরা যাক, আয়স্তর হচ্ছে OM_1, $OM_1 > OM$. OM_1 আয়স্তরে চাহিদার পরিমাণ E_1M_1 কিন্তু যোগান F_1M_1। E_1F_1 বাড়তি চাহিদা মেটাবার জন্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি আরও দ্রব্য যোগান দেবে। আবার OM_2 আয়স্তরে যোগানের পরিমাণ F_2M_2 কিন্তু চাহিদা E_2M_2 বাড়তি যোগানের জন্য উৎপাদন কমতেই থাকবে। এর ফলে আয়স্তরে OM_2 থেকে আরও কমে যাবে। অর্থাৎ C(y) + Io রেখাটি যদি ৪৫° রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করে তবে c(y) + Io রেখাটির ঢাল 1 অপেক্ষা বেশি হবে। অতএব স্থায়ী ভারসাম্যের শর্ত হ'ল প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার মান 1 অপেক্ষা কম হবে।

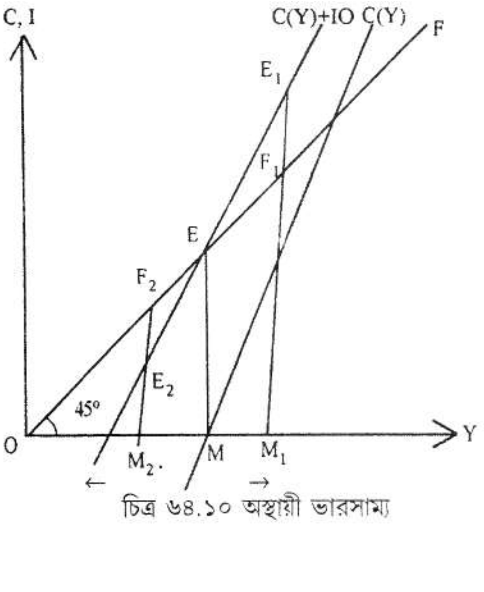

চিত্র ৬৪.১০ অস্থায়ী ভারসাম্য

৬৪.৮ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের মাধ্যমেও ভারসাম্য আয়স্তর নির্ধারণ সম্ভব। আমরা জানি সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগান যেখানে সমান হয় সেখানেই আয়স্তরে ভারসাম্য আসে। সামগ্রিক চাহিদা বলতে মোট ভোগব্যয় ও মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফলকে বোঝায়। সামগ্রিক যোগান বলতে দ্রব্যের মোট উৎপাদনকে বোঝায়। যদি উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণকে y আর ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফলকে c+I দ্বারা চিহ্নিত করা যায় তবে $Y = c + I$ ভারসাম্য জাতীয় আয়ের শর্ত। এখন সংজ্ঞানুযায়ী আয়, ভোগ ও সঞ্চয়ের যোগফলের সমান। $Y = c + s$ অর্থাৎ $Y = c + 1$ কে $y - c = I$ or $s = I$ হিসাবেও প্রকাশ করা সম্ভব, কিন্তু সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় দু'টি পৃথক গোষ্ঠী। সঞ্চয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিবারগুলি বা ক্রেতারা। অন্যদিকে, বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় দু'টি পৃথক গোষ্ঠী। সঞ্চয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরিবারগুলি বা ক্রেতারা। অন্যদিকে, বিনিয়োগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয় উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি। কাজেই পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ যে পরস্পর সমান হবে এ রকম কোনও নিশ্চয়তা নেই। কোনও এক সময়ে পরিবারগুলির যা সঞ্চয় তা যদি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের সমান হয় তবেই আয়স্তরে ভারসাম্য আসবে। যদি সঞ্চয় বিনিয়োগের থেকে বেশি হয় অর্থাৎ $s > I$ হয় তবে $y - c > Iy > c + I$ হবে। সামগ্রিক যোগান চাহিদার থেকে বেশি হবে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী বাজারে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং, উৎপাদন কমে যাবে এবং ফলে আয়স্তরও কমবে। অন্যদিকে যদি $s < I$ হয় তবে $y < c + I$ হবে, সামগ্রিক যোগান চাহিদার থেকে কম হবে। এর অর্থ হ'ল যে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী যোগান দিতে ইচ্ছুক ক্রেতারা তার থেকে বেশি ক্রয় করতে ইচ্ছুক। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন বাড়াবে। পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা পরিকল্পিত বিনিয়োগ বেশি হ'লে উৎপাদন ও আয়স্তর বাড়বে।

রেখাচিত্রের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা জানি, ভোগরেখা থেকেই সঞ্চয়রেখা পাওয়া যায়। ভোগরেখা এবং ৪৫° রেখার উল্লম্ব দূরত্বগুলিকে রেখাচিত্রের আকারে প্রকাশ করলে সঞ্চয়রেখা পাওয়া যায়। ভোগরেখা সরললেখা হ'লে সঞ্চয়রেখাও সরলরেখা হবে। ভোগরেখার ঢাল 1 অপেক্ষা কম হ'লে সরলরেখার ঢালও 1 অপেক্ষা কম হবে। ভোগরেখার উল্লম্ব অক্ষের ধনাত্মক অংশে ছেদিতাংশ থাকলে সরলরেখার উল্লম্ব অক্ষের ঋণাত্মক অংশে ছেদিতাংশ থাকবে।

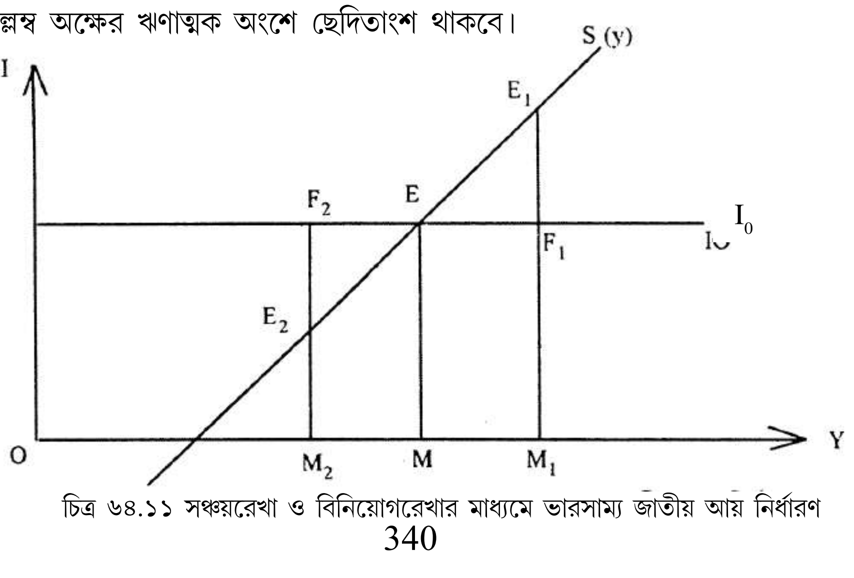

চিত্র ৬৪.১১ সঞ্চয়রেখা ও বিনিয়োগরেখার মাধ্যমে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ

৬৪.১১ নং রেখাচিত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখা অঙ্কিত হ'ল। এই রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর ও উল্লম্ব অক্ষে সঞ্চয় ও বিনিয়োগকে পরিমাপ করা হয়েছে। বিনিয়োগ যেহেতু স্থির তাই বিনিয়োগ রেখা x অক্ষের সমান্তরাল। সঞ্চয়রেখা একটি ঊর্ধ্বমুখী সরলরেখা।

সঞ্চয়রেখা বিনিয়োগ রেখাকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে, সেখানে আয়স্তর OM_1 সুতরাং পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান হচ্ছে OM আয়স্তরে। আয়স্তর বা উৎপাদন যখন OM_1 সঞ্চয় E_1M_1, বিনিয়োগ F_1M_1। সঞ্চয় বিনিয়োগ থেকে বেশি। দ্রব্যের বাজারে বাড়তি যোগান আছে। সুতরাং উৎপাদন কমবে। আবার OM_1 আয়স্তরে বিনিয়োগ FM। সঞ্চয় E_2M_2 $\therefore$ বিনিয়োগ সঞ্চয়ের থেকে বেশি। দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা আছে যার প্রভাবে আয়স্তর বাড়তে থাকবে। OM আয়স্তরে ভারসাম্য আসবে। এই ভারসাম্যটিকেই স্থায়ী ভারসাম্য বলা যায়। যদি বিনিয়োগ রেখা একটি অনুভূমিক সরলরেখা হয় এবং সঞ্চয় রেখাটি যদি ঊর্ধ্বমুখী হয় তবে সঞ্চয় রেখাটি বিনিয়োগ রেখাকে নীচের দিক থেকে ছেদ করবে। এই ছেদবিন্দুতেই স্থায়ী ভারসাম্য হচ্ছে।

৬৪.৯ মিতব্যয়িতার আপাতবিরোধিতা

দেশে জনসাধারণের যদি সঞ্চয় প্রবণতা বাড়ে তবে জাতীয় আয় কমবে। অর্থাৎ সঞ্চয় অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকারক। অন্যদিকে, যত বেশি ব্যয় করা হবে দেশের আয়স্তর তত বৃদ্ধি পাবে। বিষয়টির রেখাচিত্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরা যাক, সঞ্চয় রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী। সঞ্চয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত। বিনিয়োগ রেখা x অক্ষের সমান্তরাল, যেখানে সঞ্চয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখা পরস্পরকে ছেদ করবে সেখানেই ভারাসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে।

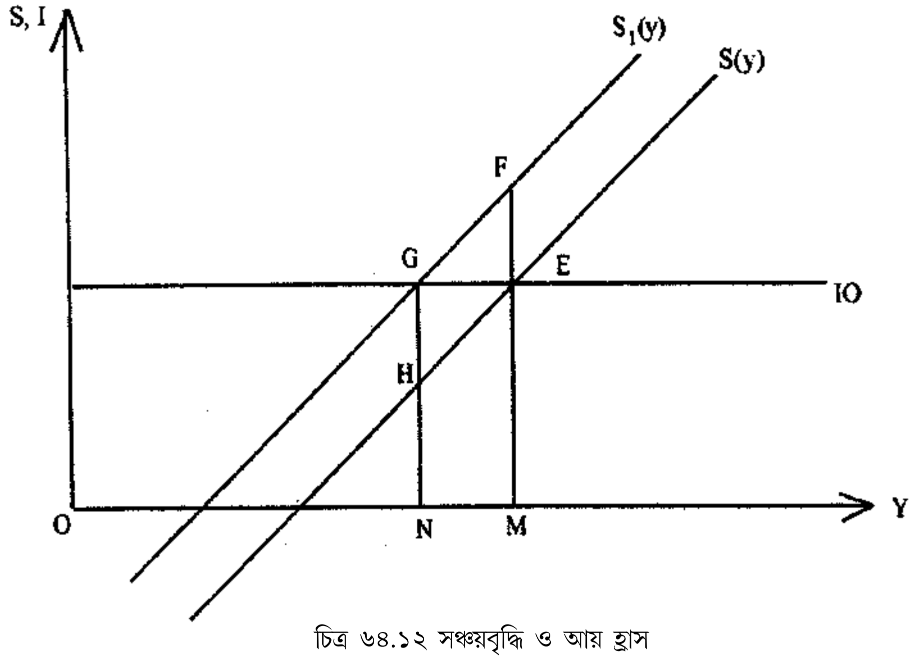

চিত্র ৬৪.১২ সঞ্চয়বৃদ্ধি ও আয় হ্রাস

s(y) সঞ্চয় রেখাটি ও Io বিনিয়োগ রেখা পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারসাম্য জাতীয় আয় OM। এখন যদি জনসাধারণের সঞ্চয় করবার ইচ্ছে বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ প্রত্যেকেই যদি আগের তুলনায় বেশি সঞ্চয় করে তবে সঞ্চয় রেখাটি ওপরের দিকে স্থান পরিবর্তন করবে। রেখাচিত্রে সঞ্চয় রেখাটির স্থান পরিবর্তন করে $S_1(Y)$ হ'ল। OM আয়স্তরে আগে সঞ্চয় ছিল FM। এইভাবে সব আয়স্তরেই সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়বে। নতুন সঞ্চয় রেখাটি বিনিয়োগ রেখাকে G বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারাসাম্য বিন্দু এখন G। ভারসাম্য আয়ের স্তর ON, ON<OM, অর্থাৎ ভারসাম্য আয় কমছে।

এর কারণ হিসাবে বলা যায়, প্রত্যেকেই যখন, বেশি সঞ্চয় করছে তখন মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়ছে। মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ FM। কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ EM। অর্থাৎ বাড়তি সঞ্চয় থাকছে। এর প্রভাবে দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে মন্দা দেখা দেবে। জিনিষপত্র অবিক্রীত অবস্থায় পড়ে থাকবে। উৎপাদকেরা উৎপাদন কমিয়ে দেবে। আয়স্তর কমতে থাকবে। আয়স্তর যখন ON হবে তখন মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান হবে। ON আয়স্তরে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ GN। যদি পুরানো সঞ্চয়ের অভ্যাস বজায় থাকতো তবে সঞ্চয় হত HN। সঞ্চয়ের অভ্যাস পরিবর্তিত হওয়ায় সঞ্চয় বেড়ে হয়েছে GN। কিন্তু জাতীয় আয় কমে গেছে।

এখন প্রশ্ন হ'ল, সঞ্চয় যদি জাতীয় আয় কমিয়েই দেয় তবে স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয় করতে উৎসাহ দেওয়া হ'ল কেন? তবে কি স্বল্পোন্নত দেশে সঞ্চয় করলে আয়স্তর কমে যায় না? এর উত্তরে বলা যায় যে, উন্নত অর্থনীতিতে যখন মন্দা দেখা যায় তখনই দেশের পক্ষে সঞ্চয় ক্ষতিকারক হয়। সঞ্চয় করলে দেশে সামগ্রিক চাহিদা আরও কমে যায়। ফলে জাতীয় আয় কমে। কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশে এই তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। স্বল্পোন্নত দেশে প্রধান সমস্যা মূলধন গঠনের সমস্যা। এর ফলে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ হয় না, নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয় না, কারখানা গড়ে ওঠে না। দেশের আয়স্তর কম থাকে। মূলধন গঠনের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয়। আবার স্বল্পোন্নত দেশের জনসাধারণ যদি সঞ্চয় কমিয়ে শুধু ভোগব্যয় বাড়াতে থাকে তবে দ্রব্যসামগ্রীর বাজারে বাড়তি চাহিদা দেখা দেবে। মূলধনের স্বল্পতার জন্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই সঞ্চয়কে নিরুৎসাহ করার নীতি স্বল্পোন্নত দেশে প্রযোজ্য নয়।

৬৪.১০ কেইন্‌সীয় গুণকে তত্ত্ব

কেইন্‌সীয় তত্ত্ব অনুসারে যখন কোনও দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, সেই দেশের মোট আয় বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মোট আয় তার কয়েক গুণ বেশি বৃদ্ধি পায়। দেশের মোট আয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির যত গুণ বৃদ্ধি পায় তাকে গুণক বলে।

গুণক তত্ত্বে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, দেশে একটি মাত্র দ্রব্য উৎপাদিত হচ্ছে। সেই দ্রব্যটিই ভোগ্য দ্রব্য এবং মূলধন দ্রব্য হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশে উৎপাদনের উপকরণগুলি পূর্ণ নিয়োজিত অবস্থায় নেই। দেশের ভোগব্যয় জাতীয় আয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু একের কম। দেশের বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত, অর্থাৎ স্থির। দেশের সরকার কোনওরকম অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণ করে না। দেশটির কোনও বৈদেশিক বাণিজ্য নেই।

উপরোক্ত অনুমানগুলির ভিত্তিতে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ করা সম্ভব। কেইন্‌সীয় তত্ত্বানুযায়ী সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের সমতার ভিত্তিতে জাতীয় আয়ে ভারসাম্য আসে। রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে গেলে যদি c+1 রেখাটি সামগ্রিক চাহিদা রেখা হয় এবং ৪৫° রেখাটি সামগ্রিক যোগানরেখা হয় তবে c+1 রেখাটি যে বিন্দুতে ৪৫° রেখাকে ছেদ করছে সেই বিন্দুতেই ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হবে। এই আলোচনায় ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, ভোগরেখাটি একটি সরলরেখা এবং এর সমীকরণ $c = a + by$. a = স্বয়ম্ভূত ভোগ, b = প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা, b-র মান শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু একের কম। সুতরাং

$y = a + by + Io$ বা $a + Io\ y = \frac{a + Io}{1-b}$ এখন স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে জাতীয় আয়ও বাড়বে।

$$y + \Delta y = \frac{a + Io + \Delta}{1-b} \text{ or, } y + \Delta y - y = \frac{a + Io + \Delta I}{1-b} - \frac{a + Io}{1-b} \Delta y = \frac{\Delta I}{1-b}$$

বিনিয়োগ ΔI পরিমাণ পরিবর্তিত হ'লে তার প্রভাবে ভারসাম্য আয়ের স্তর পরিবর্তিত হচ্ছে $\frac{1}{1-b} \times \Delta I$ পরিমাণ যেহেতু b-এর মান শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু একের কম, $\frac{1}{1-b}$ রাশিটির মান 1 অপেক্ষা বেশি। একেই গুণকে বলে। গুণকের মানকে অমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি $\frac{1}{1-b} = \frac{1}{\text{1-প্রান্তিক ভোগ}} = \frac{1}{\text{প্রান্তিক সঞ্চয়}}$

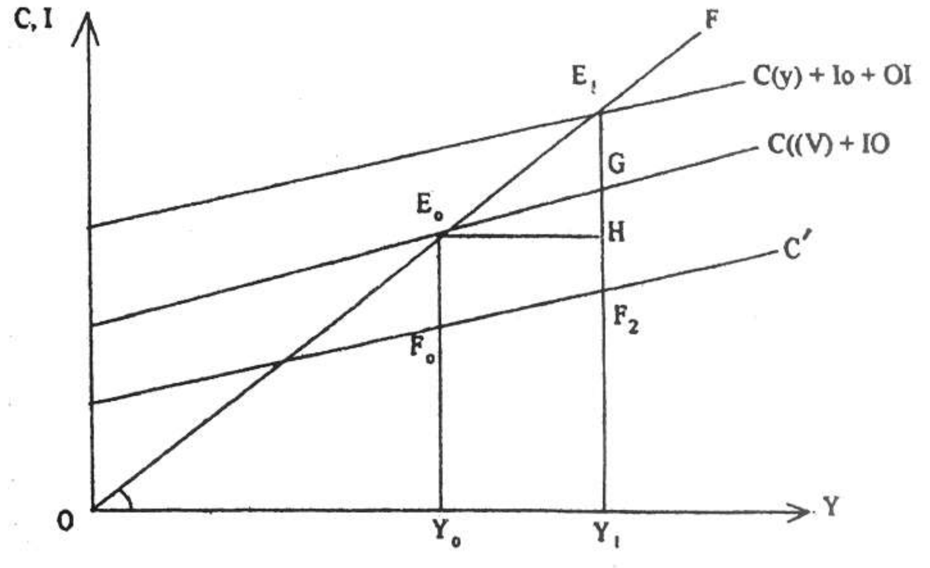

চিত্র ৬৪.১৩ গুণক তত্ত্ব

গুণকের মানটি প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার অন্যোন্যকের সমান। প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যত কম হবে গুণকটি তত বড় হবে। অন্যদিকে প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা যত বড় হবে, গুণকটি তত ছোট হবে। রেখাচিত্রের সাহায্যেও গুণকের মান নির্ণয় করা যায়। রেখাচিত্রে অনুভূমিকে অক্ষে আয়স্তর ও উল্লম্ব অক্ষে ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। CC^1 ভোগরেখা। ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের যোগফল

c(y) _ Io রেখা CC[1] রেখার সমান্তরাল, অর্থাৎ বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত ও ধ্রুবক এবং প্রতি আয়স্তরেই ভোগব্যয়ের সঙ্গে বিনিয়োগ ব্যয়কে যোগ করা হয়েছে। cc[1] রেখা এবং c(y) + Io রেখার মধ্যে উল্লম্ব দূরত্বই বিনিয়োগ। EoFo = Io. C + 1 রেখা ৪৫° রেখাকে Eo বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারসাম্য আয়ের পরিমাণ Yo। এখন ধরা যাক, ভোগ একই রইল কিন্তু বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে C + 1 রেখাটি সমান্তরাল ভাবে ঊর্ধ্বে স্থান পরিবর্তন করল। রেখাচিত্রে c(y) + Io + Δ I রেখাটি সামগ্রিক চাহিদা রেখার নতুন অবস্থান। এই রেখাটি ৪৫° রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করল। E_1 বিন্দুতে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ Y_1। অর্থাৎ E_1G পরিমাণ বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়াতে ভারসাম্য আয়ের EoH পরিমাণ $EoH = \Delta Y, E_1 = \Delta I$।

$$EoH = E_1H$$
$$= E_1 + GH$$
$$EoH > E_1G$$
$$or,\ \Delta y > \Delta I$$

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে বিনিয়োগ ব্যয় যে পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছে ভারসাম্য জাতীয় আয় তার থেকে বেশি পরিবর্তিত হয়েছে।

$$E_0H + E_1G + GH$$

উভয়পক্ষকে E_0H দিয়ে ভাগ করে

বা, $1 = \frac{E_1G}{E_oH} + \frac{GH}{E_oH}$

$$= \frac{\Delta 1}{\Delta y} + \frac{\Delta c}{\Delta y}$$

বা, $1 - \frac{\Delta c}{\Delta y} = \frac{\Delta I}{\Delta y}$

বা, $\Delta y\left(\frac{1 - \Delta c}{\Delta y}\right) = \Delta I$

বা, $\Delta y = \frac{\Delta I}{I - \frac{\Delta c}{\Delta y}}$

$= \frac{1\Delta}{1\text{-প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা}}$

$\frac{1\Delta}{1\text{-সঞ্চয় প্রবণতা}}$

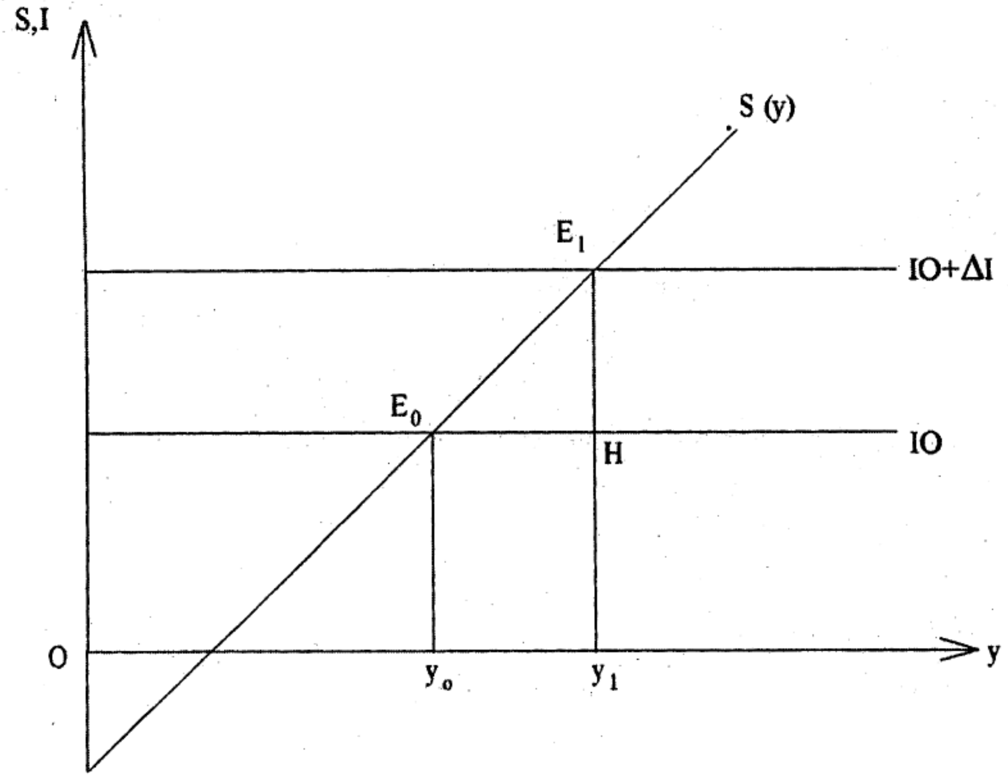

চিত্র ৬৪.১৪ সন্বত্তয় রেখা ও বিনিয়োগ রেখার মাধ্যমে গুণক তত্ত্বের ব্যাখ্যা

গুণকের মান সঞ্চয় প্রবণতার অন্যোন্যকের সমান। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ রেখার মাধ্যমেও গুণকের মান নির্ধারণ করা যায়। রেখাচিত্রে অনুভূমিক অক্ষে আয় ও উল্লম্ব অক্ষে সঞ্চয়, বিনিয়োগ পরিমাপ করা হ'ল। বিনিয়োগ রেখা Io অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল। সঞ্চয় রেখা অনুভূমিক অক্ষকে ছেদ করেছে এবং উর্ধ্বমুখী।

রেখাচিত্রে s(y) সঞ্চয় রেখাটি Io বিনিয়োগ রেখাকে E_0 বিন্দুতে ছেদ করেছে। ভারসাম্য জাতীয় আয়ের স্তর Y_0। এখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়াতে বিনিয়োগ রেখাটি স্থান পরিবর্তন করবে। নতুন বিনিয়োগ রেখা সঞ্চয় রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করবে। অতএব নতুন ভারসাম্য বিন্দু E_1 ও নতুন আয়স্তর y_1। এখানে $y_1 - y_0$ জাতীয় আয়ের পরিবর্তন। এটি ΔY or EoH এর সমান। অন্যদিকে E_1H হ্ল স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ব্যয়ে পরিবর্তন। $E_1H = 1$

এখন রেখাচিত্রে থেকে দেখা যাচ্ছে সঞ্চয় রেখার

ঢাল $= \dfrac{\Delta s}{\Delta y} = \dfrac{E_1H}{EoH} =$ প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা

যেহেতু প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা একের কম $\dfrac{E_1H}{EoH} < 1 or, E_1H < EoH$

আবার $\frac{\Delta s}{\Delta y} = \frac{E_1H}{E_0H}$ or, $E_0H = \frac{E_1H}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}}$

or, $\Delta Y = \frac{1}{\frac{\Delta S}{\Delta Y}} \Delta I$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিবর্তন ব্যয়ে পরিবর্তন ভারসাম্য আয়স্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি করছে এবং বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিবর্তনের থেকে আয়ের পরিবর্তন বেশি হচ্ছে।

৬৪.১০.১ গুণক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা ঃ

অনেকে মনে করেন যে, কেইন্‌সের গুণতত্ত্ব কয়েকটি অবাস্তব অনুমানের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। যেমন, এই তত্ত্বে ধরে নওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা সমান। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভোগ প্রবণতা বিভিন্ন। বিশেষ করে ধনী সম্প্রদায়ের মানুষের ভোগ প্রবণতা গরিব মানুষের ভোগ প্রবণতার থেকে কম। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ভোগ প্রবণতা বিভিন্ন ধরলে গুণক তত্ত্বের হিসাব আলাদা হয়।

আবার কেইন্‌সীয় গুণক তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা স্থির। কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যদি আয় বন্টনে পরিবর্তন হয় তবে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতারও পরিবর্তন হবে। যদি ধনী লোকেদের আয় বেশি বাড়ে, তাহলে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কমে যেতে পারে। তখন গুণকের মান কমে যাবে।

দেশের কোনও অংশে বিনিয়োগ বাড়লে অন্য অংশে বিনিয়োগ কমেও যেতে পারে। যে অংশে বিনিয়োগ বাড়বে সেইখানে উৎপাদনের উপকরণগুলির যেমন, জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতির দাম বাড়বে। এর ফলে অন্য বিনিয়োগকারীদের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির আশাঙ্কায় বিনিয়োগের উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারেন। এইভাবে একদিকে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যেমন আয় বাড়বে আবার অন্যদিকে বিনিয়োগ হ্রাসের ফলে আয় কমবে। সুতরাং, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেই যে আয় বাড়বে তা ঠিক নয়।

গুণক তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, বিনিয়োগ বাড়লে আয় বাড়বে, আয় বাড়লে ভোগব্যয় বাড়বে এবং তার ফলে চাহিদা বাড়বে। দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়বে, নিয়োগ বাড়বে, আয় বাড়বে। কিন্তু এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলেও পূর্ণ গুণকের প্রভাব পেতে সময় লাগে। কেইন্‌স সময়ের এই ব্যবধানের কথা তাঁর সরলগুণক তত্ত্বেও ধরেননি।

গুণক তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, দেশে কোনও বৈদেশিক বাণিজ্য নেই। কিন্তু বাস্তবে বৈদেশিক বাণিজ্য থাকলে বিনিয়োগের ফলে যাদের আয় বাড়ল এবং প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বাড়ল, তারা বিদেশে প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীও বেশি করে ক্রয় করতে পারে। ফলে আমদানি বাড়বে। দেশে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়বে না।

তাছাড়া আয়বৃদ্ধির ফলে যে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বর্ধিত আয় যদি পুরাতন ঋণ পরিশোধে ব্যবহৃত হয়, তাহলে প্রক্রিয়া কার্যকরী হয় না।

৬৪.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে?

২। ভোগ রেখার আকৃতি কিরকম হবে?

৩। ভোগরেখা থেকে কীভাবে গড় ভোগ প্রবণতা জানা যায়?

৪। ভোগরখো থেকে কীভাবে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা জানা যায়?

৫। প্রমাণ করুন যে, প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতার মান একের বেশি হতে পারে না।

৬। পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের মধ্যে যদি পার্থক্য থাকে তবে ভারসাম্য আয়স্তরে কি হবে?

৭। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান শূন্য অপেক্ষা বেশি কিন্তু একের কম হওয়ার গুরুত্ব কি?

৮। গুণক বলতে কি বোঝায়?

৯। আয়ের ভারসাম্য স্থায়ী হওয়ার শর্ত কী?

১০। যে দেশের সঞ্চয় প্রবণতা বেশি, সেই দেশের আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা কম—এটি কি সত্য? যুক্তি দিয়ে বোঝান।

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভোগ অপেক্ষক কাকে বলে? ভোগ অপেক্ষকের আকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

২। গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার সংজ্ঞা দিন। একটি ভোগ রেখার কোনও বিন্দুতে গড় ভোগ প্রবণতা ও প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা পরিমাপ করুন।

৩। কোনও দেশের মোট ভোগ ব্যয় কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করুন।

৪। ভোগ রেখা ও বিনিয়োগ মাধ্যমে কীভাবে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়?

৫। পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান হ'লে তবেই কি জাতীয় আয়ে ভারসাম্য দেখা দেবে? যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৬। কেইন্‌সের গুণক তত্ত্বটি আলোচনা করুন।

৭। দেশের মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়লে জাতীয় আয় কমে যায় কি? কীভাবে এর ব্যাখ্যা করবেন?

শূন্যস্থান পূর্ণ করুন ঃ

১। ভারাসাম্য আয়স্তর স্থায়ী হবে তখনই যখন প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান ________ কম হবে।

২। ভোগরেখা এবং ৪৫° রেখার মধ্যে উল্লম্ব দুরত্বগুলিকে ________ বলে।

৩। y = c + I ভারসাম্য ________ নির্ধারণের শর্ত।

৪। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা এবং সঞ্চয় প্রবণতার যোগফল ________ সমান হবে।

৫। প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার মান $\frac{১}{২}$ হলে গুণকের মান হবে ________।

৬। বিনিয়োগ স্বয়ম্ভূত হ'লে বিনিয়োগ রেখাটি x অক্ষের ________ হবে।

৭। ভারাসাম্য জাতীয় আয় নির্ধারণ সংক্রান্ত কেইন্‌সের তত্ত্বটি উন্নত অর্থনীতির _____ প্রেক্ষাপটে নির্মিত।

একক ৬৫ ◆ অর্থ

গঠন

৬৫.১ উদ্দেশ্য

৬৫.২ প্রস্তাবনা

৬৫.৩ অর্থের সংজ্ঞা

৬৫.৩.১ অর্থের কীভাবে উদ্ভব হ'ল

৬৫.৪ দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা

৬৫.৫ অর্থের কাজ

৬৫.৬ অর্থের শ্রেণীবিভাগ

৬৫.৭ অর্থের মূল্য

৬৫.৭.১ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

৬৫.৮ অনুশীলনী

৬৫.১ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে
- অর্থ কাকে বলে এবং অর্থের কীভাবে উদ্ভব হ'ল
- দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলি কি কি ছিল এবং অর্থের মাধ্যমে কীভাবে তা দূর হ'ল।
- কত রকমের অর্থ আছে, অর্থাৎ অর্থের শ্রেণীবিভাগ।
- অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের সম্পর্ক বলতে কি বোঝায়।

৬৫.২ প্রস্তাবনা

যে কোনও অর্থনীতিতে অর্থ কে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে এমন এক যুগ ছিল যখন মানুষ নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেই তৈরি করতে পারত। পরবর্তীকালে সমাজে শ্রমবিভাগ দেখা দিল, ব্যক্তি হারালো তার স্বাবলম্বিতা। সমাজ ব্যবস্থায় বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দিল। প্রথম যুগে দ্রব্যের সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময় হত। সরাসরি দ্রব্য বিনিময়ের নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় মানুষ অবশেষে অর্থের ব্যবহার শেখে।

৬৫.৩ অর্থের সংজ্ঞা

অর্থ হল বিনিময়ের সর্বজনগ্রাহ্য মাধ্যম, মানুষ যা দ্রব্য বা সেবার পরিবর্তে গ্রহণ করতে রাজি থাকে এবং যার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যায় তাকেই অর্থ বলে। অর্থের নিজস্ব কোনও চাহিদা নেই। দ্রব্যের চাহিদার কারণ দ্রব্য ভোগ করে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। অর্থের প্রয়োজন হয় যেহেতু অর্থের দ্বারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়। অর্থের এই যে সংজ্ঞা আমরা আলোচনা করলাম যাকে অর্থের ব্যাপক ধারণা বলা যায়। দুই ধরনের অর্থ বিহিত মুদ্রা ও ব্যাঙ্ক আমানত এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, বিহিত মুদ্রা আবার ধাতব মুদ্রা এবং কাগজী মুদ্রা উভয়ই হ'তে পারে। সরকার অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই মুদ্রা প্রচলন করে। ব্যাঙ্কের আমানত ও লেনদেনের মাধ্যমে হিসাবে বহুল প্রচলিত এবং এগুলি প্রায় সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে। সুতরাং ব্যাঙ্কের আমানতকে অর্থ বলে গণ্য করা হয়।

৬৫.৩.১ অর্থের উদ্ভব কীভাবে হল

সভ্যতার আদিপর্বে অর্থের প্রচলন ছিল না। প্রতিটি মানুষ শুধু নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে দ্রব্য উৎপাদন করত। কিন্ত সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভোগ লিপ্সা বাড়ল। সে আর নিজের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ভোগ করে সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। তখন সে নিজের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি দ্রব্য উৎপাদন করতে লাগল এবং বাড়তি উৎপাদনের সাহায্যে অন্যের উৎপাদিত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করতে লাগল। এইভাবেই দ্রব্য বিনিময় প্রথার বিকাশ ঘটে। কিন্তু দ্রব্য বিনিময় প্রথাকে কিছু অসুবিধা আছে। প্রধান অসুবিধা হ'ল যে কোনও মানুষ যদি গমের পরিবর্তে কাপড় চায় তবে তাকে এমন মানুষ খুঁজে নিতে হবে যে কাপড়ের পরিবর্তে গম চাইছে। অর্থাৎ, পারস্পরিক অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। কাপড় উৎপাদনকারী ব্যক্তির যদি গমের প্রয়োজন না থাকে তবে আর এই বিনিময় সম্ভব নয়। এই অসুবিধা দূর করবার জন্যও অর্থের প্রচলন শুরু হয়। অর্থ সকলেরই চাহিদা মেটায়। গম উৎপাদনকারী ব্যক্তি গম বিক্রি করে অর্থ পাবে। সেই অর্থ দিয়ে কাপড় উৎপাদনকারী ব্যক্তির কাছ থেকে কাপড় কিনবে। কাপড় উৎপাদনকারী ব্যক্তি অর্থ দিয়ে তার প্রয়োজনমত জিনিষপত্র কিনবে।

৬৫.৪ দ্রব্য বিনিময় প্রধার অসুবিধে

অর্থ ছাড়া এক দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য পাওয়াকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে। অর্থের আবির্ভাবের আগে এই ধরনের দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, কিন্তু দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থার কতকগুলি অসুবিধা ছিল। প্রথমত দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা চালু থাকার জন্য পারস্পরিক অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। যেমন, কোনও ব্যক্তির যদি গমের পরিবর্তে কাপড় দরকার হয় তবে তাকে এমন লোক খুঁজে নিতে হবে যে কাপড়ের পরিবর্তে গম ক্রয় করতে ইচ্ছুক।

দ্বিতীয়ত, দ্রব্যের অবিভাজ্যতা দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি করে। অনেক দ্রব্য আছে যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা যায় না। ধরা যাক, একটি গরুর বিনিময়ে দশ কেজি চাল পাওয়া যায়। যার কাছে একটি গরু আছে তার যদি পাঁচ কেজি চালের দরকার হয় তবুও তাকে দশ কেজি চাল নিতে হবে। কারণ পাঁচ কেজি চালের জন্য আধখানা গরু চাল বিক্রেতা গ্রহণ করবে না।

তৃতীয়ত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করবার জন্য কোনও নির্দিষ্ট মানদণ্ড থাকে না বলে বিভিন্ন দ্রব্যের পারস্পরিক দাম নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। ধরা যাক, একটি গরুর পরিবর্তে দুটি ভেড়া পাওয়া যায়। একটি ভেড়ার পরিবর্তে যদি তিনটি ছাগল পাওয়া যায় তবে একটি গুরুর পরিবর্তে কতগুলি ছাগল পাওয়া যাবে তা নির্ণয় করা বিশেষ সমস্যার ব্যাপার।

চতুর্থত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সঞ্চয় করার অসুবিধে আছে, বিশেষ করে পচনশীল দ্রব্য সঞ্চয় করা যায় না। আর সঞ্চল করলে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয়। তার জন্যও খরচ আছে।

পঞ্চমত, দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সমাজের মোট উৎপাদনের হিসাব করা কঠিন। কারণ এর জন্য সব দ্রব্যকে একটি সাধারণ মানদণ্ডের মাধ্যমে প্রকার করার প্রয়োজন আছে। পরিশেষে দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রি করতে অসুবিধা হয় বলে দ্রব্য উৎপাদন কম হয় এবং বাজার ছোট থাকে।

৬৫.৫ অর্থের কাজ

বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন হয়েছে। অর্থের মূল কাজ চারটি।

১) অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

২) অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসাবে কাজ করে।

৩) অর্থ ঋণ শোধের মান হিসাবে কাজ করে।

৪) অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে।

বিনিময়ের মাধ্যম ঃ অর্থের প্রধান কাজ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করা। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার জন্যই অর্থের প্রচলন। অর্থ সকলেই গ্রহণ করতে রাজি থাকে বলে লেনদেনের কাজ সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কাপড় বিক্রেতার ধানের প্রয়োজন হলে তাকে আর এমন ধানবিক্রেতা খুঁজে বার করতে হয় না যার কাপড়ের দরকার আছে। কাপড় বিক্রেতা কাপড় বিক্রি করে যে অর্থ পাবে তাই দিয়ে বাজার থেকে ধান কিনতে পারবে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের ব্যবহারের ফলে বিশেষিকরণের সুবিধা হয়। এর ফলে উৎপাদন ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

মূল্যের পরিমাপক ঃ অর্থের মাধ্যমে দেশের মধ্যে প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য প্রকাশ করা সম্ভব। বিভিন্ন দ্রব্যের একক বিভিন্ন। একটি সাধারণ মাপকাঠিতে প্রকাশ না করলে দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আমরা জানি জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এই ধরনের মাপকাঠির প্রয়োজন আছে। আবার, ধরা যাক, কোনও উৎপাদন প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের দ্রব্য প্রস্তুত করে। প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় কত হল তা জানার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

অর্থের মাধ্যমে মূল পরিমাপের একটি অসুবিধাও আছে। অর্থের নিজস্ব মূল্য এক থাকলে তবেই অর্থের মাধ্যমে মূল্য পরিমাপ হবে সঠিক। কিন্তু দামের পরিবর্তনের ফলে অর্থের মূল্যে ওঠানামা ঘটে। দাম বাড়লে অর্থের মূল্য কমবে, অর্থের মূল্য বাড়বে। অর্থের মূল্যের পরিবর্তনের ফলে অর্থের মাধ্যমে মাপা দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যও সঠিক হয় না।

ঋণ পরিশোধের মান ঃ আধুনিক যুগে ঋণ মারফত অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলে। অর্থ ঋণ বা স্থগিত দেনাপাওনার মান হিসাবে কাজ করে; তবে অর্থের মূল্যের ওঠানামার ফলে মূল্যশোধের মাপকাঠি হিসাবে অর্থের ব্যবহার ত্রুটিমুক্ত নয়। ধরা যাক, ঋণদাতা ১০,০০০ টাকা ঋণ দিল। স্বল্প গ্রহীতার সুদ সমেত ১২,০০০

টাকা ফেরত দেওয়ার কথা। এখন যদি অর্থের মূল্যে কমে যায় অর্থাৎ দামস্তর বেড়ে যায় তবে প্রকৃতপক্ষে কম মূল্য শোধ দেওয়া হল।

সঞ্চয়ের ভাণ্ডার ঃ অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করে। ভোগ্যবস্তু সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কারণ দীর্ঘদিন সঞ্চয় করে রাখলে ভোগ্যবস্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভোগ্যবস্তুর দাম স্থির নয়।

অর্থ সঞ্চয় করলে এবং অর্থের মূল্য মোটামুটি স্থির থাকলে অর্থ দিয়ে যে কোনও সময় জিনিষপত্র কেনা সম্ভব। অর্থনীতিবিদ্ কেইন্‌স অর্থের তরলতার ওপর গুরত্ব আরোপ করেছেন। অর্থের তরলতা বলতে বোঝায় যে এর পরিবর্তে যে কোনও সময়ে অন্য দ্রব্য ক্রয় করা যায়। অর্থের এই গুণ না থাকলে অর্থ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসাবে কাজ করতে পারত না।

৬৫.৬ অর্থের শ্রেণিবিভাগ

প্রচলনের ভিত্তিতে অর্থকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রকৃত অর্থ ও হিসাব নিকাশের অর্থ। প্রকৃত অর্থ বলতে সেই অর্থকে বোঝায় যেটি হাতবদল হয় এবং যেটি লেনদেনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। আমাদের দেশে যে বিভিন্ন ধাতবমুদ্রা বা কাগজী নোট প্রচলিত রয়েছে সেগুলি প্রকৃত অর্থ। অন্যদিকে হিসাব নিকাশের অর্থ হল সেই অর্থ যার মাধ্যমে শুধু হিসাব রাখা যায়। কোনও দেশের প্রকৃত অর্থ এবং হিসাব নিকাশের অর্থ এক হতে পারে আবার আলাদাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (IMF) এর সব হিসাবপত্র এক বিশেষ মুদ্রায় প্রকাশ করা হয়। সেই মুদ্রাটির নাম Special Drawing Rights বা SDR। বাস্তবে কিন্তু SDR-এর কোনও অস্তিত্ব নেই। SDR-এর অস্তিত্ব শুধু আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের হিসাব খাতায় আছে।

প্রকৃত অর্থ আবার ধাতব মুদ্রা ও কাগজীমুদ্রা দুইই হতে পারে। ধাতু দিয়ে তৈরি মুদ্রাকে ধাতবমুদ্রা বলা হয়, যেমন স্বর্ণমুদ্রা, তামা দিয়ে তৈরি মুদ্রা, নিকেলের মুদ্রা ইত্যাদি। কাগজের নোটকে কাগজীমুদ্রা বলা হয়। ধাতবমুদ্রার একটি বড় অসুবিধা যে বড় ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে এই মুদ্রা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সুবিধাজনক। ভারতে যে ধাতবমুদ্রাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি হল ৫,১০,২০,২৫,৫০ পয়সার ও এক টাকা, দুই টাকা ও পাঁচ টাকার; কাগজের নোট পাওয়ার যায় এক টাকা, দুই টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, একশো টাকা ও পাঁচশো টাকার।

কাগজী মুদ্রা সাধারণত দুই প্রকারের হয়—পরিবর্তনীয় কাগজীমুদ্রা ও অপরিবর্তনীয় কাগজীমুদ্রা। পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রার সম পরিমাণ ধাতু গচ্ছিত রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় দেশের জনসাধারণ ইচ্ছামত কাগজীমুদ্রা সরকারের কাজ থেকে ধাতব মুদ্রায় পরিবর্তন করে নিতে পারে। সরকার এই ব্যবস্থায় কাগজী মুদ্রার পরিবর্তে ধাতুমুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। ভারতে বর্তমানে যে কাগজী মুদ্রার প্রচলন আছে তা অপরিবর্তনীয়। ভারতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাগজীমুদ্রার পরিবর্তে সোনা, রূপা ও অন্য কোনও মূল্যবান ধাতু দিতে বাধ্য নয়। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রেখে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যত খুশি নোট ছাপাতে পারে। কাগজীমুদ্রা এবং ধাতুমুদ্রা দুইই বিহিত মুদ্রা অর্থাৎ আইন অনুসারে সকলেই এই মুদ্রা নিতে বাধ্য থাকে। অবশ্য কয়েক প্রকারের বিহিত মুদ্রা আছে যা ঋণ পরিশোধ বা বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি দিলে লোকে নিতে অস্বীকার করতে পারে। এইসব মুদ্রাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলা হয়। ভারতে পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা, পঁচিশ পঞ্চাশ পয়সা প্রভৃতি সসীম বিহিত মুদ্রা। কিন্তু এক টাকার নোট অসীম বিহিত মুদ্রা। ঋণ পরিশোধে বা বিনিময়ে এর যে কোনও পরিমাণ ব্যবহার করা চলে।

যে সব মুদ্রার লিখিত মূল্য অন্তর্নিহিত ধাতুমূল্যের থেকে বেশি হয় তাদের প্রতীক মুদ্রা বলে। আমাদের দেশে এক টাকা এ রকম প্রতীক মুদ্রা কার তাকে যে পরিমাণ ধাতু রয়েছে তার মূল্য এক টাকা অপেক্ষা কম।

কিন্তু যে মুদ্রার লিখিত মূল্য তার অন্তর্হিহিত ধাতুমূল্যের সমান তাকে প্রামণিক মুদ্রা বলে। বর্তমানে প্রামাণিক মুদ্রা কোনও দেশেই নেই।

অর্থকে আবার বিহিত অর্থ ও ঐচ্ছিক অর্থ এই দুই ভাবেও ভাগ করা যায়। বিহিত অর্থকে আইন স্বীকার করে এবং সমাজের সব ব্যক্তি দেনাপাওনার ক্ষেত্রে বিহিত অর্থ গ্রহণ করে। আধুনিক যুগে বড় বড় লেনদেন চেকের মাধ্যমে হয়। ব্যাঙ্কে লোকে যে আমানত রাখে তার ভিত্তিতে চেক কেটে দেনা-পাওনা মেটানো হয়। পাওনাদার কিন্তু নিজের ইচ্ছায় চেক গ্রহণ করে। সে চেক গ্রহণ করতে আইনত বাধ্য নয়, সেই কারণে চেককে ঐচ্ছিক অর্থ বলে। চেক, হুন্ডিস ট্রেজারি বিল, পোস্টাল অর্ডার ঠিক অর্থ নয়, অর্থের পরিবর্ত।

দেশে প্রচলিত সব ধাতুমুদ্রা ও কাগজী মুদ্রাকে 'কারেন্সি' বলে। বৈদেশিক বিনিময়ের বাজারে 'কারেন্সি' বলতে বোঝায় বিশেষ মুদ্রার একককে, যেমন ডলার, পাউন্ড।

ছোট ছোট দেনা-পাওনায় যে সব মুদ্রা ব্যবহূত হয়, যেমন পঁচিশ পয়সা ইত্যাদি সেগুলিকে বলে সহকারী মুদ্রা। এগুলি সাধারণতঃ তামা, ব্রোঞ্জ বা নিকেলের তৈরি হয়। এদের প্রতীক মুদ্রাও বলে।

৬৫.৭ অর্থের মূল্য

মানুষ অর্থের সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে চায় কারণ দ্রব্যসামগ্রী ভোগ করে পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। অর্থের নিজস্ব কোনও চাহিদা নেই। অর্থের চাহিদা কারণ তার ক্রয়শক্তি। অর্থের মূল্য বলতে এক একক অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকেই বোঝায়। এক একক অর্থ দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকার্য ক্রয় করা যায় তাকেই এক একক অর্থের মূল্য বলতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, এক টাকা দিয়ে যদি চারটি আলু ক্রয় করা যায় তবে এক টাকার মূল্য চারটি আলু। আবার এক টাকা দিয়ে যদি একটি কমলালেবু ক্রয় করা যায় তবে একটাকার মূল্য একটি কমলালেবু। যদি দ্রব্যের দাম বাড়ে তবে সমপরিমাণ অর্থ দিয়ে কম পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। তখন অর্থের মূল্য কমবে। আবার দাম কমলে একটি অর্থ দিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রব্য ক্রয় করা যায়। তখন অর্থের মূল্য বাড়বে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, দ্রব্যের দাম ও অর্থের মূল্যের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে। দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে আর দাম হ্রাস পেলে অর্থের মূল্য বেড়ে।

এখন সমস্যা হল যে, এইভাবে যখন অর্থের মূল্যকে অর্থনীতিতে প্রস্তুত অসংখ্য দ্রব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তখন অর্থের মূল্যও অসংখ্য রকমের হবে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য কোনও একটি বিশেষ দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকে পরিমাপ না করে সমস্ত দ্রব্যের দামের গড়ের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকে পরিমাপ করা যায়। বিভিন্ন দ্রব্যের দামের গড়কে আমরা দামস্তর বলতে পারি। দামস্তর কোনও বিশেষ দ্রব্যের দাম নয়। এটি সমস্ত দ্রব্যের দামের গড়মাত্র। এই দামস্তর যত বাড়বে অর্থের মূল্য তত কমবে আবার দামস্তর যত কমবে অর্থের মূল্য তত বাড়বে। অর্থাৎ, অর্থের মূল্য দামস্তরের অন্যোন্যকের সমান।

$$\text{অর্থের মূল্য} = \frac{1}{\text{দামস্তর}}$$

দামস্তরকে যদি p দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, তবে অর্থের মূল্য $= \frac{1}{P}$

৬৫.৭.১ অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

আগেই আলোচনা করেছি যে দামস্তরে পরিবর্তন ঘটলে অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয়। দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য কমে আর দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। এখন দামস্তর কেন পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে প্রচলিত তত্ত্বগুলির মধ্যে একটি অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে কতকগুলি অনুমান ধরে নেওয়া হয় ঃ (১) এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আছে; অর্থাৎ দ্রব্য সামগ্রীর যোগন বাড়াবার কোনও সুযোগ নেই। (২) দেশের অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। (৩) অর্থের প্রচলন বেগ স্থির। একটি টাকা কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাতবদল হয় তাকেই বলে অর্থের প্রচলন বেগ। যদি একটি একশো টাকার নোট এক বছরে দশবার হাত বদল হয় তবে ১০০০ টাকার লেনদেন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন বেগ ১০। দেশে কত টাকা লেনদেন হচ্ছে তাকে দেশের মোট অর্থের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় প্রচলন বেগ পাওয়া যায়। (৪) অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম।

উপরোক্ত চারটি অনুমানের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের প্রকাশ করা হয়। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য দেশে অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই একই হারে বাড়বে।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে দু'ভাবে প্রমাণ করা যায়। একটি ফিশারের সমীকরণের সাহায্যে এবং অন্যটি কেমব্রিজ সমীকরণের সাহায্যে।

ফিশারের সমীকরণ ঃ

অধ্যাপক আরভিং ফিশার একটি সমীকরণের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ফিশারের এই সমীকরণটি আসলে একটি অভেদ। অর্থাৎ, সব সময়েই সত্য। ধরা যাক, কোনও নির্দিষ্ট সময়ে দেশে T পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ও বিক্রি করা হচ্ছে। T পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম P সুতরাং PT হল দেশের মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্য। এখন যদি দেশে M পরিমাণ অর্থ প্রচলিত থাকে এবং প্রতি একক অর্থ V বার ব্যবহৃত হয় তবে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্য MV; তবে দেখা যাচ্ছে PT এবং MV উভয়েই মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্য প্রকাশ করছে।

$PT \equiv MV$ = ($\equiv$ চিহ্নটি অভেদের চিহ্ন) PT এবং MV সকল সময়েই সমান।

অবশ্য অনেকে এটি সমীকরণ হিসাবে চিহ্নিত করতে চান, অভেদ হিসাবে নয়। যদি T পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রিয় জন্য আসে এবং মূল্যস্তর হয় P তবে ঐ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করবার জন্য অর্থের চাহিদা হবে PT। আবার যদি দেশে M পরিমাণ অর্থ থাকে এবং প্রতি একক অর্থ V বার ব্যবহৃত হয় তবে অর্থের কার্যকারী যোগান হবে MV.

ফিশারের মতে এক নির্দিষ্ট সময়ে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান সমান হয়

$$MV = PT$$

$$p = \frac{MV}{T}$$

এই সমীকরণটি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, M বাড়লে P বাড়বে এবং M কমলে P কমবে। শুধু তাই নয়, M যে হারে বাড়বে P-ও সেই হারে বাড়বে এবং M যে হারে কমবে, P-ও সেই একই হারে কমবে।

ফিশারের মতে, পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর যোগন পরিবর্তিত হবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আবার ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, অর্থের প্রচলন বেগও স্থির আছে। সুতরাং V-র মান পরিবর্তিত হবে না। M বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি M বাড়ায় তবে P অবশ্যই বাড়বে এবং M যে অনুপাতে বাড়বে, P-ও সেই অনুপাতে বাড়বে।

আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি M কমায় তবে P-কেও সেই অনুপাতে কমতে হবে। অর্থাৎ, দেশের অর্থের পরিমাণ এবং দামস্তরের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ এবং আনুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যামান।

দেশের মোট অর্থের পরিমাণকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। ধরা যাক, M জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ এবং সেই অর্থের প্রচলন বেগ V এবং M^1 ব্যাঙ্কের কাছে রক্ষিত আমানতী অর্থ এবং সেই অর্থের প্রচলন বেগ V^1, তবে অর্থের কার্যকারী যোগান $MV + M^1V^1$. ফিশারের সমীকরণটিকে এখন আমরা $PT = MV + M^1V^1$ ভাবে লিখতে পারি।

$$P = \frac{MV + M^1V^1}{T}$$

এখন যদি T স্থির থাকে, টাকার প্রচলন বেগ V ও V^1 স্থির থাকে, এবং যদি নগদ অর্থ ও ব্যাঙ্ক রক্ষিত অর্থের মধ্যে অনুপাত স্থির থাকে তবে M ও M^1 যে হারে বাড়বে P-ও ঠিক সেই হারে বাড়বে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে। V ও V^1 স্থিব থাকলে M ও M^1 যদি দ্বিগুণ হয় তবে P-ও দ্বিগুণ হবে।

ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটা সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, যদি M বাড়ে তবে P বাড়বে অর্থাৎ T ও V স্থির থাকবে। দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকলেই T স্থির থাকে। কিন্তু এটি অবাস্তব অনুমান। যদি দেশে সম্পদ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে তবে M বাড়লে T বাড়তে পারে। তাহলে $\frac{MV}{T}$ নাও বাড়তে পারে।

আবার এই তত্ত্বে V কেও স্থির ধরা হয়। কিন্তু V যদি পরিবর্তিত হয় তবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর নাও বাড়তে পারে। M বাড়লে যদি V কমে তবে MV নাও বাড়তে পারে। সেক্ষেত্রেও P ও বাড়বে না।

দ্বিতীয়ত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে শুধু বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে অর্থের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, অর্থের চাহিদা শুধু দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করার জন্যই। কিন্তু যদি অর্থের পরিমাণ বাড়ে এবং এই বাড়তি অর্থ জনসাধারণ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য ব্যয় না করে সঞ্চয় করে রাখে তবে দ্রব্যসামগ্রীর দাম নাও বাড়তে পারে।

তৃতীয়ত, অর্থের পরিমাণ এবং মূল্যস্তরের মধ্যে কোনও কার্যকারণ সম্পর্কের কথা এই তত্ত্বে আলোচনা করা হয়নি। অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটলে কোন্ পদ্ধতি এবং কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার দরুন মূল্যস্তরে পরিবর্তন দেখা দেবে তারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না।

চতুর্থত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের ওপরে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন, শ্রমিকের কর্মদক্ষতা কমে গেলে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে এবং তার প্রতিক্রিয়া দামস্তরেও দেখা দেবে। আবার উৎপাদকের একচেটিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও দাম বাড়বে।

পঞ্চমত, ক্রাউথারের মতানুসারে বাণিজ্যচক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দামস্তরের যে ওঠানামা দেখা যায় তা অর্থের পরিমাণতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। যেমন, মন্দার সময় অর্থের স্বল্পতার জন্য দাম হ্রাস পায় না বা উৎপাদন হ্রাস পায় না, তখন ব্যাঙ্কে টাকা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে। আবার তেজীর সময় দাম বাড়ার কারণ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি নয় কারণ এই সময়ে টাকার বাজারে টানাটানি চলে।

ষষ্ঠত, অর্থনীতিবিদ্ কেইন্সের মতে, জিনিসপত্রের দামস্তর শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা এবং যোগানের ওপরেও নির্ভর করে। দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা দেশের মোট ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের ওপর নির্ভরশীল। ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় ও আয়স্তর, সুদের হারের ওপর নির্ভর করে। যদি দেশে আয় বাড়ে তবে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং যদি সামগ্রিক যোগান অপরিবর্তিত থাকে তবে দামস্তর বাড়বে। সামগ্রিক যোগান অপরিবর্তিত থাকবে একমাত্র পূর্ণনিয়োগ অবস্থায়। আবার অর্থের পরিমাণ বাড়লেই যে চাহিদা বৃদ্ধি পাবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। বাড়তি অর্থ জনসাধারণ নগদ অর্থ হিসাবে ধরে রাখতে পারে। অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে ব্যয় নাও করতে পারে।

সপ্তমত, MV এবং PT উভয়েই মোট আর্থিক লেনদেনকে প্রকাশ করে। কাজেই MV এবং PT সকল সময়েই সমান। $P \equiv MV$ একটি অভেদ মাত্র। কোনও অভেদ চলরাশিগুলির যে কোনও মানেই সিদ্ধ হয়। সমীকরণকে সমাধান করে কোনও অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করা যায়। অভেদকে কিন্তু সেইভাবে সমাধান করা যায় না। সুতরাং, $P \equiv MV$ সব দামস্তরের জন্য এবং সব অর্থের পরিমাণের জন্যই সত্য। এর থেকে দামস্তর নির্ণয় করা যায় না।

এই সব ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ফিশারের তত্ত্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি দামস্তর এবং অর্থের পরিমাণের মধ্যে সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। তবে সেই সম্পর্ক এত সহজ নয়।

কেমব্রিজ সমীকরণ ঃ

কেমব্রিজ অর্থনীতিবিদ্‌রা, যেমন মার্শাল, পিগু, রবার্টসন অন্যভাবে অর্থের পরিমাণতত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা যে সমীকরণটি ব্যবহার করেছেন সেটি কেমব্রিজ সমীকরণ নামে পরিচিত। এই সমীকরণটি M=KPY আকারে লেখা যায়। M হল মোট অর্থের পরিমাণ, Y প্রকৃত আয়, P দামস্তর এবং K একটি ধ্রুবক। এই সমীকরণ অনুযায়ী জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি অংশ অর্থের আকারে রাখতে চায়। যেহেতু P দামস্তর এবং Y প্রকৃত আয়, সুতরাং PY আর্থিক জাতীয় আয়। এই আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত K যদি জনসাধারণ অর্থের আকারে রাখতে চায় তবে দেশে মোট অর্থের আকারে রাখতে চায় তবে দেশে মোট অর্থের চাহিদা তবে KPY; অন্যদিকে অর্থের যোগান M, সুতরাং M=KPY চাহিদা ও যোগানের সমতা প্রকাশ করছে।

কেমব্রিজ সমীকরণে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আছে। সেই কারণেই প্রকৃত জাতীয় আয় Y স্থির।

জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থের আকারে রাখতে চায় এবং এই অনুপাত K স্থির।

অর্থের যোগান দামস্তর বা আয়স্তরের ওপর নির্ভর করে না। দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে অর্থের যোগান পরিবর্তন করতে পারে।

অর্থের মূল্য নির্ধারণ ঃ

অধ্যাপক মার্শালের মতে, কোনও দ্রব্যের দাম যেমন চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয় অর্থের মূল্যও তেমন অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অর্থের মূল্য দামস্তরের অন্যোন্যকের সমান। অর্থের মূল্য $=\frac{1}{P}$। অর্থের যোগান আর্থিক কর্তৃপক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট। অর্থের যোগান দামস্তরের ওপর নির্ভরশীল নয়। রেখাচিত্রে উল্লম্ব অক্ষে অর্থের মূল্যকে পরিমাপ করে অনুভূমিক অক্ষে অর্থের যোগানকে পরিমাপ করা হচ্ছে। M^s যদি অর্থের যোগান হয় তবে তাকে একটি উল্লম্ব সরলরেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা সম্ভব। (চিত্র ৬৫.১)

এখন অর্থের চাহিদাকে যদি M^D ধরি তবে $= KPY$ বা $\frac{M^D}{P} = KY$ যেহেতু K ও Y স্থির অতএব $\frac{M^D}{P}$ স্থির অর্থাৎ অর্থের চাহিদা ও অর্থের মূল্যের গুণফল একটি ধ্রুবক। রেখাচিত্র (চিত্র ৬৫.২) উল্লম্ব অক্ষে $\frac{1}{P}$ এবং অনুভূমিক অক্ষে M^D কে প্রকাশ করলে অর্থের চাহিদারেখাকে একটি নিম্নমুখী রেখা হিসাবে পাব। এই রেখাটি মূলবিন্দুর দিকে উত্তল। এর নীচে যতগুলি আয়তক্ষেত্র আঁকা হবে প্রত্যেকটির ক্ষেত্রফল সমান। সুতরাং, এই রেখাটি একটি আয়তক্ষেত্র পরাবৃত্ত। এই ধরনের চাহিদারেখা স্থিতিস্থাপকতার পরম মান সব বিন্দুতেই এককের সঙ্গে সমান।

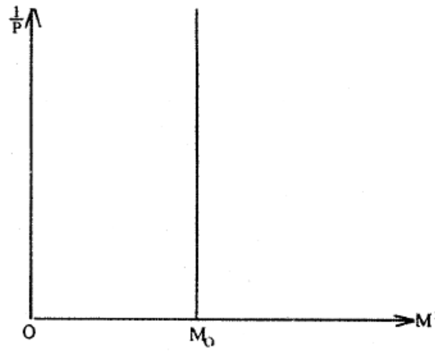

চিত্র ৬৫.১ অর্থের যোগান রেখা

রেখাচিত্রে (চিত্র ৬৫.৩) অর্থের চাহিদারেখা এবং অর্থের যোগানরেখা পরস্পর E_0 বিন্দুতে ছেদ করেছে। এই বিন্দুতে ভারসাম অর্থের মূল্য $\frac{1}{P_0}$; এখন অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তবে অর্থের যোগনরেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে। রেখাচিত্রে নতুন যোগান রেখা চাহিদারেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে।

এখানে অর্থের মূল্য $\frac{1}{p^1}$ যেহেতু $\frac{1}{p_1} < \frac{1}{P_o}$

$\therefore P_1 > P_o$

অর্থাৎ, অর্থের পরিমাণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দামস্তরও বাড়বে। আবার দামস্তর যে একই অনুপাতে বাড়বে তাও দেখান যায়। অর্থের চাহিদারেখাটি একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত হওয়ার জন্য OAE_0M_0 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল ও OBE_1M_1 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল পরস্পর সমান।

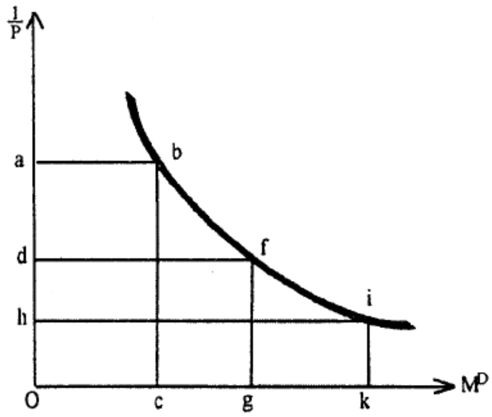

চিত্র ৬৫.২ অর্থের চাহিদা রেখা

OAE_0M_0 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{M_o}{P_o}$

OBE_1M_1 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{M_1}{P_1}$

$$\frac{M_o}{P_o} = \frac{M_1}{P_1}$$

সুতরাং, অর্থের যোগান যে হারে বেড়েছে P বা দামস্তরও একই হারে বেড়েছে।

ফিশারের সমীকরণ MV=PT এবং কেমব্রিজ সমীকরণ M=KPY এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে।

$$V = \frac{1}{K} \text{ বা } K = \frac{1}{V}$$

K ও V পরস্পরকে অন্যোন্যক।

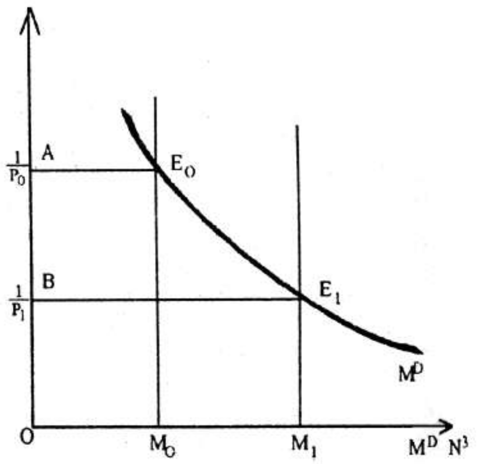

চিত্র ৬৫.৩ অর্থের মূল্য নির্ধারণ

এখানে V হ'ল প্রচলন বেগ এবং K আয়ের নির্দিষ্ট অনুপাত যা নগদ অর্থের আকারে ধরে রাখা হল। অর্থ খরচ করলে তার প্রচলন বেগ বাড়ে। তখন অর্থ নগদ অবস্থায় ধরে রাখার চাহিদা কমলে অর্থ নগদ অবস্থায় বেশি সময় ধরা থাকে। V কমলে K বাড়ে; V একটি গতিশীল বিষয় কিন্তু K গতিহীন। V একটা নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে ঘটে। K একটা নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে ঘটে থাকে।

ফিশারের সমীকরণ অনুযায়ী জনসাধারণ তাদের আয়ের সবটাই দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে ব্যয় করে। অর্থ নগদ অবস্থায় হাতে ধরে রাখতে চায় না। অন্যদিকে কেমব্রিজ সমীকরণে জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থ হিসাবে হাতে রাখে। এই অনুপাতের দ্বারাই অর্থের চাহিদা হয়। সুতরাং, কেমব্রিজ সমীকরণ অনুযায়ী অর্থের চাহিদা শুধুমাত্র ব্যয় করার জন্য নয়, অর্থ হাতে ধরে রাখার জন্যও।

ফিশারের সমীকরণ থেকে কেমব্রিজ সমীকরণটিকে উন্নত বলে মনে করা হয়। ফিশারের সমীকরণের মোট লেনদেনের পরিবর্তে কেমব্রিজ সমীকরণে প্রকৃত জাতীয় আয়কে ধরা হয়েছে। মোটা লেনদেন বলতে যে কোনও স্তরের দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়কে বোঝায় আর শুধু শেষ উৎপন্ন দ্রব্যগুলিই প্রকৃত জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। জাতীয় আয় সহজেই পরিমাপ করা যায়। তাই জাতীয় আয়ের ধারণাটি লেনদেনের ধারণা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আর এটিও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী যে অর্থের চাহিদা আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তবে শুধুমাত্র আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়।

ফিশারের সমীকরণ এবং কেমব্রীজ সমীকরণের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্যগুলি থাকলেও উভয় সমীকরণ থেকেই দেখা যায় যে, অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর বাড়বে। অর্থের যোগান যেন হারে বাড়বে দামস্তর সেই একই হারে বাড়বে এবং অন্যান্য বাস্তব বিষয়সমূহ যেমন আয়স্তর, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, সুদের হার প্রভৃতির কোনও পরিবর্তন হবে না।

ফিশারের সমীকরণের মত, কেমব্রিজ সমীকরণেরও ত্রুটি আছে। এখানেও পূর্ণ কর্মসংস্থানের অনুমানটি ধরা আছে। সুতরাং, উৎপাদন ও আয় বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু দেশে যদি পূর্ণ কর্মসংস্থান না থাকে এবং অব্যবহৃত সম্পদ থাকে তবে এই তত্ত্ব কার্যকারী নয়। আবার এই তত্ত্বে K-কে ধ্রুবক ধরা হয়েছে বা বাস্তবসম্মত নয়।

অর্থের চাহিদা শুধুমাত্র আয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। এটি সুদের হারের ওপরেও নির্ভরশীল। কিন্তু কেমব্রিজ তত্ত্বে তা ধরা হয়নি।

৬৫.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। অর্থ কাকে বলে?

২। অর্থের চারটি কাজ কি কি?

৩। অর্থের মূল্য বলতে কি বোঝায়?

৪। অর্থের প্রচলন বেগ কাকে বলে?

৫। ফিশারের সমীকরণটিকে একটি অভেদ বলা হয় কেন?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। অর্থ কাকে বলে? অর্থের কাজগুলি বর্ণনা করুন।

২। দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধাগুলি কি কি?

৩। আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার অর্থের শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করুন।

৪। ফিশারের সমীকরণের সাহায্যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করুন।

৫। কেমব্রিজ সমীকরণটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। ফিশারের সমীকরণের সঙ্গে কেমব্রিজ সমীকরণের পার্থক্য কি?

নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সযত্নে অনুধাবন করুন এবং সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন।

১। ক্রেতাদের পারস্পরিক অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার

ক) দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থায়।

খ) অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হলে।

২। দেশেব কাগজী মুদ্রা প্রচলনের দায়িত্ব

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে।

খ) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের হাতে।

৩। দেশের সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে জনসাধারণ কাগজী নোটের পরিবর্তে সমমূল্যের সোনা বা রূপার মুদ্রা পেতে পারে

ক) পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায়।

খ) অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায়।

৪। যে মুদ্রার লিখিত ও অন্তর্নিহিত মূল্য সমান তাকে বলে

ক) প্রতীক মুদ্রা।

খ) প্রামাণিক মুদ্রা।

৫। ফিশারের সমীকরণ অনুযায়ী যদি জনসাধারণের কাছে রক্ষিত নগদ অর্থ ও ব্যাঙ্কের কাছে আমানত দ্বিগুণ হয় তবে দামস্তর।

ক) বাড়বে

খ) দ্বিগুণ হবে

গ) কমবে

ঘ) অর্ধেক হবে।

একক ৬৬ ◆ মুদ্রাস্ফীতি

গঠন

৬৬.১ উদ্দেশ্য
৬৬.২ প্রস্তাবনা
৬৬.৩ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা
৬৬.৪ মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ
৬৬.৫ মুদ্রাস্ফীতির কারণ
৬৬.৬ মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান
৬৬.৭ ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি
৬৬.৮ চাহিদা বৃদ্ধি জনিত ও ব্যয় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য
৬৬.৯ উৎপাদন, আয়বন্টন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব
৬৬.১০ মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ
৬৬.১১ অনুশীলনী
৬৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

৬৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর জানা যাবে

- মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ।
- মুদ্রাস্ফীতি কারণ।
- উৎপাদন, আয় বণ্টন ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ওপর মুদ্রাস্ফীতির কি ধরনের প্রভাব পড়ে।
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার উপায়।

৬৬.২ প্রস্তাবনা

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন অধিকাংশ দ্রব্যসাগ্রীর দাম ও উৎপাদনের উপকরণের দাম ক্রমগত বৃদ্ধি পায়, আক্ষরিক অর্থে মুদ্রাস্ফীতি বলতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধিকেই বোঝায়। প্রাচীনকালে ধারণা ছিল যে অর্থের যোগান বাড়লেই দামস্তর বাড়তে থাকে, কিন্তু অর্থে যোগান বৃদ্ধিই দামস্তর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নয়।

৬৬.৩ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

অর্থনীতিতে মদ্রাস্ফীতি বলতে দামস্তরের উঁচুতে থাকাতে বোঝায় না। মুদ্রাস্ফীতি শুধু একটি অবস্থা নয়। মুদ্রাস্ফীতি হ'ল একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দামস্তর ক্রমাগত বেড়ে চলে। অর্থাৎ, মুদ্রাস্ফীতি একটি গাতিশীল ব্যাপার। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি হ'লেই তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না। দাম যদি খুব বেশি হয় কিন্তু স্থির থাকে তবে তা মুদ্রাস্ফীতি নয়। মুদ্রাস্ফীতির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে, এক নির্দিষ্ট সময়ে দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকবে।

৬৬.৪ মুদ্রাস্ফীতির প্রকারভেদ

অর্থনীতিতে বেশ কয়েকপ্রকার মুদ্রাস্ফীতির উল্লেখ আছে, যেমন পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি ও আংশিক মুদ্রাস্ফীতি।

দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ স্থির থাকে। এই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে, দেশে যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান ঘটেনি সেই রকম অবস্থায় কোনও উপাদানের যোগের অস্থিতিস্থাপকতার জন্য যে স্বল্পকালীন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে তাকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

অবাধ মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ

যদি দামস্তর অবাধে বাড়তে পারে এবং দামস্তরের বৃদ্ধি রোধ কার জন্য সরকার কোনওরকম ব্যবস্থা না গ্রহণ করেন তবে সেই মুদ্রাস্ফীতিকে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি বা মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করবার জন্য সরকার যদি দামনিয়ন্ত্রণ করেন বা রেশন ব্যবস্থা চালু করেন তবে সেই অবস্থায় যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে দমিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। যদি এই নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হয় তবে মুদ্রাস্ফীতি আবার মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি হবে।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি ঃ

মুদ্রাস্ফীতির গতি মৃদুও হ'তে পারে আবার দ্রুতও হ'তে পারে। যদি দামস্তর মৃদু গতিতে বাড়ে তবে তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অপরদিকে, যদি দামবৃদ্ধির হার খুব বেশি হয় তখন তাকে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, শতকরা কত হারে দাম বাড়লে তাকে মৃদু বা দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে সে সম্বন্ধে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে, সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধির হার শতকরা দশ শতাংশের বেশি হ'লে তাকে দ্রুত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। এবং দামস্তর বৃদ্ধির হার শতকরা দশ শতাংশের কম হ'লে তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ঃ

দেশে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেলে এবং যোগান স্থির থাকলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। অন্যদিকে উৎপাদনের উপাদানগুলি দাম বৃদ্ধি পেলে যদি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা স্থির থাকে তবে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এর ফলে যে দাম বৃদ্ধি পায় তাকে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

৬৬.৫ মুদ্রাস্ফীতির কারণ

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌দের মত ঃ মুদ্রাসস্ফীতির কারণ হিসাবে ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদ্‌রা অর্থের যোগান বৃদ্ধিকেই দায়ী করেছেন। অর্থের পরিমাণতত্ত্ব অনুসারে তাঁরা দেখিয়েছেন যে, কোনও দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে অর্থের যোগান যদি বাড়ে তাহলে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই একই হারে বাড়বে। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, অর্থের যোগান বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়ে না। কিন্তু যে দেশে পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা বজায় নেই সেখানে দামস্তর কেন বাড়ে তার কোনও ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক সময় দেখা যায় যে, অর্থের পরিমাণ একই থাকা সত্ত্বেও দামস্তর বাড়ছে। এরও কোনও ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না।

কেইন্‌সীর মত ঃ অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে, মুদ্রাস্ফীতির অর্থে যেহেতু দাম বৃদ্ধি পাওয়া তাই তার কারণ জিনিষপত্রের চাহিদা বৃদ্ধি এবং যোগানের সম্পূর্ণ অস্থিতিস্থাপকতা। দ্রব্যের যোগান স্থির থাকলে যদি চাহিদা বাড়ে তবেই জিনিষপদের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। দেশে পূর্ণনিয়োগ ব্যবস্থা বর্তমান থাকলেই দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। অর্থাৎ, কেইন্‌সীর তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে, শুধুমাত্র পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। পূর্ণ কর্মসংস্থান না থাকলে চাহিদা বৃদ্ধির প্রভাবে উৎপাদন বাড়বে, দাম নয়। কিন্তু বহু দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামো অনুন্নত হওয়ার দরুন অথবা উৎপাদনের কোনও গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের যোগান অস্থিতিস্থাপক হওয়ার দরুন চাহিদা বৃদ্ধির প্রভাবে উৎপাদন বাড়ে না। সেখানে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই দামস্তর বাড়তে থাকে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে কেইন্‌সের তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আধুনিক মত ঃ আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে, মুদ্রাস্ফীতি দু'রকমভাবে দেখা দিতে পারে। একটি চাহিদা বৃদ্ধির কারণে, অপরটি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে। উৎপাদন দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলে তাঁর প্রভাবে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। আবার উপাদানের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলেও তার প্রভাবে মুদ্রাস্ফীতি হবার সম্ভাবনা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি শ্রমের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকে তবে মজুরি বাড়বে। মজুরি বাড়লে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, জিনিষপত্রের দাম বাড়বে।

আবার উপকরণের জন্য বাড়তি চাহিদা না থাকলেও মুদ্রাস্ফীতি হ'তে পারে। ধরা যাক, শ্রমের বাজারে বাড়তি যোগান আছে। অর্থাৎ, বেশ কিছু শ্রমিক বেকার অবস্থায় আছে। কিন্তু শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে দরকষাকষির মাধ্যমে অতিরিক্ত মজুরি আদায় করতে পারে। এইভাবে শ্রমিকসংঘের মাধ্যমে যদি শ্রমিকরা বেশি মজুরি আদায় করতে পারে তাহলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরূপ জিনিষপত্রের দামও বৃদ্ধি পাবে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

শ্রমিকের মজুরি ছাড়া অন্যান্য উপাদানের দাম বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রাস্ফীতি হ'তে পারে, যেমন জ্বালানির দাম, কাঁচামালের দাম। পেট্রোলিয়াম জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারী দেশগুলি যদি সংঘবদ্ধভাবে পেট্রোলিয়ামের দাম বাড়ায় তবে যে দেশ পেট্রোল আমদানি করছে তার ব্যয় বাড়বে।

৬৬.৬ মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান

যখন কোনও দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে সেই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর সামগ্রিক যোগান ও সামগ্রিক চাহিদার মধ্যে যে ব্যবধান বা পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায় তাকে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান বলা হয়। একটি রেখাচিত্রের

সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আয়স্তর ও উল্লম্ব অক্ষে সামগ্রিক চাহিদা, অর্থাৎ ভোগব্যয়, বিনিযোগ ব্যয় ও সরকারের ব্যয়ের যোগফলকে পরিমাপ করা হয়েছে।

এখানে OT হল ৪৫° কোণ বিশিষ্ট রেখা এবং DD মোট চাহিদারেখা। DD রেখাটি OT রেখাকে A বিন্দুতে ছেদ করেছে। A বিন্দুতে দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগান OY_F, এই যোগান পূর্ণ নিয়োগ স্তরের যোগান। অর্থাৎ, যোগান আর বাড়ানো সম্ভব নয়। সুতরাং, মোট যোগান $OY_F = AY_F$। A বিন্দুতে মোট চাহিদা ও মোট যোগান সমান।

এখন কোনও কারণে যদি চাহিদার বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ চাহিদারেখা উপরের দিকে পরিবর্তন হয় তবে যোগানবৃদ্ধি না হওয়ার দরুন মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে। রেখাচিত্রে নতুন চাহিদা রেখা হ'ল DD^1। আয় যখন OY_F মোট যোগান আগের স্তরেই সীমাবদ্ধ আছে কিন্তু অতিরিক্ত চাহিদার দরুন AB হবে মুদ্রাস্ফীতিজনিত ব্যবধান।

পাশের রেখাচিত্র অনুযায়ী দ্রব্যের বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির কারণেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের উদ্ভব। এখন দ্রব্যসাগ্রীর চাহিদা যেহেতু মোট ভোগব্যয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় এবং সরকারের মোট ব্যয়ের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং, এই তিন প্রকার ব্যয়ের যে কোনও একটির বৃদ্ধি ঘটলেই চাহিদা বাড়বে। ভোবব্যয় বৃদ্ধি নানা কারণে ঘঠতে পারে। যেমন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, দেশের লোকের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতার বৃদ্ধি ঘটলে, নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার হ'লে ইত্যাদি। আবার, সরকারি ভোগব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটতে পারে। যেমন, সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আমোদ-প্রমোদ, রাজনৈতিক সভা-সমিতি, প্রশাসনিক কাজে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারেন। আবার, সরকারের বিনিয়োগ ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে পারে। যেমন, যুদ্ধ বাধলে, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে কিম্বা উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য সরকার নতুন টাকা ছাপিয়ে ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন। তখন মোট চাহিদা বাড়ে। এসব কারণেই মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। আবার দেশের বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিলেও বেসরকারি বিনিয়োগ ব্যয় বাড়বে। তাতেও মুদ্রাস্ফীতি হ'তে পারে। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান দুরকমভাবে দূর হ'তে পারে— প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে।

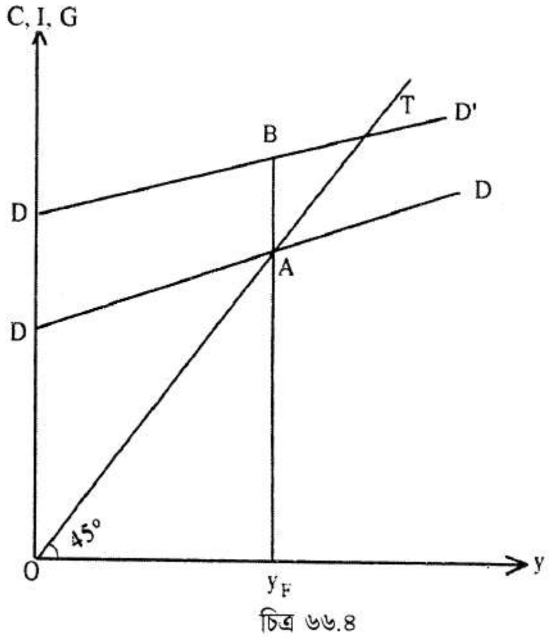

চিত্র ৬৬.৪

দেশের পরিবারগুলি যদি ভোগব্যয় কমিয়ে দেয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলি যদি বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস করে, তবে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমে যাবে। সরকারের আর্থিক নীতির প্রভাবেও মুদ্রাস্ফীতি কমতে পারে। যেমন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি ব্যাঙ্করেট বাড়িয়ে দেয় অথবা রিজার্ভ অনুপাতের হার বাড়িয়ে দেয় তবে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমবে। ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে জনসাধারণ কম করে টাকা ধার নেয় এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিও কম করে টাকা ধার দিতে উৎসাহী হয়। তার ফলে দেশে মোট ঋণ অর্থের যোগান কমে আসে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়। আবার সরকার যদি ব্যয় কমাতে সমর্থ হয় অথবা কর বাড়ায় তবে মুদ্রাস্ফীতি কমবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থায় নেওয়া যেতে পারে। সেগুলি পরে আলোচনা করা হবে।

এখন পরোক্ষভাবে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি কমতে পারে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকলে দ্রব্যসামগ্রীর দামবৃদ্ধি পায়, দামবৃদ্ধি পেলে পরিবারগুলির ক্রয়ক্ষমতা কমবে। কারণ, নগদ অর্থের প্রকৃত মূল্য বা মোট সম্পদের মূল্য হ্রাস পেলে ভোগব্যয় বা সামগ্রিক চাহিদা কিছুটা কমে যাবে।

দ্বিতীয়, দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেতে থাকলে ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে এই আশঙ্কায় পরিবারগুলি সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে।

তৃতীয়ত, যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় কিন্তু অর্থের পরিমাণ একই থাকে তবে অর্থ যোগানের প্রকৃত মূল্য কমে আসে। তখন অর্থের বাজারে সুদের হার বৃদ্ধি পায়। সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ ব্যয় কম হয়। বিনিয়োগ ব্যয় কমলে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কমবে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতির সময়ে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পায় বলে রপ্তানি কমবার ও আমদানি বাড়বার আশঙ্কা থাকে। ফলে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত নিট আয় কমে আসে। দ্রব্যসাগ্রীর চাহিদাও কমে আসে।

পঞ্চমত, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মুনাফা অপেক্ষাকৃত বেশি হারে বৃদ্ধি পায় ও মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হারে বাড়ে। যেহেতু মুনাফার তুলনায়, মজুরির বেশিরভাগই ভোগদ্রব্য ক্রয় করতে ব্যয়িত হয়, তাই এই বৈষম্যের ফলে ভোগ্যবয় হ্রাস পাবে।

মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের তত্ত্বের কিছু ত্রুটি আছে। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয় যে, মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান থাকলে দামস্তর বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু দামস্তর কি হারে বৃদ্ধি পাবে সে সম্পর্কে কোনও ধারণা এই তত্ত্ব দিতে পারে না।

এই তত্ত্বে দেখানো হয়েছে যে, পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় চাহিদা বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় যে, অনেক দেশে পূর্ণ নিয়োগ আসার আগেই দামস্তর বাড়ছে। সেই ব্যাখ্যা কেইন্‌সের এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। তাছাড়া পূর্ণনিয়োগ অবস্থা পরিমাপ করবারও অসুবিধা আছে।

পরিশেষে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের এই তত্ত্বটি একটি গতিহীন অবস্থাকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ, এই তত্ত্বের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

৬৬.৭ ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

কেইন্‌সের মুদ্রাস্ফীতি আলোচনায় মুদ্রাস্ফীতিজনক ব্যবধানের ধারণাটিই প্রধান। তিনি মুদ্রাস্ফীতির জন্য দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদাকেই দায়ী করেছেন। কিন্তু দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি না পেয়ে যদি শুধু উৎপাদন ব্যয় বাড়ে তার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উৎপাদনের উপকরণগুলির দাম বৃদ্ধি পেলে অথবা উৎপাদন-ক্ষমতা হ্রাস পেলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ স্বরূপ, শ্রমিকের মজুরির কথা বলা যেতে পারে। যদি শ্রমিকসংঘের চাপে মজুরির হার বাড়ে কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা না বাড়ে তবে উৎপাদনব্যয় বাড়বে। উৎপাদন ব্যয় বাড়লে দ্রব্যের দামও বৃদ্ধি পাবে।

এখন, কোন্ কোন্ অবস্থায় শ্রমিকসংঘ মজুরির হার বাড়াতে পারে তা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। যদি শ্রমিকের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হয়, অর্থাৎ মজুরির হার বাড়ালেও শ্রমিকের চাহিদা না কমে, তবে মজুরি বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু শ্রমিকের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হ'লে মজুরির হার বাড়ালে কর্মসংস্থান কমবে। আবার, শ্রমিক নিয়োগ করে যে দ্রব্যটি উৎপাদন করা হচ্ছে শ্রমিকের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা সেই দ্রব্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার ওপরেও নির্ভরশীল। সেই দ্রব্যের চাহিদা যত অস্থিতিস্থাপক হবে শ্রমিকের চাহিদাও তত অস্থিতিস্থাপক হবে।

বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে মজুরির পার্থক্য থাকলেও মজুরি বৃদ্ধির দাবি আসতে পারে। ধরা যাক্, কোনও বিশেষ শিল্পে শ্রমিকদের বেশি মজুরি দেওয়া হচ্ছে; কারণ, ঐ শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা বেশি এবং শ্রমিকদের দক্ষতাও বেশি। তখন যদি অন্যান্য শিল্পে মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দেওয়া হয় এবং সেইসব শিল্পে উৎপাদিত পণ্যের বাজার চাহিদা বা উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত শ্রমিকদের দক্ষতা যদি না বাড়ে তবে উৎপাদন ব্যয় বাড়বে। আবার, কোনও শিল্পে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান মজুরি বাড়ালে অন্যান্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানাবে। মজুরির হারকে আবার অনেক সময় জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়। জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক বাড়লে মজুরির হারও বাড়বে।

এখন মজুরির হার বাড়লে কি ফল হ'তে পারে দেখা যাবে। ধরি, একজন শ্রমিক ৮ টাকা মজুরিতে ৪ একক দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম এবং এই দ্রব্যটি উৎপাদন করতে শ্রম ব্যতীত অন্য কোনও উপকরণের প্রয়োজন নেই। সুতরাং, একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় ২ টাকা। এখন যদি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেয়ে ১৬ টাকা হয় কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা একই থাকে তবে উৎপাদন ব্যয় হবে ৪ টাকা। কিন্তু যদি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে তবে উৎপাদন ব্যয় কম হারে বাড়বে। ধরা যাক ১৬ টাকা মজুরি হওয়ার পর শ্রমিক ৫ একক দ্রব্য প্রস্তুত করছে তবে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হবে ৩ টাকা ২০ পয়সা। অর্থাৎ, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মজুরি বাড়লেও উৎপাদন ব্যয় কম হারে বাড়বে।

তবে, মজুরির হার বাড়লে অর্থের বাজারে প্রভাব দেখা যায়। মজুরি বৃদ্ধির ফলে যদি দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে তবে লেনদেনের জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। অর্থের চাহিদা বাড়বে। এখানে অর্থের যোগান যদি না বাড়ে তবে সুদের হার বাড়বে। সুদের হার বাড়লে বিনিয়োগ হ্রাস পাবে; উৎপাদন ও বিনিয়োগ কমবে। মজুরি বৃদ্ধি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হবে।

কিন্তু বেসরকারী বিনিয়োগ হ্রাস পেলেও যদি সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় বা সরকার অর্থের যোগান বাড়ায় তবে নিয়োগ কমবে না। সেক্ষেত্রে শ্রমিক সংঘ বেশি মজুরি আদায় করতে সক্ষম হবে।

৬৬.৮ চাহিদা বৃদ্ধি জনিত ও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য

চাহিবৃদ্ধিজনিত ও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে কয়েকটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

দ্রব্যের বাজারে বাড়তি চাহিদা থাকলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বাড়ানো লাভজনক। কিন্তু দেশে পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বজায় থাকলে নিয়োগ আর বাড়ানো যায় না। তখন উৎপাদনের উপকরণগুলির দাম বাড়ে। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরকম। এইক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসার আগেই মজুরির হার বা অন্যান্য উপকরণের দাম বৃদ্ধি পায়। ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। উৎপাদন ব্যয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে। কিন্তু চাহিদার পরিবর্তন না হওয়ায় দাম বাড়ে।

চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত চাহিদা দামকে টেনে তোলে। তাই ইংরাজিতে একে Demand-Pull-Inflation বলা হয়। কিন্তু ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে উৎপাদন-ব্যয় নিচের থেকে ঠেলা দিয়ে দামকে বাড়িয়ে দেয়। একে ইংরাজিতে বলা হয় Cost-Push-Inflation.

চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে উৎপাদনব্যয় অপরিবর্তিত আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। আবার ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে চাহিদার পরিমাণ স্থির আছে বলে ধরা হয়।

তত্ত্বগত দিক দিয়ে চাহিদাবৃদ্ধি জনিত ও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও বাস্তবে কোনও দেশের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদাবৃদ্ধি জনিত না ব্যয়বৃদ্ধি জনিত তা নির্ণয় করা মুশকিল হয়ে পড়ে। চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে। উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব না হ'লে অতিরিক্ত চাহিদার জন্য দ্রব্যের দাম বাড়ে। দ্রব্যেরদাম বাড়লে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি জানায়। সফল হ'লে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। আবার ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতির ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরি বা অন্যান্য উপাদানের দামবৃদ্ধির জন্য উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। ফলে দ্রব্যের দাম বাড়ে। তবে, এই পার্থক্য কার্যকরণ দিক থেকেই। দামবৃদ্ধি এবং মজুরিবৃদ্ধি একই সময়ে ঘটতে পারে। তখন দামবৃদ্ধির জন্য দামবৃদ্ধি ঘটেছে সে কথা বলা মুশকিল।

তবে চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত পূর্ণনিয়োগ স্তরে হয়। পূর্ণনিয়োগের আগেই মুদ্রাস্ফীতি হ'লে তাকে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়। পূর্ণনিয়োগের আগেই চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি বাড়বে। দামবৃদ্ধি পেলেও সাময়িকভাবে বৃদ্ধি পাবে। দামবৃদ্ধি স্থায়ী হবে না। তবে দেশে পূর্ণনিয়োগ আছে কিনা সেটি নির্ধারণ করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পূর্ণ নিয়োগ আছে, অর্থাৎ সবাই কাজ করছে তা নয়। কতজন শ্রমিক বেকার থাকলে বা দেশের মোট শ্রমিকের কত অংশ বেকার থাকলে পূর্ণনিয়োগ বলা যায় সে সম্পর্কে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

৬.৯ মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে মুদ্রাস্ফীতি বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। ক্রেতাদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তাদের পরিতৃপ্তি কম হয়। আবার জিনিষপত্রের বিক্রেতাদের লাভ বাড়ে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব মিশ্র।

(১) উৎপাদনের ওপর প্রভাব

(২) বণ্টনের ওপর প্রভাব

(৩) অন্যান্য প্রভাব

(১) উৎপাদনের ওপর প্রভাব ঃ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। কিন্তু যদি দেশে পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা বর্তমান থাকে তবে দাম বাড়লেও উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতিকেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি বা পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি বলে।

কিন্তু পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই যদি মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তবে অব্যবহৃত উপাদানগুলিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। সাধারণত প্রথমে ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে এবং পরে এর প্রভাবে মূলধন দ্রব্যেরও উৎপাদন বাড়ে। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার আগেই যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায় তাকে অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি বলে। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, মুদ্রাস্ফীতি মৃদুগতিতে হ'লেই তা উৎপাদনবৃদ্ধির সহায়ক হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার খুব দ্রুত হ'লে দেশের মুদ্রাব্যবস্থার ওপর ক্রেতাবিক্রেতার আস্থা হ্রাস পায়।

(২) বণ্টনের ওপর প্রভাব ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে আয় ও সম্পদের বণ্টনের কাঠামোতে নানারকম পরিবর্তন দেখা যায়। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কিছু শ্রেণীর মানুষ লাভবান হন আবার অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হন।

(৩) (ক) দেনাদার ও পাওনাদার ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময় পাওনাদাররা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দেনাদাররা লাভবান হয়। ঋণ দেবার সময় অর্থের ক্রয়ক্ষমতা বেশি থাকে এবং ঋণশোধের সময় সুদসহ বেশি টাকা ফেরৎ পাওয়া গেলেও টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যেতে পারে। সুদের হার চুক্তির দ্বারা নির্দিষ্ট হয়। দামস্তর বাড়লেও সুদের হার আর বাড়ে না। তাই সুদের প্রকৃত মূল্য মুদ্রাস্ফীতির ফরে হ্রাস পায়।

(৩) (খ) শ্রমিক ও উৎপাদক ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জিনিষপত্রের দাম বাড়লে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। তবে, সংগঠিত-শিল্পে শ্রমিক সংঘ আন্দোলনের মাধ্যমে আর্থিক মজুরি কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হয়। আর্থিক মজুরি বাড়লেও দাম যে হার বাড়ে সেই হারে আর্থিক মজুরি বাড়ে না; সুতরাং, প্রকৃত মজুরি কমে।

অন্যদিকে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপাদক বা মালিকের অতিরিক্ত আয় হয়। উপাদানের জন্য ব্যয় সেই তুলনায় নাও বাড়তে পারে। অনেক উপাদানের দামই চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত হওয়ায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে উপাদানগুলির দাম বাড়ে না। তখন উৎপাদকের লাভ হয়।

স্থির আয়ের ব্যক্তি ও পরিবর্তনশীন আয়ের ব্যক্তি ঃ

যে সব ব্যক্তির আয় স্থির মুদ্রাস্ফীতির সময় তাদের ক্ষতি হয়। যেমন বেতনভোগী কর্মচারী, পেনসনভোগী, বাড়ির মালিক প্রভৃতি। আর যাদের আয় বৃদ্ধির সুযোগ আছে তার আয় বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রতিরোধ করতে পারে। যেমন ব্যবসাদার শ্রেণীর মানুষেরা দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে আয় বাড়াতে পারে।

কৃষিজীবি ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম বাড়লে কৃষকেরা লাভবান হয়। তবে সেটি সবসময় সত্য নয়। কৃষকদেরও কৃষিকাজে ব্যবহারের জন্য সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। তাছাড়া নিজেদের ভোগ করার জন্য কাপড়, ভোজ্যতেল, চিনি, কেরোসিন ওষুধপত্র প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য কিনতে হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় এই সব দ্রব্যের দাম বাড়ে। সুতরাং, ফসলের দাম বাড়লেও কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মজুতদার ও ফাটকা কারবারী ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মজুতদার ও ফাটকা কারবারীর লাভ হয়। তারা কম দামে জিনিষ কিনে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে।

শেয়ারহোল্ডার ও ডিবেঞ্চার হোল্ডার ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে শেয়ারহোল্ডাররা লাভবান হয়। কারণ মুদ্রাস্ফীতির দরুণ কম্পানীর মুনাফা বৃদ্ধি পায়। শেয়ার হোল্ডারা বেশি ল্যাভ্যাংশ পায়। কিন্তু ডিবেঞ্চার হোল্ডাররা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কারণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়লেও ডিবেঞ্চার থেকে প্রাপ্ত সুদ পূর্বনির্দিষ্টি এবং বাড়ে না।

স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তি ঃ স্বয়ং নিযুক্ত পেশায় যাঁরা মুক্ত থাকেন মুদ্রাস্ফীতির সময়ে তাঁরা নিজেদের কি বাড়িয়ে দেন; যেমন ডাক্তার বা উকিল তাঁর ফি বাড়িয়ে দেবেন। এইভাবে স্বয়ং নিযুক্ত ব্যক্তিরা মুদ্রাস্ফীতির সময়ে নিজেদের আয় বাড়িয়ে ফেলতে পারেন যদি তাঁদের সেবার বাজারে চাহিদা থাকে।

অন্যান্য প্রভাব ঃ মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা যায়। দেশে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ায় দেশীয় শিল্পপতিরা বিদেশের বাজার থেকে দেশের বাজারেই দ্রব্য বিক্রি করতে বেশী পছন্দ করে। ফলে রপ্তানি কমে যায়। আবার, বিদেশী উৎপাদকেরাও দেশে দ্রব্য বিক্রি করতে উৎসাহী হয়। অতএব, আমদানি বেড়ে যায়।

মুদ্রাস্ফীতির সময় অর্থবান ব্যক্তিদের সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। জিনিষপত্রের দাম খুব বেশি থাকে বলে ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। লোকে জিনিষপত্র ক্রয় কমিয়ে দিয়ে সঞ্চয় করতে থাকে। একেই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় বলে। যদি মুদ্রাস্ফীতির হার খুব দ্রুত হয়, তবে অর্থের মূল্য দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে, জনসাধারণ তাদের সঞ্চয় অর্থের বদলে অন্য দ্রব্যের আকারে রাখতে চায়। ফলে, সোনা অথবা অন্য কোনো মূল্যবান ধাতু অথবা জমির ক্রয় বেড়ে যায়। এর ফলে মূলধন গঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় দামবৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের মজুরি কম হারে বাড়ে বলে অনেক সময় দীর্ঘ শ্রমিক আন্দোলন দেখা যায়। এর ফলে উৎপাদন ব্যহত হয়।

উপসংহারে বলা যায় যে, মুদ্রাস্ফীতির মৃদুহার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হ'লেও সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতি কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। মুদ্রাস্ফীতি একবার দেখা দিলে তাকে দমিয়ে রাখাও কঠিন। এর ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জনসাধারণ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৬.১০ মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ

দেশের অর্থনীতিতে বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ জরুরী। মুদ্রাস্ফীতিকে দু'ভাবে প্রতিরোধ করা যায়। প্রথমত, দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান বাড়িয়ে। দ্বিতীয়ত, চাহিদা হ্রাস করে। মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করার জন্য যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সেগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় ঃ ১) আর্থিক পদ্ধতি ২) রাজাস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ৩) অন্যান্য পদ্ধতি।

আর্থিক পদ্ধতি ঃ আর্থিক পদ্ধতিগুলির প্রয়োগকারী হ'লেন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রাব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করে। দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করাই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ, প্রথমত, মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের সুদের হার বা ব্যাঙ্ক রেট বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। উদ্যোক্তরা বিনিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। বিনিয়োগের পরিমাণ কমলে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়ত, টাকার যোগানের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল ব্যাঙ্ক ঋণ। সুতরাং, এর পরিমাণ কমানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে তাদের নগদ-আমানতের অধিক অংশ জমা হিসাবে চাইতে পারে। এর ফলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যায়। ঋণসৃষ্টির পরিমাণও কমে। সামগ্রিক চাহিদা কমে।

তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলা বাজারে সরকারী ঋণপত্র বিক্রি লোকের হাত থেকে নগদ টাকা তুলে নিতে পারে। জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা কমে গেলে এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ টাকা কমে গেলে ঋণসৃষ্টির পরিমাণ কমে যাবে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিও গ্রহণ করতে পারে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের জন্য ঋণ দিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিষেধ করতে পারে।

রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতি ঃ আর্থিক পদ্ধতি ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। অনেক সময় আর্থিক পদ্ধতির থেকে সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত পদ্ধতিই বেশি কার্যকর হয়।

প্রথমত, দেশের মোট ব্যয়ের মধ্যে সরকারী ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য সরকার নিজের ব্যয় কমাতে পারে। অনাবশ্যক ব্যয় বাদ দিতে পারে। প্রশাসনিক অপব্যয় বন্ধ করতে পারে। তবে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ-প্রকল্পগুলির কাজ সরকার বন্ধ করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যয় হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী ব্যয়ের পরিমাণও কমাতে হবে। বেসরকারী ব্যয় কামানোর একটি উপায় করের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং নতুন কর আরোপ করা। এর ফলে ব্যক্তি বা পরিবারগুলির হাতে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে যাবে।

তৃতীয়ত, সরকার জনসাধরণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। করের পরিমাণ খুব বেশি বাড়ালে সরকারকে সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়। তাই ঋণপত্র বিক্রিয় মাধ্যমেও সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে বাড়তি অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং চাহিদা হ্রাস করতে পারে। অনেক সময়ই উন্নয়নশীল দেশের সরকারের আয়ের থেকে ব্যয় বেশি হয় এবং নতুন অর্থ সৃষ্টি করে ঘাটতি ব্যয় মেটাতে হয়। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং তা মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে সরকারকে এই পথ পরিত্যাগ করতে হবে। নতুন অর্থের প্রচলন বন্ধ করতে হবে।

চতুর্থত, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় প্রকল্পও চালু করতে পারে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জনসাধারণকে তাদের আয়ের এক অংশ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করতে হয়। এতে ব্যয়যোগ্য অর্থের পরিমাণ কমে। মুদ্রাস্ফীতির অবসান ঘটলে সেই সঞ্চয় ব্যক্তিকে ফেরৎ দেওয়া হয়।

অন্যান্য পদ্ধতি ঃ আর্থিক পদ্ধতি ও রাজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতি আছে, যেমন উৎপাদন বৃদ্ধি। যদি পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা না থাকে তবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া আছে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি। সরকার অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য, যেমন খাদ্যশষ্য, ওষুধপত্র প্রভৃতির দাম নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আবার, রেশন ব্যবস্থার মাধ্যমে ন্যায্য মূলের দোকানে প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনসাধারণের কাছে বিক্রি করতে পারে।

মজুরিও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে শ্রমিকেরা মজুরি বৃদ্ধির জন্য চাপ দিতে থাকে এবং সফল হ'লে শ্রমিকের আয় এবং ব্যয় দুইই বাড়ে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ব্যয় বাড়ে। ফলে, জিনিষপত্রের দাম বাড়ে। জিনিষপত্রের দাম বাড়লে শ্রমিকরা আবার মজুরি বৃদ্ধির দাবী জানায়। এই দুষ্টচক্র প্রতিরোধ করার জন্য মজুরি বৃদ্ধি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এর প্রভাবে জিনিষপত্রের দাম না

বাড়ে। এর জন্য মজুরি বৃদ্ধি সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা যেতে পারে অথবা শ্রমিকদের এবং অন্যান্য চাকুরিজীবির অতিরিক্ত পাওনা সাময়িকভাবে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রকল্পের খাতে জমা রাখা যেতে পারে। আবার মুদ্রাস্ফীতির সময়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য মজুত করে রাখার প্রবণতা দেখা যায়। এতে জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কঠোর হাতে এইসব বেআইনী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

৬৬.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। পার্থক্য নির্ণয় করুন ঃ

(ক) পূর্ণ মুদ্রাস্ফীতি ও অর্ধ মুদ্রাস্ফীতি।

(খ) মুক্ত মুদ্রাস্ফীতি ও দমিত মুদ্রাস্ফীতি।

(গ) চাহিদাবৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি ও ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি।

২। মৃদুগতি সম্পন্ন মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে?

৩। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কিভাবে দূর করা যায়?

৪। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান কিভাবে দূর করা যায়?

৫। অর্থের পরিমাণ না বাড়লে কি মুদ্রাস্ফীতি হ'তে পারে?

৬। মজুরি বুদ্ধির ফলে কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে?

৭। কোন্ পরিস্থিতিতে মজুরি বৃদ্ধি পেলেও মুদ্রাস্ফীতি হবে না?

৮। দেনাদার ও পাওনাদারের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করুন।

৯। স্থির আয়ের ব্যক্তি ও পরিবর্তনশীল আয়ের ব্যক্তিকে মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে প্রভাবিত করে?

১০। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি আর্থিক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে?

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতি কত রকমের হয়? মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলি উল্লেখ করুন।

২। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধানের ধারণাটি বিশ্লেষণ করুন। এই ধারণাটির গুরুত্ব কি? এর ত্রুটিগুলি উল্লেখ করুন।

৩। উৎপাদন এবং আয় বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব আলোচনা করুন।

৪। কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা আলোচনা করুন।

৫। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে? বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।

নিম্নলিখিত উক্তিগুলি ঠিক না ভুল বলুন ঃ

১। অর্থনীতিবিদ্ কেইন্সের মতে, দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে যদি অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায় তবে দামস্তর বাড়বে।

২। শ্রমিকদের মজুরি অথবা অন্যান্য উপাদানের আয় বৃদ্ধি পেলে ব্যয়বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে।

৩। দামস্তর বৃদ্ধি পেলে নগদ অর্থের প্রকৃত মূল্য বেড়ে যায়।

৪। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা যায়। আয় এবং সম্পদের বণ্টন বৈষম্য দেখা যায়।

৬৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Branson W.H : An Introduction to Macro Economics

২। সরখেল জয়দেব (১৯৯৮) : আধুনিক অর্থনীতির ভূমিকা

৩। Tribedy Gopal (1976). : Introduction to Macro Economics Theory

৪। Samuelson & Nordhaus (1985) : Economics

৫। মিত্র জিতেন্দ্র কুমার (১৯৮৩) : আধুনিক অর্থনীতি ও পরিকল্পনা

৬। Ackley G : Macro Economic Theory

একক ৬৭ ◆ বিনিয়োগের ত্বরণ তত্ত্ব ও বাণিজ্য চক্র

গঠন

৬৭.১ উদ্দেশ্য

৬৭.২ প্রস্তাবনা

৬৭.৩ ত্বরণ তত্ত্ব

৬৭.৩.১ বিনিয়োগ

৬৭.৩.২ বিনিয়োগ সম্পর্কিত কেইনসীর তত্ত্ব

৬৭.৩.৩ ত্বরণ তত্ত্ব-ব্যাখ্যা

৬৭.৩.৪ সমালোচনা

৬৭.৪ সারাংশ

৬৭.৫ অনুশীলনী

৬৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আলোচনা করার পরে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- বিনিয়োগের অর্থ কী?
- মূলধন কাকে বলে?
- বিনিয়োগের পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

১. এ বিষয়ে কেইনসীয় ধারণা।

২. আধুনিক ধারণা—ত্বরণ তত্ত্ব

৩. ত্বরণ তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

৬৭.২ প্রস্তাবনা

সমষ্টিগত অর্থনীতিতে সমগ্র অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপ করা, দেশের মোট ভোগ ব্যয় ও সঞ্চয়, মোট বিনিয়োগ ব্যয় প্রভৃতি সমষ্টিগত আলোচনার

বিষয়। এ ছাড়া অর্থনীতির মোট কর্মসংস্থান ও আয়স্তর কিসের ওপর নির্ভর করে—আমাদের আলোচনার বিষয়। কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিনিয়োগ নির্ধারক বিষয়গুলি জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই এককে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৬৭.৩ ত্বরণ তত্ত্ব

৬৭.৩.১ বিনিয়োগ

বিনিয়োগ শব্দটির সঙ্গে আমরা খুবই পরিচিত এবং এই সঙ্গে মূলধন শব্দটিও খুব প্রাসঙ্গিক।

বিনিয়োগ নির্ধারক বিষয়গুলি আলোচনা করার আগে বিনিয়োগ ও মূলধন এ দুটি শব্দের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকার বিশেষ প্রয়োজন।

মূলধন উৎপাদনের একটি উপাদান। মোট উৎপাদনের যে অংশটি পুনরায় উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাকেই বলে মূলধন। কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূলধন-ভাণ্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ একটি প্রবাহ। মূলধন একটি সময় বিন্দুতে ও বিনিয়োগ একটি সময়কালে পরিমাপ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ সংকেতের সাহায্যে বলা যায় যে যদি O সময়বিন্দুতে বিনিয়োগের পরিমাণ K_o হয়, এবং 1 সময়বিন্দুতে বিনিয়োগের পরিমান k_1 হয়, তাহলে $K_1–K_o$ হবে O থেকে 1 সময়কালের বিনিয়োগ। ইহা ধনাত্মক ও ঋণাত্মক উভয়ই হতে পারে।

৬৭.৩.২ বিনিয়োগ সম্পর্কিত কেইনসীয় তত্ত্ব

কেইনসের মতে বিনিয়োগ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। তিনি মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ধারণার সাহায্যে বিনিয়োগ সুদের হারের উপর কীভাবে নির্ভর করে তা ব্যাখ্যা করেছেন। মূলধনী দ্রব্য থেকে গড়ে শতকরা কী হারে প্রতিদান পাওয়া যায় মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার সাহায্যে তা পরিমাপ করা হয়। সুদের হার ও মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার পারস্পরিক সম্পর্কের উপর বিনিয়োগ হার নির্ভর করবে। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হারের থেকে বেশি হলে ফার্ম অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগ করবে এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা সুদের হারের থেকে কম হলে, বিনিয়োগও কম হবে। যখন মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হার সমান হবে, তখন ফার্ম মূলধনের বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়বেও না, কমাবেও না।

মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা নির্ভর করে বিনিয়োগের প্রত্যাশিত আয় ও প্রত্যাশিত ব্যয়ের উপর।

৬৭.৩.৩ ত্বরণ নীতি

পরবর্তী অর্থনীতিবিদরা কেইনসের এই তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন এবং বিনিয়োগের ত্বরণ তত্ত্বের সাহায্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে, ব্যাখ্যা করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে ১৯১৭ সালে অর্থাৎ কেইনসের আগেই জন মরিস্ ক্লার্ক জার্নাল অফ পলিটিক্যাল ইকনমিতে **"Business Accelaration and Law of Demand"** শীর্ষক প্রবন্ধ ত্বরণ তত্ত্বের অবতারণা ও আলোচনা করেন। ত্বরণ তত্ত্বে মূলধন ভাণ্ডার ও উৎপাদন প্রবাহের সম্পর্কের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণ মূলধন ও উৎপাদনের আনুপাতিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করবে। কাম্য মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাতে তখনই পৌঁছানো যাবে, যখন মূলধনের পূর্ণ ব্যবহার করে লাভ সর্বাধিক করা যায় যখন কাম্য ও প্রকৃত মূলধন এবং উৎপাদনের অনুপাত সমান হবে,

তখনই ফার্মগুলি সর্বোচ্চ মুনাফা করবে এবং সামগ্রিকভাবে ফার্মগুলি তাদের বিনিয়োগ নীতি পরিবর্তন করবে না।

আমরা আগেই মূলধনের সংজ্ঞা আলোচনা করেছি। মূলধন একটি উৎপাদনের উপাদান। সুতরাং যে কোনও উৎপাদনের মতো মূলধনের চাহিদাও উদ্ভূত চাহিদা। অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদান যে দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেই দ্রব্যের চাহিদার উপর উৎপাদনের উপাদানের চাহিদা নির্ভর করে। কোনও দ্রব্যের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে সেই বাড়তি চাহিদা মেটানোর জন্য অধিক পরিমাণ উৎপাদনের উপাদানের প্রয়োজন হবে। ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায়, তাহলে অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হবে এবং অধিক পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য অধিক পরিমাণ মূলধন লাগবে। কারণ (১) উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, (২) প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।

ত্বরণ তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে যে কোনও দেশের বিনিয়োগের হার আয় পরিবর্তন বা ভোগব্যয়ের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। যদি ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আয় বৃদ্ধি ঘটলে মূলধনের চাহিদা বাড়বে এবং বাড়তি মূলধন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হলে, বিনিয়োগ হবে ধনাত্মক। সুতরাং ত্বরণ তত্ত্ব অনুসারে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ প্রত্যক্ষভাবে ভোগ্যদ্রব্য ব্যয় বা বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল।

এখন একটি উদাহরণের সাহায্যে এ বিষয়টি আমরা পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারি। মনে করা যাক্ কোনও একটি বস্ত্রশিল্পে ১০,০০০ টাকা মূল্যের সমান কাপড় তৈরি করার জন্য ৪০,০০০ টাকার সমান মূল্যের মূলধন ব্যবহার করা হয় এবং এই উৎপাদনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয় হয় দশ শতাংশ অর্থাৎ ৪০০০ টাকা। চাহিদা অপরিবর্তিত থাকলেও মূলধনের পরিমাণ একই রাখার জন্য এই ৪০০০ টাকা মূল্যের প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ করতে হবে। যদি কাপড়ের চাহিদা দশ শতাংশ বেড়ে ১১,০০০ টাকা মূল্যের সমান হয়, তাহলে মূলধনের চাহিদা বাড়বে (১) ৪০০০ টাকা মূল্যের প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ (২) বাড়তি ১০০০ ইউনিট চাহিদা মেটানোর জন্য ৪০০০ টাকা সমান মূল্যের নতুন বিনিয়োগ। মোট বিনিয়োগ বাড়বে ৮০০০ টাকা সমান মূল্যের। অর্থাৎ চাহিদা দশ শতাংশ বাড়ার ফলে বিনিয়োগ একশত শতাংশ বেড়ে যাবে। মূলধনজাত দ্রব্যের স্থায়িত্বের উপর বিনিয়োগের বৃদ্ধির হার নির্ভর করবে। প্রতিস্থাপনের ব্যয় যত বেশি হবে, বিনিয়োগ তত দ্রুত হারে বাড়বে।

ত্বরণ তত্ত্বটি কয়েকটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১। মূলধন ও উৎপাদনের অনুপাত (Capital-output ratio) স্থির। ফার্ম স্বচ্ছন্দে একটি ভারসাম্য অবস্থা থেকে অন্য একটি ভারসাম্য অবস্থায় পৌঁছায়।

২। ফার্মের কোনও অব্যবহৃত মূলধন নেই এবং ঋণ পাওয়ার কোনও অসুবিধা নেই।

৩। কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফার্মের একটি সর্বোত্তম মূলধন ভাণ্ডার আছে। মূলধনজাত দ্রব্যগুলি বিভাজ্য।

৪। সুদের হার, মজুরির হার, উৎপন্ন দ্রব্যের হার স্থির আছে বলে ধরা হয়।

এই অনুমানগুলির ভিত্তিতে আমরা ত্বরণ তত্ত্বকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি।

আমাদের পূর্বোক্ত আলোচনা অনুসারে কাম্য মূলধন ভাণ্ডার K ফার্মের কাম্য উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ K কাম্য মূলধন ভাণ্ডার, V, অর্থাৎ মূলধন ও উৎপন্ন অনুপাতের সর্বোত্তম মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কটি একটি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়—

$$K = vy$$

একটি বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে ফার্ম উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য মূলধন ভাণ্ডার বাড়িয়ে লাভ সর্বোচ্চ করার চেষ্টা করবে।

যদি t সময়ের মূলধনকে K_t এবং t সময়ের উৎপাদনকে আমরা y_1 বলি, তাহলে

$$\frac{K_t}{Y_t} = V \text{ বা } K_t = vy_t$$

এখন ধরা যাক্, t সময়ে অর্থনীতির মোট মূলধন ছিল K_t এবং এটিই সর্বোত্তম মূলধন হওয়ার জন্য আর বাড়তি মূলধনের কোনও প্রয়োজন ছিল না। এখন t + 1 সময়কালে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে $y_t + 1$ হল। এই পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী বৃদ্ধি করার জন্য সর্বোত্তম মূলধন ভাণ্ডার হবে।

$$K_{t+1} = Yy_{t+1}$$

যদি আমরা t + 1 সময়ের বিনিয়োগকে I_{t+1} দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে

$I_{t+1} = V(y_{t+1} - y_t)$

$y_{t+1} - y_t$ হল t+1 সময়ে উৎপাদিত দ্রব্যের বা আগের পরিবর্তন। এটিকে আমরা

Δy_{t+1} দ্বারা চিহ্নিত করতে পারি তাহলে

$I_{t+1} = V\Delta y_{t+1}$ সুতরাং I_{t+1} প্রত্যক্ষ ভাবে Δy_{t+1} এর উপর নির্ভরশীল। Δy_{t+1} যত বেশি হবে ও তত বেশি হবে It+1 নীট বিনিয়োগ প্রত্যাশিত উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম মূলধন ও উৎপাদিত দ্রব্যের আনুপাতিক হারের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সম্পর্ককেই **ত্বরণ গুণাঙ্ক** (Accelerator Coefficient) বলে।

ত্বরণ তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা যে আলোচনা করলাম তা থেকে জানা গেল যে বিনিয়োগকে একটি স্থির জায়গায় রাখার জন্য বিনিয়োগের সঙ্গে সমান গতিতে বিক্রয় বর্ধিত করতে হবে। যদি বিক্রয় বৃদ্ধির হার কোনও কারণে সমান গতিতে বৃদ্ধি না পায়, বিনিয়োগ আরও বেশি দ্রুত গতিতে হ্রাস পাবে। বিক্রয় কমে গেলে ফার্মগুলি কেবলমাত্র বিনিয়োগ বাড়ানো বন্ধই করবে না, ব্যবহৃত মূলধনী দ্রব্য বিক্রয় করে বিনিয়োগ মোচন (disinvestment) করতে পারে। এর ফলে মন্দা সৃষ্টির সম্ভাবনাও থাকে। এভাবে অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে।

ত্বরণ গতি উভয় ক্ষেত্রে, অর্থাৎ বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও হ্রাস, কার্যকরী হতে পারে।

৬৭.৩.৪ সমালোচনা

ত্বরণ কয়েকটি অনুমান ত্রুটিযুক্ত হওয়ার ফলে বাস্তব অভিজ্ঞতার সকল ক্ষেত্রে সবসময় প্রয়োগ করা যায় না।

প্রথমত, কাম্য মূলধন ও উৎপন্নের মধ্যে অনুপাতকে স্থির ধরে নেওয়া হয়েছে। মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ফার্ম কী ধরনের নীতি গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়নি।

দ্বিতীয়ত, ত্বরণ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে (১) ফার্মগুলির অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই, (২) ফার্মগুলি কোনও এক সময়ে তার মূলধন ভাণ্ডারকে সর্বোত্তম ভাণ্ডারের সমান করেছে, (৩) ফার্মগুলি সমস্তটাই বিনিয়োগ করে। মূলধন বিন্যস্ত করার সময় যে ফাঁক থাকতে পারে তা এক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

তৃতীয়ত, ত্বরণ তত্ত্বে উৎপাদনের কাজে মূলধনকেই একমাত্র উৎপাদনের উপাদান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যদি আমরা ধরে নিই উৎপাদনের কাজে দুটি উপাদান ব্যবহার করা হয় শ্রম এবং মূলধন—তাহ'লে বাড়তি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা মূলধন বৃদ্ধি না করে অতিরিক্ত শ্রম নিযুক্ত করেও মেটানো যায়।

ত্বরণ তত্ত্বে যেহেতু ফার্মের সর্বোত্তম লাভের জন্য কোনও বিশেষ ধরনের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি, সেহেতু এই তত্ত্ব কেবলমাত্র স্বল্পকালীন বিনিয়োগের মাত্রা নির্ধারক বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে।

৬৭.৪ সারাংশ

কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধিকে বিনিয়োগ বলে। বিনিয়োগ একটি প্রবাহ, কেইনসের মতে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা ও সুদের হারই বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারক। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা নির্ভর করে মূলধনের প্রত্যাশিত আয় ও প্রত্যাশিত ব্যয়ের উপর। ত্বরণ তত্ত্ব অনুযায়ী দেশে বিনিয়োগের হার আয় পরিবর্তন বা উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর নির্ভর করে।

শব্দগুচ্ছ ঃ

মূলধন—উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ আবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মূলধন বলে।

বিনিয়োগ—মূলধন জাত দ্রব্যের জন্য ব্যয়কে বিনিয়োগ ব্যয় বলে। মূলধন ভাণ্ডারেও কোনও নির্দিষ্ট সময়ে যে বৃদ্ধি হয়, তাকেই বিনিয়োগ বলে।

উদ্ভূত চাহিদা—ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বাড়লে সেই দ্রব্য-উৎপাদনকারী উৎপাদনের উপাদানের যে চাহিদা হয়, তাকেই বিনিয়োগ বলে।

ত্বরণ তত্ত্ব—এই তত্ত্ব বিনিয়োগ নির্ধারক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। এই তত্ত্ব অনুসারে আয় ও উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদার উপর বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে।

গুণাঙ্ক—নীট বিনিয়োগ, প্রত্যাশিত উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি এবং সর্বোত্তম মূলধন ও উৎপাদিত দ্রব্যের হারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ককেই গুণাঙ্ক বলা হয়।

৬৭.৫ অনুশীলনী

নিজেকে যাচাই করে দেখুন—

১। মূলধন কাকে বলে?

২। বিনিয়োগ কাকে বলে? উদ্ভূত বিনিয়োগ কী?

৩। মূলধন ও বিনিয়োগের মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা কাকে বলে?

৫। ত্বরণ তত্ত্ব কাকে বলে?

৬। ত্বরণ তত্ত্বের ত্রুটিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

(খ) কোনটি ঠিক যাচাই করে বলুন—

১। ত্বরণ তত্ত্বে

(a) বিক্রয় বৃদ্ধি হ্রাস পেলে নীট বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

(b) বিক্রয় বৃদ্ধির হার কমে গেলে নীট বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

(c) নীট বিনিয়োগ হ্রাস পেলে বিক্রয় কমে যায়।

(d) নীট বিনিয়োগ বিক্রয় হ্রাসের-সঙ্গে আনুপাতিক হারে কমে।

২। ত্বরণ তত্ত্ব অনুসারে

১. মূলধন ভাণ্ডার ও বিক্রয় স্তরের মধ্যে স্থির সম্পর্ক আছে।

২. মূলধন ভাণ্ডার ও মজুদ বিনিয়োগের স্তরের মধ্যে স্থির সম্পর্ক আছে।

৩. মূলধন ভাণ্ডার ও লাভের স্তরের মধ্যে স্থির সম্পর্ক আছে।

৪. মূলধন ভাণ্ডার ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মধ্যে স্থির আছে।

গ্রন্থপঞ্জী

Samuelson P.A—Economics

Ackley. G—Macroeconomic : Theory & Policy

Branson W. H—Macroeconomic Theory & Policy.

একক ৬৮ ◆ বাণিজ্য চক্র

গঠন

৬৮.১ উদ্দেশ্য

৬৮.২ প্রস্তাবনা

৬৮.৩ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞা

৬৮.৩.১ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

৬৮.৪ বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তর

৬৮.৫ বাণিজ্য চক্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

৬৮.৫.১ হট্রের তত্ত্ব

৬৮.৫.২ কেইনসীয় তত্ত্ব

৬৮.৫.৩ হিক্‌সের তত্ত্ব

৬৮.৬ বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

৬৮.৭ সারাংশ

৬৮.৮ অনুশীলনী

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৬৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা প্রধানত নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উত্থান পতন সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করতে পারব—

- বাণিজ্য চক্র কাকে বলে?
- বাণিজ্য চক্র কেন ঘটে?
- বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরে অর্থনৈতিক কার্যাবলী কী ধরনের হয়?
- অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উত্থান পতন কী কী কারণে হতে পারে?
- এই পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায় কী?

৬৮.২ প্রস্তাবনা

আমরা এখন এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব। আমরা ত্বরণ তত্ত্ব আলোচনা করার সময় দেখেছি উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ও বিনিয়োগ উভয়েরই হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। প্রত্যেক শিল্পপণ্যোৎপাদী দেশ দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধারায় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর ওঠানামা বা অস্থিরতার সম্মুখীন হয়। এই অস্থিরতা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যাপৃত নানাবিধ পরিবর্তনীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা এখন এই উত্থান-পতন সম্পর্কিত বিষয়গুলি আলোচনা করব।

৬৮.৩ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞা

যখন একটি নিয়মানুসারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপে নিয়মিত উত্থান-পতন ঘটে, সেই অবস্থাকেই বাণিজ্য চক্র বলে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ কখনও বৃদ্ধি পায় আবার কখনও হ্রাস পায়। অর্থাৎ কখনও কখনও অর্থনীতির আয়, দামস্তর, কর্মসংস্থান, মুনাফা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই ঘটনা কিছু সময় পরে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আবার কিছু সময় পরে পূর্বাবস্থা ফিরে আসে। এইভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের চক্রাকারে হ্রাসবৃদ্ধিকে বাণিজ্য চক্র বলা হয়।

৬৮.৩.১ বাণিজ্য চক্রের সংজ্ঞার বিশ্লেষণ

বাণিজ্য চক্রের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, পরবর্তী পরিবর্তনে বীজ পূর্ববর্তী স্তরে অন্তর্হিত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যচক্রের গতি ও প্রকৃতির মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায় কিন্তু তারা অবিকল একই রকমের নয়। পরিবর্তনীয় অর্থনৈতিক বিষয়গুলির পরিবর্তন ও বাণিজ্যচক্রের স্থায়িত্ব বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে এরা যে এক পরিবারভুক্ত তা সহজেই বোঝা যায়। অধ্যাপক স্যামুয়েলসানের মতে ''Though not identical twins, they are recognizable as belonging to the same family.''

বিভিন্ন প্রকারের বাণিজ্য চক্র—সময় অনুযায়ী

বাণিজ্য চক্রের কালগত ব্যবধান সকল দেশে বা সকল সময়ে একই হয় না। সময়-সীমা অনুযায়ী বাণিজ্য চক্রকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

১। স্বল্পসময়ের বাণিজ্য চক্র—তিন চার বছরের স্থায়িত্ব।

২। মধ্যম সময়ের বাণিজ্য চক্র—আট থেকে দশ বছরের সময়সীমা।

৩। এর থেকে বেশি সময় বাণিজ্য চক্রকে দীর্ঘস্থায়ী বলা হয়। দীর্ঘস্থায়ী বাণিজ্যচক্র Kondratief Cycle নামেও পরিচিত। এই বাণিজ্য চক্রের স্থায়িত্ব গড় ৫৪ বছর।

বাণিজ্য চক্রের সময় সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা যায় না। বাণিজ্য চক্রের পরিবর্তনকে আমরা আবহাওয়া সংক্রান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

৬৮.৪ বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তর

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বাণিজ্যচক্রকে দুটি সন্ধিক্ষণে ভাগ করেন—(১) সমৃদ্ধি, (২) মন্দাবস্থা, অবনতি ও পুনরুন্নতি ও দুই বাঁকের (turning point) মধ্যবর্তী স্তর।

একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বাণিজ্য চক্রের রূপ বোঝানো যায়। এই রেখাচিত্রে আমরা অনুভূমিক অক্ষে সময়কাল ও উল্লম্ব অক্ষে অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিমাপ করছি। বাণিজ্য চক্র যেহেতু নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, একটি বাণিজ্য চক্র যেখানে শেষ হয়, অন্যটি সেখান থেকেই আরম্ভ হয়।

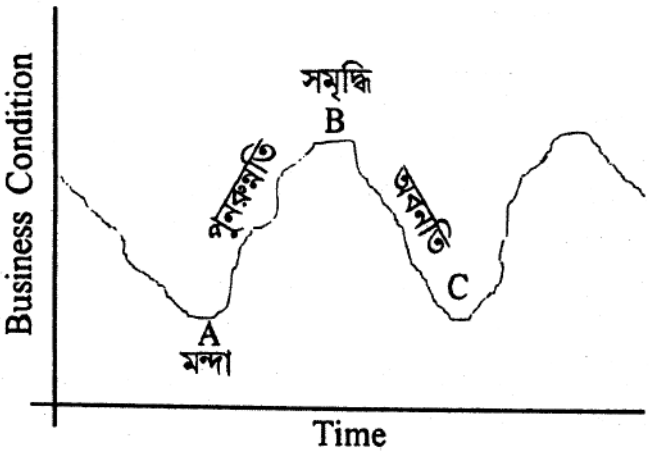

এই রেখাচিত্রে A বিন্দুটি হল মন্দাবস্থা—যেখানে আয় সর্বনিম্ন হয় এবং B হল সমৃদ্ধি বা শীর্ষ বিন্দু—যেখানে আয় সর্বোচ্চ হয়। A বিন্দুর পর থেকে আয় বাড়তে আরম্ভ করেছে অর্থাৎ পুনরুন্নতি শুরু হয়েছে। আবার B বিন্দুর পর থেকে আয়স্তর কমতে শুরু করেছে। B থেকে C এই অংশটিকে অবনতির স্তর বলা হয়।

কোনও একটি বাণিজ্যচক্রের শীর্ষবিন্দু থেকে নিম্নবিন্দুর উল্লম্ব দুরত্বকে বাণিজ্য চক্রের উচ্চতা বলা হয়। যখন বাণিজ্য চক্রের এই উচ্চতা মোটামুটি সমান থাকে তখন বাণিজ্য চক্রের একটি ঊর্ধ্বতম মাত্রা ও একটি নিম্নতম মাত্রা থাকে। বাণিজ্যচক্র এই ঊর্ধ্বতম মাত্রা ও নিম্নতম মাত্রার মধ্যেই ওঠানামা করে। সমৃদ্ধির সময় আয়, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সমস্ত কিছু সর্বোচ্চ থাকে। সমৃদ্ধি যতই তেজী হতে থাকে ততই উৎপাদনে উপকরণগুলির পূর্ণ নিয়োগ দেখা দেয় এবং একটি স্তরের পরে আর আয় বৃদ্ধি করা যায় না। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য নতুন বিনিয়োগ হয়। ঋণের চাহিদা বাড়ে, সুদের হারও বাড়ে। ব্যবসায়ীরা আশাবাদী হয়ে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে।

অবনতি—সমৃদ্ধি কিন্তু বেশিদিন টিকে থাকে না। বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক কার্যাবলী অর্থাৎ কর্মসংস্থান, উৎপাদন, লাভ ও সুদ সবই কমতে থাকে এবং অবনতির সুত্রপাত হয়। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে অতিরিক্ত উৎপাদন করে অথচ তদনুযায়ী চাহিদা না থাকায় মূল্যস্তর হ্রাস পেতে থাকে। অবনতির চরম অবস্থাকে মন্দা বলা হয়।

মন্দাবস্থা—মন্দা বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে অর্থনৈতিক কাজকর্মের মান সর্বাপেক্ষা

কম। এই সময় দেশে আয়স্তর, উৎপাদন, ও মূল্যস্তর কমে যায়, ভীষণভাবে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। চাহিদার অভাবে দ্রব্য সামগ্রী অবিক্রীত থাকে ফলে বিনিয়োগ হ্রাস পায় ও কর্মসংস্থান কমে যায়।

পুনরুন্নতি—বাণিজ্যচক্রের মন্দাবস্থার পরেই পুনরুন্নতি দেখা দেয়। মন্দাবস্থা কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্থনৈতিক কাজকর্ম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়। চাহিদাও বাড়তে থাকে। মন্দাবস্থার সময় ফার্মগুলির হাতে যে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল, সেগুলি ব্যবহার করা হয়। শ্রমিক সুলভ হয়। সুদের হারও হ্রাস পায়। এই বিষয়গুলিই মন্দাবস্থা থেকে পুনরুন্নতির সহায়ক হয়।

৬৮.৫ বাণিজ্য চক্র সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব

আমরা এতক্ষণ আলোচনা করলাম যে সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তনের ফলেই অর্থনৈতিক কার্যাবলী চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়। এখন প্রশ্ন এই যে বাণিজ্যিক কার্যাবলী এই চক্রাকারে পরিবর্তিত হওয়ার কোনও সাধারণ কারণ আছে কি না। এই সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌রা বিভিন্ন কারণের অবতারণা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে মতভেদও আছে।

অধিকাংশ তত্ত্বে স্থায়ী ভোগ্যদ্রব্য ও বিনিয়োগের পরিমাণ ও অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলির উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু বাহ্যিক কারণ অর্থাৎ জনসংখ্যা, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করে।

৬৮.৫.১ হট্রের তত্ত্ব

অধ্যাপক হট্রের মতে বাণিজ্যচক্র পুরোপুরি একটি আর্থিক ব্যাপার। হট্রে বিশ্লেষণ অনুযায়ী শুধুমাত্র অর্থের জোগানের প্রসার ও সংকোচনের ফলেই বাণিজ্য চক্র দেখা দিতে পারে। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ফলে অর্থের জোগানের যে নিয়মিত পরিবর্তন হয়, তারই ফলস্বরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটে।

হট্রে এই কার্যকারিতার জন্য তিনটি শ্রেণীর কার্যবলীর উপর গুরুত্ব দিয়েছেন—পাইকারি ব্যবসায়ী, উৎপাদক ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক। পাইকারি ব্যবসায়ীরা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে উৎপাদকের কাছ থেকে দ্রব্য সামগ্রী কিনে মজুত ভাণ্ডার তৈরি করে। পরে খুচরা ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুসারে জোগান দেয়। ব্যাঙ্কের সুদের হারের উপর ব্যবসায়ীদের মজুত ভাণ্ডারের আয়তন নির্ভর করে। সুদের হার বেশি হলে, মজুত ভাণ্ডার কম হবে। আর সুদের হার হ্রাস পেলে পাইকারি ব্যবসায়ীরা বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ নেবে এবং মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে। প্রথম ক্ষেত্রে মজুত ভাণ্ডার কমিয়ে দিলে, উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে—ফলে উৎপাদকরা কম উৎপাদন করবে এবং কম উপাদান নিয়োগ করবে। ফলে উপাদানের মালিকের আয় কমবে, চাহিদা আরও কমে যাবে, উৎপাদনও কমে যাবে। এইভাবে উৎপাদন ও আয়স্তর ক্রমাগত কমতে থাকে এবং সারাদেশে অবনতি ও মন্দা দেখা দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়ে দিলে বিপরীত অবস্থা সৃষ্টি হবে এবং সারা দেশে অর্থনৈতিক কাজকর্মে ঊর্ধ্বগতি দেখা দেবে। কিন্তু কিছুদিন পরে ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভ কমে যাওয়ার ফলে ব্যাঙ্কগুলি সুদের হার বাড়াতে বাধ্য হবে এবং আবার অবনতি শুরু হবে।

● **সমালোচনা—**

আধুনিক অর্থনীতিবিদরা হট্রের তত্তটি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন যে—

১। আর্থিক বিষয় ছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থা বর্হিভূত অন্য কতগুলি বিষয় যেমন—যুদ্ধ, বিপ্লব, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, নতুন প্রযুক্তিগত আবিষ্কার ইত্যাদিও অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে প্রভাবিত করে।

২। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ঋণব্যবস্থা অস্থিতিশীল। কিন্তু আধুনিক ব্যাঙ্কব্যবস্থায় এই অনুমান প্রযোজ্য নয়।

৩। বাস্তব মজুত ভাণ্ডার সুদের হার ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

৬৮.৫.২ কেইনসীয় তত্ত্ব

কেইনস্ বাণিজ্য চক্র সংক্রান্ত কোনও নতুন তত্ত্ব আলোচনা করেননি। তাঁর আয় ও কর্মসংস্থানের তত্ত্বের আলোচনা থেকে তাঁর বাণিজ্য চক্রের কার্যকরণ সম্পর্কিত ধারণা জানা যায়।

কেনইসের তত্ত্ব অনুযায়ী মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ওঠানামার উপরই বাণিজ্যচক্রের উত্থানপতন নির্ভর করে। নতুন বিনিয়োগ থেকে যে প্রতিদান পাওয়া যায় তার শতকরা হারকেই মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বলে। মূলধনের দক্ষতা অনেকাংশে উৎপাদকদের প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে। যদি উৎপাদকদের বাজারের সম্প্রসারণ সম্পর্কে নিরাশাবাদী মনোভাব পোষণ করে, প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে উৎপাদকরা যদি বাজারে অবস্থা সম্পর্কে নিরাশাবাদী মনোভাব পোষণ করে, প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পাবে। এটি অনেকাংশে মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা। কেইনস্ বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যায় উৎপাদকদের এই প্রত্যাশার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কেইনসীয় তত্ত্বে বিনিয়োগকারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কেইনসেক মতে সামগ্রিক চাহিদা ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টি দ্বারা নির্ধারিত হয়। ভোগ অপেক্ষকের ধারণায় আমরা পরিষ্কারভাবে দেখেছি যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা সবসময়েই ১(একের) কম হয় অর্থাৎ জাতীয় আয় যে হারে বাড়ে না। ফলে উৎপাদিত দ্রব্য অবিক্রীত থাকে এবং ব্যবসায়ীরা প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জন করতে পারে না। ব্যবসা-জগতে নিরাশার সৃষ্টি হয় এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা হ্রাস পায়। ফলস্বরূপ বিনিয়োগের পরিমাণও হ্রাস পায়। গুণক প্রভাবে আয় ও কর্মসংস্থান কমতে থাকে। বিনিয়োগ যে হারে কমে আয়স্তর তার চেয়ে বেশি হারে কমে। এইভাবে বাণিজ্যচক্র তীব্র গতিতে চরম সঙ্কটে পৌঁছায়। মন্দাবস্থায় বিনিয়োগ কমতে কমতে যখন একটি নিম্নসীমায় পৌঁছায়, তখন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রতিস্থাপন বিনিয়োগ করতে হয়। এই নতুন বিনিয়োগের মধ্য দিয়েই পুনরুত্থান শুরু হয়। এই সঙ্গে গুণক প্রক্রিয়াও কার্যকরী হয়ে ওঠে। ফলে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ও বাণিজ্যচক্র ঊর্ধ্বমুখী হয়।

● **সমালোচনা—**কেইনসীয়-তত্ত্বে বাণিজ্যচক্র—প্রধানত মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার উপর নির্ভর করে এবং মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতা বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে। সুতরাং অনেক অর্থনীতি-বিদের মতে কেইনসীয় তত্ত্ব একটি মানসিক ব্যাখ্যা মাত্র। অর্থসংক্রান্ত বা অর্থসংক্রান্ত বহির্ভূত কোনও বিষয়ের উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

৬৮.৫.৩ হিকসের তত্ত্ব

অধ্যাপক হিকসের তত্ত্ব গুণক ও ত্বরণ দুই-এর পরস্পরের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিনিয়োগ পরিবর্তিত হলে গুণক প্রভাবে আয়স্তর পরিবর্তিত হয় এবং আয়স্তর পরিবর্তিত হয়ে ত্বরণের ফলে বিনিয়োগ পরিবর্তিত হয়। পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে চক্রাকারে অবনতি, উন্নতি, সম্প্রসারণ ও মন্দাবস্থা দেখা দেয়। হিকসের মতে কোনও দেশের বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভূত এবং উদ্ভূত বিনিয়োগ, এই দুভাবে ভাগ করা যায়। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ কয়েকটি বাহ্যিক কারণে যেমন জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ইত্যাদি কারণে বৃদ্ধি পায়। স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে গুণক প্রভাবের ফলে দেশের আয় বৃদ্ধি পাবে ও ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। আয় বৃদ্ধির ফলে ত্বরণ প্রভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং পুনরায় গুণক প্রভাব কাজ করবে ও তার ফলে আবার আয় বৃদ্ধি ঘটবে। এইভাবে আয় ও বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্ব গতি দেখা দেবে।

কিন্তু এই যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে উপরে তুলে ধরে রাখা, এই প্রক্রিয়া পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরের উপরে উঠতে পারবে না। এই স্তরে ওঠার পরে আবার অবনতি শুরু হবে কারণ ত্বরণ নীতি কার্যকারিতার ফলে বিনিয়োগের হার হ্রাসমান হয়ে যাবে। গুণক ও ত্বরণের কার্যকারিতার সমন্বয়ে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উত্থান ও পতন হবে। যখন উৎপাদনের পরিমাণ দ্রুত কমে যায়, তখন ত্বরণের কার্যকারিতার ফলে বিনিয়োগ ঋণাত্মক হবে। কিন্তু যন্ত্রপাতি ইত্যাদি জনিত বিনিয়োগ কখনও ঋণাত্মক হতে পারে না। ফলে বিনিয়োগ কমতে কমতে নিম্নতম সীমায় পৌঁছবে। বিনিয়োগের নিম্নতম সীমা হল যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির পূরণের জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। এখানেই বাণিজ্য চক্রের আধোগতি বন্ধ হবে। এই অবস্থায় আবার বিনিয়োগ বাড়তে শুরু করবে এবং নতুন বাণিজ্যচক্র শুরু হবে।

আমরা এখানে আলোচনা করলাম যে বাহ্যিক কারণে বাণিজ্য চক্রের আবর্তন শুরু হল। কিন্তু আরম্ভ হওয়ার পরে ত্বরণ ও গুণক সহ-অভ্যন্তরীণ কারণসমূহের জন্যই বাণিজ্য চক্র চলমান থাকবে।

গুণক ও ত্বরণতত্ত্বের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে আয়ের পরিবর্তন কীভাবে হয়, নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে বোঝানো যায়।

	স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগ	উদ্ভূত ভোগ	উদ্ভূত বিনিয়োগ	সামগ্রিক আয়বৃদ্ধি
ভিত্তি বছর	০	০	০	০
১	১০	০	০	০
২	১০	৬.৭	১৩.৪	৩০.১
৩	১০	২০.০	২৬.৬	৫৬.৬
৪	১০	৩৭.৮	৩৫.৬	৮৩.৪
৫	১০	৫৫.৬	৩৫.৬	১০১.২

	স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগ	উদ্ভূত ভোগ	উদ্ভূত বিনিয়োগ	সামগ্রিক আয়বৃদ্ধি
ভিত্তি বছর	০	০	০	০
৬	১০	৬৭.৬	২৩.৮	১০১.৪
৭	১০	৬৭.৬	০.২	৭৭.৮
৮	১০	৫১.৮	১০.০০	৫১.৮
৯	১০	৩৪.৬	১০.০০	৩৪.৬
১০	১০	২৩.০	১০.০০	২৩.০
১২	১০	১০.২	১০.০০	১০.২
১১	১০	১৫.৪	১০.০০	১৫.৪
১৩	১০	৬.৮	৬.৮	১০.০
১৪	১০	৬.৬	+ ০.২	১৬.৮

আমরা এখানে অনুমান করে নিয়েছি যে প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা ২/৩ এবং ত্বরণ ৩ এবং একটি সময়ের ফাঁক (One period lag)—অর্থাৎ এক বছরের আয়বৃদ্ধি হলে পরবর্তী বছরে ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

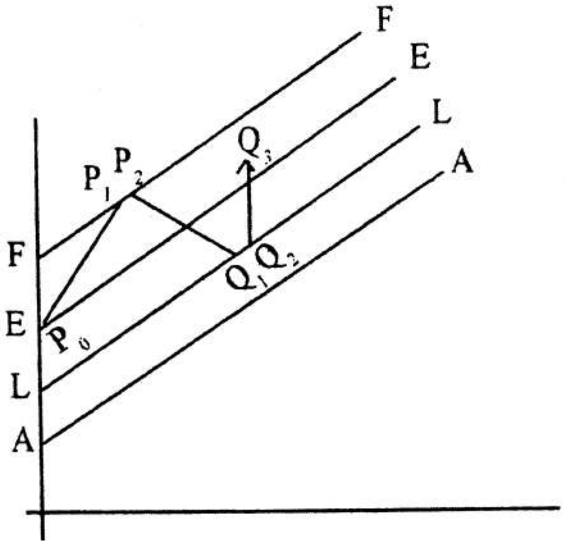

আরও অনুমান করে নেওয়া হয়েছে, (১) স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ বরাবর ১০ কোটি টাকাই থাকবে, (২) উৎপাদনের উপাদানের জোগান সীমাবদ্ধ নয় এবং (৩) পূর্ণ কর্মসংস্থানের কোনও সীমাবদ্ধতা (Ceiling) নেই।

কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা (Ceiling) থাকার দরুণ জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণও সীমিত হয়। এখন আমরা প্রফেসার হিকস প্রদত্ত রেখাচিত্রের সাহায্যে বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যা করব।

AA রেখা স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ নির্দেশ করছে। হিকসের অনুমান অনুসারে স্বয়ংক্রিয় বিনিয়োগ বৃদ্ধির হার এই রেখার ঢালের সাহায্যে বোঝা যায়। প্রান্তিক ভোগপ্রবণতার সাহায্যে আমরা গুণকের পরিমাণ নির্ধারণ করি। এরপর স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ ও গুণকের পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাত (interaction)-এর মাধ্যমে ভারসাম্য আয়ে পৌঁছানো যায়, LL রেখার সাহায্যে দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে আয়ের গতিধারা কীরকম হয় LL রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুণক ও ত্বরণের যৌথ প্রভাব জাতীয় আয়ের ভারসাম্য রেখা LL, AA রেখার উপরে অবস্থিত। FE রেখার দ্বারা পূর্ণ কর্মসংস্থান বা পূর্ণ নিয়োগের গতিপথ দেখানো হয়েছে। ধরা হয়েছে যে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে আয়বৃদ্ধির হার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ হারের সঙ্গে সমান। সেজন্য FF রেখাটি AA রেখার সমান্তরাল হিসাবে আঁকা হয়েছে।

ধরা যাক যে কিছু আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগ কিছুটা বৃদ্ধি পেল—এবং গুণক ও ত্বরণের যৌথ প্রভাবে জাতীয় আয় বা উৎপাদন P_0 থেকে বেড়ে P_1-এ পৌঁছায়। যখন আয় রেখাটি পূর্ণনিয়োগ সীমাকে P_1 বিন্দুতে ছেদ করবে, তখন এটি পূর্ণ নিয়োগ বাধার জন্য আর বাড়তে পারবে না। P_2 পর্যন্ত পূর্ণকর্মসংস্থান বরাবর আয়রেখা বৃদ্ধি পাবে। যখন পূর্ণকর্মসংস্থান অবস্থা আসে, তখন উদ্ভূত বিনিয়োগ আর বৃদ্ধি পায় না, ফলে মোট বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং গুণক বিপরীতমুখী হয়ে কাজ করে। বিনিয়োগ হার কমলেই উৎপাদন এবং আয়স্তর কমতে থাকে। মোট বিনিয়োগ হ্রাস পেতে পেতে নিম্নতম স্তর Q_1 বিন্দুতে নেমে আসে। তারপর আবার স্বয়ম্ভূত বিনিয়োগের বৃদ্ধি এবং গুণক ও ত্বরণের যৌথ প্রভাবে পুনরায় আয় বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতি দেখা দেয়।

৬৮.৬ বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

বাণিজ্যচক্রের কারণ ও বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌দের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই সঙ্কট অপরিহার্য। এই সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য দু ধরনের নীতিগ্রহণের কথা ভাবা যায় (১) প্রতিরোধমূলক, (২) প্রতিকারমূলক।

প্রতিরোধমূলক নীতি হিসাবে—চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য চেষ্টা করার প্রয়োজন উল্লেখ করা যেতে পারে। অভ্যন্তরীণ কারণগুলি ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। কিন্তু বাহ্যিক যে সব কারণ যেমন যুদ্ধ, বন্যা ইত্যাদি এগুলি নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং নিয়মিত ঘটে না।

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা—প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমেই বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিগুলিই আর্থিক নীতির অন্তর্গত। বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুধরণের নীতি গ্রহণ করে—

(১) পরিমাণগত ও (২) গুণগত।

(১) পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্দেশ্য হল প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি করা। ব্যাঙ্কগুলির রিজার্ভের উপর প্রভাব আরোপ করে এই নীতিকে কার্যকরী করা হয়। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তিন ধরনের নীতি গ্রহণ করে (১) ব্যাঙ্ক রেট, (২) খোলাবাজারে

ঋণপত্র ক্রয় ও বিক্রয় ও (৩) রিজার্ভের অনুপাতের পরিবর্তন। বাণিজ্যচক্রের উর্ধ্বগতির সময় ব্যাঙ্করেট বাড়ানো হয়। ফলে ঋণের পরিমাণ হ্রাস পায় ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হ্রাস পায়। খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয় করে ও রিজার্ভের অনুপাত বাড়িয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান করার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ফলে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ কমে যাবে ও ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পাবে। বাজারে চাহিদা কমে যাবে ও বাণিজ্য চক্রের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রিত হবে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির সময় ব্যাঙ্ক রেট হ্রাস, খোলাবাজারে ক্রয় ও রিজার্ভের অনুপাত কমিয়ে জনসাধারণের হাতে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাবে ও বাণিজ্যচক্রের আধোগতি বন্ধ হবে।

২। গুণগত নিয়ন্ত্রণ নীতির সাহায্যে বিশেষ ধরনের ঋণের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিশেষ ধরনের কার্যকলাপ বা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই নীতি অনুসরণ করা হয়।

আর্থিক নীতির সাহায্যে বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণ করা সবসময় সম্ভব হয় না। কারণ এই নীতির কার্যকারিতা প্রত্যক্ষভাবে হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি অন্য ব্যাঙ্কগুলি অনুসরণ করলে তবেই এই নীতি কার্যকরী হতে পারে।

রাজস্ব-নীতি (Fiscal policy)

কেইনসের মতে আর্থিকনীতি বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ সফল হয় না। বিশেষ করে মন্দাবস্থা দেখা দিলে আর্থিক নীতির সাহায্যে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। মন্দার সময় নগদপছন্দ রেখাটি আনুভূমিক রেখার সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে থাকে। ফলে অর্থের জোগান যতই বাড়ুক না কেন সুদের হার আর কমে না এবং বিনিয়োগও বাড়ে না। সুতরাং সুদের হার কমিয়ে মন্দাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। কেইনস সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি বা রাজস্ব সংক্রান্ত রীতি কার্যকরী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বাণিজ্যচক্র বিরোধী রাজস্ব নীতির মাধ্যমে বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এই নীতির মূল বিষয় হল যে ঊর্ধ্বগতির সময় সামগ্রিক চাহিদা কমাতে হবে ও নিম্নগতির সময় সামগ্রিক চাহিদা বাড়াতে হবে। ঊর্ধ্বগতির সময় ভোগব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় কমাতে হবে। ভোগব্যয় কমানোর জন্য সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে অতিরিক্ত কর সংগ্রহ করতে পারে, ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পেলে, ঊর্ধ্বগতি প্রশমিত হবে। অন্যদিকে অবনতির সময় জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়া নানাবিধ নির্মাণমূলক কাজ—যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে অর্থের জোগান বাড়িয়ে সরকার সামগ্রিক চাহিদা বাড়িয়ে বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি প্রশমিত করতে পারে।

আর্থিক নীতি ও রাজস্বসংক্রান্ত নীতি ছাড়া আরও কয়েকটি প্রত্যক্ষ নীতি যেমন মজুরি নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বাণিজ্য চক্রের নিয়ন্তণ করার জন্য গ্রহণ করা হয়।

বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতিগুলি দ্রুত গ্রহণ করা যায় না ও সামগ্রিক চাহিদা প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

উপসংহারে বলা যায় যে বাণিজ্যচক্রকে নির্মূল করা সম্ভব নয়।

৬৮.৭ সারাংশ

কোনও দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যে নিয়মিত উত্থান-পতন ঘটে তাকেই অর্থনীতিতে বাণিজ্যচক্র বলে। বাণিজ্যচক্রের চারটি পর্যায় দেখা দেয়—মন্দাবস্থা, পুনরুন্নতি, সমৃদ্ধি এবং অবনতি। অর্থনীতিবিদরা বাণিজ্য চক্রের কারণ নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। হট্রের তত্ত্ব অনুসারে অর্থের যোগান বাড়া কমার জন্যই বাণিজ্যে উত্থান পতন দেখা যায়। কেইনসের মতে মূলধনের প্রান্তিক দক্ষতার ওঠানামার জন্যই বাণিজ্যচক্র ঘটে। হিক্‌সের মতানুযায়ী গুণক ও ত্বরণের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য বাণিজ্যচক্র ঘটে। বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়।

শব্দগুচ্ছ ঃ

বাণিজ্য চক্র—কোনও দেশের—অর্থনৈতিক কার্যকলাপে যে নিয়মিত উত্থানপতন ঘটে তাকেই বাণিজ্যচক্র বলে।

স্বয়ম্ভুত বিনিয়োগ—যদি বিনিয়োগ কোনও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর না করে, তাহলে সেই বিনিয়োগকে স্বয়ম্ভুত বা স্বাধীন বিনিয়োগ বলা হয়।

উদ্ভুত বিনিয়োগ—বিনিয়োগের পরিমাণ যদি আয়স্তর, সুদের হার বা কোনও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহলে তাকে উদ্ভুত বিনিয়োগ বলা হয়।

গুণক—স্বয়ম্ভুত ব্যয় বৃদ্ধি পেলে দেশের ভারসাম্য আয়স্তর যতগুণ বৃদ্ধি পায়, তাকেই গুণক বলে।

আর্থিক নীতি—অর্থের পরিমাণ ও সুদের হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে যে নীতি, তাকে আর্থিক নীতি বলে।

রাজস্ব নীতি (fiscal policy)—বাজেটের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারি আয়ব্যয়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে কাম্য পরিবর্তন আনার জন্য সরকারের গৃহীত নীতিকে বাজেট নীতি বলা হয়।

৬৮.৮ অনুশীলনী

১। বাণিজ্য চক্র কাকে বলে? বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়গুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। মন্দা ও সমৃদ্ধি বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।

৩। বাণিজ্য চক্র সম্পর্কিত হিক্‌সের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪। বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন।

- **কোনটি ঠিক যাচাই করে বলুন—**

১। বাণিজ্যচক্র বলতে বোঝায়

ক। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর বার্ষিক ওঠানামা।

খ। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পৌনঃপৌনিক পরিবর্তন যা নির্দিষ্ট সময়ে হয় না এবং একবছরেও কম সময়ের জন্য হয়।

গ। অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পৌনঃপৌনিক পরিবর্তন যা নির্দিষ্ট সময়ে হয় না এবং অন্তত ১ বছরের বেশি সময়ে জন্য হয়।

ঘ। দীর্ঘকালীন ধারা থেকে অর্থনৈতিক কার্যাবলির বিচ্যুতি।

২। **বাণিজ্যচক্রের সঙ্কোচনের সময়—**

ক। বেকারত্ব, সুদের হার ও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায়।

খ। অর্থনৈতিক কার্যাবলী, সুদের হার ও কর্মসংস্থানের স্তর বৃদ্ধি পায়।

গ। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, সুদের হার ও কর্মসংস্থানের স্তর হ্রাস পায়।

ঘ। মূল্যস্তর, সুদের হার ও কর্মসংস্থানের স্তর হ্রাস পায়।

৬৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

Samuelson P. A. — Economics

Ackley G — Macroeconomic Theory

Dornbush. R, Fischer S—Macroeconomics

একক ৬৯ ◆ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ও আর্থিক নীতি

গঠন

৬৯.১ উদ্দেশ্য

৬৯.২ প্রস্তাবনা

৬৯.৩ আর্থিক নীতির হাতিয়ার সমূহ

৬৯.৩.১ আর্থিক নীতির হাতিয়ার সমূহ

৬৯.৪ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা

৬৯.৪.১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

৬৯.৪.২ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

৬৯.৫ সারাংশ

৬৯.৬ সারাংশ

৬৯.৭ অনুশীলনী

৬৯.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৬৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে পারব।

- আর্থিক নীতি বলতে কী বোঝায়?
- আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য কী?
- আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কী কী হাতিয়ার ব্যবহার করে?
- আর্থিক বাজার—সংগঠিত ও সংগঠিত ও অসংগঠিত।
- কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও তার কার্যাবলী।
- বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ও তার কার্যাবলী।

৬৯.২ প্রস্তাবনা

আমরা পূর্ববর্তী এককে আলোচনা করে দেখেছি যে অর্থনৈতিক উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা অর্থাৎ ক্রয়-

ক্ষমতা অনেকাংশে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর উত্থান পতনকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করা যায় ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব বজায় রাখা যায়। আর্থিক নীতি কিভাবে এইভাবে অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করে আমরা এই এককের শেষে সেই সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।

৬৯.৩ আর্থিক নীতি — সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ

অর্থের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে যে নীতি, তাকেই আর্থিক নীতি বলা হয়। কেইনসীয় মত অনুসারে অর্থের যোগানের পরিমাণ সমস্ত রকমের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনশীল বিষয়গুলি, যেমন কর্মসংস্থান, উৎপন্ন দ্রব্য, সুদ, মূলস্তর ইত্যাদির উপর প্রভাব ফেলে। অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সুদের হার কমিয়ে বিনিয়োগ ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাবে ও জাতীয় আয়ের স্তর উন্নীত হবে।

কোনও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আর্থিক নীতি পরিচালনা করার প্রধান দায়িত্বে থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে অর্থপ্রচলন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাছাড়া সুদের হার পরিবর্তনের ক্ষমতাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত হয়। বর্তমানে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক দ্বারা সৃষ্ট আমানত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। সুতরাং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি দ্বারা প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করে। এই হাতিয়ারগুলি আর্থিক নীতির অঙ্গ বিশেষ।

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্য

আর্থিক নীতির উদ্দেশ্যগুলি সব দেশেই মোটামুটি একই ধরনের এবং এই উদ্দেশ্যগুলিকে সাধারণভাবে ৬টি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। সম্ভাব্য উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার।

২। পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা।

৩। উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করা।

৪। মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় রাখা।

৫। সম্পদ বন্টনে বৈষম্য কমানো।

৬। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা।

এখন আমরা আর্থিক নীতির সাহায্যে কিভাবে এই লক্ষ্যগুলিতে পৌছানো যায় তা আলোচনা করব।

১। উৎপাদনের উৎপাদনের যোগ্যতা অনুসারে পূর্ণ ব্যবহার করার (full capacity output) অবস্থা তৈরি করা আর্থিক নীতির একটি লক্ষ্য। অবশ্য এই ধারণাটি স্বল্পকালীন সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। উৎপাদনের উপাদানকে ক্ষমতানুযায়ী পূর্ণ ব্যবহার করার পরে চাহিদা বৃদ্ধি পেলেও আরও উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান বাড়ানো যাবে না। ফলস্বরূপ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে। বিপরীত দিকে যদি সামগ্রিক চাহিদা (সেই সময়ের দাম অনুযায়ী) কম হয় তাহ'লে মন্দা দেখা দেবে ফলে উৎপাদন কম হবে এবং দাম আরও কমে যাবে। নিরপেক্ষ আর্থিক নীতি এই দুই চরম অবস্থাকেই পরিহার করার চেষ্টা করবে।

২। পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা আর্থিক নীতির অন্য আর একটি লক্ষ্য। অনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে নিয়মিত বাণিজ্যচক্র দেখা দেয়। এই বাণিজ্যচক্রের প্রভাবে কখনও আয়স্তর বাড়ে এবং কখনও আয়স্তর বাড়ে এবং কখনও আয়স্তর কমে। আয়স্তর পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরের কম হয়, বেকার সমস্যা বাড়ে। আর আয়স্তর যখন পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরকে অতিক্রম করে তখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ও বেকার সমস্যা দূর করার জন্য আর্থিক নীতিকে কার্যকরী করার জন্য নানাবিধ হাতিয়ার ব্যবহার করা হয়। এই হাতিয়ারগুলির সাহায্যে সমৃদ্ধির সময় যখন মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে আয়স্তরও খুব বাড়তে থাকে, তখন আয়স্তর কমানোর জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ কতগুলি হাতিয়ার ব্যবহার করেন। আবার মন্দাবস্থায় যখন আয়স্তর খুব কম থাকে, তখন আয়স্তর বাড়াবার জন্যও কতগুলি হাতিয়ার আর্থিক কর্তৃপক্ষের আছে।

৩। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হল অর্থনৈতিক সাহায্য করা। সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাহায্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। সুতরাং আর্থিক নীতির সাহায্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ানো যায়। সুদের হার কমালে বিনিয়োগ বাড়বে এবং উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পাবে। তেমনি ভাবে সঞ্চয় বাড়ানোর জন্যও ভোগপণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ হ্রাস ইত্যাদির জন্য নানারকম নীতি গ্রহণ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রক্রিয়াটিকে সাহায্য করার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেক্ষেত্রে এই পরিকল্পনাকে সফল করা আর্থিক নীতির লক্ষ্য হয়।

৪। মূল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় রাখা—আর্থিক নীতির এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। সম্ভাব্য সর্বাধিক উৎপন্ন দ্রব্যের স্তরে দীর্ঘকালীন মূল্যস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে পারলে আর্থিক নীতির অন্যান্য লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে উঠবে। নিরপেক্ষ আর্থিক নীতির (Neutral money) সাহায্যে এই দুটি লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন করা যায়।

৫। সম্পদ বন্টনে বৈষম্য কমানো—অনিয়ন্ত্রিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য দেখা যায়। এই সম্পদ ও আয় বন্টনে সমতা নিয়ে আসা আর্থিক নীতির আরও একটি লক্ষ্য।

বৈদেশিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখাও আর্থিক নীতির অন্যতম লক্ষ্য। যদি দেশের রপ্তানি আমদানির থেকে বেশি হয় তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দেয় অন্যদিকে যদি আমদানি রপ্তানির থেকে বেশি হয়, বাণিজ্যে ঘাটতে দেখা দেয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা আর্থিক নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ বিনিময়ের হার নিয়ন্ত্রণ, আমদানির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাহায্য নেয়।

আর্থিক নীতির বিভিন্ন লক্ষ্যগুলির একই সঙ্গে পূরণ করার ক্ষেত্রে অনেক সময় সংগঠন জনিত সমস্যা দেখা দেয়। মনে করা যাক অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যালান্সে ভারসাম্য রাখার লক্ষ্যে আর্থিক নীতির হাতিয়ার ব্যবহার করা হল। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সামগ্রিক চাহিদা ও সামগ্রিক যোগানের প্রয়োজন। সুদের হার কমিয়ে ও অর্থের যোগান বাড়ানোর ফলে কর্মসংস্থান ও আয়স্তর বৃদ্ধি পেল। এদিকে বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য আমদানি ও রপ্তানির সমতা প্রয়োজন। কিন্তু আয়স্তর বৃদ্ধির ফলে আমদানিজাত দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কেবলমাত্র আর্থিক নীতির সাহায্যে উভয় লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে দেশের প্রয়োজনে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, তার উপরই বিশেষ নজর দিতে হবে।

৬৯.৩.১ আর্থিক নীতির হাতিয়ার সমূহ

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। অর্থনীতির স্থায়িত্ব, উন্নয়ন বা প্রসার অনেকাংশেই ঋণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সুতরাং ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক নীতি রূপায়ণ করার দায়িত্বে থাকে। সুতরাং ঋণ নিয়ন্ত্রণের নীতি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই সময়ানুসারে গ্রহণ করে। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন ফাটকা কারবারিরা বেশি সুদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে অল্প মেয়াদে টাকা ঋণ নেয় এবং সেই টাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে। এর ফলে অত্যাবশ্যক দ্রব্য সামগ্রীর দাম ও ফাটকা কারবারির লাভ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণহ্রাস করে এবং কঠোর ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করে। আবার মন্দার সময় জিনিসপত্রের দাম কমত থাকে এবং উৎপাদকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি উৎসাহিত করার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি শিথিল করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করে সেগুলিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

১। পরিমাণগত বা সাধারণ নিয়ন্ত্রণ।

২। গুণগত বা নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণ এবং,

৩। নৈতিক প্রণোদন।

● **পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ**

পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা হয়। নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে ঋণদান করাকে উৎসাহ করা হয় বা কয়েকটি ক্ষেত্রে ঋণদান দিতে নিরুৎসাহ করা হয়। পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলি হল—

(ক) ব্যাঙ্ক রেট (হার)

(খ) খোলাবাজারে ক্রয় বিক্রয়

(গ) জমার অনুপাত পরিবর্তন

(ঘ) ঋণদানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ

(ক) ব্যাঙ্ক হারের পরিবর্তন — ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলির মধ্যে অতি পুরোনো ও বহু পরীক্ষিত পদ্ধতি হল ব্যাঙ্ক হার ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে হারে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের উপযুক্ত ঋণপত্র পুনর্বাট্টা (rediscount) করে তাকে ব্যাঙ্করেট বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান করার ক্ষমতা হ্রাস করতে চায়, তাহলে সে ব্যাঙ্ক-হার বৃদ্ধি করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য ব্যাঙ্কহার হ্রাস করবে। যখন জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে, ফাটকা কারবারিরা তাদের বিল বাট্টা (discount) করে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর মজুত ভাণ্ডার তৈরি করে। তখন বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ঋণপত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে পুনর্বাট্টা করে অর্থসংগ্রহ করে করে ঋণ দেয়। এই অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে (১) পুনবাট্টাকৃত মূল্য কমে

যায়, (২) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা কমে যায়, (৩) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ককে তাদের নিজস্ব সুদের হার বাড়াতে হয়, (৪) ব্যাঙ্ক হার বৃদ্ধি হলেই ইহা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ কমাতে দৃঢ়বদ্ধ, (৫) ঋণের চাহিদাও কমে যায়। অপরদিকে ঋণবৃদ্ধির প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-হার হ্রাস করে ও পূর্বোক্ত ঘটনার বিপরীত ঘটনা ঘটে ও ঋণ বৃদ্ধি পায়।

ব্যাঙ্ক রেট পদ্ধতি যদিও সবচেয়ে পুরোনো পদ্ধতি, ইহা দুর্বলতম পদ্ধতি। এই পদ্ধতির ত্রুটিগুলি (১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে যথেষ্ট উদ্বৃত্ত জমা থাকলে, ইহা কার্যকরী হবে না। (২) ব্যাঙ্ক রেট নীতি সরাসরি ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে না, (৩) এই নীতি অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক নয়, (৪) ব্যাঙ্ক-হার নীতি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

(খ) খোলাবাজারের কারবার ঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয়কেই খোলাবাজারের কারবার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় করলে ক্রেতাদের কাছে ঋণপত্র চলে আসে কিন্তু নগদ চলে যায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে। এর ফলে জনসাধাবণ ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ অর্থ হ্রাস পায়, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতাও হ্রাস পায়, সুদের হার বাড়ে, ঋণের চাহিদা কমে যায়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক খোলাবাজারে ঋণপত্র ক্রয় করে জনগণ ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে অর্থের পরিমার বাড়াতে পারে। ফলে সুদের হার হ্রাস পায় এবং ঋণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং খোলাবাজারের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষভাবে ঋণে চাহিদা হ্রাস বা বৃদ্ধি করাতে পারে।

যদিও খোলাবাজারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যাঙ্ক-রেট পদ্ধতি থেকে অধিক কার্যকর তবুও এই পদ্ধতিরও সীমাবদ্ধতা আছে যেমন, (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়া অব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে ঋণপত্র কিনতে বা বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারে না, (২) ব্যাঙ্কগুলির হাতে অতিরিক্ত রিজার্ভ থাকলে এই পদ্ধতি কার্যকরী হয় না, (৩) মূলধনের বাজার বিস্তৃত ও সুসংগঠিত না হলে এই পদ্ধতি কার্যকরী হবে না। (৪) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি ঋণপত্র থাকবে এবং (৫) সরকারি ঋণপত্রের পরিমাণ বেসরকারি ঋণপত্রের থেকে বেশি হবে।

(গ) পরিবর্তনশীল জমার অনুপাত—ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি তাদের আমানতের শতকরা যত অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে বাধ্য থাকে, তাকে বলা হয় বিধিসম্মত সর্বনিম্ন নগদ জমার অনুপাত (Legal Minimum Cash Reserve Ratio)। ব্যাঙ্কের মোট আমানত থেকে CRR বাদ দিলে যে আমানত থাকে এই ভিত্তিতেই ব্যাঙ্কগুলি ঋণের ভিত্তিতে আমানত তৈরি করতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক CRR হ্রাস করে এবং অন্যদিকে ঋণদানের ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য CRR বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ CRR বৃদ্ধি করলে অতিরিক্ত রিজার্ভ হ্রাস পায় ও কম করলে অতিরিক্ত রিজার্ভ বৃদ্ধি পায়। প্রথম ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস পায় ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

এই পদ্ধতির কয়েকটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করা যায়—(১) নগদ জমার হারে পরিবর্তন করলে সকল ব্যাঙ্ক সমানভাবে প্রভাবিত হয় না। (২) এই পদ্ধতি কেবলমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজিত হবে। (৩) নগদ জমার পরিবর্তনের সঙ্গে আনুপাতিক হারে কতটা রিজার্ভ বাড়বে বা কমবে

নিশ্চিত করে বলা যায় না।

(ঘ) ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ (Credit rationing)

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক সঙ্কটের সময় ব্যাঙ্কের ঋণের চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে দেয় ঋণের পরিমাণ সীমিত করে এবং কোনও কোনও সময়ে কেবলমাত্র স্বল্পকালীন মেয়াদি বিলে পুনর্বাট্টা দেয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাঙ্ক রেট ধার্য করে—

● গুণগত নিয়ন্ত্রণ

যে ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে ঋণের গুণগত মান বিচার করে প্রয়োজনীয় ঋণ অক্ষুণ্ণ রেখে, অপ্রয়োজনীয় ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে, তাকেই গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি বলে। নির্বাচনমূলক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হল একপ্রকার গুণগত নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বেছে বেছে ঋণ দেবার নির্দেশ দেয়। যদি জানা যায় যে ঋণগ্রহীতা ফাটকা কারবারে খাটানোর জন্য ঋণ নিতে চাইছে তখন ব্যাঙ্ক তাকে ঋণ দিতে অস্বীকার করতে পারে বা কঠোর শর্ত আরোপ করতে পারে।

নগদ মার্জিনের মাধ্যমেও ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সাধারণ শেয়ার বাজারে ফাটকার জন্য প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নগদ মার্জিনের পরিবর্তন করা হয়। মার্জিন বলতে বোঝায় শেয়ারের বা ঋণপত্রের দামের যে অংশ নগদে দিতে হবে। কম ঋণ দিতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মার্জিন বৃদ্ধি করে এবং বেশি ঋণ দিতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক মার্জিন কমিয়ে দেয়। এছাড়া ভোগ্যপণ্য কেনার জন্য ঋণ নিয়ন্ত্রণ, আমদানির আগে আমদানির মূল্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ জমা রাখতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নির্দেশ দিতে পারে।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কার্যকরী করার কতগুলি অসুবিধা আছে—(১) যে উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়া হয় তা অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে পারে। (২) প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হয়। (৩) অনুন্নত দেশের ঋণের বাজার সুসংগঠিত না হওয়া এই সমস্ত দেশে এই নীতি কার্যকরী করা যায় না।

● নৈতিক প্রণোদন

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সহযোগিতা করে সেইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে নানারকম সদুপদেশ ও নৈতিক প্রণোদন দিতে থাকে। নৈতিক প্রণোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপদেশ বা নির্দেশ মানার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কোনও আইনগত বাধ্যবাধ্যকতা নেই। তবে তার অনুরোধ ব্যাঙ্কগুলি রক্ষা করার এই আশায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নৈতিক প্রণোদন নীতিটি গ্রহণ করে। যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অনুরোধ অনুযায়ী কাজ না করে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

৬৯.৪ ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা

আমরা এর আগে আলোচনা করেছি যে আর্থিক ব্যবস্থায় অর্থের বাজার গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। অর্থের বাজার ও মূলধনী বাজার নিয়ে অর্থের বাজার গঠিত। এই দুটি বাজারেরই দুটি অংশ আছে— সংগঠিত ও অসংগঠিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, নন-ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলি সংগঠিত অংশের অন্তর্ভুক্ত।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই অংশকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। অসংগঠিত অংশ দেশীয় ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের নিয়ে গঠিত। এই অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত। তবে সংগঠিত অংশ বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংগঠিত অংশ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ ও গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ব্যাঙ্ক হল অর্থ ও ঋণের ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ হল জনগণের সঞ্চিত অর্থ আমানতের মাধ্যমে গচ্ছিত রাখা এবং সেই আমানত থেকে আমানতকারীদের প্রয়োজনমতো টাকা দেওয়া এবং আমানতকারীরা তাদের জমানো টাকার সমস্তটাই একসঙ্গে তুলে নেয় না বলে ব্যাঙ্ক সেই টাকা থেকে স্বল্পমেয়াদি ঋণও অগ্রিম দেয়।

ব্যাঙ্ক বিভিন্ন প্রকার হতে পারে—

১। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক
২। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক
৩। শিল্প ব্যাঙ্ক
৪। বিনিময় ব্যাঙ্ক
৫। সমবায় ব্যাঙ্ক
৬। উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

আমরা এখানে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

৬৯.৪.১ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। সর্বাধিক মুনাফা করাই হল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের লক্ষ্য সর্বোচ্চ মুনাফা নয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আর্থিক ক্ষেত্রের পরিচালক, বাণিজ্যিক ব্যবস্থার নিয়ামক ও অভিভাবক ও দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে এক জাগ্রত প্রহরী বিশেষ। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ সৃষ্টি করার একচেটিয়া ক্ষমতা ন্যস্ত করা থাকে। অর্থনৈতিক লেনদেনের জন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় সেই অর্থ প্রয়োজনমত সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির জমা আমানতের তত্ত্বাবধায়করূপে কাজ করে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে আইনানুগভাবে মোট জমা আমানতের এক অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে প্রয়োজনে, বিশেষ করে সঙ্কটের সময়, ঋণ নিতে পারে। এইজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা (lender of the last resort) বলা হয়।

৩। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সদস্য ব্যাঙ্কগুলির নিকাশঘরের কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি নিকাশঘরের মাধ্যমে পারস্পরিক দেনা পাওনা মেটায়। প্রত্যেকটি ব্যাঙ্ক একটি কেন্দ্রীয় আর্থিক ব্যবস্থার সুযোগ পায়।

৪। দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আর্থিক নীতি গ্রহণ করা এবং সেই নীতি প্রয়োগ করাই হল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান লক্ষ্য। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যে আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে তার

দ্বারা অর্থের চাহিদা, অর্থের জোগান, সুদের হার, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উৎপাদন আয়, দামস্তর—প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কাম্য পরিবর্তন আনে। এদিক থেকে দেখলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা যায়। বাজারে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৫। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক, অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শদাতা ও প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে। সরকার বিভিন্ন সূত্র থেকে যে অর্থ আদায় করেন, সেই অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের নির্দেশমত সরকারের অর্থ আদায় করেন। সেই অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের নির্দেশমত সরকারের অর্থ জমা রাখে ও সরকারের অর্থ ব্যয় করে। আবার প্রয়োজন হলে সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করে।

৬। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ও স্বর্ণভাণ্ডার রক্ষা করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের মুদ্রার সঙ্গে অন্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঘোষণা করে ও সেই হারের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। তাছাড়া দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৭। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ঋণ ও অর্থ সাহায্য করে। উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে ঋণের উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক পুনরায় অর্থ সাহায্য করে। ফলে পরিকল্পনার কাজ অব্যাহত থাকতে পারে।

৬৯.৪.২ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যাদের উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে বা যাদের ঘাটতি থাকে তাদের মধ্যে যোগসাধনের কাজ করে। সুতরাং আমানত গ্রহণ করা ও ঋণদান করা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যতম কাজ। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলি ঋণ দেবার জন্য কাজ করে। পোস্ট অফিস ব্যাঙ্ক নয়, কারণ আমানত জমা নিলেও ঋণ দিতে পারে না। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কার্যাবলিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১। আমানত গ্রহণ

২। অর্থ ঋণদান

৩। প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা

৪। সাধারণ সেবা

১। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের প্রধান কাজই হল লোকের সঞ্চিত অর্থ গচ্ছিত রাখা। একে বলে আমানত। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে তিন ধরনের আমানত রাখা যায়—(ক) স্থায়ী আমানত, (২) সঞ্চয়ী আমানত, (গ) চলতি আমানত।

(ক) স্থায়ী আমানত—ব্যাঙ্কে আমানত খোলার সময় মেয়াদ সম্পর্কে যে চুক্তি হয়, সেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর যে আমানতের টাকা পাওয়া যায় তাকে স্থায়ী আমানত বলে। স্থায়ী আমানতের উপর ব্যাঙ্ক বেশি হারে সুদ দেয়। অবশ্য সুদের হার সময়ের উপর নির্ভর করে।

(খ) সঞ্চয়ী আমানত—যে আমানতে যখন টাকা জমা রাখা যায়, কিন্তু সারাবছর নির্দিষ্ট বারের বেশি টাকা তোলা যায় না, তাকে সঞ্চয়ী আমানত বলে। এই আমানতে সুদের হার স্থায়ী আমানতের থেকে অনেক কম।

(গ) চলতি আমানত—যে আমানতে যে কোনও সময়ে টাকা জমা দেওয়া যায় এবং যতবার প্রয়োজন টাকা তোলা যায় তাকে চলতি আমানত বলে। চলতি আমানতে গচ্ছিত অর্থের উপর কোনও সুদ দেয় না। অনেক সময় চলতি আমানতে হিসাব রক্ষার ব্যয় বরাদ্দ কিছু ফি নেওয়া হয়।

২। ঋণদান—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের অন্যতম প্রধান কাজ ঋণদান করা। সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ব্যক্তিগত জামিন অথবা প্রতিশ্রুতি অথবা কোনও সম্পত্তির জামিনে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামে আমানত খোলে এবং সেই আমানত থেকে চেক কেটে অর্থ তোলার অধিকার দিয়ে আর্থিক সাহায্য দিতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সাধারণত চার ভাবে ঋণ দেয়, (ক) নগদ টাকার ঋণ, (খ) ওভার ড্রাস্টবিন্ (গ) ঋণ ও অগ্রিম, (ঘ) বিল বাট্টার সুযোগ।

(ক) **নগদ টাকার ঋণ**—ব্যাঙ্ক তার ঋণগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা তার অংশবিশেষ নগদ টাকা তোলার অনুমতি দ্বারা নগদ ঋণ মঞ্জুর করতে পারে। মঞ্জুরীকৃত ঋণের যে অংশ নগদ তুলে নেওয়া হয় তার উপর ব্যাঙ্ক ওভারড্রফট দেয়।

(গ) **ঋণ ও অগ্রিম**—বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণগ্রহীতাকে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ থোক টাকা মঞ্জুর করে, যে টাকা থেকে ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনমতো বা এককালীন টাকা তুলতে পারে তাকে ঋণ বলা হয়। ঋণের টাকা আগে দেওয়া হলে তাকে অগ্রিম বলা হয়।

(ঘ) **বিল বাট্টার সুযোগ**—ব্যাঙ্কগুলি দালালদের মাধ্যমে বিলগুলি ক্রয় করে এবং কোম্পানীগুলিকে বিল বাট্টার সুযোগ দেয়। বিলের মেয়াদ শেষ হবার আগে বিলের অর্থপ্রাপকের টাকার দরকার হয়, সে বিল নিয়ে ব্যাঙ্কের কাছে যায়। ব্যাঙ্ক অবশিষ্ট মেয়াদের সুদ কেটে নিয়ে বাকি টাকা দিয়ে বিলটি বাট্টা করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক বিল বাট্টার মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। ব্যাঙ্কের পক্ষে এটি সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগের ক্ষেত্র। যেহেতু বিলগুলি দুজন ব্যবসায়ীর সিকিউরিটি থাকে তাই এখানে ঝুঁকি কম এবং এটি সবচেয়ে তরল সম্পদ।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি একযোগে ঋণ ও অগ্রিম দানের মাধ্যমে অর্থব্যবস্থার মোট ঋণ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। একে বলা হয় ঋণ সৃজন প্রক্রিয়া। কোনও ব্যাঙ্ক গ্রহীতাকে যে পরিমাণ টাকা ঋণ দেয়, ঋণগ্রহীতা তার সবটাই এককালীন তুলে নিতে বা প্রয়োজনমতো তুলে নিতে পারে। ঋণগ্রহীতা যে টাকা তোলে, সে টাকা কোনও না কোনও ব্যাঙ্কে জমা পড়ে এবং সেই ব্যাঙ্কের আমানত বৃদ্ধি করে। সেই আমানত থেকে ব্যাঙ্ক আবার ঋণ সৃষ্টি করতে পারে। এইভাবে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে গুণক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আমনতির বেশ কয়েকগুণ ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক তার আমানতকারীদের প্রতিনিধি হিসাবে একাধিক কাজ করে থাকে। এই প্রতিনিধিত্বমূলক কাজের জন্য আমানতকারীর কাছ থেকে স্বল্পহারে সুদ আদায় করে।

৪। **অন্যান্য কাজ**—এ ছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জনগণের মূল্যবান সম্পত্তি যথা, অলঙ্কার, দলিল, শেয়ার ইত্যাদি নিরাপত্তার সঙ্গে গচ্ছিত রাখে, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুরোধে নানারকম উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের ভোগ-ঋণও দেয়।

৬৯.৪.৩ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পমেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জন্য বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘমেয়াদি ঋণের প্রয়োজন হয়। দীর্ঘমেয়াদি ঋণের

প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation), ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank), রাজ্যের অধীনে রাজ্য অর্থ-কর্পোরেশান (State finance Corporation) প্রভৃতি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়েছে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এই উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি নিম্নলিখিতভাবে ঋণ প্রদান করে।

(ক) **প্রত্যক্ষভাবে ঋণ প্রদান ঃ** উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকীকরণ, প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ প্রভৃতি কাজের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানকে অনধিক ২৫ বছরের জন্য ঋণ সরবরাহ করাই হল উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ।

(খ) **ঋণের গ্যারাণ্টি প্রদান ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যদি বাজার থেকে কিংবা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ব্যাতীত অন্য কোনও সূত্র থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তাহলে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে গ্যারাণ্টি প্রদান করে। গ্যারণ্টি প্রদানের দ্বারা উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহায্যে করে।

(গ) **শেয়ার ও বন্ড ক্রয়ের দ্বারা অর্থ সাহায্য ঃ** উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ক্রয় করে। অনেক সময় পুরোনো ঋণকে শেয়ারে পরিণত করেও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির দীর্ঘমেয়াদি অর্থের প্রয়োজন পূরণ করে।

(ঘ) **শেয়ার ও বন্ড অবলেখন ঃ** শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি শেয়ার ও বন্ড বিক্রয় করতে না পারলে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সেই সব শেয়ার বা বন্ড গচ্ছিত রেখে অর্থ সাহায্য করে। সাধারণ নির্দিষ্ট কয়েক বছরের মধ্যে শেয়ার বিক্রি হবে—সেই শর্তে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক অবলেখনের কাজ করে।

অন্যান্য বিষয়ে গ্যারাণ্টি প্রদান ঃ কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠান ঋণের মাধ্যমে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের চুক্তি করলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যন্ত্র-সরবরাহকারী শিল্পকে ঋণশোধের ব্যাপারে গ্যারিণ্টি প্রদান করে।

পুনঃ অর্থসংস্থানের কাজ ঃ কোনও শিল্প অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়, তাহলে উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সেই শিল্প অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সেই টাক ঋণ দেয়। একে বলে পুনরায় অর্থসংস্থান (refinance)।

বিল পূর্ণবাট্টা ঃ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্পে, ক্ষেত্রবিশেষ, বিল পুনর্বাট্টা করে।

অন্যান্য কাজ ঃ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্পে অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৬৯.৪.৪ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

যে কোনও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উন্নতমানের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা অপরিহার্য। অনুন্নত ব্যাকিং ব্যবস্থা অনেক সময়েই, উন্নয়নের বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যাঙ্ক নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কাজ করে।

(ক) জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ নিরাপত্তার সঙ্গো জমা রাখার ফলে জনসাধারণ সঞ্চয়ে উৎসাহী হয়। ফলে দেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

(খ) ব্যাঙ্ক একদিকে সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে অন্যদিকে সেই সঞ্চয় যাতে বিনিয়োগের কাজে ব্যবহৃত হয়, পরোক্ষভাবে তার ব্যবস্থাও করে।

(গ) ব্যাঙ্কসৃষ্ট ঋণপত্র বিনিময়ের মাধ্যমে হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে আর্থিক লেনদেন অনেক সহজ হয়েছে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে।

উন্নয়ন ব্যাঙ্কগুলি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ফলে দেশে শিল্পে পুঁজির সমস্যা থাকে না। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই বেড়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শীর্ষদেশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দেশের অর্থনৈকি স্থায়িতব রক্ষা ও উন্নয়নক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেবার কথা উল্লেখ করা যায়। আমরা বাণিজ্যচক্র আলোচনা করার সময় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক কার্যাবলীকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে জেনেছি।

সুতরাং বলা যায় যে দেশে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে স্থিতিশীল ও চালু অবস্থায় রাখার জন্য উন্নতমানের ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর্থিক সম্পদকে সচল রেখে এবং বাঞ্ছিত ক্ষেত্রে নিয়োগ করার সুযোগ করে দিয়ে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেশের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

৬৯.৫ সারাংশ

অর্থের পরিমাণ ও সুদের হার পরিবর্তনের মাধ্যমে যে নীতি কাজ করে তাকে বলে আর্থিক নীতি। কোনও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই আর্থিক নীতি পরিচালনা করার দায়িত্বে থাকে। দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান রক্ষা করা, বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতি দূর করা বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, আয় ও সম্পদের বন্টনে সমতা আনা—ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য আর্থিক নীতি ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য একই সঙ্গে কার্যকরী করার সময় অনেক সময় সংঘাত সৃষ্টি হয়।

অর্থের ও ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কয়েকটি হাতিয়ার ব্যবহার করে। এগুলিকেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বলে। এই নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— (১) পরিমাণগত, (২) গুণগত, (৩) নৈতিক প্রণোদন।

পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে আছে (ক) ব্যাঙ্ক হার (খ) খোলা বাজারে কারবার (গ) জমার অনুপাত পরিবর্তন, (ঘ) ঋণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে আছে (ক) নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (খ) মার্জিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

নৈতিক প্রণোদনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে অনুরোধ ও পরামর্শদান করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যখন ঋণপত্র জমা রেখে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে টাকা ধার দেয় (পুনর্বাট্টা) তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছ থেকে যে সুদ নেয়, সেই সুদের হারকেই ব্যাঙ্ক রেট বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

খোলাবাজারে কার্যকলাপ সাধারণত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক বাজারে সরকারি ঋণপত্রগুলি কেনাবেচা করাকে বোঝায়। এ ছাড়া ব্যাপক অর্থে খোলাবাজারের কারবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কর্তৃক যে কোনও ধরনের

ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়কে বোঝায়। যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ঋণপত্র বিক্রি করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ কমে যায় ও ঋণদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এইভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে আইনগতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে আমানতের এক অংশ জমা রাখতে হয়। এই নির্দিষ্ট অনুপাতকে নগদে জমার অনুপাত বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের এই জমার অনুপাত বাড়ানো ও কমানোর ক্ষমতা থাকে এই ক্ষমতার ব্যবহারকেই পরিবর্তনীয় নগদ জমার অনুপাত পদ্ধতি বলা হয়। নগদ জমার অনুপাতে হ্রাস বৃদ্ধি করে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ঋণ প্রদান ক্ষমতা সংকোচন ও প্রসারণ করতে পারে।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ দেবার নির্দেশ দেয়। কখনও কখনও শেয়ারের বা ঋণের মূল্যের যে অংশে নগদে জমা রাখতে হয় তার অনুপাত অর্থাৎ মার্জিন বাড়িয়ে দেয়। তাছাড়া ভোগপণ্যদ্রব্যের জন্য ঋণপ্রদান নিয়ন্ত্রণ, আমদানির জন্য আগাম জমা রাখা ইত্যাদি পদ্ধতিও গ্রহণ করে।

এ দুটি পদ্ধতি ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নৈতিক প্রণোদনের সাহায্যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে অর্থাৎ অনুরোধ ও উপদেশের সাহায্যে তাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। এই উপদেশ বা অনুরোধ মানার কোনও আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সঞ্চয় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে বিনিয়োগ যোগ্য মূলধনকে উৎসাহিত করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি স্বল্পমেয়াদি ঋণ প্রদান করে। ব্যাঙ্ক-সৃষ্ট ঋণপত্র বা চেক লেনদেনকে সহায়তা করে বাণিজ্যিকে প্রসারিত করে। অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান—যেমন IFC, IDB, SFC ইত্যাদি দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিয়ে বৃহদাকার শিল্পগুলির সম্প্রসারণে সাহায্য করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে স্থিতিশীল অবস্থায় রাখতে চেষ্টা করে।

৬৯.৬ অনুশীলনী

১। আর্থিক নীতি কাকে বলে? আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

২। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যে হাতিয়ারগুলি আছে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

৩। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?

৪। আর্থিক নীতি কাকে বলে? আর্থিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করুন।

৫। ঋণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যে হাতিয়ারগুলি আছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিন।

৬। পরিমাণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী?

৭। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন—

ক। ব্যাঙ্করেট কী?

খ। খোলাবাজারের কার্যকলাপ কাকে বলে?

গ। নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন করলে কীভাবে ঋণ সৃষ্টির গুণকটি পরিবর্তিত হয়?

ঘ। নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির কয়েকটি উদাহরণ দিন।

৬৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

Gupta S. B. — Monetary Economics, Institutions, Theory & Practice

Samuelson P. A. — Economics.

একক ৭০ ◆ সরকারী আয় ও ব্যয় (Public finance)

গঠন

৭০.১ উদ্দেশ্য

৭০.২ প্রস্তাবনা

৭০.৩ বাজেট ও ফিসক্যাল নীতি

৭০.৪ বাজেট নীতির হাতিয়ার

৭০.৫ করারোপ নীতি

৭০.৬ প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও আধাগতিশীল কর

৭০.৭ সরকারি ঋণ

৭০.৮ সারাংশ

৭০.৯ অনুশীলনী

৭০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

৭০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন

- বাজেট কী?
- মুদ্রাস্ফীতি কী
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
- কর ব্যবস্থা

৭০.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকার নানাভাবে অংশগ্রহণ করে। বাজেট সরকারের এই কাজকর্মের একটি প্রতিচ্ছবি উপস্থাপিত করে। বাজেটের মাধ্যমে যে নীতি কাজ করে তাকেই বাজেট বা ফিসক্যাল নীতি বলা হয়। বাজেট নীতি প্রকৃতপক্ষে সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতি। কর রাজস্ব, সরকারি ব্যয় ও সরকারি ঋণ—এই তিনটি উপায়ের সাহায্যেই সরকারের বাজেট নীতি কার্যকারী করা হয়। এ ছাড়া সরকার বেসরকারি অর্থনৈতিক কাজকর্ম কখন কখনও নিয়ন্ত্রণ করে। একচেটিয়ামূলক বৃহৎ ব্যবসা- প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপও কখনও কখনও নিয়ন্ত্রণ করে। এই অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়গুলি আলোচনা করব।

বাজেট নীতি

সংজ্ঞা ঃ সমষ্টিগত অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য সরকারের আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নীতিকে বাজেট বা ফিসক্যাল নীতি বলাহয়।

উদ্দেশ্য—সরকারের বাজেট নীতির একাধিক উদ্দেশ্য থাকে।

১। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ঃ ধনতান্ত্রিক দেশে বাণিজ্যচক্রের প্রভাবে আয়স্তর ওঠানামা করে (এ বিষয়ে আমরা আগে আলোচনা করেছি)। বাণিজ্য চক্রের ওঠানামা প্রতিরোধ করার জন্য সরকার বাণিজ্য চক্র বিরোধী নীতি (Contra cyclical fiscal policy) গ্রহণ করে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার চেষ্টা করে।

২। পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা বজায় রাখা ঃ পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে সরকার বাজেট নীতিকে ব্যবহার করে। অতিরিক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ব্যবস্থা সরকার বাজেটের মাধ্যমে করতে পারে। অনিচ্ছাকৃত বেকারদের কাজে লাগানোর জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করে পূর্ণ নিয়োগ বজায় রাখার জন্য বাজেট নীতিকে ব্যবহার করা যায়।

৩। প্রতিকূল লেনদেন উদ্বৃত্তের সংশোধন ঃ বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিলে বাজেট নীতির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া যায়। অনুরূপভাবে আমদানিকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক বসিয়ে আমদানির পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হয়। এইভাবে বাজেট নীতির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি মেটানো যেতে পারে।

৪। আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য হ্রাস ঃ ধনীদের আয় হ্রাস করার জন্য প্রগতিশীল করব্যবস্থা, অনুপার্জিত আয়ের উপর করবৃদ্ধি, সম্পদ কর আরোপ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। অন্যদিকে দরিদ্রদের আয়বৃদ্ধির জন্য সর্বনিম্ন মজুরি স্থির করা, ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন—অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে শিল্পস্থাপনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলের বিনিয়োগকারীদের মুনাফার এক অংশ আয়কর থেকে বাদ দিয়ে, পরিবহণ, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য কাঁচামাল সুলভে সরবরাহ করে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও অনুন্নত অংশে উন্নয়নের জন্য বাজেট নীতিকে ব্যবহার করা যায়।

সর্বোপরি দেশের জনকল্যাণ বৃদ্ধি করার জন্যও বাজেট নীতিকে ব্যবহার করা হয়।

৭০.৪ বাজেট নীতির হাতিয়ার

বাজেট নীতির হাতিয়ার প্রধান তিনটি—

১। সরকারের ব্যয়ে পরিবর্তন।

২। সরকারের কর রাজস্বে পরিবর্তন।

৩। সরকারের ঋণগ্রহণ পরিমাণে পরিবর্তন।

আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস এবং অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন : অনগ্রসর অঞ্চলগুলিতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ

দেওয়ার জন্য ঐ অঞ্চলে বিনিয়োগকারীদের মুনাফার এক অংশ আয়কর থেকে বাদ দেওয়া হয়। তাছাড়া বিদ্যুৎ, পরিবহণ, কাঁচামাল ইত্যাদি সুলভে সরবরাহ করে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস ও অনুন্নত অংশে উন্নয়নের জন্য বাজেট নীতি ব্যবহার করা হয়।

কেইনসের পূর্ববর্তী সময়ে সরকারি আয়-ব্যয় নীতিকে কেবলমাত্র সরকারি ব্যয় মেটানোর জন্য রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা হত। কেইনস বাজেট নীতিকে কর্তব্যমূলক (functional finance) করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। Functional Finance কথাটি Prof. Lerner প্রথম ব্যবহার করেন। অর্থাৎ সরকারি বাজেট নীতির লক্ষ্য হবে কতগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরর্ণ করা এবং গুরুত্বপূর্ণ অথনৈতিক কার্যবলীর জন্য অর্থের ব্যবস্থা করা। কেইনসই প্রথম মন্দাবস্থা ও বেকারি দূরীকরণে জন্য এবং আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য সরকারি ব্যয়ের প্রস্তাবনা করেন।

কর ঃ—ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীকে সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সেবার জন্য তার আয় বা সম্পত্তির যে অংশ বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্র বা সরকারকে দিতে হয়, তাকে কর বলে। এই সংজ্ঞা থেকে করের দুটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—(১) কর বাধ্যতামূলকভাবে দেয়, (২) করের বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনও সেবা বা দ্রব্য প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না।

৭০.৫ করারোপ নীতি

যে নীতি অনুযায়ী সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে সেই নীতিকে করারোপের নীতি বলা হয়। এই সম্পর্কে অ্যাডাম স্মিথের অবদান এখনও অনেকাংশ গ্রহণযোগ্য। এখন আমরা এই নীতিগুলি আলোচনা করব।

এ্যাড্যাম স্মিথের করারোপ নীতি—

(১) **সমতার নীতি (Cannon of equity) ঃ** গরীব অপেক্ষা ধনীদের উপর করের বোঝা বেশি হওয়া উচিত কারণ তাদের কর প্রদান ক্ষমতা বেশি। এই নীতি অনুযায়ী কর ব্যবস্থা প্রগতিশীল (Progressive) হওয়া উচিত।

(২) **নিশ্চয়তার সূত্র (Cannon of certainty) ঃ** কর প্রদানের পরিমাণ এবং কীভাবে দিতে হবে তা সরকার কর্তৃক স্পষ্টভাবে করদাতাদের জানিয়ে দিতে হবে।

(৩) **সুবিধার সূত্র (Cannon of convienence) ঃ** করপ্রদান যাতে করপ্রদানকারীর সুবিধ হয় সে রকম সময়ে কর ধার্য বা সংগ্রহ করা উচিত। সরকারের দিক থেকে যাতে করসংগ্রহে কোনও অসুবিধা না হয়, সেদিকেও লক্ষ রাখা উচিত।

(৪) **ব্যয়সংক্ষেপের সূত্র**—করসংগ্রহের খাতে যতদূর সম্ভব অল্প খরচ হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। এ নীতিগুলি ছাড়াও আধুনিক কর ব্যবস্থায় আরও কয়েকটি নীতি অনুসৃত হয়।

(১) **স্থিতিস্থাপকতার নীতি (Canon of elasticity) ঃ** কর ধার্যের নীতি সবসময় পরিবর্তনশীল ও নমনীয় হওয়া উচিত যাতে সরকারের প্রয়োজন অনুযায়ী কর ধার্য করা যেতে পারে।

(২) **উৎপাদনশীলতার নীতি (Canon of productivity) ঃ** কর ব্যবস্থাকে এমনভাবে গঠন করা উচিত যাতে তা উৎপাদনের উদ্যোগ ও অনুপ্রেরণার পরিপন্থী না হয়।

(৩) **সরলতার নীতি (Canon of simplicity) ঃ** যে সকল কর ধার্য করা হয়, সেগুলি সম্পর্কে সকল বিষয়ে জনসাধারণ যেন সহজে বুঝতে পারে।

(৪) **উদ্দেশ্য সাধনের নীতি (Canon of social objective)** ঃ কোনও একটি সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কর ধার্য করা হলে, ঐ বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংগৃহীত রাজস্ব খরচ করতে হবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে পার্থক্য ঃ

প্রত্যক্ষ কর ও পরোক্ষ কর এই দুই ধরনের কর আছে।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করভার একজনের উপর থেকে আরেকজনের উপর চালান করা যায় না। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতা কর প্রদানের বোঝা আরেকজনের উপর চালান করতে পারে। আয়কর একটি প্রত্যক্ষ কর কারণ করদাতা আয়করের বোঝা অন্য কারো উপর চাপাতে পারে না। অনুরূপভাবে সম্পদ কর, দান কর, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ কর। আবার বিক্রয় কর, বাণিজ্য শুল্ক, আবগারি শুল্ক প্রভৃতি হল পরোক্ষ কর। করদাতা এগুলির বোঝা অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারে।

- **করদানের বোঝা বা করভার (Incidence of Taxation)**

করধার্য করা হলে করের ভিত্তিতে সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে অর্থপ্রদান করার বোঝাকে বলা হয় করের তাৎক্ষণিক প্রভাব (impact)। করপ্রদানের বোঝা বা করভার (incidence) হল চূড়ান্ত পর্যায়ে করভার। প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতাকে করের তাৎক্ষণিক বোঝা বা প্রভাব (impact) এবং চূড়ান্ত বোঝা (incidence) উভয়ই বহন করতে হয়। পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে করদাতাদের তাৎক্ষণিক বোঝা (impact) বহন করতে হয় বটে, কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে করদাতা এই বোঝা অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। ইহাকেই করপ্রদানের বোঝা চালান Shifting of incidence বলে। করচালান সম্ভব হলে করপাত পৃথক ব্যক্তির উপর পড়ে। কিন্তু কর-চালান সম্ভব না হলে কর-ঘাত ও কর-পাত একই ব্যক্তির উপর পড়ে।

করঘাত ও করপাতের পার্থক্য ঘটে করচালনার সম্ভাবনার মাধ্যমে। কর-চালান দুধরনের হয়— পশ্চাৎমুখী করচালান (Backward Shifting), সম্মুখবর্তী করচালান (Forward Shifting)। উৎপাদনকারী আরোপিত কর দুভাবে চালান করতে পারে (১) যাদের কাছে কাঁচামাল, মূলধন ইত্যাদি ক্রয় করে, তাদের দাম কমিয়ে (Backward Shifting), (২) উৎপন্ন দ্রব্যের দামবৃদ্ধি করে ক্রেতাদের উপর করভার চালান করা (Forward Shifting)।

আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশে করের বোঝা সুষ্ঠু বন্টন করা একটি মস্ত বড় সমস্যা। এই সমস্যা শুধু ন্যায় বোধের সঙ্গে জড়িত নয়, দেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও নির্ধারণ করতে হয়। এই সম্পর্কে অর্থনীতিবিদ্‌রা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। আমরা এখন এই মতগুলো আলোচনা করব।

(১) সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি (Cost of Service Principle)—

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তিকে সরকারের সেবাকাজ দান করে। এইজন্য সরকারের ঠিক যতখানি অর্থ ব্যয় করবে ঠিক সেই পরিমাণ অর্থই ব্যক্তির কাছ থেকে কররূপে আদায় করবে।

এই তত্ত্বটি প্রয়োগ করার কতগুলি অসুবিধা আছে,

(ক) সরকার যে সেবাকার্য দান করে, সেগুলি অনেক ব্যক্তি একসঙ্গে ভোগ করে থাকে। এর ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির জন্য সরকার কতটা ব্যয় করে, তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।

(খ) এই নীতি প্রয়োগ করলে দরিদ্রদের উপর করের বোঝা বেশি পড়বে। যদিও তারা সরকারের কাছ থেকে বেশি সেবাকাজ পায়, কিন্তু তাদের করের বোঝা বহন করার মত আর্থিক সামর্থ থাকে না।

(গ) সরকার যে কর আদায় করে তার বিনিময়ে প্রত্যক্ষভাবে কোনও সেবাদান করে না।

(২) উপকার বা সুবিধার নীতি (Benefit Principle)—

এই নীতি অনুসারে সরকারের ব্যয় থেকে প্রাপ্ত সুবিধার অনুপাতে দেশের জনগণের মধ্যে করের বোঝা বন্টন করতে হবে। যদি প্রত্যেক সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুবিধা বা উপকারের অনুপাতে কর দেয়, তাহলে সমতার নীতি পূরণ হবে।

এই নীতিটির বাস্তব প্রয়োগেও কতগুলি অসুবিধা আছে।

(ক) বিভিন্ন সরকারি কার্যকলাপ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তি কী পরিমাণ সুবিধা পেল তা পৃথকভাবে ও সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

(খ) এই নীতিটিও বাস্তবে প্রয়োগ করতে হলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রদের করের ভার বেশি পড়বে কারণ দরিদ্ররাই তুলনামূলকভাবে সরকারি কাজকর্ম থেকে বেশি সুবিধা ভোগ করে।

(গ) সরকারি সেবাকার্য থেকে কোনও ব্যক্তি কী পরিমাণ উপকার পাচ্ছে তা পরিমাপ করা সম্ভব নয় কারণ কোনও ব্যক্তির সুবিধা বা উপকার পাওয়ার পরিমাণ অনেকাংশে তার মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

(৩) সামর্থ্যের নীতি (ability to pay)—এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব ক্ষমতা বা সামর্থ্য অনুযায়ী কর প্রদান করবে। দরিদ্র ব্যক্তিদের কর প্রদানের ক্ষমতা কম আর ধনী ব্যক্তিদের কর প্রদানের ক্ষমতা বেশি। সুতরাং দরিদ্র ব্যক্তিদের উপর কম কর ও ধনী ব্যক্তিদের উপর অধিক কর আরোপ করা উচিত। এইভাবে ন্যায় ও সমতা বজায় থাকবে।

কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপের জন্য তিনটি বিষয়কে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যায় (১) ব্যয় (২) সম্পত্তি (৩) আয়। ভোগের ক্ষেত্রে সামর্থ্যের চেয়ে প্রয়োজন বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। সম্পত্তির দ্বারাও সামর্থ্য পরিমাপ করা যায় না কারণ বিভিন্ন প্রকার সম্পত্তি থেকে বিভিন্ন ধরণের আয় হয়।

এই নীতি প্রয়োগ করতে হলে কর প্রদানের ক্ষমতা পরিমাপ করার পদ্ধতি স্থির করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কোনও সন্তোষজনক মাপকাঠি নেই। আধুনিককালে ব্যক্তির আয়কেই কর প্রদানের ক্ষমতার মাপকাঠি মেনে নেওয়া হয়। জোমির স্ট্যাম্পের মতে আয়কে যদি করপ্রদানের সামর্থ্যের মাপকাঠি হিসাবে মেনে নিতে হয় তাহলে কতগুলি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) আয় উপার্জনের সময়কালের মধ্যেই কর দিতে হবে।

(খ) উপার্জনের জন্য যা ব্যয়, সেই ব্যয় করযোগ্য আয় থেকে বাদ দিতে হবে।

(গ) উপার্জিত আয়ের উপর অনুপার্জিত আয়ের অনুপাতে কম পরিমাণে কর আরোপ করা উচিত।

সামর্থ্যের নীতি অপর দুটি নীতি অপেক্ষা অধিকতর বাস্তবসম্মত। কিন্তু সামর্থ্য মাপার যথাযথ মাপকাঠি নির্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। সুতরাং কর প্রদানের সামর্থ্য পরিমাপের জন্য ব্যক্তির আয়, ভোগ ও সম্পত্তি কোনওটিকেই একমাত্র মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। সব কটিকে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

৭০.৬ প্রগতিশীল, সমানুপাতিক ও আধাগতিশীল কর

আয়করের হার নির্ধারণ করার তিনটি পদ্ধতি আছে—

(১) প্রগতিশীল কর ব্যবস্থায় কোনও ব্যক্তির করযোগ্য আয় যত বৃদ্ধি পায়, গড় করের হারও তত বেশি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ করযোগ্য আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় মোট আয়কর তার থেকে বেশি বৃদ্ধি পায়।

(২) সমানুপাতিক কর ব্যবস্থায় ব্যক্তির করযোগ্য আয় যে হারে বৃদ্ধি পায় করের হার সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।

(৩) আধাগতিশীল কর ব্যবস্থায় করযোগ্য আয় যে হারে বাড়ে মোট আয়কর তার থেকে কম হারে বাড়ে।

আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌রা মনে করেন যে এই তিনটি পদ্ধতির মধ্যে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট এবং অধিকাংশ দেশ এই পদ্ধতি অনুসরণ করে। কিন্তু প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার পক্ষে যেমন যুক্তি আছে বিপক্ষেও তেমন যুক্তি আছে। আমরা এখন এগুলি আলোচনা করব।

(১) ধনীদের আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা কম। সেজন্য ধনী ব্যক্তিদের করপ্রদানের সামর্থ্য বেশি।

(২) এই করব্যবস্থায় জনসাধারণের ন্যূনতম ত্যাগ স্বীকার করা সম্ভব।

সরকারি ব্যয়

সরকারি ব্যয় নানা প্রকার হতে পারে—যেমন (১) ভোগজনিত ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়, (২) উন্নয়নমূলক ব্যয় ও উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয়।

(১) (ক) সরকারের ভোগজনিত ব্যয় (Consumption Expenditure) ঃ ব্যক্তির ন্যায় সরকারেরও কতগুলি ব্যয় আছে যার ফলে কোনও উৎপাদন হয় না। যেমন প্রশাসনিক ব্যয়, পুলিশ ও প্রতিরক্ষার জন্য ব্যয়, বিভিন্ন খাতে ভরতুকি ইত্যাদি। এগুলিকে সামাজিক ভোগ ব্যয়ও বলা হয়।

(খ) বিনিয়োগ ব্যয় ঃ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় হয় বা উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে এমন ব্যয়কে বিনিয়োগ ব্যয় বলা হয়।

(২) (ক) উন্নয়নমূলক ব্যয়—যে ব্যয় দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য করা হয়। সেগুলিকে উন্নয়নমূলক ব্যয় বলা হয়।

(খ) উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় অনেকটাই ভোগজনিত ব্যয়ের মধ্যেই পড়ে। এই ব্যয়ের প্রধান উপাদানগুলি

হলো ঋণের উপর সুদ দান, ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি।

উন্নয়নশীল দেশে সরকারি ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে

উন্নয়নশীল দেশে সরকারি ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারি ব্যয় বিভিন্নভাবে সহায়তা করে (১) সামাজিক প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদি সরবরাহ করে উন্নয়নের পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করে। (২) আঞ্চলিক উন্নয়নে সমতা আনায় সাহায্য করে। (৩) কৃষি ও শিল্পোন্নয়নে এবং প্রাকৃতিক সম্পদব্যবহার সম্ভব করে। (৪) অনুদান, ভর্তুকি ইত্যাদির সাহায্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে।

৭০.৭ সরকারি ঋণ

সরকারি আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হলে বাজেটে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটনি পূরণের জন্য সরকার ঋণ গ্রহণ করে থাকে।

সরকারি ঋণের প্রকার ভেদ ঃ

সরকারি ঋণকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করা যায়।

(১) কোনও সরকারি কর্তৃপক্ষ দেশের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা পরিবারের কাছ থেকে ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে যে ঋণ গ্রহণ করে তাকে অভ্যন্তরীণ ঋণ (Internal debt) বলে।

(২) অপরপক্ষে সরকারি কর্তৃপক্ষ বাহিরের কোনও উৎস—যেমন আন্তর্জাতিক সংস্থা, বিদেশি সরকার, ব্যাঙ্ক বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করে, তাকে বৈদেশিক ঋণ বা বাহ্যিক ঋণ বলে।

(৩) স্বেচ্ছামূলক ঋণ ও বাধ্যতামূলক ঋণ ঃ জনগণ স্বেচ্ছায় সরকারকে যে ঋণ দেয়, তা হল স্বেচ্ছামূলক ঋণ। আবার অনেক সময়, যেমন যুদ্ধ বা জরুরি অবস্থায় সরকার জনগণের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে ঋণ নিতে পারে।

(৪) উৎপাদনশীল ঋণ ও অনুৎপাদনশীল ঋণ ঃ ঋণের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ দেশের গঠন ও অতিরিক্ত সম্পদ সৃজনের জন্য ব্যবহার হলে তাকে উৎপাদনশীল ঋণ বলা হয়। অপরপক্ষে যুদ্ধের জন্য বা পুরাতন ঋণ-শোধের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তাকে অনুৎপাদনশীল বা মৃতভার (Dead weight) ঋণ বলা হয়।

(৫) দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী ঋণ—

সরকার দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্র বিক্রয় করে ঋণসংগ্রহ করে। আবার ট্রেজারী বিল নামক সরকারী বিলের সাহায্যে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে। দীর্ঘমেয়াদী ঋণকে আবদ্ধ (Funded Debt) এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণকে অনাবদ্ধ বা ভাসমান (unfunded or floating debt) বলা হয়।

(৬) পরিশোধযোগ্য ও অপরিশোধযোগ্য ঋণ

সরকার নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের মধ্যে যে ঋণের আসল পরিশোধ করে এবং শর্তমত সুদ প্রদান করে, তাকে পরিশোধযোগ্য ঋণ (redeemable) বলা হয়। আর যে ঋণ সরকার অনির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গ্রহণ করে এবং নিয়মিত সুদ দেওয়া হয় কিন্তু যে অর্থ ঋণ গ্রহণ করা হয় সে অর্থ পরিশোধের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই, তাকে অপরিশোধযোগ্য (irredeemable) ঋণ বলা হয়।

সরকার সাধারণত নিম্নলিখিত কারণে ঋণ গ্রহণ করে—

(১) বাজেটে ঘাটতি পূরণের জন্য—আয় ও ব্যয়ের ব্যবধান হলে, আর্থিক অভাব মেটাতে সরকার ঋণ গ্রহণ করে।

(২) যুদ্ধের বা জরুরি কারণে—দেশে যুদ্ধ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি জরুরি অবস্থা দেখা দিলে সরকারের আয়ের অধিক ব্যয়ের দরকার হয়। তখন সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে ঋণ নেয়।

(৩) অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ স্বল্পোন্নত দেশের প্রধান দায়িত্ব হল অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। এজন্য যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, অনুন্নত দেশে করের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সরকারকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়।

মুদ্রাস্ফীতি দমন ঃ মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা দেখা দিলে অর্থব্যবস্থার মধ্য থেকে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্থ নিষ্কাশন করা হয়। এর ফলে জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে চলে আসে।

● সরকারি ঋণের ভার (Burden of Public Debt)—

ঋণের ভার সংজ্ঞা—

সরকারি ঋণের ভারকে দু ভাবে ভাগ করা যায়—

(১) প্রত্যক্ষ বোঝা বা আর্থিক ভার (Direct money Burden)।

(২) পরোক্ষ বোঝা বা বাস্তব ভার (Real Burden)।

(১) অর্থের হিসাবে প্রকাশিত ঋণের ভার হল আর্থিক ভার। সরকার যে অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে সেই অর্থ ভবিষ্যতে সুদ সমেত ফেরত দিতে হয়। এই সুদের পরিমাণ আর্থিক ভার সূচিত করে।

(২) সরকারি ঋণ গ্রহণের সময় দেশের মোট উৎপাদন, মোট আয়, আয়ের বণ্টন, দেশবাসীদের অর্থনৈতিক কল্যাণ ইত্যাদি বাস্তব বিষয়গুলি যে স্তরে থাকে, ঋণ পরিশোধের ফলে যদি সে সব বিষয়ের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে, তাহলে সেই হ্রাসপ্রাপ্তির পরিমাণই ঋণের বাস্তব ভার সূচিত করে।

অভ্যন্তরীণ সরকারি ঋণের ভার ঃ

অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনও বোঝা আছে কিনা এ নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। একদল অর্থনীতিবিদ মনে করে অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনও বোঝা নেই কারণ এই ঋণ দেশের অভ্যন্তর থেকে সংগৃহীত হয় এবং যখন পরিশোধ হয় তখন ঋণের অর্থ দেশের মধ্যেই থেকে যায়। অন্য অর্থনীতিবিদদের মতে যেহেতু ব্যক্তিগত ঋণের মতো সরকারি ঋণও সুদসহ শোধ দিতে হয়, সেহেতু অভ্যন্তরীণ ঋণেরও ভার আছে। ধনী ব্যক্তিরাই তাদের উদ্বৃত্ত আয় থেকে সরকারি ঋণপত্র ক্রয় করে ফেলে সরকার যখন ঋণ

পরিশোধ করে, তখন ধনী ব্যক্তিদের হাতে অধিক আয় ও ক্রয়ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। দেশে আয়ের বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। দেশবাসীর তৃপ্তি ও অর্থনৈতিক কল্যাণ হ্রাস পায় এবং ইহাই অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রত্যক্ষ ভার।

পরোক্ষভাবে যদি জনগণের উপর কর আরোপ করে ঋণ পরিশোধের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়, তাহলে জনগণের ভোগপ্রবণতা, সঞ্চয় প্রবণতা, কর্ম প্রচেষ্টা ইত্যাদি হ্রাস পাবে। এর ফলে জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পাবে।

বৈদেশিক ঋণের ভার ঃ

বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের সময় যে পরিমাণ অর্থ ও সুদ পরিশোধ করা হয়, তা অন্যদেশে স্থানান্তরিত হয়। বৈদেশিক ঋণের ভার দুটি দেশের দামস্তর ও তাদের পরিবর্তন, দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের উপর অনেকাংশ নির্ভর করে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করার জন্য সরকারের উৎপাদনজনিত কার্যকলাপ হ্রাস পায়।

অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক ঋণ যদি উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করা হয় এবং মোট উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবহৃত হয়, তাহ'লে এ ভার অনেকটা কমানো যায়।

ঘাটতি ব্যয় ঃ বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকের মন্দার সময় ঘাটতি বাজেট ধারণাটির উৎপত্তি হয়। সাম্প্রতিককালে অনুন্নত দেশে উন্নয়নের কাজকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঘাটতি বাজেটের গুরুত্ব বেড়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, সরকারি বাজেটের চলতি ও মূলধনী খাতে কর রাজস্ব, বাণিজ্যিক রাজস্ব, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ থেকে প্রাপ্ত মোট আয় অপেক্ষা মোট ব্যয় বেশি হলে তাকে ঘাটতি ব্যয় বলে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য সরকার (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে গচ্ছিত সঞ্চয় তহবিল থেকে অর্থসংগ্রহ করে। (২) সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাছে ট্রেজারি বিল বিক্রয় করে অর্থ সংগ্রহ করে এবং কেন্দ্রীয় এই সব ঋণপত্রের ভিত্তিতে নতুন অর্থ ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দেয়। (৩) সরকার বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছে সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে এবং এগুলির ভিত্তিতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক নতুন ঋণ সৃষ্টি করতে পারে।

এভাবে বাজেটের ঘাটতি পূরণের জন্য যে অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সৃষ্টি হয় তাকেই বলা হয় ঘাটতি ব্যয়।

ঘাটতি ব্যয়ের উদ্দেশ্য ঃ (১) মন্দা প্রতিরোধের জন্য (২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য (৩) যুদ্ধের ব্যয় বহনের জন্য।

(১) ১৯৩০ সালে সারা বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগ কমানোর ফলে কর্মসংস্থান, উৎপাদন, আয় প্রভৃতি ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। এই অবস্থা প্রতিকারের জন্য কেইনস ঘাটতি ব্যয় পদ্ধতি গ্রহরের সুপারিশ করেন। সরকার ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে ক্রয়ক্ষমতা সৃজনের ব্যবস্থা করতে পারে। ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা সরকার জাতীয় আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে সামগ্রিক চাহিদার বৃদ্ধি সূচিত হয়। এর ফলে দাম বাড়ে, মুনাফা বাড়ে, ব্যবসায়ীরা উৎসাহিত হয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এইভাবে ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে মন্দা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।

(২) অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঃ অনুন্নত দেশে উন্নয়নের প্রয়োজনে ঘাটতি ব্যয়ের নীতিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই সমস্ত দেশের মূল সমস্যা হচ্ছে যে মূলধন গঠনের হারের তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি। সুতরাং মূলধনের অভাবই প্রধান সমস্যা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ

বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। এর জন্য অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন। কিন্তু এসব দেশে মাথাপিছু গড় আয় কম হওয়ার জন্য সঞ্চয়ের সাহায্যে এ সমস্যা সমাধান করা যায় না। সেইজন্য উন্নয়নের গতিকে দ্রুত করার জন্য সরকার ঘাটতি ব্যয়ের নীতি অনুসরণ করে। উন্নয়নশীল দেশে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা থাকে। মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ রেখে উৎপন্নের পরিমাণ বাড়াতে পারলে এই আশঙ্কা অনেকাংশে দূর করা যাবে।

(৩) যুদ্ধের জন্য বাড়তি ব্যয় জনগণের কাছ থেকে কর আদায় করে মেটানো সম্ভব হয় না। তখন সরকার নতুন অর্থসৃষ্টি করে যুদ্ধের ব্যয় মেটানোর চেষ্টা করে। ভোগ্যপণ্যদ্রব্য উৎপন্নের পরিমাণ বাড়ে না—বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রাস পায়, অথচ অর্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি তীব্র আকার ধারণ করে।

আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের জন্য জনগণের দ্বারা জনগণের সরকার গঠিত হয়। সুতরাং জনগণের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে সরকার কাজ করে।

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

(১) সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে ঃ আধুনিক রাষ্ট্রে সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মতো প্রত্যক্ষভাবে নানাভাবে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন ও বিক্রয় করে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণ। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যের বণ্টন বা বিক্রয়ের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়।

(২) সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মে পরোক্ষ অংশ গ্রহণ করে ঃ বেসরকারি ভোগ ও উৎপাদন কাজে সহায়তা করে সরকার অর্থনৈতিক কাজে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ ও আর্থিক সাহায্য দান করে, কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা করে ও পরিকাঠামো তৈরি করে সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপাদনের কাজে সাহায্য করে।

(৩) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ঃ সামগ্রিক অর্থনীতির স্বার্থে নানারকম কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

যেমন একচেটিয়া প্রভাব নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন পাশ, মুদ্রাস্ফীতি বা বাণিজ্যচক্র নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ ইত্যাদির সাহায্যে অর্থনৈতিক কাজকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) উন্নয়নমূলক কাজ ঃ আধুনিক স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আয় ও সম্পদ বণ্টনের মধ্যে যাতে বৈষম্য বৃদ্ধি না পায়—সরকারের নীতির লক্ষ্য থাকে। তাছাড়া জনসাধারণের নিম্নতম প্রয়োজন পূরণের দায়িত্বও সরকারের।

● উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কোনও ব্যক্তি তার ইচ্ছামূলক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ করতে পারে না। একজন ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার ফলে অন্যের স্বাধীনতা যাতে খর্ব না হয়। সেজন্য সরকার বিভিন্ন

বিধিনিষেধ দ্বারা বেসরকারী অর্থনৈতিক কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।

সরকারের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি দু রকমের হয়—

(১) সরকার প্রয়োজনীয় ও বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের দায়িত্ব নিজের হাতে নেয়।

(২) বেসরকারী উৎপাদন ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ। কারও যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য গৃহীত নীতি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হয়। এইজন্য কোনও প্রতিষ্ঠান সরকারের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারে না। লাইসেন্সিং পদ্ধতির মাধ্যমে সরকার শিল্পে বিনিয়োগ ও উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার আর্থিক ও বাজেট বা ফিসক্যাল নীতির দ্বারাও বেসরকারি ব্যবসা ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করে। অনেক সময় কোনও কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নানাভাবে অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে নিজের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে বসে। সরকার এইসব একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আইনবিধিবন্ধ করে নিয়ন্ত্রণ করে। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় অতিরিক্ত দাম আদায় করে ভোক্তাদের কল্যাণ হ্রাস করে এবং এর ফলে দেশের উৎপাদনের উপাদানগুলি যথাযথভাবে বণ্টন করা হয় না। দেশে আয় বণ্টনে অসাম্য দেখা দেয় ও বেকার সমস্যার সৃষ্টি করে। সরকার এই সকল সমস্যা দূর করার জন্য বড়ো শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য অনেক সময় উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করে দেয়। সরকার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন সীমিত রাখার জন্য আইন প্রণয়ন করে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের চূড়ান্ত পরিণতি হল রাষ্ট্রীয়করণ। এছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে উন্নত করায় সাহায্য করে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি করে।

ইহা ব্যতীত ব্যাঙ্ক ও বীমা ব্যবস্থার কাজকর্মের উপর প্রয়োজনমত হস্তক্ষেপ করতে পারে। সরকার দেশের প্রয়োজনে বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

৭০.৮ সারাংশ

(১) সরকারের বাজেট নীতির উদ্দেশ্য—দেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে কাম্য পরিবর্তন আনার জন্য সরকারের গৃহীত নীতিকে বাজেট নীতি বলে।

সরকার প্রধানত তিনটি হাতিয়ার ব্যবহার করে দেশের আয়স্তরকে পরিবর্তন করতে পারে (ক) সরকারের ব্যয়ের পরিমাণে পরিবর্তন করে (খ) রাজস্ব সংগ্রহে পরিবর্তন (গ) সরকারের ঋণের পরিমাণে পরিবর্তন করে।

(২) বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে করভার বণ্টন করার জন্য সরকারের নীতি গ্রহণের ভিত্তি হিসাবে তিনটি তত্ত্ব প্রচলিত (ক) সেবাকার্যের ব্যয়ের নীতি (খ) উপকার বা সুবিধার নীতি (গ) কর প্রদানের সামর্থ্যের নীতি। কোনও নীতিই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃত হয় না।

(৩) কর সাধারণত তিনভাবে বসানো হয়—প্রগতিশীল কর, সমানুপাতিক কর ও অধোগতিশীল কর। যখন কোনও ব্যক্তির করযোগ্য আয় যে হারে বাড়ে, আয়করও ঠিক সেই হারেই বাড়ে, তখন এই ধরনের করকে প্রগতিশীল কর বলা হয়। সমানুপাতিক কর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গড় করের হার একই থাকে। অধোগতিশীল কর ব্যবস্থায় করযোগ্য আয় বাড়ার সাথে সাথে গড় করের হার কমতে থাকে।

(৪) সরকারি ঋণ—দেশের সরকার তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস থেকে যে ঋণ নেয়, তাকেই সরকারি ঋণ বলা হয়। সরকার বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ নেয়, যেমন বাজেটের ঘাটতি মেটাবার জন্য, জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের জন্য, মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য ইত্যাদি। এই ঋণের ফলে আয় বণ্টনে পরিবর্তন হয়। ফলে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় প্রভাবিত হয়।

(৫) সরকারি ঋণের বোঝা দু-রকমের হতে পারে। প্রত্যক্ষ বোঝা ও পরোক্ষ বোঝা। আবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়কেই আর্থিক বোঝা ও আসল বোঝা এই দুভাবে ভাগ করা যায়। কোনও কোনও অর্থনীতিবিদ মনে করেন অভ্যন্তরীণ ঋণের কোনও বোঝা নেই। কিন্তু অন্য একদল অর্থনীতিবিদদের মতে অভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা আছে। বাহ্যিক ঋণের অবশ্যই বোঝা আছে।

(৭) সরকারি বাজেট নীতিতে ঘাটতি ব্যয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করে। সরকারের সংগৃহীত মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বেশি বলে, তাকে ঘাটতি ব্যয় বলে। এই ব্যয় মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নেয় এবং প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ঋণপত্রের ভিত্তিতে নতুন টাকা ছাপিয়ে দেয়। সাধারণত মন্দা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এবং যুদ্ধের ব্যয় বহন করার জন্য এই নীতি গৃহীত হয়।

(৮) আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) বলা হয়। সুতরাং সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় আয় বণ্টনে সমতা রক্ষা করার চেষ্টা করে। এছাড়া অনুন্নত দেশে উন্নয়নমূলক কাজে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। সরকার বৃহদায়তন শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে, একচেটিয়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বাধা সৃষ্টি করে।

৭০.৯ অনুশীলনী

১। বাজেট নীতি কাকে বলে? বাজেট নীতির উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

২। সরকারি ঋণ কী? কী কী উদ্দেশ্যে সরকারি ঋণ ব্যবহৃত হয়?

৩। সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী কী কী—আলোচনা করুন

৪। সংক্ষেপে উত্তর লিখুন—

(ক) প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা কাকে বলে?

(খ) ঘাটতি বাজেট কাকে বলে?

(গ) অভ্যন্তরীণ ঋণ ও বাহ্যিক ঋণের পার্থক্য কী কী?

৭০.১০ গ্রন্থপঞ্জী

Musgrave and Musgrave—Public Finance S. Ganguly—Public Finance.

একক ৭১ ◆ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও লেনদেন

গঠন

৭১.১ উদ্দেশ্য
৭১.২ প্রস্তাবনা
৭১.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য
৭১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি
৭১.৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব
৭১.৫.১ চরম ব্যয় পার্থক্য
৭১.৫.২ তুলনামূলক ব্যয়ের তত্ত্ব
৭১.৫.৩ হেকমার-ওহলিন তত্ত্ব
৭১.৬ লেনদেন (ব্যালান্স)—হিসাব-বাণিজ্য উদ্বৃত্ত-সেবা উদ্বৃত্ত
৭১.৬.১ লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি সংশোধনের পদ্ধতি
৭১.৭ বাণিজ্য শর্ত বা বাণিজ্য হার
৭১.৮ বিনিময় হার—বিনিময় হার কীভাবে নির্ধারিত হয়
৭১.৯ সারাংশ
৭১.১০ অনুশীলনী
৭১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

৭১.১ উদ্দেশ্য

বর্তমানে কোনও দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি দেশই বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা কেন দুটি দেশে বাণিজ্য দেখা দেয়, কীভাবে দুটি দেশের মধ্যে অর্থের লেনদেন হয়, বৈদেশিক বাণিজ্যে কখন উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি দেখা দেয়, কীভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রিত হয়, আলোচনা করব। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য কী কী উপায় অবলম্বন করা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুফলই বা কী—এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

৭১.২ প্রস্তাবনা

এই উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করার জন্য আমাদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করতে হবে। প্রথমেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য কী দেখতে হবে। তারপর এই

বাণিজ্যের ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব আলোচনা করব। বিনিময় হার, বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি এ বিষয়গুলি এখন সকলেরই পরিচিত। আমরা এগুলি বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট ধারণা করব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভ বা ক্ষতি এবং কখনও কখনও কেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, কীভাবেই বা নিয়ন্ত্রণ করা হয়—এসব আমরা এখন আলোচনা করব।

৭১.৩ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পার্থক্য

কোনও একটি দেশের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে দ্রব্য সামগ্রীর যে লেনদেন বা বাণিজ্য ঘটে তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়। অপরপক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন বা বাণিজ্য ঘটে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। যদিও দুধরনের বাণিজ্যেই দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন হয়, তথাপি কয়েকটি পার্থক্য থাকার জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োজন হয়।

পার্থক্যগুলি আলোচনা করা হয়—

(১) গতিশীল অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অংশে উৎপাদনের উপাদানগুলি গতিশীল কিন্তু বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতার অভাব।

(২) বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা হয়, যার ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের দ্রব্য সামগ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মুদ্রারও বিনিময় হয়। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট মুদ্রা ব্যবহার করা হয়।

(৩) কোনও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মোটামুটি অবাধ বাণিজ্য হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলি নিজ নিজ দেশে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসারের জন্য নানারকমের বিধিনিষেধ আরোপ করে।

৭১.৪ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হল আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগ বা আন্তর্জাতিক বিশেষায়ন। কোনও ব্যক্তি যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না, তেমনই কোনও দেশও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন উৎপাদন দক্ষতা বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন দক্ষতাও বিভিন্ন। যে ব্যক্তি যে কাজে পারদর্শী সে কাজে সে বিশেষায়ন অর্জন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। তেমনই যে দেশ যে দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ন অর্জন করে সে ক্ষেত্রে দ্রব্যটি অধিক উৎপাদন করে রপ্তানি করে। আবার শ্রম ও মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদ বণ্টনও বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই রকম হয় না। এর ফলে বিভিন্ন দেশে উৎপাদন ব্যয়ে পার্থক্য দেখা দেয় এবং এর ফলেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্ভব হয়। উৎপাদন ব্যয় এই পার্থক্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৭১.৫ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্ত্ব

৭১.৫.১ চরম ব্যয় পার্থক্য তত্ত্ব

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মিথ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সাহায্যে

আন্তর্জাতিক বিনিময়ের সুবিধা ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Wealth of Nations-এ অ্যাডাম স্মিথ উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের ফলে দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেহেতু শ্রমবিভাগ বাজারের আয়তনের উপর নির্ভরশীল এবং বাজারের আয়তন সীমাবদ্ধ, সেইজন্যই বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে সব দেশই লাভবান হয়। মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি হিসাবে চরম ব্যয় তত্ত্ব অ্যাডাম স্মিথ প্রবর্তন করেছিলেন। নীচের উদাহরণের সাহায্যে অ্যাডাম স্মিথের তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা যায়। ধরা যাক X ও Y দুটি দেশ এবং দুটি দেশই A ও B দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে। উভয় দ্রব্য উৎপাদনেই একটি উৎপাদনের উপাদান 'শ্রম' ব্যবহার করা হয়। X দেশে A দ্রব্যের ১ ইউনিটের উৎপাদনের ব্যয় ৫ ঘণ্টা শ্রম ও B দ্রব্যের ১ ইউনিট উৎপাদনের ব্যয় ১০ ঘণ্টা শ্রম। অন্যদিকে Y দেশে ১ ইউনিট A উৎপাদনের ব্যয় ১০ ঘণ্টা শ্রম ও ১ ইউনিট B উৎপাদনের ব্যয় ৫ ঘণ্টা শ্রম। উভয় দেশের উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়কে একটি সারণিতে প্রকাশ করা হল।

১ ইউনিট দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় (শ্রম ঘণ্টার মাধ্যমে)

দেশ	A দ্রব্য	B দ্রব্য
X	5	10
Y	10	5

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে A দ্রব্য উৎপাদনে X দেশের ব্যয় সবচেয়ে কম এবং B দ্রব্যটি Y দেশে সব থেকে কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায়। এরকম অবস্থায় বলা হয় যে X দেশটি A দ্রব্য উৎপাদনে এবং Y দেশটি B দ্রব্য উৎপাদনে চরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করছে। অ্যাডাম স্মিথের মতে এরকম সময়ে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে এবং যে দেশে উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম সেই দেশ সে দ্রব্য উৎপাদনে সম্পূর্ণরূপে উৎপাদনের উপাদান নিয়োগ করবে। X দেশটি A দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং B দ্রব্য আমদানি করবে। অন্যদিকে Y দেশটি A দ্রব্য আমদানি ও B দ্রব্য রপ্তানি করবে।

৭১.৫.২ তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্যের তত্ত্ব

১৮১৭ সালে Principles of Political Economy and Taxation বইটিতে ডেভিড রিকার্ডো মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সুবিধা সম্পর্কে একটি যুক্তিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন। ইংল্যান্ড প্রথম শিল্পবিপ্লবের সুফল হিসাবে বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের সুযোগ লাভ করে এবং লক্ষণীয় এই যে মুক্ত বাণিজ্যের সুবিধাজনিত তত্ত্ব এইখানেই প্রবর্তিত হয়।

রিকার্ডোর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কিত তত্ত্ব তুলনামূলক ব্যয়ের নীতির উপর অবস্থিত। রিকার্ডোর তত্ত্ব কতগুলি অনুমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(১) দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হচ্ছে।

(২) দুটি মাত্র দ্রব্য আছে। এই দুটি দ্রব্যেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হচ্ছে।

(৩) দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদান মাত্র একটি—'শ্রম'।

(৪) উভয় দেশে প্রতিটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় শ্রম ঘণ্টার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাপের সঙ্গে ব্যবহৃত শ্রমের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়।

(৫) মজুরি অর্থাৎ শ্রম ঘণ্টার মূল্য দুটি দ্রব্য উৎপাদনে একই রকম হয়। একটি দ্রব্যের মূল্যের দ্বারা প্রকৃত মজুরি পরিমাপ করা যায়।

(৬) দেশের অভ্যন্তরে দুটি দ্রব্যের উৎপাদনের প্রযুক্তি বিভিন্ন ধরনের হয়।

(৭) দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিকের সম্পূর্ণ গতিশীলতা আছে এবং দেশের মধ্যে মজুরির হার এক। কিন্তু দুই দেশের মধ্যে শ্রমিকের গতিশীলতা নেই এবং মজুরির পার্থক্য আছে।

রিকার্ডোর মতে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্যের ফলে দু-দেশের মধ্যে দ্রব্যের আদানপ্রদান হলেও শ্রমিকের গতিশীলতা সম্ভব হয় না। যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্য দুটি ব্যয়ের অনুপাতে পার্থক্য হয় তাহলে ওই দুটি দেশের মধ্যে তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য রয়েছে বলে ধরা হয়। যদি কোনও একটি দেশ উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই ব্যয় সংকোচ ভোগ করে তাহলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হতে পারে, যদি উভয় দেশের ব্যয়ের অনুপাত পৃথক হয়। দুটি দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাতে পার্থক্য থাকলে বাণিজ্য সম্ভব হবে এবং ঐ বাণিজ্য উভয় দেশের পক্ষেই লাভজনক হবে। যে দেশে দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক সুবিধা থাকবে সেই দেশ সেই দ্রব্যটি উৎপাদন এবং রপ্তানি করবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা রিকার্ডোর তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে পারি।

রিকার্ডোর উদাহরণ সাহায্যেই আমরা এই তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করব। ধরা যাক দুটি দেশ রয়েছে—পর্তুগাল ও ইংল্যান্ড। উভয় দেশই দুটি দ্রব্য উৎপাদন করে—মদ ও কাপড়। রিকার্ডোর উদাহরণ অনুসারে পর্তুগাল দুটি দ্রব্য উৎপাদনেই বেশি দক্ষ। পর্তুগালে ১ ইউনিট মদ তৈরি করতে ৪০ ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয় এবং ১ ইউনিট কাপড় তৈরি করতে—৯০ ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয়। ইংল্যান্ডে ১ ইউনিট মদ উৎপাদনে ১২০ ঘণ্টা শ্রম ও ১ ইউনিট কাপড় তৈরি করতে ১০০ ঘণ্টা শ্রম প্রয়োজন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উভয় দ্রব্যের উৎপাদনেই পর্তুগাল চরম ব্যয় সুবিধা ভোগ করছে।

আমরা নীচের সারণির সাহায্যে এটি প্রকাশ করতে পারি।

১ ইউনিট দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম ঘণ্টা		
	মদ	**কাপড়**
পর্তুগাল	৪০	৯০
ইংল্যান্ড	১২০	১০০

এই উদাহরণ অনুসারে দেখা যায় যে যদিও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনে পর্তুগালের চরম ব্যয় সুবিধা আছে কিন্তু মদ উৎপাদনে পর্তুগালের সুবিধা কাপড় উৎপাদন অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি। ১ ইউনিট মদ উৎপাদন করতে পর্তুগালের দরকার ৪০ ঘণ্টা শ্রম এবং ইংল্যান্ডের দরকার ১২০ ঘণ্টা শ্রম। অর্থাৎ ইংল্যান্ডে যা শ্রম দরকার পর্তুগাল তার ৬৭% (৮০/১২০×১০০) খরচেই ১ ইউনিট মদ তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে কাপড় উৎপাদনে পর্তুগালের খরচ কম কিন্তু এই খরচ ইংল্যান্ডের খরচের ৯০% (৯০/১০০×১০০)। এক্ষেত্রে উভয়দ্রব্য উৎপাদনে পর্তুগালের চরম সুবিধা থাকলেও মদ উৎপাদনের ক্ষেত্রে পর্তুগালের তুলনামূলকভাবে সুবিধা বেশি। আবার অন্যদিকে যদিও উভয়ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের চরম ব্যয়াধিক্য আছে, কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে সুবিধা বেশি। আবার অন্যদিকে যদিও উভয়ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের চরম ব্যয়াধিক্য আছে, কাপড় উৎপাদনে তুলনামূলকভাবে ব্যয়াধিক্য কম। মদ উৎপাদনে পর্তুগালে যা ব্যয় ইংল্যান্ডের ব্যয় তার ৫০% বেশি ১২০/৯০×১০০ = ১৫০% অন্যদিকে কাপড়

উৎপাদনে ইংল্যান্ডের ব্যয় ১১% বেশি কারণ ১০০/৯০×১০০ = ১১১%। সুতরাং তুলনামূলকভাবে ইংল্যান্ডের কাপড় উৎপাদনেই কিছুটা সুবিধা রয়েছে।

বাণিজ্য না থাকলে ইংল্যান্ডে ১ ইউনিট মদ ১ ইউনিট কাপড়ের থেকে বেশি মূল্যবান হবে অর্থাৎ ১ ইউনিট মদ ১.২ ইউনিট (১২০/১০০) কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় হবে। অন্যদিকে পর্তুগালে ১ ইউনিট মদ ০.৮৯ (৮০/৯০) ইউনিট কাপড়ের সঙ্গে বিনিময় হবে। এখন ধরা যাক্ দুটি দেশের মধ্যে বিনিময় বা বাণিজ্য শুরু হল। এ ক্ষেত্রে যদি ইংল্যাণ্ড ১ ইউনিট মদ ১.২ ইউনিট কাপড়ের থেকে কমে পায় এবং পর্তুগাল ১ ইউনিট মদের বিনিময়ে ০.৮৯ ইউনিটের বেশি কাপড় পায়, তাহলে উভয়েই লাভবান হবে।

এখন ধরে নেওয়া যাক্ যে ইংল্যান্ড ও পর্তুগালের মধ্যে যখন বাণিজ্য হচ্ছে তখন মদ ও কাপড়ের মধ্যে ১ ঃ ১ এই বিনিময় হার স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ইংল্যান্ড ১ ইউনিট কাপড় রপ্তানি করলে পর্তুগালের কাছে ১ ইউনিট মদ পাবে। আবার পর্তুগাল ১ ইউনিট মদ রপ্তানি করলে বিনিময়ে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ১ ইউনিট কাপড় পাবে। এই বাণিজ্য হার চালু থাকলে উভয় দেশেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে লাভবান হবে।

যদি অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা (autonomy) থাকত তাহলে ১ ইউনিট মদ তৈরি করতে ইংল্যান্ডে ১২০ ঘন্টা শ্রম প্রয়োজন হত। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে ১০০ ঘন্টা শ্রম দিয়ে ইংল্যান্ড কাপড় তৈরি করে তার বিনিময়ে ১ ইউনিট মদ পেতে পারবে। অর্থাৎ বলা যায় এখন ইংল্যান্ড ১০০ শ্রম ঘন্টার বিনিময়ে ১ ইউনিট মদ পাচ্ছে। এই শ্রমের সাহায্যে আরও বেশি কাপড় তৈরি করতে পারে বা শ্রমিকরা বিশ্রাম আকারে এই সময় ব্যবহার করতে পারে। অনুরূপভাবে পর্তুগালও লাভবান হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক দেশ যে সব দ্রব্য তুলনামূলক ব্যয় সুবিধা ভোগ করে সে ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ করে সেই দ্রব্য রপ্তানি করবে এবং যে দ্রব্য উৎপাদনে তুলনামূলক ব্যয় অসুবিধা আছে সে দ্রব্য আমদানি করবে। উভয় দেশেব মধ্যে বিনিময় হার যদি ব্যয় পার্থক্যের মধ্যে থাকে তাহলে বাণিজ্যের ফলে উভয় দেশই লাভবান হবে।

রিকার্ডোর তত্ত্ব কয়েকটি অনুমানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যেগুলি বাস্তবসম্মত নয়।

রিকার্ডোর অনুমানে ধরে নেওয়া হয়েছে যে দুটি দ্রব্য উৎপাদনে একটি মাত্র উৎপাদনের উপাদান-শ্রম ব্যবহার করা হয়েছে। কোনও দ্রব্যের মূল্য সেই দ্রব্য উৎপাদনে কত শ্রম ঘন্টা ব্যবহার করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ মূল্যের শ্রমতত্ত্বের ভিত্তিতেই তুলনামূলক ব্যয়-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। বাস্তবে এই তত্ত্বটি কার্যকরী হয় না। রিকার্ডোর তত্ত্ব অনুসারে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে সমগ্র দেশটি লাভবান হলেও এটি সামগ্রিকভাবে দেশের কল্যাণবৃদ্ধি করবে কিনা আলোচনা করা হয় নি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাণিজ্যহার ও পারস্পরিক চাহিদা ঃ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দুটি দেশের মধ্যে যে আনুপাতিক দামে দ্রব্য বিনিময় হয় তাকে দ্রব্য বিনিময় হার বলা হয়। অর্থ ব্যবহৃত হওয়ায় আমদানি ও রপ্তানির মূল্য একটি বিশেষ মুদ্রার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং বিনিময় হার আমদানি ও রপ্তানি মূল্যের অনুপাত হিসাবে প্রকাশিত হয়।

রিকার্ডোর তত্ত্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বাণিজ্যহার কি ভাবে নির্ধারিত হবে তাহা আলোচিত হয়নি। মিলের মতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চাহিদার গুরুত্ব সম্পর্কে যথাযথ নজর দেওয়া হয়নি। মিল ও মার্শাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে হার নির্ধারণে চাহিদার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। পারস্পরিক চাহিদা ও Offer Curve (প্রস্তাব রেখা) এর ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন।

কোন দেশের প্রস্তাব রেখা (Offer Curve) সে দেশের রপ্তানি পরিমাণের বিনিময়ে আমদানির প্রস্তাবিত পরিমাণ নির্দেশ করে। উপরোক্ত রেখায় ইংল্যান্ডের আপেল রপ্তানীর বিনিময়ে কতটা রুটি আমদানি করতে ইচ্ছুক তা প্রকাশিত হয়েছে। এই রেখার ঢাল উর্দ্ধমুখি কেন না কেবলমাত্র বেশি আপেল রপ্তানি করলে বেশি রুটি আমদানী করা যাবে। OE রেখার ঢাল বর্দ্ধিত হারে বৃদ্ধি পেতে

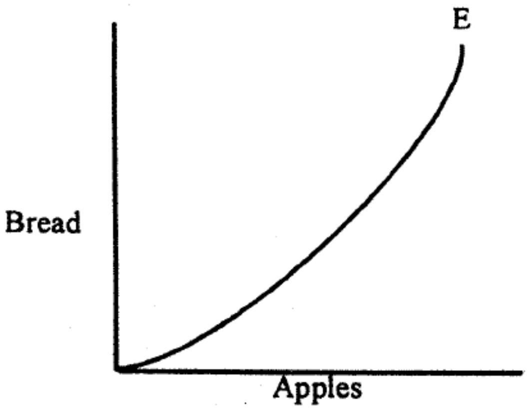

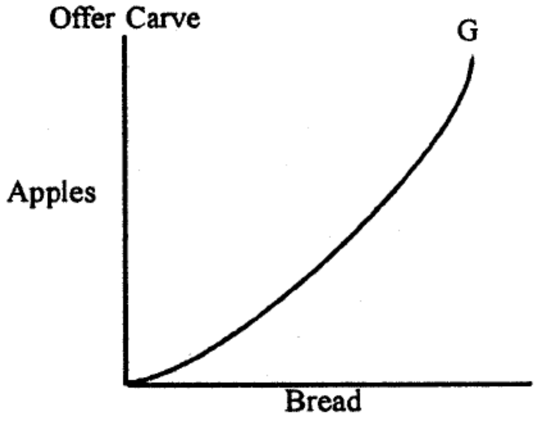

থাকে। কারণ প্রত্যেকটি বাড়তি একক আপেল রপ্তানির বিনিময়ে ইংল্যান্ড আরও বেশি রুটি আমদানি করতে চাইবে। কারণ—

(১) প্রথমতঃ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি অনুসারে আমদানির ফলে রুটির অভ্যন্তরীণ ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায়, রুটির প্রান্তিক উপযোগিতা হ্রাস পাবে। অন্যদিকে রপ্তানির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে আপেলের যোগান কমে যাবে। ফলে অভ্যন্তরীণ ভোগের ক্ষেত্রে আপেলের প্রান্তিক উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

(২) দ্বিতীয়তঃ রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি করলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হবে এবং উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।

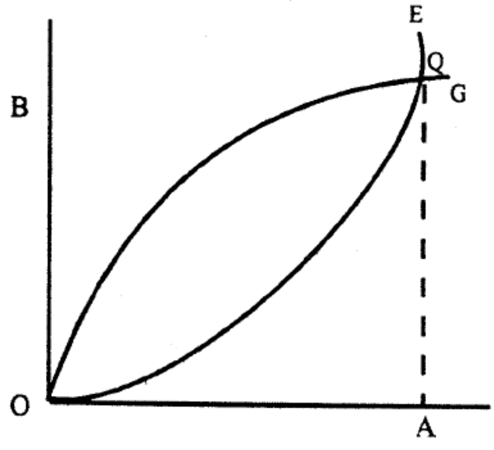

সমান্তরাল অক্ষে ইংল্যান্ড থেকে রপ্তানিকৃত ও জার্মানির আমদানি দ্রব্য আপেল ধরা হল এবং উল্লম্ব অক্ষে জার্মানি থেকে রপ্তানিকৃত ও ইংল্যান্ডে আমদানি দ্রব্য রুটি ধরা হল। OG এবং OE রেখা যথাক্রমে জার্মানি ও ইংল্যান্ডের প্রস্তাব রেখা (Offer Curve)। এই দুটি Q বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে। OQ রেখা আন্তর্জাতিক বিনিময় হার রেখা। বিনিময় হার রেখা ভারসাম্য বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য কোনও দেশের রপ্তানির মূল্য ও আমদানি মূল্য সমান হতে হবে। যদি আপেলের দাম P_a ও রুটির দাম P_b হয় তাহলে $OA \times P_a = OB \times P_b$

$OA \times P_a$ = ইংল্যান্ডের আপেল রপ্তানি ও জার্মানির আপেল আমদানির মূল্য এবং $OB \times P_b$ = জার্মানির রুটি রপ্তানি ও ইংল্যান্ডের রুটি আমদানির মূল্য।

সুতরাং $\frac{OA}{OB} = \frac{P_b}{P_a} = P$

$P = \frac{P_b}{P_a}$ = উভয় দেশের বাণিজ্য বিনিময় হার।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে পারস্পরিক চাহিদার ধারণাও সম্পূর্ণরূপে বোঝা যায়। ইংল্যান্ডের আমদানি দ্রব্য জার্মানির রপ্তানি দ্রব্য এবং জার্মানির আমদানি দ্রব্য ইংল্যান্ডের রপ্তানি দ্রব্য। সুতরাং এক দেশের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যদেশের যোগানই পারস্পরিক চাহিদার প্রতিফলন এবং এর সাহায্যেই বাণিজ্য হার নির্ধারিত হয়।

৭১.৫.৩ হেকমার ওহলিনের তত্ত্ব

হেকমার ওহলিনের তত্ত্ব অনুযায়ী দুটি কারণে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য হয় (১) সমস্ত দেশে সমস্ত উৎপাদনের উপাদান সমভাবে বন্টিত নয়। কোনও দেশে শ্রম সুলভ, কিন্তু মূলধন দুষ্প্রাপ্য। আবার কোনও দেশে মূলধন সুলভ শ্রম দুষ্প্রাপ্য। (২) সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে পদ্ধতি একই রকম নয়। যে দেশে মূলধনের প্রাচুর্য আছে সে দেশ, যে দ্রব্য উৎপাদনে মূলধন-নিবিড় পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়, সে দ্রব্য উৎপাদন করবে, আবার যে দেশে শ্রমিক সুলভ, সে দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদন করবে, যাতে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজন।

হেকমার ওহলিন তত্ত্বটি দুটি দেশ, দুটি দ্রব্য ও দুটি উৎপাদনের অনুমানের ভিত্তিতে গঠিত। ধরা যাক দুটি দেশ, ইংল্যান্ড (E) এবং জার্মানি (G) দুটি দ্রব্য আপেল এবং রুটি শ্রম (L) এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (N) দ্বারা প্রস্তুত করে। দুটি দেশের দুটি উৎপাদনের উপাদান সমানভাবে পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে দুটি উৎপাদনের বাস্তব পরিমাণের অনুপাতের দ্বারা হয়। অথবা প্রাথমিক মূল্যের অনুপাতের সাহায্যে দুটি দেশের দুটি দ্রব্যের পরিমাণগত পার্থক্য প্রকাশ করা যায়। দুটি দেশের চাহিদা অপরিবর্তনীয় থাকলে প্রাথমিক মূল্যের অনুপাত দুটি দেশের দুটি দ্রব্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা যায়। যেমন—

যদি $\left(\frac{L}{N}\right)_E > \left(\frac{L}{N}\right)_G$ তাহলে $\left(\frac{W}{r}\right)_E < \left(\frac{w}{r}\right)_G$

W = Wage

r = rent

এখন আমরা লেনদেন উদ্বৃত্তের চারটি প্রধান শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করব—

পাওনার দিকে এই চারটি শ্রেণী হল (১) দৃশ্য রপ্তানি (Visible export), (২) অদৃশ্য রপ্তানি বা সেবাকার্য রপ্তানি (Invisible export), (৩) প্রতিদানহীন পাওনা (Unrequited receipts) এবং (৪) মূলধনী পাওনা (Capital receipts)। তেমনি দেনার দিকে যথাক্রমে (১) দৃশ্য আমদানি (Visible import), (২) অদৃশ্য বা সেবাকার্যাদি আমদানি (invisible import), (৩) প্রতিদানহীন দেনা (৪) মূলধনী দেনা (Capital payments)।

উপরোক্ত হিসাবে দুটি প্রধান খাত আছে (১) বাণিজ্য দফা (Trade items) এবং অপরটি হস্তান্তর দফা (Transfer items)। হস্তান্তর দফাকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় (১) একতরফা হস্তান্তর (২) মূলধনী হস্তান্তর।

- বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, চলতি খাতে উদ্বৃত্ত ও লেনদেন উদ্বৃত্ত।

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত—দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানির পার্থক্যকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি পরস্পর সমান নাও হতে পারে। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

অদৃশ্য রপ্তানি বা অদৃশ্য আমদানির মূল্যের পার্থক্যকে বলা হয় সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত।

যখন কোনও দেশ অন্য দেশের অধিবাসী উপহার দেয় অথবা দান করে তাহলে একতরফা বা প্রতিদানহীন পাওনা বলা হয়। আবার তেমনি ভাবে প্রতিদানহীন দেনাও হয়। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে।

অর্থাৎ যে দেশে শ্রমিক সুলভ সেখানে মজুরি ও খাজনার অনুপাত কম হবে। এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (Land) যেখানে প্রচুর সেখানে অধিক হবে।

এখানে $\left(\frac{L}{N}\right)_E$ এবং $\left(\frac{L}{N}\right)_G$ ইংল্যান্ডে ও জার্মানির শ্রমিক ও জমির অনুপাত এবং $\left(\frac{W}{r}\right)_E$ এবং $\left(\frac{w}{r}\right)_G$ মজুরি খাজনার অনুপাত যথাক্রমে প্রকাশ করে।

হেকমার-ওহলিনের তত্ত্ব কয়েকটি অনুমানের ভিত্তিতে আলোচিত হয়েছে—

১। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনও পরিবহন ব্যয় নেই বা কোনও অন্যরূপ বাধা নেই।

২। দ্রব্য ও উৎপাদনের উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে।

৩। সমস্ত উৎপাদন আপেক্ষক সমজাতীয় এবং সমানুপাতিক।

৪। উৎপাদন আপেক্ষক দুটি দেশের উৎপাদনের উপাদানের পার্থক্য প্রকাশিত করে।

৫। দুটি দেশের উৎপাদনের আপেক্ষকে পার্থক্য হয় কিন্তু উৎপাদন পদ্ধতি একই থাকে।

হেকমার ও ওহলিন এই দুই সুইডিশ অর্থনীতিবিদের মত অনুযায়ী সাধারণ মূল্যতত্ত্বের সাহায্যেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যখ্যা করা যায়। যে কোনও দ্রব্যের দাম যেমন চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং দাম একক প্রতি উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়—সেভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দাম ঠিক হয়। বাণিজ্যের মূলসূত্র—যাহা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে প্রযোজ্য, তাহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। উৎপাদনের উপাদানের গতিশীলতার অভাব এই তথ্যের তুলনামূলক ব্যয়বিধি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ওহলিনের মতে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেই নয়, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা যায়।

বাণিজ্য নীতি—মুক্ত বাণিজ্য নীতি ও সংরক্ষণ নীতি।

মুক্ত বাণিজ্য নীতি— যে সব তত্ত্ব আমরা আলোচনা করলাম, সমস্ত তত্ত্বই মুক্ত বাণিজ্য নীতির দ্বারাই বিশেষায়ন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক লাভ করা যায়—এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। রিকার্ডোর মতে যেক্ষেত্রে কোন দেশের তুলনামূলক সুবিধা আছে সেক্ষেত্রে সে দেশ বিশেষায়নের দ্বারা সর্বনিম্ন দামে দ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম হয়। হেকমার-ওহলিন মডেলে বাণিজ্যের আগে বা পরে সর্বক্ষেত্রের দুটি উৎপাদনের এমন সমন্বয়ে উভয় দ্রব্য উৎপাদন করা হয় যাতে লাভ সর্বোচ্চ হয়। কিন্তু বাণিজ্যের ফলে উৎপাদন দ্রব্যের গঠন পরিবর্তিত হয় এবং প্রত্যেক দেশ সেই দ্রব্যটিই উৎপাদন করবে, যে ক্ষেত্রে উৎপাদনের উপাদান সুলভ। এর ফলে দেশের ভোগের স্তরও উন্নীত হয়।

সুতরাং রিকার্ডো ও হেকমার ওহলিন তত্ত্ব অনুসারে মুক্ত বাণিজ্য নীতির ফলেই দেশে লাভ বা কল্যাণ সর্বাধিক হবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সবক্ষেত্রে মুক্তবাণিজ্য নীতি কার্যকরী করা যায় না। অধ্যাপক লিওনটিয়েফের মতে উৎপাদনের উপাদান প্রাচুর্যতা ও অপ্রাচুর্যতা দিয়ে বাণিজ্যের ধারা সবসময় ব্যাখ্যা করা যায় না। যদিও আমেরিকায় মূলধনের প্রাচুর্যতা এবং শ্রমের অভাব আছে, তথাপি দেখা যায় চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে আমেরিকা যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদন শ্রম-নিবিড়, সেগুলি রপ্তানি করছে, আর যে সমস্ত দ্রব্য উৎপাদনে মূলধন বেশি লাগে, সেগুলি আমদানি করছে।

বিভিন্ন দেশে উৎপাদনের উপাদানের দামের অনুপাত বিভিন্ন ধরনের হয়। সুতরাং মুক্ত বাণিজ্যের ফলে উৎপাদনের উপাদানের মূল্যের সমতা স্থাপিত হয় না।

বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় অনুন্নত দেশগুলির ক্ষেত্রে মুক্ত বাণিজ্য মোটেও লাভজনক হয়নি। বৈদেশিক বাণিজ্য উন্নয়নের ইঞ্জিন (engine of growth) বা কারণ হয়নি। বরঞ্চ বাণিজ্যের ফলে এই সমস্ত দেশের প্রকৃত সম্পদ দেশের বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছে।

মুক্ত বাণিজ্য নীতির সমালোচনা

(১) প্রত্যেকটি শিল্পোন্নত দেশ উন্নয়নের প্রথম স্তরেও এমনকি পরবর্তী স্তরের সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে যখন শিল্পায়ন শুরু হয়েছে, সমস্ত দেশেই বিদেশি বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সীমাবদ্ধতা ছিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে এ সকল সীমাবদ্ধতা তুলে নেওয়া হয় এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সঙ্গে উপনিবেশগুলির ব্যবসা শুরু হয়। কোনও উপনিবেশ এর দ্বারা উপকৃত হয়নি। পরবর্তীকালে উন্নত দেশগুলিও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছে।

(২) উন্নয়নের প্রয়োজনে অনুন্নত দেশগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজন আছে।

(ক) বিশ্ববাজারে কাঁচামালের মূল্য হ্রাস হলে, যে সমস্ত দেশ এই ধরনের দ্রব্য রপ্তানি করে তাদের ঝুঁকি ও ক্ষতির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ১৯৫০ সালে ল্যাটিন আমেরিকান অর্থনীতিবিদরা মুক্ত বাণিজ্যনীতির এই ত্রুটির জন্য সংরক্ষণের ভিত্তিতে শিল্পায়নের যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। অধ্যাপক প্রেবিশ (Prebish) এর অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন।

(২) মুক্ত বাণিজ্য নীতির ফলে অনুন্নত দেশগুলি দেশগুলি বিদেশি রাষ্ট্রগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এই নির্ভরতা দূরীকরণ উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন। সুতরাং বাণিজ্য নীতিতে সীমাবদ্ধতা থাকার প্রয়োজন আছে।

অনুন্নত দেশগুলির সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করায় উন্নত দেশগুলি ও বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ইত্যাদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি পুরোপুরি সমর্থন করে না। আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন আপস মীমাংসার মধ্যে তা প্রকাশিত হয়।

৭১.৬ লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব

এই ইউনিটে আমরা লেনদেন ব্যালান্সের (Balance of payments) বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমরা প্রথমে লেনদেন ব্যালান্সের সংজ্ঞা আলোচনা করব। কোনও দেশের লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাব বলতে আমরা বুঝি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একদেশের অধিবাসীদের সঙ্গে পৃথিবীর অন্য সকল দেশের অধিবাসীদের যাবতীয় লেনদেনের ধারাবাহিক হিসাব। এই সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য করা হয়। লেনদেনগুলিকে কতগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং একই ধরনের লেনদেনের সমষ্টি প্রকাশ করা হয়।

এই হিসাবে দুটি দিক আছে, একটি দিককে বলে পাওনার দিক (credit side)। অন্যদিককে বলে দেনার দিক (debit side)। দেশ দ্রব্য রপ্তানি করে বিদেশের কাছ থেকে বৈদেশিক মুদ্রা পায়। এই লেনদেনগুলি পাওনার দিকে অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে আমদানি করার ফলে বিদেশে বৈদেশিক মুদ্রা দিতে হয়। এই লেনদেনগুলি দেনার তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

আমরা একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারি।

লেনদেন ব্যালান্সের হিসাব

পাওনা (credits)	দেনা (debits)	
1. দ্রব্য (দৃশ্য) রপ্তানি	2000	
2. দ্রব্য (দৃশ্য) আমদানি	—	1000
3. দ্রব্য আমদানি রপ্তানি ব্যালান্স	1000	—
4. সেবা (অদৃশ্য) রপ্তানি	3000	—

5. সেবা (অদৃশ্য) আমদানি		2000
6. সেবা আমদানি ও রপ্তানি ব্যালান্স	1000	—
7. একতরফা হস্তান্তর উপহার ইত্যাদি	—	1000
চলতি খাতে উদ্বৃত্ত	1000	
স্বল্পকালীন মূলধন		1000
দীর্ঘকালীন মূলধন আমদানি	700	—
Change in official reserve	—	600
	570	5700

এই সারণিতে দুটি দেশের মধ্যে আর্থিক লেনদেনকে দেনা ও পাওনার বিভিন্ন খাতে দেখানো হয়েছে। কোনও দেশের বৈদেশিক ক্ষেত্র থেকে আয় হয় দ্রব্য রপ্তানি (১) সেবা রপ্তানি, একতরফা হস্তান্তর (উপহার ইত্যাদি Item 7) অথবা দীর্ঘকালীন মূলধন আমদানি (বিদেশ থেকে ঋণ) (Item 10) অন্যদিকে ব্যয় হয় দ্রব্য আমদানি (Item 2), সেবা আমদানি ও একতরফা হস্তান্তর (বিদেশিদের উপহার দেওয়া ইত্যাদি (Item 5)। এই সারণিতে (Item 7) দেখানো হয়েছে যে স্বল্পকালীন মূলধন রপ্তানি মূলধন আমদানির থেকে বেশি।

দীর্ঘকালীন মূলধন আমদানি (বৈদেশিক ঋণ) (Item 10) পাওনা খাতে লেখা হয়েছে। দেনার খাতে (Item 12) দেখানো হয়েছে যে বিদেশি মুদ্রার জমার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। দুই তরফা হিসাবের ফলে প্রত্যেকটি লেনদেন দুই দিকেই লেখা হয়। চলতি বছরের আয় ও ব্যয়ের উদ্বৃত্তকে (এই সারণিতে 1–7) চলতি খাতে উদ্বৃত্ত বলা হয়। মূলধনী খাতে দেনা ও পাওনা (সারণিতে 9-11) দ্রব্য ও সেবা খাতে দেনা ও পাওনার (সারণিতে 1-7) প্রতিপূরক।

সুতরাং বাণিজ্য ব্যালান্সকে চলতি ব্যালান্স ও মূলধনী ব্যালান্সে ভাগ করা হয়। অনেক সময় চলতি ব্যালান্সকে দৃশ্য বাণিজ্য ব্যালান্স ও সেবা বাণিজ্য ব্যালান্স—এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত—দৃশ্য রপ্তানি ও দৃশ্য আমদানির পার্থক্যকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানি সমান নাও হতে পারে। বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ঋণাত্মক বা ধনাত্মক হতে পারে।

অদৃশ্য রপ্তানি ও অদৃশ্য আমদানি পার্থক্যকে সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত বলা হয়।

একতরফা পাওনা

যে পাওনার বিনিময়ে দেশকে কিছু দিতে হয় না তাকে হস্তান্তর পাওনা বলা হয়।

চলতি খাতে উদ্বৃত্ত—চলতি বছরের আয় ও খরচের উদ্বৃত্তকে বলা হয় চলতি খাতে উদ্বৃত্ত (Balance of Current Account)।

মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত—মূলধনী খাতে পাওনা ও দেনার মধ্যে যে উদ্বৃত্ত তাকে বলা হয় মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত (Balance of Capital Account)।

লেনদেনের উদ্বৃত্ত—চলতি খাতের উদ্বৃত্ত ও মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত যোগ করলেই লেনদেনের উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়।

কোনও দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও লেনদেনের মধ্যে পার্থক্য এই যে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ধনাত্মক বা ঋণাত্মক হতে পারে; কিন্তু লেনদেনের উদ্বৃত্ত সবসময়েই শূন্য হয়। (Balance of payment always balances)

লেনদেন ব্যালান্সে সমতা (Equality in the balanc of payments)

লেনদেন উদ্বৃত্তের হিসাবে দুই তরফা দাখিলা পদ্ধতি (double entry system of accounting) গ্রহণ করার ফলে এই হিসাবের মোট দেনা ও পাওনা সবসময় সমান থাকে। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এই পদ্ধতিতে প্রতিটি লেনদেনই দুদিকে লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি দিককে বলা হয় গ্রহীতার দিক (debit side) এবং আর একটি দিককে বলা হয় দাতার দিক (credit side)। যখনই কোনও লেনদেন সংঘটিত হয়, তখনই গ্রহীতা ও দাতা দুপক্ষ থাকে এবং হিসাবের খাতায় দুটি পক্ষই লিপিবদ্ধ করা হয়। দুটি তরফা দাখিলা তত্ত্ব গ্রহণ করার ফলে মোট দেনা ও মোট পাওনা সবসময়েই সমান হয়। এই ঘটনাটিকেই বলা হয় যে লেনদেন ব্যাল্যান্সে সকল সময়েই সমতা রয়েছে। কিন্তু এই সমতা হল হিসাব শাস্ত্রীয় সমতা। এই সমতার দ্বারা লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্য সূচিত হয় না।

উদাহরণ দিয়ে এই ঘটনাটি বোঝানো যায়।

ধরা যাক একটি দেশ কিছু পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করেছে। এতে দেশের সম্পত্তি বেড়ে গেল। এটি debit বা গ্রহীতার দিকে অন্তর্ভুক্ত হবে। আবার এই পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করার জন্য দেশকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে হল, সেটি দেশের সম্পত্তি কমিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ দেশে দায় (Liability) বাড়িয়ে দিচ্ছে। সুতরাং সমপরিমাণ অর্থ দাতার দিকে (credi side) অন্তর্ভুক্ত হলো। এই ভাবে দেখা যায় যে প্রতিটি লেনদেনই বৈদেশিক লেনদেনের হিসাবে দুটি জায়গায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং debit side-এর দফাগুলির (item) যোগফল credit side-এর দফাগুলির যোগফলের সমান হবে। লেনদেন ব্যালান্সে সবসময় সমতা থাকার অর্থ কিন্তু এই নয় যে বৈদেশিক বাণিজ্যে কখনই উদ্বৃত বা ঘটতি হচ্ছে না। এটি দুই তরফা হিসাব দাখিল পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলশ্রুতি। এটি একটি অভেদ (identity) মাত্র।

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য—বৈদেশিক লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য আছে কিনা সেটি জানার জন্য বৈদেশিক লেনদেনগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করি—(১) স্বয়ম্ভুত লেনদেন (autonomous transactions), (২) উদ্ভুত লেনদেন (induced transactions)। স্বয়ংভুত লেনদেন বলতে আমরা সেই লেনদেনগুলিকেও বুঝি যেগুলি অর্থনৈতিক ইউনিট স্বেচ্ছায় ও স্বতস্ফূর্তভাবে করে থাকে। অপরদিকে স্বয়ম্ভুত লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে যে যে লেনদনে হয়, তাকে উদ্ভুত লেনদেন বলা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য আছে কিনা সেটি জানার জন্য আমাদের শুধুমাত্র স্বয়ম্ভুত লেনদেনগুলিকেই ধরতে হবে। যদি স্বয়ম্ভুত লেনদেন থেকে উদ্ভুত পাওনা এবং স্বয়ম্ভুত লেনদেন থেকে উদ্ভুত দেনা পরস্পর সমান হয় তাহলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রয়েছে। স্বয়ম্ভুত পাওনা যাদি স্বয়ম্ভুত দেনা থেকে বেশি হয়, তাহলে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি হবে। লেনদেনের উদ্বৃত্তের মোট স্বয়ম্ভুত পাওনা ও মোট স্বয়ম্ভুত দেনার পরিমাণ অসমান হলেই সেই দেশের স্বর্ণভাণ্ডার বা বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের হ্রাস বা বৃদ্ধি

হবে। এই পরিবর্তনই হল লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতার পরিচায়ক। অধ্যাপক সডারস্টনের মতে কোনও দেশে বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের অপরিকল্পিত বা অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তন না ঘটলেই বলা যায় যে, লেনদেন উদ্বৃত্তে ভারসাম্য আছে।

৭১.৬.১ লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি সংশোধনের পদ্ধতিসমূহ

কোনও দেশে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দিলে অর্থনীতিতে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। সেইজন্য ভারসাম্যহীনতার প্রতিকার করা প্রয়োজনীয়।

ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরা মনে করতেন যে, লেনদেনের উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীনতা স্বয়ংক্রিয় ভাবেই দূর হয়ে যাবে। কোনওরকম প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বর্ণমানের যুগে সোনার আমদানি ও রপ্তানির মধ্য দিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবেই এই ভারসাম্যহীনতা দূরীভূত হত।

নয়া ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদরাও মনে করতেন যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভারাসাম্যহীনতা দূর হবে। তবে স্বর্ণমান পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে বৈদেশিক বিনিময়ের হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে লেনদেনর ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করা হয়। কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা না থাকলে বিনিময়ের হারের পরিবর্তন লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ হয়।

সুতরাং অনেক অর্থনীতিবিদের মতে লেনদেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্যহীন দূর করার জন্য পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, এই উদ্দেশ্যে দুটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় প্রধানতঃ (১) রপ্তানি প্রসার, (২) আমদানি হ্রাস।

রপ্তানি প্রসার—ঘাটতি দেশের রপ্তানির জন্য চাহিদা আসে বিদেশ থেকে। কাজেই রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে ঘাটতি দেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করার জন্য উৎপাদন ব্যয় ও দাম কমানো, রপ্তানি দ্রব্যের গুণগত মানের উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। তাছাড়া, রপ্তানি-আমদানি চুক্তি বা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক চুক্তির মাধ্যমে নতুন নতুন দেশে রপ্তানি সম্প্রসারণের চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমদানি হ্রাস—আমদানি দ্রব্যের চাহিদা ঘাটতি দেশেব নিজস্ব ব্যাপার। কাজেই ঘাটতি দেশ আমদানি হ্রাসের জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা না থাকলে বিনিময়ের হারের পরিবর্তন লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য রাখতে ব্যর্থ হয়।

লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি সংশোধনের পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ—

কোনও দেশে যদি ধারাবাহিকভাবে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি থাকে, তাহলে সে দেশের মজুত স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু হ্রাস পাবে। এই ধরনের অবস্থা দেশের অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। সুতরাং লেনদেন ব্যালান্সে সমতা স্থাপনের জন্য সংশোধনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

প্রথমতঃ আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ঘাটতি সংশোধন করা যায়। প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্সের কারণই আমদানির পরিমাণ রপ্তানির পরিমাণ থেকে অধিক হওয়া। সুতরাং আমদানির পরিমাণ হ্রাস ও রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করাই প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

রপ্তানি প্রসার—ঘাটতি দেশের রপ্তানির জন্য চাহিদা আসে অন্য দেশ থেকে। কাজেই রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ঘাটতি দেশকে অন্য দেশেব উপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ইত্যাদি করা যেতে পারে। রপ্তানিজাত দ্রব্যের ব্যয় কমানোর জন্য রপ্তানি শুল্ক হ্রাস ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া যায়। রপ্তানি দ্রব্যের গুণগতমানও বৃদ্ধি করতে হবে।

আমদানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা যায়।

(১) আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্য আমদানি শুল্ক ধার্য করা হলে আমদানি দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাবে। ফলে দেশের লোকেরা আমদানি দ্রব্য না কিনে দেশীয় দ্রব্য কিনতে আগ্রহী হবে।

(২) মোট আমদানির উপর পরিমাণগত বিধিনিষেধ বা কোটা আরোপ করে কোনও দ্রব্যের আমদানির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। যারা আমদানি করবে তাদের বিশেষ অনুমতি বা লাইসেন্স দেওয়া হয়।

(৩) বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যদি দেশের মুদ্রার দাম বিদেশি মুদ্রার মূল্যের তুলনায় কমিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ যদি দেশীয় মুদ্রার অবমূল্যায়ন ঘটে, তাহলে, আমদানি করা দ্রব্যের দাম দেশে বেড়ে যায়। ফলে আমদানি কমবে। এর ফলে পরোক্ষভাবে রপ্তানি বাড়ারও সম্ভাবনা থাকে। বিদেশি মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদেশের বাজারে মুদ্রা অবমূল্যায়নকারী দেশের জিনিসের দাম কমে যাবে।

(৪) মুদ্রা সংকোচনের মাধ্যমেও আমদানি কমানো সম্ভব। যদি বাজারে মুদ্রার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে মুদ্রার মূল্য বেড়ে যাবে ও মূল্যস্তর কমে যাবে। সুতরাং এর ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে এবং আমদানি কমবে।

(৫) বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ—লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি সংশোধনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা যেতে পারে। যেমন কোনও দেশে নিয়ম থাকতে পারে যে ঐ দেশের অধিবাসীরা যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে, তার সমস্তটাই আর্থিক কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে হবে। আবার কোন দেশের অধিবাসীরা যে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করবে, তার সবটাই দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিনতে হবে অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারেই বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার করা যাবে।

এ সকল উপায় ছাড়া আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার থেকে স্বল্পকালীন ঋণগ্রহণ, দেশের মজুত স্বর্ণ থেকে স্বর্ণ রপ্তানি বিদেশি রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণগ্রহণ করেও লেনদেন ব্যালান্সের ঘাটতি মেটানো যায়।

৭১.৭ বাণিজ্য শর্ত বা বাণিজ্য হার

যে কোনও দুটি দেশের মধ্যে দুটি দ্রব্য নিয়ে বাণিজ্য হলে ঐ দুটি দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যের শর্তের মাধ্যমে বিনিময় হয়। ইহাকেই বাণিজ্য শর্ত বা বাণিজ্য হার বলা হয়। বাণিজ্য হারকে দ্রব্যগতভাবে অথবা দুটি দেশের মধ্যে যে কোনও একটি দেশেব মুদ্রার হিসাবে প্রকাশ করা যায়। বাণিজ্য হার যদি দুটি দ্রব্যের পরিমাণের অনুপাত হিসাবে প্রকাশিত হয় তাহলে তাকে দ্রব্যগত বাণিজ্য হার (Barter terms of trade) বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে রপ্তানি দ্রব্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে আমদানি দ্রব্যের বিনিময় হয় না। রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য স্বদেশি মুদ্রার হিসাবে এবং আমদানি দ্রব্যের মূল বিদেশি মূদ্রার হিসাবে প্রকাশিত হয়। বাণিজ্য শর্ত বা বাণিজ্য হার পারস্পরিক চাহিদার উপর নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে কোনও দেশের রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা যদি কম হয় এবং যোগান যদি বেশি হয়, বাণিজ্য হার রপ্তানি দ্রব্যের প্রতিকূল যাবে। বিপরীত পক্ষে যদি রপ্তানি দ্রব্যের চাহিদা বেশি হয়, যোগান কম হয়, বাণিজ্য হার রপ্তানি দ্রব্যের অনুকূলে যাবে।

বাণিজ্য শর্তকে আমরা নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারি—

$$\text{বাণিজ্য হার} = \frac{\text{আমদানি দ্রব্যের মূল্য}}{\text{রপ্তানি দ্রব্যের মূল্য}}$$

$$= \frac{\text{আমদানি দ্রব্যের দাম} \times \text{আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ}}{\text{রপ্তানি দ্রব্যের দাম} \times \text{রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ}}$$

আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলে বাণিজ্য শর্ত বা বাণিজ্য হার হবে = $\frac{\text{আমদানি মূল্য}}{\text{রপ্তানি মূল্য}}$

এই দামের সূচক থেকে দামের পরিবর্তনজনিত বাণিজ্যহারের পরিবর্তন সম্বন্ধে সহজেই ধারণা করতে পারি।

৭১.৮ বিনিময় হার (Rage of exchange)

কোনও দেশের মুদ্রার এক ইউনিটের বিনিময়ে অন্য দেশের মুদ্রা কত ইউনিট পাওয়া যাবে, সেটিই হল সেই মুদ্রা দুটির বিনিময় হার।

এখন দুটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার কীভাবে নির্ধারিত হয়, সেটি দেখা যাক্—

(১) স্বর্ণমানের অধীনে বিনিময় হার—যে দুটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য হচ্ছে, দুটি দেশেই যদি স্বর্ণমান চালু থাকে তাহলে উভয় দেশের মুদ্রার স্বর্ণের পরিমাণের ভিত্তিতে বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। স্বর্ণের মারফত এই বিনিময় হার স্থির হয় বলে একে বলে টাঁকশালের বিনিময় হার (Mint par of exchange) বলা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে বিনিময় হার ঐ হার থেকে সামান্য পৃথক হয় এবং বিনিময় হারের ওঠানামা স্বর্ণ আমদানি বিন্দু ও স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর মধ্যে সীমাবন্ধ থাকে। টাঁকশালের বিনিময় হারের সঙ্গে ব্যাঙ্ক কমিশন, যা পরিবহণজনিত ব্যয় ইত্যাদি যোগ করেই প্রকৃত বিনিময় হার স্থির হয়।

(২) কাগজীমানের অধীনের বিনিময় হার—কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে বিনিময় হার নির্ধারণ সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব আছে।

(ক) ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব

(খ) চাহিদা যোগান তত্ত্ব

ক্রয় ক্ষমতার তত্ত্ব—সুইডিশ অর্থনীতিবিদ গুস্তাভ ক্যাসেল এই তত্ত্বটি প্রবর্তন করেন। এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য হল যে দুটি দেশেব মধ্যে বিনিময় হার ঐ মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। কোনও দেশের মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয় ক্ষমতা ওই দেশের দামস্তরের উপর নির্ভর করে। কাজেই দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ দামস্তরের তুলনার মাধ্যমে এ দুটি দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার স্থির হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ইংল্যান্ডে যে দ্রব্য এক পাউন্ডে পাওয়া যায়, সে দ্রব্যই যদি ভারতবর্ষে ১৬ টাকায় পাওয়া যায়, তাহলে ১ পাউন্ডের ক্রয় ক্ষমতা ১৬ টাকার সমান। সুতরাং ক্রয় ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব অনুযায়ী বিনিময় হার হবে ১ পাউন্ড = ১৬ টাকা।

এই তত্ত্বের প্রধান গুণ হল যে এই তত্ত্বে বিনিময় হারকে অর্থের ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রধান ত্রুটি এই যে কোন্ কোন্ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ক্ষমতা নির্ধারণের জন্য অর্থভুক্ত করা হবে তা সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়নি। সকল দেশের অধিবাসীরা একই ধরনের সামগ্রী ভোগ করে না। ফলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা তুলনা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, মূলধনের আদান প্রাদন, আন্তর্জাতিক চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিনিময় হার নির্ধারণে বাণিজ্য হারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অর্থের ক্রয়-ক্ষমতা সমতা তত্ত্বে এগুলির উল্লেখ নেই।

বিনিময় হার নির্ধারণে চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব—

(Demand and supply theory for the Determination of the Rate of Exchange)

আধুনিক অর্থনীতিবিদদের মতানুসারে অন্যান্য দ্রব্যের মতো কোনও দেশের মুদ্রার বর্হিমূল্য বা বিনিময় হার বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যে বিনিময় হারে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হয়,তাকে ভারসাম্য বিনিময় হার বলা হয়।

কোনও একটি দ্রব্যের বাজারে যেমন ভারসাম্য বিন্দু ঐ দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের ছেদ বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, সেরকমই বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা ও যোগানের ছেদ বিন্দুতেই ভারসাম্য হার নির্ধারিত হয়। বিষয়টি নীচের রেখাচিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

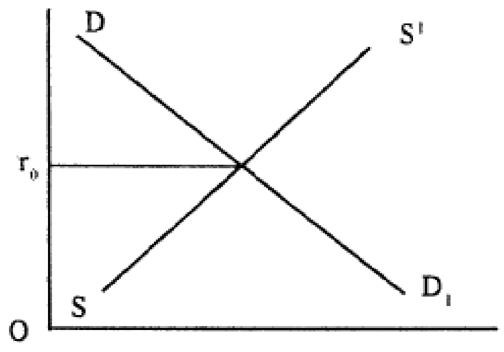

DD′ ও SS′ রেখা যথাক্রমে বিদেশি মুদ্রা, পাউন্ডের চাহিদা ও যোগান রেখা। ধরে নেওয়া যাক যে পাউন্ডের চাহিদা রেখা নিম্নভিমুখী ও যোগান রেখা ঊর্ধ্বাভিমুখী। এই দুটি রেখা P বিন্দুতে পরস্পর

ছেদ করে P বিন্দুতে O হল বিনিময় হার এবং এই বিনিময় হারই হল ভারসাম্য বিনিময় হার।

কোনও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা আসে লেনদেন ব্যালান্সের দেনার দিক থেকে এবং যোগান আসে লেনদেন ব্যালান্সের পাওনার দিক থেকে। সুতরাং চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব অনুসারে লেনদেন ব্যালান্সের উপর বিনিময় হার নির্ভর করে। লেনদেন ব্যালান্সে উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি দেখা দিলে বিনিময় হার পরিবর্তিত হয়। লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য থাকলে স্বয়ম্ভূত দেনা বা পাওনার মধ্যে সমতা সমতা বজায় থাকে তখনই ভারসাম্য বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

৭১.৯ সারাংশ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হল আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ। অ্যাডাম স্মিথের চরম ব্যয় পার্থক্য তত্ত্ব অনুযায়ী যদি একটি দেশ একটি দ্রব্য কম করচে উৎপাদন করতে পারে, অন্য আর একটি দেশ অন্য দ্রব্যটি কম খরচে উৎপাদন করতে পারে, তাহলে উভয় দেশের মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে।

রিকার্ডোর মতে একটি দেশ যদি উভয় দ্রব্যই কম খরচে উৎপাদন করতে পারে, কিন্তু উভয় দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত দুটি দেশে পৃথক হয়, তাহলেও উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য হবে। ব্যয় অনুপাত পৃথক হলেই তুলনামূলক ব্যয়ের পার্থক্য আছে বলা হয়।

হেমকার-ওহলিন তত্ত্বের মূল কথা বল যে-দুটি দেশের উৎপাদনের উপাদান বণ্টনের পার্থক্য এবং বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতির বিভিন্নতার জন্য দুটি দেশে তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য দেখা দেয়।

রপ্তানি ও আমদানির হিসাবকে বলে বাণিজ্য ব্যালান্স ও বাণিজ্যিক হিসাব। লেনদেন হিসাবের তিনটি অংশ (১) দৃশ্য ও অদৃশ্য তালিকা, (২) মূলধনের স্থানান্তর বা আনাগোনা (Capital movements)

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত, চলতি খাতে উদ্বৃত্ত ও লেনদেন উদ্বৃত্ত দৃশ্য আমদানি ও দৃশ্য রপ্তানির মধ্যে পার্থক্যকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বলা হয়। সেবামূলক কার্যাদির আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য বলে সেবামূলক কার্যাদির উদ্বৃত্ত। একতরফা দেনা পাওনার উদ্বৃত্তকে বলে একতরফা দেনা পাওনার উদ্বৃত্ত। তিনটি উদ্বৃত্তকে যোগ করলে আমরা পাই চলতি খাতে উদ্বৃত্ত। মূলধনী খাতের দেনা ও পাওনার পার্থক্যকে বলা হয় মূলধনী খাতের উদ্বৃত্ত। চলতি খাতের উদ্বৃত্ত ও মূলধনী খাতে উদ্বৃত্ত যোগ করলে আমরা পাই লেনদেনের ব্যালান্স।

লেনদেন ব্যালান্সে সমতা ঃ লেনদেন ব্যালান্সের হিসাবটি তৈরি করার সময় দুই তরফা দাখিলা (Double entry) পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ প্রতিটি লেনদেনই দাতা ও গ্রহীতার দিকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে দুটি দিকের যোগফল সবসময় হয়।

লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ঃ লেনদেন দুরকমের হয়। স্বয়ম্ভূত (autonomous) এবং সমন্বয় বিধানকারী (accommodating or induced)। যে লেনদেন বিভিন্ন অর্থনৈতিক ইউনিট স্বেচ্ছায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে করে, সেগুলিকে স্বয়ম্ভূত লেনদেন বলে। যে লেনদেনগুলি স্বয়ম্ভূত লেনদেনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত অবস্থার জন্য হয়, সেগুলিকে উদ্ভূত বা সমন্বয়কারী লেনদেন বলে। স্বয়ম্ভূত লেনদেন থেকে উদ্ভূত দেনাপাওনা সমান হলে লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য হয়েছে বলা হয়।

লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি সংশোধনের জন্য প্রধানত রপ্তান প্রসার ও আমদানি সংকোচনের চেষ্টা করা হয়। রপ্তানি প্রসারের জন্য উৎপাদন ব্যয় কমালে, রপ্তানি শুল্ক কমানো এবং রপ্তানি দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হয়। আমদানি কমানোর জন্য আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা, আমদানির পরিমাণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা এবং প্রয়োজনমতো বিনিময় হারও নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

বিনিময় হার নির্ধারণ—কোনও দেশের মুদ্রার ১ ইউনিটের সঙ্গে অন্য দেশের মুদ্রা কত ইউনিট পাওয়া যায়, তাকে মুদ্রার বিনিময় তাঁর হার বলে।

স্বর্ণমান ও কাগজীমানে ভিন্ন ভিন্ন নীতি অনুসারে বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

স্বর্ণমানের অধীনে বিনিময় হার স্বর্ণ আমদানি বিন্দু ও স্বর্ণ রপ্তানি বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

কাগজীমানের অধীনে বিনিময় হার (১) ক্রয়ক্ষমতার সমতা তত্ত্ব, (২) চাহিদা-জোগান তত্ত্বের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়।

(১) ক্রয়ক্ষমতার তত্ত্ব অনুসারে দুই দেশের মুদ্রার অভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার দ্বারা বিনিময় হার নির্ধারিত হয়।

(২) চাহিদা ও জোগান তত্ত্বের মতে যে কোনও দ্রব্যের মত বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য ও চাহিদা ও যোগান দ্বারা নির্ণীত হয়।

শব্দগুচ্ছ

(১) মুক্ত অর্থনীতি— যে অর্থনীতি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও আথিক লেনদেনের দ্বারা যুক্ত।

(২) বন্ধ অর্থনীতি (Closed economy)—যে অর্থনীতিতে পৃথিবীর অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক বা আর্থিক সম্পর্ক নেই।

(৩) বিনিময় হার—দেশীয় মুদ্রায় বিদেশি মুদ্রার মূল্য।

(৪) বাণিজ্য হার—যে হারে দুটি দ্রব্যের বিনিময় হয়।

৭১.১০ অনুশীলনী

১। একটি দেশ যদি দুটি দ্রব্যই অপর দেশ কম ব্যয়ে উৎপাদন করতে পারে, তাহলে কি দুটি দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অনুষ্ঠিত হবে।

২। দুটি দেশের মধ্যে কোন ব্যয় পার্থক্য দেখা দেয়, সে সম্পর্কে হেকমার-ওহ্‌লিন তত্ত্বের বক্তব্যটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। "লেনদেন ব্যালান্সে সকল সময়েই সমতা রয়েছে"—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

৪। কোনটি ঠিক যাচাই করে বলুন—

(ক) পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে (১) বন্ধ অর্থনীতি (Closed economy) (২) মুক্ত অর্থনীতি (৩) স্বয়ং নির্ভর অর্থনীতি, (৪) বাণিজ্যবিহীন অর্থনীতি দেখা যায়।

(খ) সংরক্ষণের পক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি দেওয়া হয়—(১) বিদেশি সুলভ শ্রমিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে দেশীয় শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য (২) দেশের বেকারত্ব হ্রাস করার জন্য

(৩)শিল্ড শিল্প ও দেশের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিল্পগুলি রক্ষার করার জন্য (৪) সবগুলির জন্যই। (গ) নিম্নলিখিত কোন বিষয়টি লেনদেন ব্যালান্সের চলতি খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়— (১) দ্রব্য ও সেবা রপ্তানি (২) দ্রব্য ও সেবা আমদানি (৩) মূলধন প্রবাহ (৪) সরকারি অনুদান।

৭১.১১ গ্রন্থপঞ্জী

Soderston Bo International Economics

Chacoliade, Mitrades —International Trade.